চতুরঙ্গ দ্বাদশ বর্ষ প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৫৭

মার্ক্‌স্‌বাদ্‌ ও নীতিবিজ্ঞান

নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

নীতিবিজ্ঞানের স্বরূপ : মার্ক্‌সীয় দর্শনে নীতিবিজ্ঞানের স্থান কি এই সম্বন্ধে অনেক সময়েই জিজ্ঞাসু ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ প্রশ্ন তুলিয়া থাকেন, এবং এই প্রশ্নের যথাযথ আলোচনা ও সমাধান অত্যাবশ্যক। এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য অধুনা পুস্তকাদি ও প্রবন্ধাদি লিখিত হইয়াছে। অনেকে মনে করেন যে মার্কসীয় সমাজনীতির ও অর্থনীতির সঙ্গে নীতিবিজ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই, কারণ, মার্ক্‌স্‌বাদ্‌ সমাজকে ও অর্থনৈতিক সমাজব্যবস্থাকে বিশেষ এক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া অনুধাবন করে এবং ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় হইল সমাজের ও সমাজিক আর্থিক পরিস্থিতির ঐতিহাসিক প্রগতির দ্বান্দ্বিক নিয়মাবলি বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্থিরিকৃত করা। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে মার্ক্‌সীয় চিন্তাধারার সঙ্গে নীতিবিজ্ঞানের কোন যোগ নাই। কিন্তু মার্ক্‌সীয় দার্শনিকগণ বলেন, যে, সমাজ বিজ্ঞানের সঙ্গে নীতিবিজ্ঞানের কোন দ্বন্দ্ব নাই এবং যাহাই সমাজ-বিজ্ঞান সম্মত, তাহাই নীতিবিজ্ঞান সম্মত। এই প্রশ্নের সমাধান করিবার পূর্ব্বে নীতিবিজ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রাথমিক আলোচনা আবশ্যক মনে করি।

এই প্রবন্ধে নীতিবিজ্ঞান, নীতিধর্ম্ম, নীতিদর্শন, নীতিশাস্ত্র এক অর্থে ব্যবহৃত হইবে। ধর্ম্ম শব্দটির দুইটি অর্থ প্রচলিত। এক অর্থে ইংরেজি রিলিজিয়ন্‌ শব্দটির প্রতিশব্দ রূপে ধর্ম্ম শব্দটি ব্যবহৃত হয়। অন্যার্থে যে সমস্ত বিধি অথবা নিয়ম ব্যবহারিক জীবনে অনুসরণ করিলে ব্যক্তির এবং সমাজের

মঙ্গল হয় সেই সব মানসিক ও ব্যবহারিক নিয়মাবলিকে অথবা বিধি সমূহকে ধর্ম্ম বলিয়া অবিহিত করা হয়। আমি এই প্রবন্ধে ধর্ম্ম শব্দটি, আবশ্যক হইলে দ্বিতীয়ার্থে ব্যবহার করিব।

নীতিশাস্ত্রের অথবা ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারনা থাকা আবশ্যক। যে সব মানসিক বৃত্তি, বাক্য অথবা কর্ম্ম মানুষের ব্যক্তিগত অথবা সামাজিক জীবনে মঙ্গলকর উহাদিগকে আমরা নীতিসঙ্গত অথবা ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া থাকি। কতকগুলি বাক্য, কর্ম্ম ও চিন্তাকে আমরা বলি ন্যায়সঙ্গত অথবা অন্যায়, ভাল অথবা মন্দ। কাম, ক্রোধ লোভ, মোহ, মাৎসর্য্য, প্রভৃতিকে আমরা অন্যায় অথবা নীতি-বিরুদ্ধ মানসিক বৃত্তি বলিয়া মনে করি। সেইরূপ অপ্রিয়, অসত্য, রূঢ় অথবা অযথা বাক্যকে আমরা অন্যায় অথবা নীতিবিরুদ্ধ বাক্য বলিয়া অবিহিত করি। তদ্রূপ আমরা চুরি ডাকাতি প্রাণহানি প্রতারণা নিষ্ঠুরতা হিংসা প্রভৃতি কর্ম্মকে আমরা অন্যায় কর্ম্ম অথবা নীতিবিরুদ্ধ কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত করি। যে সব মানসিক বৃত্তি বাক্য অথবা কর্ম্ম ন্যায়সঙ্গত অথবা নীতিসঙ্গত তাহাই ভাল এবং যাহা উহাদের বিপরীত তাহাই মন্দ। ভাল ও মন্দ এই শব্দ দুইটির ব্যপকতর অর্থও আছে, যথা, ভাল আম অথবা খারাপ আম ; ভাল কাপড় অথবা মন্দ কাপড় ; ভাল জল অথবা খারাপ জল ইত্যাদি। এইরূপ প্রয়োগে ভাল অথবা মন্দ ; এই শব্দ দুইটির কোন নৈতিক অর্থ নাই। কিন্তু অন্যত্র ভাল ও মন্দ এই দুইটি শব্দ নীতিসঙ্গত ও নীতি বিরুদ্ধ, এই অর্থে যথাক্রমে প্রযুক্ত হয়।

যাহা ন্যায়সঙ্গত অথবা ধর্ম্মানুমোদিত তাহা অনুসরণ করা আমাদের কর্ত্তব্য এবং যাহা উহার বিরুদ্ধ তাহা করা আমাদের অকর্ত্তব্য। সুতরাং আমরা যে সব কাজ করি তাহাদের কতগুলি আমাদের করা উচিত অথবা কর্ত্তব্য এবং উহাদের কতগুলি আমাদের করা উচিত নয় অথবা অকর্ত্তব্য। কর্ত্তব্য কাজ আমাদিগকে মঙ্গলের পথে অগ্রসর করে এবং অকর্ত্তব্য কাজ, মঙ্গলের পরিপন্থী। আমাদের জ্ঞান-সাধনা অথবা সৌন্দর্য্য-সাধনা মঙ্গলের সহায়ক অথবা পরিপন্থী হইতে পারে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এমন ভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে যাহাতে জীবের উপকার অথবা অপকার সাধিত হয়। সেইরূপ সৌন্দর্য্য স্পৃহা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য আমরা মহৎ অথবা নীচ প্রবৃত্তির আশ্রয় লইতে পারি। সত্য-সাধনা জ্ঞান স্পৃহাকে পরিতৃপ্ত করে এবং সুন্দরের সাধনা আমাদের অনুভূতিকে

(ইমোষন্‌) পরিতৃপ্ত করে। কিন্তু প্রয়োগ ক্ষেত্রে সত্যের ও সুন্দরের বিকার আমরা দেখিতে পাই, এবং এই সব ক্ষেত্রে সত্য ও সুন্দর মঙ্গলের পরিপন্থী।

মানসিক বৃত্তির সঙ্গে বাক্যের ও কর্ম্মের ঘনিষ্ঠ যোগ। সেই জন্যই মনোবিজ্ঞানের সহিত নীতি-বিজ্ঞানের যোগ ঘনিষ্ঠ। আমাদের কামনা বাসনা আশা আকাঙ্খা প্রভৃতির প্রেরণা অথবা প্রবৃত্তি কর্ম্মের উৎস। আমরা আমাদের প্রয়োজন মিটাইতে চাই। ইহাদের মধ্যে কতগুলি প্রয়োজন না মিটাইলে আমাদের চলে না। এইসব প্রয়োজনের পশ্চাতে আছে আমাদের কতগুলি আদিম প্রবৃত্তি, যথা, ক্ষুধা তৃষ্ণা যৌন প্রবৃত্তি ইত্যাদি। খাদ্য না হইলে আমরা বাঁচিতে পারিনা। সেইরূপ আমরা গৃহ বস্ত্র প্রভৃতির প্রয়োজন অনুভব করি। যৌন প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত করার ফলে বংশ রক্ষা হয়। সভ্যতা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নব নব কামনার ও বাসনার উদ্ভব হয় এবং মানুষ ইহাদিগকে পরিতৃপ্ত করা আবশ্যক মনে করে। সভ্য মানুষ শিক্ষা স্বাস্থ্য উত্তম বাসগৃহ উপযুক্ত সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা মানবহিতকর কার্য্য সৌন্দর্য্য-সাধনা জ্ঞান-সাধনা প্রভৃতিকে কাম্য বলিয়া মনে করে। আমরা যাহা কামনা করি তাহাই কাম্য নহে। পরের ক্ষতি করিয়া আমি যদি নিজের সুখের কামনা করি, সেরূপ কামনা কাম্য অথবা ন্যায় সঙ্গত নহে। সুতরাং কতগুলি প্রবৃত্তি কামনা অথবা বাসনার পরিতৃপ্তি ন্যায় সঙ্গত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে উহাদের পরিতৃপ্তি ন্যায় বিরুদ্ধ। ক্ষুন্নিবৃত্তি আবশ্যক কিন্তু লোভের বশবর্ত্তী হইয়া অতিরিক্ত ভোজন করিয়া শরীর নষ্ট করা অন্যায় এবং উহা বর্জ্জনীয়। অত্যাবশ্যক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা ন্যায় সঙ্গত কিন্তু পরস্বাপহরণ করিয়া অথবা পরপীড়ন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা অন্যায়। জ্ঞান লাভ করা কর্ত্তব্য কিন্তু জ্ঞানের অসদ্ব্যবহার করা অথবা অন্য কোন কাম্যতর কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়া জ্ঞানার্জ্জন করা অন্যায়। সুতরাং আমরা দেখিতেছি কামনা অথবা প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি করা স্থান বিশেষে ন্যায় সঙ্গত অথবা অন্যায় হইতে পারে। প্রথমতঃ আমাদের কামনার উদ্দেশ্য ন্যায়সঙ্গত হওয়া আবশ্যক এবং দ্বিতীয়তঃ যে উপায়ে আমরা কামনা পরিতৃপ্ত করি তাহা ন্যায়সঙ্গত হওয়া আবশ্যক। এইজন্যই নীতি-বিজ্ঞান সৎ ও অসৎ কর্ম্মের সঙ্গে প্রবৃত্তির ও কামনার কি সম্বন্ধ তাহা আলোচনা করে।

কোন কোন নীতিদার্শনিক উপরোক্ত মত সমর্থন করেন না। ইহাদের মতে যাহা প্রেয়ঃ তাহাই শ্রেয়ঃ নহে। কামনা ও প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত হইলে

অনেক সময় সুখ লাভ করা যায়, কিন্তু সুখ লাভ করাই কাম্য নহে। ইঁহাদের মতে প্রবৃত্তির ও কামনার উর্দ্ধে উঠিতে না পারিলে শ্রেয়ঃ লাভ করা সম্ভব নহে। যাহারা কাম ক্রোধ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া নানারূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা কদাপি পরাশান্তি অথবা মোক্ষ লাভ করিতে পারে না। মানুষ কখনও তাহার বাসনাকে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। কামনা বহুমুখী, একটি কামনা পরিতৃপ্ত হইলে অন্য কামনা মানুষকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে এবং এই কামনার বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ চক্রবৎ ঘুরিতে থাকে। তাই গীতার মতে ফলাকাঙ্খা পরিত্যাগ করিয়া লোকসংগ্রহের জন্য নিষ্কাম কর্ম্ম করাই শ্রেয়ঃ লাভের প্রধান উপায়। সুতরাং গীতার মতে কাম ক্রোধ লোভ মোহ পরিত্যাগ করিয়া লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয়, সুখ-দুঃখ, সমান মনে করিয়া মানুষের কর্ম্ম করা আবশ্যক এবং এইরূপ কর্ম্ম করিলেই মানুষ পরাশান্তি অথবা মোক্ষ লাভ করিতে পারে। গীতাকার শাঙ্খ্যের মত সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে, গুণাতীত হইয়া পুরুষ যখন প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে তখনই সে শ্রেয়ঃ লাভ করে। বৌদ্ধ ও জৈন নীতিদর্শনের মতেও বাসনা সমস্ত দুঃখের মূল এবং কামনার অথবা বাসনার হাত হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে শ্রেয়ঃ লাভ করা সম্ভব নহে। বৌদ্ধ ও জৈন দার্শনিকদের মতে সৎচিন্তা, সত্যভাষণ, সদাচরণ, সৎকর্ম্ম, অহিংসা প্রভৃতি চিন্তার সাহায্যে মানুষ কামনা ও প্রবৃত্তির হাত হইতে মুক্ত হইতে পারে। তদ্ব্যতীত ইঁহারা বলেন যে যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে শ্রেয়ঃ লাভ করা সম্ভব নহে। অজ্ঞানের ফলেই মানুষ কামনার ও প্রবৃত্তির দাস হইয়া পড়ে। জার্ম্মান দার্শনিক ক্যান্ট্ও অনেকটা এই মতের সমর্থক। ইঁহার মতে আমরা যদি ভালবাসা অথবা ঘৃণা, সুখলাভ অথবা দুঃখবর্জন, কামনা হিংসা, প্রভৃতি প্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই তাহা হইলে সেরূপ কর্ম্মকে সৎ অথবা ন্যায়সঙ্গত কর্ম্ম বলিয়া অবিহিত করা যায় না। আমরা যখন কামনা ও প্রবৃত্তির হাত হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধ জ্ঞানের আশ্রয় লইয়া কর্ত্তব্য বোধে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই তখনই আমাদের কর্ম্ম হয় ন্যায়সঙ্গত অথবা নীতিসঙ্গত। কিন্তু অনেক নীতিদার্শনিকই কেবল মাত্র নিষ্কাম কর্ম্মকেই নীতিসঙ্গত অথবা ধর্ম্মসঙ্গত কর্ম্ম বলিয়া মনে করেন না। ইঁহাদের মতে কতগুলি কামনা অথবা প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত করা কর্ত্তব্য এবং কতগুলি কামনা ও প্রবৃত্তি বর্জনীয়।

আবার কোন কোন নীতিদার্শনিক বলেন যে, নৈতিক জীবনে কতগুলি

নিয়ম অনুসরণ করা আবশ্যক। ইঁহাদের মতে কতগুলি নিয়ম অথবা বিধি নীতিসঙ্গত এবং উহাদের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য ও উহাদের বিরুদ্ধতা করা অকর্ত্তব্য। কাণ্ট্ এই মতের সমর্থক। সত্য কথা বলা কর্ত্তব্য, মিথ্যা কথা বলা অন্যায়; চুক্তিরক্ষা করা কর্ত্তব্য, চুক্তিভঙ্গ করা অন্যায়; দান করা কর্ত্তব্য, পরস্বাপহরণ করা অন্যায়, সদয় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, নিষ্ঠুর ব্যবহার করা অন্যায় ইত্যাদি। কিন্তু ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে, কোন কোন ক্ষেত্রে তথাকথিত নৈতিক নিয়ম ভঙ্গ করা কর্ত্তব্য হইতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে সত্যভাষণ চুক্তিরক্ষা অথবা দান করা অন্যায় অথবা যুক্তিবিরুদ্ধ হইতে পারে। সুতরাং নৈতিক কোন নিয়মই সর্ব্বত্র প্রযোজ্য নহে।

সক্রেটিস্ প্রমুখ দার্শনিকগণ বলেন যে, নীতি ও জ্ঞান অভিন্ন। সুতরাং যাহাই যুক্তিযুক্ত তাহাই কর্ত্তব্য। ইঁহারাও নীতিধর্ম্মকে মানুষের কামনার ও প্রবৃত্তির অতীত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ইঁহারা ভুলিয়া যান যে সর্ব্বক্ষেত্রে মানুষের কর্ত্তব্য কামনার ও প্রবৃত্তির অতীত হইতে পারে না।

কোন কোন দার্শনিক যথা, স্যাফ্‌ট্‌স্‌বেরি, হাসিসন্ প্রভৃতি সৌন্দর্য্য বুদ্ধিকে ও নীতিধর্ম্মকে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। ইঁহাদের মতে সৌন্দর্য্যতত্ত্ব ও নীতিশাস্ত্র ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু এই মতও গ্রহণীয় নহে। কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই যে সৌন্দর্য্যের সাধকগণ নীতিজ্ঞান বর্জ্জিত। সৌন্দর্য্যের উপাসক হইলেই যে মানুষ নীতিধর্ম্মের উপাসক হইবে ইহা সত্য নহে। আমরা অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত যে অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত সৌন্দর্য্যবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি অন্যায় কাজকে কুৎসিৎ কর্ম্ম বলিয়া পরিত্যাগ করেন।

আমাদের এই স্থলে মনে রাখা আবশ্যক যে নীতিসঙ্গত কর্ম্ম সামাজিক কর্ম্ম। যে সব কর্ম্ম মানব সমাজের অথবা জীবের হিতকর তাহাই কর্ত্তব্য এবং যাহা উহার পরিপন্থী তাহা বর্জনীয় বা অন্যায়। যে সব নীতিদার্শনিকগণ সমাজনিরপেক্ষ ব্যক্তির সুখ সুবিধাকেই নৈতিক জীবনের আদর্শ বলিয়া মনে করেন তাঁহারা নীতিধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। সমাজনিরপেক্ষ মানুষের প্রকৃত নীতিবোধ থাকিতে পারে না। সেই জন্যই এরিষ্টটল্ বলিয়াছেন যে এইরূপ মানুষ হয় পশুর অথবা দেবতার সমতুল্য।

কোন কোন নীতিদার্শনিক বলেন যে নীতিধর্ম্মের নিয়ম শাশ্বত অথবা চিরন্তন। এই মত গ্রহণীয় নহে। ইতিহাসের গতি অনুধাবন করিলে আমরা

দেখিতে পাই যে, এক যুগে যাহা নীতিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় অন্যযুগে তাহা নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয়। এক যুগে দাসপ্রথা নীতিসঙ্গত বলিয়া মনে করা হইত কিন্তু আধুনিক যুগে উহা নীতিবিরুদ্ধ। আধুনিক যুগে অনেক ভারতবাসী আর্য্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে অযৌক্তিক অথবা নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করেন।

সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম নীতিবিজ্ঞানের গণ্ডীর মধ্যে আসে না। অচেতন পদার্থের কার্য্যকে আমরা নীতিসঙ্গত অথবা নীতিবিরুদ্ধ বলি না। ঝড় ঝঞ্ঝা অথবা জল প্লাবনের ফলে বহুক্ষতি সাধিত হয়। সেইরূপ বায়ু, সূর্য্যের উত্তাপ, জল, আবহাওয়া প্রভৃতি জীবের বহু উপকার করে। কিন্তু আমরা ইহাদের কার্য্যকে নীতিবিজ্ঞানের অন্তর্গত বলিয়া মনে করিতে পারিনা। নিম্নশ্রেণীর জীবগণ অনেক সময় আমাদের উপকার অথবা অপকার করিয়া থাকে, কিন্তু ইহাদের কার্য্য নীতিশাস্ত্রের আলোচনার বহির্ভূত। সেইরূপ শিশুদের কার্য্য নীতিশাস্ত্রের গণ্ডীর মধ্যে আসে না। বয়স্ক লোকেরও কতগুলি কার্য্য নীতি-বিজ্ঞানের বিচার্য্য নহে, যথা, হাতনাড়া, পা নাড়া, হাঁচি, কাশি, বসার, দাঁড়াইবার অথবা চলিবার ভঙ্গি ইত্যাদি। সেইরূপ মানুষ যদি অপরের সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী হইয়া নিজের স্বাধীন ইচ্ছা বা বিচার-বুদ্ধি দ্বারা চালিত না হইয়া কাজ করে তাহা হইলে সেরূপ কার্য্যকে ন্যায় অথবা অন্যায় বলা যাইতে পারে না। প্রাচীন যুগে দাসগণ তাহাদের প্রভুদের আজ্ঞাধীনে নানারূপ কাজ করিতে বাধ্য হইত, তাহাদের ঐসব কার্য্য ন্যায়বিজ্ঞানের বিচার্য্য নহে। মানুষ স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারা এবং স্বাধীন বিচারবুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া যে সব কর্ম্ম করে সেই সব কর্ম্মই ন্যায়বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।

সেইজন্যই কান্ট্ প্রভৃতি মনীষীগণ সত্যই বলিয়াছেন যে স্বাধীন ইচ্ছা ও স্বাধীন বিচার বুদ্ধি নীতিবিজ্ঞানের ভিত্তি। মানুষ স্বাধীনভাবে কলাফল বিচার করিয়া যে সব কাজ করিয়া থাকে, সেই সব কার্য্যই ন্যায়বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। যেরূপ ব্যক্তির কর্ম্ম সেইরূপ সমাজের অথবা সঙ্ঘের অথবা রাষ্ট্রের কার্য্যাবলীও নীতিবিজ্ঞানের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। স্বাধীনতা নীতিবিজ্ঞানের ভিত্তি হওয়ায় কান্ট্ প্রভৃতি মনীষীগণ বলিয়াছেন যে প্রত্যেক মানুষকেই স্বাধীন এবং পূর্ণ বলিয়া মনে করা উচিত এবং কোন মানুষকেই পশুর অথবা যন্ত্রের ন্যায় উপায় রূপে ব্যবহার করা অন্যায়। প্রত্যেক মানুষকেই স্বাধীনভাবে জীবন নির্ব্বাহ করিবার সুবিধা দেওয়া আবশ্যক। সুতরাং নীতি-

বিজ্ঞানের মতে মানুষের প্রধান কর্ত্তব্য হইল প্রত্যেক মানুষকে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিবার অধিকার দেওয়া।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে নৈতিক জীবনের একটি আদর্শ আছে। এক কথায় বলিতে গেলে এই আদর্শ হইল মঙ্গলের পথে অগ্রসর হওয়ার আদর্শ। সেই সব কার্য্যই নীতিসঙ্গত, যাহা দ্বারা সমাজ ও ব্যক্তি মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে পারে। মানুষ নানাবিধ কাজে নিরত হয় এবং নানারূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। ইহাদের কতগুলি মঙ্গলজনক, সুতরাং কাম্য এবং কতগুলি অমঙ্গলজনক অথবা বর্জনীয়। কিন্তু মঙ্গলের স্বরূপ কি এই সম্বন্ধে বিভিন্ন নীতিদার্শনিকদের বিভিন্ন মত। কেহ বলেন এই মঙ্গলের স্বরূপ হইল ব্যক্তির সুখ, কেহ বলেন ইহা হইল প্রভূততম লোকের প্রভূততম সুখ, কেহ বলেন পূর্ণতা লাভ করাই মানবের চরম আদর্শ অথবা চরম মঙ্গল, আবার কেহ বলেন মোক্ষ লাভ করাই নৈতিক জীবনের চরম আদর্শ। নৈতিক জীবনের চরম আদর্শ সম্বন্ধে এইরূপ নানাবিধ মত প্রচলিত। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা এখানে সম্ভব নহে। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, যেরূপ জীবনযাত্রা করিলে প্রত্যেক মানুষ সমাজশরীরে স্বাধীন ইচ্ছা ও স্বাধীন বিচার বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া নিজের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধন করিতে পারে এবং তাহার ফলে যতটা সম্ভব সুখ ও শান্তি লাভ করিতে পারে ও দুঃখ দুর্দ্দশা হইতে মুক্ত হইতে পারে সেইরূপ জীবনযাত্রাকে নৈতিক জীবনের চরম মঙ্গলময় আদর্শ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

আমরা সাধারণভাবে নৈতিক জীবনের স্বরূপ ও আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি এবং নীতিশাস্ত্রের প্রধান ধারণাগুলিকে কতকটা বিশ্লেষণ করিয়াছি। ইহার পরে আমরা মার্কস্‌বাদের সঙ্গে নীতি-বিজ্ঞানের কি সম্বন্ধ সেই বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

<u>মার্কস্‌বাদ কি নীতি-সঙ্গত?</u>: মার্ক্‌স্‌বাদকে দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই দর্শন বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত। ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় হইল প্রকৃতির ইতিহাসের ও চিন্তার অভিব্যক্তি যথাযথভাবে বর্ণনা করা। এই দর্শন আরও প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে যে মানুষের সামাজিক অথবা ব্যক্তিগত চিন্তাধারা সামাজিক ও আর্থিক পরিস্থিতির দ্বারা মূলতঃ নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এই চিন্তাধারা আবার সামাজিক ও ব্যক্তির কর্ম্মধারাকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করে। এই দর্শনের ভিত্তি

মানুষের সম্মিলিত অভিজ্ঞতা, এবং ইহার পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক। লক্, হিউম্, জেম্স্ প্রভৃতি দার্শনিকদের অভিজ্ঞতাবাদ মার্ক্সীয় অভিজ্ঞতাবাদ হইতে বিভিন্ন, কারণ মার্কসীয় দার্শনিকদের মতে অভিজ্ঞতার সত্য নির্দ্ধারণ করা যায় সামাজিক ব্যবহারিক জীবনের সাহায্যে।

এই দর্শন বস্তুবাদী, কারণ ইহার মতে বস্তু চিন্তার পূর্ব্বগামী এবং বস্তুর অভিব্যক্তির ফলেই চিন্তার উদ্ভব হয়। ইতিহাসের ক্ষেত্রে বস্তুবাদ এই প্রমাণ করিতে চাহে যে, মানুষের সামাজিক কর্ম্মধারা ও সামাজিক সম্বন্ধ, সমাজের আর্থিক ক্রিয়াকলাপের উপর এবং পণ্য প্রস্তুতের যন্ত্রাদির উপর প্রধানতঃ নির্ভরশীল। সেইজন্য এই দর্শন বলে যে, মানুষের সামাজিক আর্থিক ক্রিয়া-কলাপের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার সামাজিক পরিস্থিতি ও সামাজিক সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত হয় এবং এই সামাজিক পরিস্থিতি ও সম্বন্ধ দ্বারা সামাজিক মানুষের চিন্তাধারা নির্দ্ধারিত হয়।

মার্ক্সীয় দার্শনিক পদ্ধতি দ্বান্দিক। ইহার মতে বিরুদ্ধের মধ্যে ঐক্য ও দ্বন্দ্ব বর্ত্তমান এবং ইহার ফলে প্রকৃতির ও ইতিহাসের ক্রমবিকাশ ঘটিয়া থাকে। মার্ক্সীয় দর্শন তত্ত্বদর্শনের (মেটাফিজিক্স্) পরিপন্থী। কারণ ইহার মতে সত্য অদৃশ্য অথবা অতিপ্রাকৃত নহে এবং প্রত্যেক সত্যকেই নিরীক্ষণ পরিক্ষণ ও বিচারের সাহায্যে প্রমাণিত করা যায়। তদ্ব্যতীত এই দর্শন বলে যে, বিভিন্ন বস্তু একে অন্য হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নহে, জগতের বিভিন্ন বস্তু আন্তরিক যোগসূত্রে আবদ্ধ। দ্বান্দিক বস্তুবাদ বলে যে দ্বন্দ্বের ফলে বস্তু সমূহ রূপান্তরিত হয়, এবং ইহার ফলে নব নব রূপের প্রকাশ হয়। পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে নূতন গুণের আবির্ভাব হয় এবং যাহা একবার অস্বীকৃত হয় তাহা আবার অভিব্যক্তির ফলে নবরূপে প্রকাশিত হয়। বিরুদ্ধের দ্বন্দ্ব উচ্চতর ঐক্যের মধ্যে সমন্বিত হয় এবং এই ঐক্যের ভিতরে পুনরায় দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয় এবং উহা আবার উচ্চতর ঐক্যের ভিতরে সমন্বিত হয়। এইরূপে প্রকৃতির ও ইতিহাসের বিকাশ ঘটে।

মার্ক্সীয় প্রকৃতি-দর্শনের মতানুসারে দ্বান্দিক অভিব্যক্তির ফলে জড়জগত হইতে প্রাণের উদ্ভব হইয়াছে এবং প্রাণের ক্রমবিকাশের ফলে চিত্তবৃত্তির ও চিন্তার উদ্ভব হইয়াছে। মানব মস্তিস্কের উদ্ভবের ও ক্রিয়ার ফলেই চিন্তার উদ্ভব ও ক্রিয়া সম্ভব হইয়াছে। মার্ক্সীয় ইতিহাস দর্শন এই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে যে, মানুষের আর্থিক ক্রিয়াকলাপের ফলে মানবসমাজ নানাভাবে

রূপায়িত হইয়াছে। পণ্য প্রস্তুতের প্রয়োজনে মানুষ নানারূপ যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছে। প্রথমে প্রস্তর ও কাষ্ঠ দ্বারা মানুষ পণ্য প্রস্তুতের যন্ত্র নির্ম্মাণ করে, পরে, যখন তাহারা ধাতুর ব্যবহার শেখে তখন তাহারা ধাতব যন্ত্র নির্ম্মাণ করে এবং সভ্যতার উন্নতির ফলে আধুনিক যুগে মানুষ নানারূপ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র যথা, বাষ্পীয় যন্ত্র বৈদ্যুতিক যন্ত্র ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই সব যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রকার পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করা হইয়াছে। যন্ত্রের ও পণ্য প্রস্তুতের পদ্ধতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক পরিস্থিতি ও সম্বন্ধ পরিবর্তিত হইয়াছে। পণ্য প্রস্তুতের তাগিদে দাসপ্রথা সমাজে প্রচলিত হইয়াছিল। দাসগণ ছিল শোষিত শ্রেণী এবং তাহাদের কোনরূপ সামাজিক অথবা রাষ্ট্রিক অধিকার ছিল না। ইহাদের প্রভুগণ ইহাদের প্রতি যথেচ্ছ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিত। পণ্য প্রস্তুতের পদ্ধতির এবং তৎসম্পর্কীয় যন্ত্রাদির পরিবর্ত্তনের ফলে মধ্যযুগীয় জায়গীরদারী সমাজব্যবস্থা প্রচলিত হয়। এই যুগে ভূমিদাসগণ ছিল শোষিত শ্রেণী এবং জমিদারগণ ইহাদের উপর যথেচ্ছ ব্যবহার করিত। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে পণ্য প্রস্তুতের পদ্ধতির ও যন্ত্রাদির পরিবর্ত্তনের ফলে ধনিক সমাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং এই সমাজে শ্রমিকগণ হইল শোষিত শ্রেণী এবং ধনিকগণ হইল প্রভু। এই তিন যুগেই শোষক ও শোষিত এই দুই'এর ভিতরে দ্বন্দ্ব বর্ত্তমান। এবং দ্বন্দ্বের ফলে সমাজের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে কখনও মন্থর গতিতে ও অপেক্ষাকৃত শান্তির মধ্যে এবং কখনও ঘটিয়াছে বিদ্রোহের ফলে। পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার সমাজই শ্রেণী বিভক্ত সমাজ; তাহা হইলেও দাসপ্রথা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা হইতে জায়গীরদারী সমাজ ব্যবস্থা উচ্চতর এবং আধুনিক ধনিক সমাজ ব্যবস্থা জায়গীরদারী সমাজ ব্যবস্থা হইতে উচ্চতর। মার্ক্সীয় দার্শনিকগণ বলেন যে ধনিক সমাজ ব্যবস্থায় পণ্য প্রস্তুতের পদ্ধতি এবং সামাজিক সম্বন্ধের মধ্যে দ্বন্দ্ব বর্ত্তমান থাকায় কালক্রমে এই সমাজ ব্যবস্থা ধুলিসাৎ হইয়া যাইবে এবং ইহার ফলে সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই সমাজ ব্যবস্থার আওতায় পণ্য প্রস্তুতের পদ্ধতির এবং সামাজিক সম্বন্ধের এবং পণ্য প্রস্তুত ও মানুষের প্রয়োজনের মধ্যে কোনরূপ দ্বন্দ্ব থাকিবে না। সুতরাং এই সমাজ হইবে ধনিক সমাজ হইতে উন্নততর ও অধিকতর প্রগতিশীল এবং এই সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইলে, প্রত্যেক মানুষই সুখে ও সচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে এবং সর্ব্বপ্রকারে

উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে। সাম্যবাদী সমাজে কোনরূপ শ্রেণীদ্বন্দ্ব থাকিবে না।

মার্ক্সীয় দর্শন প্রত্যক্ষভাবে নীতিশাস্ত্রের আলোচনা করে নাই। তাহা হইলেও মার্ক্স্ এঙ্গেল্স্ প্রভৃতির লিখিত পুস্তক হইতে আমরা তাঁহাদের নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয় মতমত জানিতে পারি। ইঁহাদের প্রথম প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে বিজ্ঞান ও নীতিধর্ম্ম একে অন্যের পরিপন্থী নহে। সমাজ বিজ্ঞান সমাজের উন্নতির ও অবনতির কারণ বিশ্লেষণ করে। মার্কসীয় দার্শনিকদের মতে নীতি বিজ্ঞানও এক প্রকার সমাজ-বিজ্ঞান। ইঁহাদের মতে যে সমস্ত চিন্তা ও ব্যবহার সমাজিক উন্নতি সাধন করে সেই সমস্ত চিন্তা ও আচরণ ন্যায়সঙ্গত এবং যাহা বিজ্ঞানানুসারে সমাজের প্রগতির পরিপন্থী তাহাই নীতি-বিরুদ্ধ। সুতরাং মার্ক্সবাদ অনুসারে আমরা যদি বিজ্ঞানানুমোদিত উপায়ে সমাজের উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হই তাহা হইলে আমাদের নৈতিক জীবনও উন্নত হইবে। অজ্ঞতা নৈতিক উন্নতির পরিপন্থী। মার্ক্স্ প্রভৃতি বলেন যে মানুষের কর্ত্তব্য হইল জগতের ও ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক গতি যথাযথভাবে উপলব্ধি করিয়া মানব সমাজের উন্নতির জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া। সম্যক জ্ঞান লাভ করিয়া সমাজের উন্নতি সাধন করাই নীতিবিজ্ঞান সম্মত কর্ম্ম। এই জন্যই মার্ক্সীয় দার্শনিকগণ প্রত্যেক মানুষকে যথার্থ শিক্ষালাভ করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। অজ্ঞানই অমঙ্গলের কারণ। মানুষ বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে নিযুক্ত থাকে এবং সর্ব্বক্ষেত্রেই মানুষের কর্ত্তব্য হইল জ্ঞান লাভ করিয়া সমাজের ও নিজের উন্নতির জন্য কর্ম্ম করা। শিক্ষা বলিতে ইঁহারা কেবলমাত্র মানসিক শিক্ষা বোঝেন না, শিক্ষা সর্ব্বাঙ্গীন হওয়া আবশ্যক। সুতরাং একদিকে যেমন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানলাভ করা আবশ্যক, অন্যদিকে তদ্রূপ যাহাতে শারীরিক উন্নতি হয়, যাহাতে মানুষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়দিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করিতে পারে, যে উপায় অবলম্বন করিলে চিত্তবৃত্তির উন্নতি সাধন করিতে পারা যায় এবং মানুষ কর্ম্ম-কুশল হইতে পারে সেইরূপ জ্ঞান লাভ করাও মার্ক্সবাদীগণ অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করেন। এতদিন মানুষ শিক্ষা বলিতে মানসিক শিক্ষাই বুঝিত এবং কর্ম্মকুশলতা শিক্ষার অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত না। সমাজের উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিগণ বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোচনা করিতেন এবং এই সব ব্যক্তিগণ কর্ম্ম-কুশল হওয়া আবশ্যক মনে করিতেন না। হাতের কাজ করা, পণ্য দ্রব্য প্রস্তুত করা প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিদের উপযুক্ত কার্য্য বলিয়া মনে করা হইত।

যেসব লোক কৃষিকার্য্য শিল্পকার্য্য, ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতিতে নিযুক্ত থাকিত তাহাদিগকে হেয় বলিয়া মনে করা হইত। নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিগণ উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার বিশেষ কোন সুবিধা পাইত না। গ্রীসীয় সমাজে যাহারা নাগরিক কেবলমাত্র তাহারাই উচ্চ শিক্ষা লাভ করিবার সুবিধা পাইত এবং রাষ্ট্রিক অধিকার পাইত, কিন্তু দাসগণ ও অন্যান্য শ্রমিকগণ কোনরূপ শিক্ষা লাভ করিতে পারিত না এবং রাষ্ট্রিক অধিকার পাইত না। মধ্যযুগীয় সমাজেও জায়গীরদারদের শিক্ষা লাভ করিবার সুবিধা ছিল এবং রাষ্ট্রিক অধিকার ছিল, কিন্তু ভূমিদাসদের সেইরূপ সুবিধা বা অধিকার ছিল না। ধনিক সমাজেও উচ্চশ্রেণী ধনিকদের সর্ব্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা আছে কিন্তু শ্রমিকদের পূর্ণ শিক্ষা লাভ করিবার এবং নাগরিক ও রাষ্ট্রিক অধিকার ভোগ করার পূর্ণ সুযোগ নাই। মার্ক্‌সীয় দার্শনিকগণ মনে করেন যে এইরূপ বৈষম্য বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ ও নীতি বিরুদ্ধ।

মার্ক্‌সীয় দার্শনিকগণ বলেন যে প্রত্যেক শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে একদল ব্যক্তি শোষণ করে এবং অন্য একদল ব্যক্তি শোষিত হয়। প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিগণ সম্পত্তির অধিকারী এবং ইহারাই রাষ্ট্র পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়া আপনাদের সুবিধানুসারে রাষ্ট্রকে ও সমাজকে পরিচালনা করে ও আইন প্রণয়ন করে। দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিগণ এইরূপ সমাজ ব্যবস্থার ফলে সম্পূর্ণ নিঃস্ব হইয়া পড়ে। শোষিত শ্রেণী তাহাদের শ্রমের ন্যায্য মূল্য প্রায় না এবং ফলে সর্ব্বপ্রকার দুঃখে ও কষ্টে জীবন যাপন করে। ইহারা থাকে অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্নতায়। তাই মার্কসীয় দার্শনিকগণের মতে শ্রেণী-বিভক্ত সমাজব্যবস্থা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ ও নীতিবিরুদ্ধ। সেই জন্যই এই দার্শনিকগণ বলেন যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজ লোপ করিয়া সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই প্রত্যেক মানুষের শারীরিক মানসিক আর্থিক ও নৈতিক উন্নতি সাধিত হইবে। মার্ক্‌স্‌বাদের মতে শ্রেণীবিভক্ত সমাজ অপেক্ষা সমাজতান্ত্রিক সমাজ উন্নততর। সমাজতান্ত্রিক সমাজে প্রত্যেক মানুষই কাজ করিবে এবং প্রত্যেক মানুষই শ্রমের উপযুক্ত মূল্য পাইবে। এই সমাজে প্রত্যেক মানুষই পূর্ণ শিক্ষার ও পূর্ণ রাষ্ট্রিক অধিকার লাভ করিবার সুবিধা পাইবে এবং প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। এই সমাজে শোষণের অবসান হওয়ায় অধিকতর পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইবে এবং মানুষ পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিবে মানুষের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য, লাভ করিবার জন্যে নহে। ধনিক

সমাজে লাভ করিবার জন্য ধনিকগণ পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করে, এবং ইহার ফলে সমাজের প্রয়োজন মত পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত হয় না এবং বহু দ্রব্যের অপচয় ঘটে। এই সব বিবেচনা করিয়া মার্ক্‌স্‌বাদী দার্শনিকগণ বলেন যে সাম্যবাদী সমাজ উন্নততর এবং ইহা বিজ্ঞানসম্মত ও নীতিসম্মত।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে মার্ক্‌স্‌বাদ বৈজ্ঞানিক হইলেও ইহা নীতি-বিজ্ঞানের পরিপন্থী নহে। সমাজে মানুষের যাহাতে মঙ্গল হয় ও উন্নতি সেই পথেই মার্ক্‌স্‌বাদীগণ সমাজকে পরিচালিত করিতে চাহেন। প্রত্যেক মানুষই যাহাতে দুঃখ ও দুর্দ্দশার হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে এবং সমাজে প্রত্যেক মানুষই যাহাতে শিক্ষার ও রাষ্ট্রিক অধিকার লাভ করিয়া এবং শ্রমের উপযুক্ত মূল্য পাইয়া সুখ-সুবিধা লাভ করিতে পারে এবং উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে তাহাই মার্ক্‌স্‌বাদীদের কাম্য। সুতরাং মার্ক্‌স্‌বাদ ন্যায় অন্যায় কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য, নৈতিক ভাল মন্দ ও মানবের মঙ্গল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত। সেই জন্যই মার্ক্‌স্‌বাদীগণ শোষণকে অন্যায় বলিয়া মনে করেন এবং শোষণের অবসান করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। মার্ক্‌স্‌বাদীগণ বলেন যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সমাজের প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য এবং লাভের আশায় সমাজের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করিয়া পণ্য প্রস্তুত করা অন্যায় এবং লাভের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুর অপচয় করা অন্যায়। মার্ক্‌সীয় দার্শনিকগণ বলেন যে পণ্যোৎপাদনের পদ্ধতির সঙ্গে সামাজিক মানুষের সম্বন্ধের সামঞ্জস্য স্থাপন করা কর্ত্তব্য এবং ইহার বিরুদ্ধ ব্যবস্থা অন্যায়। ইঁহারা বলেন যে প্রত্যেক মানুষকে শিক্ষা দেওয়া ও সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অধিকার দেওয়া কর্ত্তব্য এবং ইহার বিরুদ্ধ ব্যবস্থা অন্যায়। ইঁহারা বলেন যে এক জাতি যে অন্য জাতিকে শোষণ করে তাহা অন্যায়, এবং প্রত্যেক জাতিকে সমান অধিকার দেওয়া কর্ত্তব্য। সেইজন্যই মার্ক্‌সীয় দার্শনিকগণ সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ, একচেটিয়া ব্যবসা প্রভৃতিকে নিন্দা করেন এবং বলেন যে এই সমস্তই ধনতান্ত্রিক সমাজের বিষময় ফল। তাই ইঁহাদের মতে সমাজ-তান্ত্রিক সমাজ নৈতিক আদর্শের অনুকূল এবং শ্রেণী বিভক্ত সমাজ উহার প্রতিকূল।

মার্ক্‌স্‌ তাঁহার 'ক্যাপিটাল্‌' নামক গ্রন্থে তীব্র ভাষায় কি প্রকারে ধনিকগণ নিঃস্ব শ্রমিক-শ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছে এবং কি প্রকারে তাহারা শ্রমিক-শ্রেণীকে শোষণ করে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। এই ধনিকগণ কুটিরশিল্প নষ্ট

করিয়াছে, প্রজাদের ভূমিস্বত্বের অধিকার লোপ করিয়াছে এবং এইরূপে নিঃস্ব শ্রমিকশ্রেণীর সৃষ্টি করিয়াছে। মার্ক্‌স্‌ তীব্র ভাষায় এবং অপরিসীম ঘৃণার সহিত ধনিক শ্রেণীর ব্যভিচার ও নিষ্ঠুরতার কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নিঃস্ব শ্রমিকশ্রেণী সৃষ্টি করিবার জন্যে ধনিকগণ বহু লোকের সম্পত্তির অধিকার লোপ করিয়াছে। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে কি প্রকারে শিশু, নারী, বয়স্ক পুরুষ নির্ব্বিশেষে অসহনীয় পরিস্থিতির মধ্যে ধনিকগণ শ্রমিক-দিগকে দিনে ১২।১৪ ঘণ্টা কাজ করিতে বাধ্য করে। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে সামান্য বেতন পাইয়া শিক্ষার বাসস্থানের ও উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে শ্রমিকগণ কি প্রকারে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক অধঃপতনের চরম সীমায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। শ্রমিকদের এইরূপ দুরবস্থার কথা বিবেচনা করিয়াই মার্ক্‌স্‌ ও এঙ্গেল্‌স্‌ উদ্দাত্ত কণ্ঠে নিঃস্ব শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ হইয়া তাহাদের ন্যায্য অধিকার লাভ করিবার জন্য সংগ্রম করিতে আহ্বান জানাইয়াছেন। যদি কেহ বলেন যে মার্ক্‌স্‌ 'ক্যাপিটাল্‌'এ কেবল মাত্র ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি কোনরূপ নৈতিক আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হন নাই, তাহা হইলে তিনি মার্ক্‌স্‌বাদকে ভুল বুঝিবেন। মার্ক্‌স্‌ ও এঙ্গেল্‌স্‌ ঐতিহাসিক ঘটনা সর্ব্বদাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া অনুশীলন করিয়াছেন, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহাদের নিকট সর্ব্বদাই জন-কল্যাণের আদর্শ উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হইত।

স্বাধীনতাই যে নৈতিক আদর্শের মূল মার্ক্‌সীয় দার্শনিকগণ এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত। স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে ইঁহাদের মতে মানুষকে জ্ঞান লাভ করিতে হইবে এবং আর্থিক শোষণ হইতে মুক্ত হইতে হইবে। জগতের ও ইতিহাসের গতির আবশ্যিক নিয়মাবলি সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতে না পারিলে মানুষ স্বাধীন হইতে পারে না। সেই জন্যই মার্ক্‌সীয় দার্শনিকগণ বলিয়াছেন যে স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক মানুষেরই শিক্ষা লাভ করা আবশ্যক, এবং প্রত্যেক সমাজেরই কর্ত্তব্য লোকশিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা। এতদ্ব্যতীত মার্ক্‌সীয় দার্শনিকগণ বলিয়াছেন যে, যতদিন পর্য্যন্ত জনগণ আর্থিক শোষণের হাত হইতে মুক্ত হইতে না পারিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহারা স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে না। যতদিন পর্য্যন্ত মানুষ আর্থিক অধীনতাপাশে আবদ্ধ থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের কোনরূপ সামাজিক অথবা রাষ্ট্রিক অধিকার অথবা স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং মানুষের মত বাঁচিতে

হইলে এবং শারীরিক মানসিক ও নৈতিক উন্নতি লাভ করিতে হইলে জনসাধারণকে ধনিক সমাজের শোষণের হাত হইতে অবশ্যই মুক্তি লাভ করিতে হইবে। সেই জন্যই মার্ক্সবাদ ধনতন্ত্রের বিলোপ সাধন ও সমাজতন্ত্রের অভ্যুত্থান অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করে। ইহার মতে কেবল মাত্র শ্রেণীহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজেই প্রত্যেক মানুষের পক্ষে স্বাধীনভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা সম্ভব এবং সর্ব্বপ্রকার শারীরিক আর্থিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতি লাভ করা সম্ভব। এই সমাজে শোষণ থাকিবে না, প্রত্যেক মানুষই কর্ম্ম করিবে ও কর্ম্মের উপযুক্ত মূল্য পাইবে, প্রত্যেক মানুষই শিক্ষা লাভ করিয়া সম্পূর্ণ নাগরিক ও রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে। কেবল মাত্র স্বাধীন মানুষের পক্ষেই নৈতিক উন্নত লাভ করা সম্ভব। কাণ্ট্ বলিয়াছেন যে নীতি হিসাবে প্রত্যেক মানুষকেই স্বাধীন ও পূর্ণ বলিয়া বিবেচনা করা আবশ্যক, এবং তাহাকে উপায় অথবা যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা অন্যায়। মার্ক্সবাদ এই মত সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে। বহুদিন পর্য্যন্ত নারী পুরুষের অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল কিন্তু মার্ক্সবাদের মতে পুরুষের যে প্রকার স্বাধীনতা লাভ করা আবশ্যক স্ত্রীলোকদেরও সেই প্রকার স্বাধীনতা লাভ করা আবশ্যক। সেই জন্যই মার্ক্সীয় দার্শনিকগণ মনে করেন, যে সমাজে পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েরই সকল বিষয়ে সমান অধিকার থাকিবে। ইঁহারা স্ত্রী স্বাধীনতার বিশেষ সমর্থক। নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিয়া সর্ব্বক্ষেত্রে যাহাতে তাহারা পুরুষের পাশাপাশি দাঁড়াইয়া সমাজশরীরকে পুষ্ট করিতে পারে, মার্ক্সীয় দার্শনিকগণ সেইরূপ সমাজ ব্যবস্থারই পক্ষপাতী।

<u>বিবাহ, পরিবার, সমাজ, জাতি, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ</u>: বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত বিবাহ ও পরিবার এই দুইটি প্রতিষ্ঠান সমাজে ও রাষ্ট্রে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। বলাই বাহুল্য যে ইহাদের নৈতিক আদর্শের উপর সমাজের নৈতিক আদর্শ বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল। ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠান দুইটিও বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। নানারূপ বিবাহ ব্যবস্থা সমাজে প্রচলিত ছিল ও আছে। কেহ কেহ বলেন যে আদিম সমাজে যৌন সম্বন্ধের বিষয় স্ত্রী পুরুষের অবাধ স্বাধীনতা ছিল। এতদ্ব্যতীত একজন স্ত্রীলোকের বহু স্বামী গ্রহণ করিবার প্রথাও ছিল। একজন পুরুষের বহু স্ত্রী বিবাহ করার নিয়ম পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল, এবং এখনও কোন কোন সমাজে প্রচলিত আছে।

অধুনা সভ্য সমাজে এক স্বামীর এক স্ত্রী এবং এক স্ত্রীর এক স্বামী এই প্রথাই প্রচলিত। তাহা হইলেও আধুনিক বিবাহব্যবস্থার সঙ্গে বিবাহিত স্ত্রী পুরুষের ব্যভিচার এবং আইন সম্মত গণিকাবৃত্তি প্রচলিত আছে। বিভিন্ন আর্থিক ও সামাজিক পরিস্থিতির ফলেই বিভিন্নরূপ বিবাহের ব্যবস্থা সমাজে প্রচলিত হইয়াছে। বিবাহের ফলে যখন সন্তান জন্মলাভ করে তখনই পরিবার গঠিত হয়। প্রধানতঃ স্বামী, স্ত্রী ও সন্তান লইয়াই পরিবার গঠিত। কোন কোন ক্ষেত্রে অন্যান্য আত্মীয় স্বজন ও ভৃত্যাদি পরিবারের অন্তর্গত বলিয়া মনে করা হয়। এখন প্রশ্ন হইল যে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে এবং পরিবারের অন্তর্গত ব্যক্তিদের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ থাকিলে মানুষের পক্ষে নৈতিক উন্নতি লাভ করা সম্ভব। আমাদের প্রধান বিচার্য্য এই যে প্রচলিত ধনিক সমাজে কিরূপ ব্যবস্থা বর্ত্তমান, এবং মার্ক্‌সবাদীগণ কিরূপ ব্যবস্থা সমীচীন বলিয়া মনে করেন।

বহুদিন পর্য্যন্ত বিবাহবন্ধনকে ধর্ম্মানুমোদিত স্ত্রী পুরুষের বন্ধন বলিয়া মনে করা হইত এবং এখনও কোন কোন সমাজে সেইরূপ মনে করা হয়। কিন্তু কালক্রমে সভ্যতার প্রসারের ফলে অনেক ক্ষেত্রে সমাজ ও রাষ্ট্র বিবাহ বন্ধনকে বিশেষ একপ্রকার চুক্তি বলিয়া মনে করে। সুতরাং এইরূপ সমাজের মতে কোন কোন ক্ষেত্রে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করা কঠিন ছিল, কিন্তু ক্রমেই বিবাহবিচ্ছেদের নিয়ম সহজ হইতেছে। অধুনা মার্কিন ও বহু ইউরোপীয় দেশে অনেক ক্ষেত্রেই বিবাহবন্ধন সাময়িক। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা জীবনব্যাপীও হইয়া থাকে। স্ত্রী ও পুরুষের স্বাধীনতা যখন রাষ্ট্র স্বীকার করে এবং স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই যখন সমান সুযোগ ও শিক্ষা পাইয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনের সুবিধা পায়, তখন হইতেই বিবাহ বন্ধন শিথিল হইতে থাকে। যখন স্ত্রীলোক পুরুষের উপর জীবিকার জন্য নির্ভরশীল ছিল এবং সম্পূর্ণভাবে পুরুষের অধীন ছিল তখন স্ত্রীলোকের পক্ষে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করা সহজ ছিল না। সভ্য জগতে অধুনা বিবাহের ও পরিবারের সম্বন্ধ শিথিল হওয়ায় নানারূপ অব্যবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য হইল সন্তানকে জন্ম দেওয়া ও পরিবার গঠন করা। স্বামী ও স্ত্রীর বন্ধন আন্তরিক না হইলে পারিবারিক জীবন সুখের হয় না এবং সন্তানগণ উপযুক্তরূপে বর্দ্ধিত ও শিক্ষিত হইতে পারে না। সন্তানদিগকে উপযুক্তভাবে লালন পালন করা এবং তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া পূর্ণ

নাগরিকের পদে উন্নিত করাই পরিবারের এবং সমাজের প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু আধুনিক সমাজে বিবাহবন্ধন ও পারিবারিক বন্ধন শিথিল হওয়ায় এই প্রধান কর্ত্তব্য যথাযথভাবে পালিত হইতেছে না। তাছাড়া স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই আর্থিক ও নাগরিক স্বাধীনতা লাভ করার ফলে আধুনিক সভ্য সমাজে নানারূপ ব্যভিচার দেখা দিয়াছে। সুতরাং এখন সমাজনীতিকদের স্থির করা আবশ্যক যে কি প্রকার পারিবারিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে মানুষের পক্ষে সর্ব্বপ্রকার উন্নতিলাভ করা সম্ভব হইবে এবং সন্তানগণ যথোপযুক্তভাবে বর্দ্ধিত হইবে।

মার্ক্সীয় দার্শনিকগণ এই সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন, এবং এই সমস্যার সমাধান করিবার জন্য তাঁহারা বিশেষ মনোযোগী। ইঁহাদের মতে ধনিক সমাজের শ্রেণীবিভাগ ও শোষণ ব্যবস্থা বিবাহিত ও পারিবারিক জীবনকে বিষময় করিয়া তুলিয়াছে। আর্থিক শোষণের ফলেই বহু নারী গণিকাবৃত্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। এই সমাজে অনেক ক্ষেত্রেই পারিবারিক-বন্ধন আর্থিক-বন্ধন, এবং স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধ আন্তরিক প্রেমের ভিত্তির উপর স্থাপিত হইতে পারে না। অনেক সময় অর্থাভাবে পিতামাতা সন্তানদিগকে উপযুক্ত সুখ, সুবিধা ও শিক্ষা দিতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পিতামাতার সঙ্গে সন্তানদের সম্বন্ধ বিকৃত। অনেক সময় আর্থিক কারণে বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয়। তদ্ব্যতীত ধনিক সমাজে অনেক ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক মানসিকবৃত্তির উদ্ভব হয়। মানুষ বাস্তব অথবা কাল্পনিক অশান্তির কথা ভাবিয়া সহজেই উত্তেজিত হইয়া পড়ে, আর সেই জন্যই এই সমাজে বহু ক্ষেত্রেই চিত্তবৃত্তির বিকার প্রসার লাভ করে। এই সব কারণেই নানারকম সামাজিক ব্যাধি আধুনিক মানুষের জীবনকে বিষময় করিয়া তুলিতেছে। নৈতিক জীবনের অবনতি ক্রমেই প্রসার লাভ করিতেছে! মার্ক্সীয় দার্শনিকগণ তাই বলেন যে নানারূপ সামাজিক ব্যাধি দূর করিতে হইলে প্রধান কর্ত্তব্য হইল শোষক ও শোষিতের শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ লোপ করিয়া সমাজতান্ত্রিক সমাজ স্থাপন করা। এই সমাজে কোন মানুষই লাভের লিপ্সার বশবর্ত্তী হইয়া অন্যকে শোষণ করিতে পারিবে না। এই সমাজে প্রত্যেক স্ত্রীলোক ও পুরুষের কর্ম্ম করিবার ও জীবিকা অর্জ্জন করিবার অবাধ সুযোগ ও সুবিধা থাকিবে। কেহই পরাধীন বলিয়া আপনাকে হেয় মনে করিবে না, এবং কেহই আপনাকে প্রভু মনে করিয়া অন্যের উপর অত্যাচার করিতে পারিবে না। এই সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের, পুরুষের সঙ্গে

নারীর এবং পিতামাতার সঙ্গে সন্তানের সম্বন্ধ হইবে স্বাভাবিক। এইরূপ সমাজ গঠিত হইলে প্রকৃত ভালবাসার ভিত্তির উপরই বিবাহ-বন্ধন স্থাপিত হইবে। দুইটি স্বাধীন মানুষ—স্ত্রী ও পুরুষ কেবল মাত্র ভালবাসার আকর্ষণে একে অন্যের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইবে। আর্থিক সুবিধা বা অসুবিধা বিবেচনা করিয়া একে অন্যকে বিবাহ করিবে না। প্রকৃত ভালবাসার ভিত্তির উপরে বিবাহবন্ধন স্থাপিত হইলে উহা ক্ষণস্থায়ী হইবার সম্ভাবনা কমিয়া যাইবে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে বিবাহিত স্ত্রীপুরুষের জীবন যদি সুখময় না হয়, এবং যদি বিবাহিত জীবন উভয়ের অশান্তির কারণ হয়, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিবার সুযোগ থাকা আবশ্যক। তবে প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক সমাজে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিবার প্রয়োজন বহুলাংশে কমিয়া যাইবে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে বিবাহের ফলে যে সন্তানদের জন্ম হইবে তাহাদের সঙ্গে পিতামাতার সম্বন্ধ হইবে অনাবিল স্নেহভালবাসার। যদিও পিতামাতা সন্তানদের উপযুক্ত ভরণপোষণের ও শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিবে, তথাপি যে ক্ষেত্রে পিতামাতার আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য সন্তানদিগকে উপযুক্ত ভাবে শিক্ষিত করিতে অসমর্থ হইবে, সেইক্ষেত্রে সমাজ ও রাষ্ট্র সন্তানদের ভরণ-পোষণের, স্বাস্থ্যরক্ষার এবং শিক্ষার ভার গ্রহণ করিবে। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে বিবাহিত ও পারিবারিক জীবন সুখময় হইবে, গণিকাবৃত্তি ও ব্যভিচার সমাজ শরীরকে কলুষিত করিবে না। মানুষের চিত্তবৃত্তি স্বাভাবিক হইবে এবং সন্তানগণ উপযুক্তভাবে বর্দ্ধিত হইয়া সমাজ শরীরকে পুষ্ট করিবে। সুতরাং মার্ক্সীয় দার্শনিকদের মতে সমাজতান্ত্রিক সমাজে মানুষের সর্ব্বপ্রকার শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতির পথ প্রশস্থ হইবে। ইহাদের মতে এইরূপ সমাজই কাম্য।

আমরা এখন জাতীয়তাবাদ ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্ক্সীয় দর্শনের মতবাদ আলোচনা করিতে পারি। এই আলোচনার ফলে আমরা স্থির করিতে পারিব যে মার্ক্সীয় মতবাদ নীতিসঙ্গত না তাহার বিপরীত। বিবাহ এবং পরিবারের ন্যায় জাতি ও রাষ্ট্র এই দুইটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। জাতি অথবা জাতীয়তার ধারণা কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বে জাতি ও ইংরাজি Race এই দুইটি শব্দ সমার্থে ব্যবহৃত হইত। মনে করা হইত যে, যে সব লোক সমজাতীয়, তাহাদের মধ্যে সমরক্তের সম্বন্ধ বর্ত্তমান। তদ্ব্যতীত ইহা মনে করা হইত যে সমজাতীয় ব্যক্তিগণের ভাষা হইবে এক এবং তাহারা হইবে

সমধর্ম্মীয়। ইহা ছাড়া আরও মনে করা হইত যে, সমজাতীয় ব্যক্তিদের রীতিনীতি, ঐতিহাসিক পরিবেশ, আর্থিক ও ভৌগোলিক পরিস্থিতি এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা একরূপ হওয়া আবশ্যক। এই সব ঐক্যের ফলেই জাতীয় বৈশিষ্ট রূপায়িত হয়। মার্ক্‌স্‌বাদ প্রত্যেক জাতির যে বৈশিষ্ট আছে তাহা সম্পূর্ণ স্বীকার করে এবং ইহার মতে সভ্যতার ও সংস্কৃতির বিকাশের জন্য জাতীয় বৈশিষ্ট রক্ষা করা অত্যাবশ্যক। রাষ্ট্র এক জাতীয় অথবা বহু জাতির সম্মিলন-ক্ষেত্র হইতে পারে। মার্ক্‌সীয় দার্শনিকদের মতে প্রত্যেক জাতিরই রাষ্ট্রশরীরে স্বায়ত্বশাসনের অধিকার থাকা আবশ্যক। ইঁহাদের মতে এইরূপ অধিকার না থাকিলে জাতীয় বিকাশ ও জাতির আর্থিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতি ব্যহত হয়। কিন্তু আধুনিক যুগে জাতি বলিতে কি বুঝায় এই সম্বন্ধে মার্ক্‌স্‌বাদীদের বিশেষ মত আছে। ইঁহারা বলেন যে, রক্তের সম্পর্ক এখন আর জাতীয়তার ভিত্তি বলিয়া মনে করা সম্ভব নহে। ইতিহাসের গতির ফলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে রক্তের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। ধর্ম্মও জাতীয়তার ভিত্তি হইতে পারে না, কারণ সমজাতীয় ব্যক্তিগণ বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইতে পারে। এই সব বিবেচনা করিয়া মার্ক্‌সীয় দার্শনিকগণ নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কোন সঙ্ঘ যদি জাতি বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে উহার অন্তর্গত ব্যক্তিদের মধ্যে ভাষাগত, আর্থিক, ভৌগোলিক এবং ভাবগত অথবা সংস্কৃতিগত ঐক্য থাকা আবশ্যক। কোন সঙ্ঘের ভিতরে যদি এই সমস্ত বিষয়ে ঐক্য থাকে এবং এইরূপ সঙ্ঘের লোকসংখ্যা যদি যথেষ্ট হয়, তাহা হইলে এইরূপ সঙ্ঘ জাতি বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং এইরূপ জাতির স্বায়ত্বশাসনের অধিকার থাকা অত্যাবশ্যক। মার্ক্‌সীয় দার্শনিকদের মতে জাতীয় সমস্যা সমাধান করিতে হইলে উপরোক্ত নীতি অবলম্বন করা আবশ্যক। যে রাষ্ট্রে বহু জাতির বাস, সেই রাষ্ট্র যদি জাতীয় সমস্যার সমাধান করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার সর্ব্বপ্রকার অগ্রগতি ব্যহত হয়। সোভিয়েট্‌ রাশিয়ার জাতীয় সমস্যা সমাধান হওয়ার ফলে সেখানে প্রত্যেক জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে ও ইহার ফলে সোভিয়েট রাশিয়ার রাষ্ট্রশরীর পুষ্ট হইয়াছে। মার্ক্‌সীয় দার্শনিকগণ যেভাবে জাতীয় সমস্যার সমাধান করিয়াছেন উহা নীতিসম্মত কিনা তাহা পাঠকদের বিবেচ্য।

মার্ক্‌সীয় দার্শনিকদের মতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার তাগিদেই রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। উচ্চশ্রেণী ব্যক্তিদের স্বার্থ ও সম্পত্তি রক্ষা করাই রাষ্ট্রের

প্রধান কার্য্য। ইহা শোষক শ্রেণীর হাতের একটি বিশেষ হাতিয়ার, যাহার সাহায্যে উক্ত শ্রেণী শোষিত শ্রেণীকে পদদলিত করিয়া রাখিতে পারে। সুতরাং মার্ক্‌সীয় দর্শনের মতে রাষ্ট্র একটি শোষণের যন্ত্র। ইঁহারা বলেন যে শ্রমিকগণ যখন রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করিয়া সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপন করিবে, তখনই এই শোষণের ও দুর্নীতির অবসান হইবে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্র ক্ষমতা পরিচালিত হইবে জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে।

মার্ক্‌সীয় দার্শনিকগণ বলেন যে, কোন বিশেষ রাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত হইলেই রাষ্ট্রের প্রয়োজনের অবসান হইবে না। যতদিন পর্য্যন্ত ধনিক রাষ্ট্র সমূহ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধতা করিবে এবং উহার বিলোপ সাধনের চেষ্টা করিবে ততদিন পর্য্যন্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রয়োজন থাকিবে। কিন্তু ইতিহাসের প্রগতির ফলে যখন সমগ্র মানব জাতি সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং ফলে রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব বিলুপ্ত হইবে, তখন আর মানব সমাজে রাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রয়োজন থাকিবে না। রাষ্ট্র তখন নিজেই বিলুপ্ত হইবে। সমাজতান্ত্রিক মানবসমাজে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, এবং জাতির সঙ্গে জাতির দ্বন্দ্ব, দূরিভূত হইবে। এই সমাজে মানুষ প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব লাভ করিবে এবং সে পণ্য প্রস্তুত করিবে মানুষের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য, লাভের জন্য নহে। তখন যে দ্বন্দ্ব সমাজে বর্ত্তমান থাকিবে, তাহা হইল কেবলমাত্র বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে ভবিষ্যতের উন্নততর সমাজ ব্যবস্থার দ্বন্দ্ব। মানবসমাজ তখন ক্রমোন্নতির জন্য ব্যগ্র হইবে এবং বর্ত্তমান ব্যবস্থার অসমাপ্তি ও ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করিয়া কল্যাণের পথে অগ্রসর হইবে। এই সমাজে চুরি, পরস্বাপহরণ, অথবা শোষণের কোন প্রয়োজন থাকিবে না। মার্ক্‌সীয় দার্শনিকদের এই মতবাদ কাল্পনিক না বাস্তব, নীতিসম্মত না নীতিবিরুদ্ধ, তাহা পাঠকদের বিবেচ্য।

আন্তর্জাতিকতা সম্বন্ধে মার্ক্‌সীয় দার্শনিকগণের বিশেষ মত আছে। সমাজতন্ত্রবাদকে আন্তর্জাতিকতাবাদ বলিয়া অভিহিতকরা যায়। ইঁহাদের মতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করিতে হইলে, জগতের সমস্ত শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। মার্ক্‌সবাদের মতে যতদিন পর্য্যন্ত জগতে ধনতান্ত্রিক সমাজ থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর, জাতির সঙ্গে জাতির, এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের দ্বন্দ্বের অবসান হইবে না। শোষণ ও যুদ্ধ ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার আওতায় অনিবার্য্য। ধনতন্ত্রের ফলে

আসিয়াছে এক চেটিয়া ব্যবসা, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ। রক্তাক্ত ইতিহাসের পাতায় ধনতন্ত্রের কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়া আছে। পরস্বাপহরণ ও লোলুপতা ধনতান্ত্রিক সমাজের মূল মন্ত্র। এই সমাজ জগতের অধিকতর লোককে পশুর পর্য্যায় নামাইয়া আনিয়াছে। বেকার-জীবন, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ, রক্তপাত, ব্যক্তিগত ও জাতীয় বিদ্বেষ, ঈর্ষা অসূয়া, সন্দিগ্ধতা প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক সমাজের পরিণত ফল। শোষণলিপ্সাই এই সমাজের মূল ব্যাধি এবং উহা হইতে আসিয়াছে দুর্নীতি ও সর্ব্বপ্রকার দুঃখ।

মার্ক্‌সীয় দার্শনিকগণ বলেন যে, জগতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ স্থাপিত হইলে, আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ বন্ধুত্বপূর্ণ হইবে। শোষণের অবসান হইলেই রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের যুদ্ধের প্রয়োজনের অবসান হইবে। আন্তর্জাতিক সমাজে জগতের সমস্ত মানুষ হাতে হাত মিলাইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। তখন আর রক্তপাত, যুদ্ধ, পরস্বাপহরণ প্রভৃতি ইতিহাসের পাতাকে কলঙ্কিত করিবে না। মানুষের ইতিহাস হইবে তখন প্রগতির ইতিহাস। সুতরাং মার্ক্‌সীয় দার্শনিকদের মতে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক সমাজ যতদিন পর্য্যন্ত জগতে স্থাপিত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত মানুষের দুঃখ দুর্দ্দশা ও নৈতিক অবনতির অবসান হইবে না। জগৎ হইতে আর্থিক শোষণ অবসান করিতে না পারিলে মানবের কল্যাণ অসম্ভব। এই জন্যই মার্কসীয় দার্শনিকগণ ধনতান্ত্রিক সমাজের অবসান করিয়া সমাজতান্ত্রিক সমাজ স্থাপন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে পাঠকগণ মার্ক্‌স্‌বাদের সঙ্গে নীতিবিজ্ঞানের সম্বন্ধ উপলব্ধি করিতে পারিবেন, যদিও মার্ক্‌স্‌বাদ প্রধানতঃ বৈজ্ঞানিক অর্থনৈতিক মতবাদ, তাহা হইলেও নীতিধর্ম্মের সঙ্গে ইহার কোন বিরোধ নাই। মার্ক্‌স্‌বাদীগণ নৈতিক আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত। মানবের কল্যাণ সাধন করাই মার্ক্‌স্‌বাদের উদ্দেশ্য এবং সে যাহাতে দুঃখ দুর্দ্দশার হাত হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে সুখসুবিধার, উন্নতির ও মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে পারে তাহাই মার্ক্‌স্‌বাদের কাম্য। মার্ক্‌স্‌বাদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হইল এই যে, অর্থবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান সম্মত প্রগতির পথে অগ্রসর হইলেই, নৈতিক উন্নতি লাভ করা সম্ভব এবং ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে নৈতিক অবনতি অনিবার্য্য।

মুর্শিদাবাদ, ১৯৪৮

অন্নদাশঙ্কর রায়

বাঙালী আমি ভুলিব নাকো
বাঙালী ওরা সবে
দিবসযামী ভাবিব আমি
মিলন কিসে হবে।

২৭শে জুন

গৃহযুদ্ধ এ আত্মঘাতের মতো
দেশ জুড়ে এর নিজেরি নখরক্ষত।

২৮শে জুন

হৃদয় আমার যদি দেখিত ওরা
দেখিত প্রীতির রস হৃদয়জোড়া।

১লা জুলাই

তোমার নির্দ্দেশ দাও
দ্বিধাহীন অকুণ্ঠ নির্দ্দেশ
আমরা নিমিত্তমাত্র
রক্তপাতে সুস্থ হোক দেশ
অথবা পরম শান্তি
আকাঙ্ক্ষিয়া লভুক অশেষ।

১২ আগস্ট

সকলের মাঝে রয়েছ তুমি
তাই মনে আছে আশা

এক দিন হবে হয়নি যাহা
ভায়ে ভায়ে ভালোবাসা।
২৬শে আগস্ট

মেলাবে, একদা মেলাবে
তার আগে তুমি কতই খেলা যে খেলাবে।
৩রা সেপ্টেম্বর

প্রাণ নিতে যেন বিলম্ব করি
কে জানে কবে
হয়তো ভায়ের সঙ্গে ভায়ের
মিলন হবে।
৪ঠা সেপ্টেম্বর

কিসে হবে মঙ্গল কিসে না হবে
শান্তিতে কিম্বা হবে আহবে
বিধাতা জানেন, নর জেনেছে কবে।
৭ই সেপ্টেম্বর

দাও হৃদয়ের মিল্
দিল্এ মিলে যাক দিল্
এ বিভেদ দূর হয়ে যাক
এ বিরহ হোক শেষ
প্রেমে জুড়ে যাক দেশ
অবিশ্বাস কুয়াশা মিলাক।
১৮ই সেপ্টেম্বর

বাঙালীরে তুমি দয়া করো আজ বিধাতা
মা'কে ভাগ করে ভাবে না যেন সে বিমাতা।
১৯শে সেপ্টেম্বর

করো আশীর্ব্বাদ
আমরা শিশুর মতো যা করি বিবাদ
পশুর মতো না হোক, না হোক প্রমাদ।
১৭ই সেপ্টেম্বর

বিনা রক্তপাতে
সংঘর্ষ হয় না সাঙ্গ, জানি এ ধরাতে।
তবু তাই চাই
ওরা মোর ভাই।
১৮ই আগষ্ট

সোনালী চুলের গান

ডিলিস্ বেনেট লেইং

বিনুনি তোমার নামাও র‍্যাপুঞ্জেল!
ঢেলে দাও সব সোনা।
বুনব কামিজ
শীতার্ত্ত যত মানুষের বুক ঢাকতে।

যৌবন বার্দ্ধক্য
চিরন্তন অসখ্য।

কুন্তলে হাত দিও না মা।
দৃঢ় বিশ্বাসে বাধা-জয়ী যৌবন
এই উজ্জ্বল রজ্জু উঠুক বেয়ে।
স্বপ্নের চুমা পাড়তে মানুষ অনেক উর্দ্ধে চড়ে।

জরা আর যৌবন
সত্যেরে দেখে দুই দিকে দুইজন।

হৃদয় তোমার ছুড়ে ফেলে দাও র‍্যাপুঞ্জেল
উচ্চ মিনার থেকে ;
আনো সান্ত্বনা দুহিতার সেবা দিয়ে ;
তোমার দীপ্তি জ্বালুক ঘরের বাতি।

উদয় এবং অস্ত
সরস অন্ন আবার তাই বিরস'ত।

একটু রেহাই দাও না মা !
থামাও তোমার কণ্ঠ।
আমাদের মাঝে পাহাড়-প্রাচীর দাঁড়িয়ে,
জরা, যৌবন এ ওর জানেনা ভাষা।

এখানে ও বহুদূর
যৌবন কি নিঠুর।

পাথুরে দেওয়াল ছাড়িয়ে কন্যা শুখাও চুল,
আমার শিশুরা নাগাল যেন না পায় ;
নইলে সবাই দোল খেয়ে যাবে চলে,
আঁধারে আমায় একলা এখানে ফেলে।

বহুদূরে আর কাছে
জরা শুধু তার দুঃখ এবং ভয়টুকু নিয়ে বাঁচে।

হে প্রাচীন ছায়া তুমি সরে গেলে পরে
পাথুরে সোপান বেয়ে নেমে যাব আমি।
ইস্পাত-চুলে বুনব চাদর
যখন সময় হবে।

মধুমাস্ আর শীত
জীবন অনিশ্চিত।

অলিন্দ থেকে নুয়ে পড়ে তবে কে
র‍্যাপুঞ্জেল,

মোহিনী শিখার ফিতাটি ঝুলিয়ে দেবে,
হিম-জ্যোৎস্নায় অবশ আঙ্গুলে ধরবার ?

জীবন আর মরণ !
বাক্য ত শুধু নিশ্বাস-সমীরণ।

হে জরা স্তব্ধ হও।
দু'জনেই ফের জ্বলব'ত সেই হাস্যময়ীর মাঝে,
পথের পাথর ঝলসায় যার
জ্বলন্ত এলো চুল।

জাগো আর ঘুমাও
যায় না যা রাখা দুহাতে হেসে ছড়াও।

অনুবাদ : প্রেমেন্দ্র মিত্র

কবিতা : বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ

জীবনানন্দ দাশ

যতদূর সম্ভব সব বিষয়েরই মানে ও লক্ষ্য বুঝতে চেষ্টা করেছে অনেক দিন মানুষ। প্রায় পুরোপুরি চেতনায় মানুষ অনেক সময় কথা ভাবে-কাজ করে। যে সব মুহূর্তে চেতনার এদিককার অভিযান কম তখন আর এক রকম আলোর সন্ধান পাওয়া যায়, কেউ কেউ বলে। মন-নির্মনের সন্ধি এই আলোর অপর রকম স্পষ্টতা দান করছে আমাদের—অনেক ধর্মসাধকদের এই মত। কোনো কোনো কবিও এই আলোর স্থির স্পষ্টতার কাছে তাঁদের কবিতার ঋণ স্বীকার করেছেন। চেতনার লৌকিক স্বচ্ছতার চেয়ে এ আলোক, তাঁরা মনে করেছেন, কবিতাসৃষ্টির উপকরণগুলোকে উদ্বোধন করতেও সাহায্য করেছে বেশি; তারপর গ্রথিত করা—সঠিকভাবে—সেই উপকরণগুলোকে; তারপরে কবিতায় পরিণত করা। মানুষের সাংসারিক সজাগ মনের সম্পূর্ণ মধ্যস্থতায় এ কাজ সম্ভব নয়। দরকারী উপাদানগুলো কবিতা নয়, কবিতা হবে,—সামাজিক তর্কবলে খানিকটা অবশ্য, কিন্তু যুক্তিতর্ক যেখানে সাময়িক ভাবে অন্ততঃ অন্তিম প্রসাদ লাভ করেছে এমনই একটা স্পষ্ট, অটুট মন-নির্মনের সহায়তায়। এই হচ্ছে তাঁদের মত—যতটা বুঝতে পেরেছি আমি। এটা আমিও স্বীকার করি—সম্পূর্ণভাবে নয় অবিশ্যি—কিছু উনিশ বিশ উপলব্ধি ক'রে। যে সব কবি বিষয়কে কবিতাসত্তায় দাঁড় করানো সম্বন্ধে কোনো মতামত ব্যক্ত করেন নি তাঁদের কবিতা প'ড়ে দেখলে বোঝা যাবে যে বিজ্ঞান দর্শন এমন কি ধর্মেরও পরিণত মীমাংসার চেয়ে আলাদা এক নির্মলতা রয়েছে কবিতায়; ভিন্ন ধরণের এক অব্যর্থ (বলা যাক একে) পদ্ধতির ফলে এই স্পষ্টতা সম্ভব হয়েছে।

এই স্পষ্টতা (ও দিব্যতা—আজকালও যেটাকে মনে হচ্ছে কবিতা-পাঠকদের কাছে) কত দিন টিকবে কালের বিচারে? দর্শন ঠিক তার নিজের ভূমিতে টিকল না। যে রীতির প্রয়োগে দর্শনস্থিত—বিষয়কে শিক্ষিত বা অশিক্ষিতপটু মানুষের নিতান্তই ব্যক্তিগত ধারণার কোন থেকে দেখবার ফলে, নানারকম অসারতা ও অভাব বেরিয়ে পড়ছে তার; রীতিকে ক্রমেই বৈজ্ঞানিক

করবার চেষ্টা করছে সে তাই ; বিজ্ঞানের দার্শনিক ব্যাখ্যার স্তরেও হয়তো থাকবে না সে আর। দর্শন, আশঙ্কা করা যাচ্ছে, বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে থাকবে। দর্শন ব'লে কোনো জিনিষ তার নিজের পরিচিত প্রস্থানে থাকতে পারবে কি আর ? বিজ্ঞানের থেকে দূরে স'রে যাচ্ছিল ধর্ম্ম ; নিজের আগেকার 'স্বচ্ছ শিবত্বে' (সেটা বিজ্ঞানী সত্য হোক বা না হোক) যদি সে স্থির হয়ে থাকতে চায়—বিজ্ঞানের রীতিপদ্ধতির থেকে দূরেই থাকতে হবে তাকে। কিন্তু এ রকম স্থিরতা ক্রমেই হারিয়ে ফেলছে ধর্ম ; ধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেখা যাচ্ছে। যুক্তিস্বচ্ছ নীতিকে এখনও ধর্ম বলা চলে না, কিন্তু বিজ্ঞানের একমাত্র সত্যে বিশ্বাস আরও বাড়তে থাকলে ঐ নীতি ছাড়া অন্য কোনো জিনিষকে ধর্ম ব'লে মনে করতে পারা যাবে না।

বিজ্ঞানের পদ্ধতি ছাড়া সত্য ও দিব্যতা লাভ করতে পারা যায় না এ রকম ধারণায় আজ পর্য্যন্ত কোনো বিশ্বাস নেই কবিতার ; যতদূর বুঝতে পারছি ভবিষ্যতেও ও রকম একান্ত বিশ্বাসের কোনো তলব আসবে না বিজ্ঞানের কাছ থেকে বা প্রয়োজনীয়তা বোধ হবে না কবিতার দিক থেকে। বিজ্ঞানে যে সত্যের দেখা পাওয়া যায় কবিতায় তা' অপর এক ভূমি লাভ ক'রে সৃষ্টিকে নিজেদের মধ্যে ভাগ ক'রে নেয় নি বটে, কিন্তু পরস্পরের সাহায্যে আরও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করছে। বিজ্ঞান যে সব সত্য লাভ করতে চাচ্ছে তা' বিজ্ঞান নিজে সৃষ্টি করে নি, সেগুলো প্রায়ই সব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, আবিষ্কারে প্রায়ই ভুল বেরিয়ে পড়ে বিজ্ঞানীর, কখন সম্পূর্ণ শুদ্ধতা পাওয়া যাবে সেটাও স্থির হয় না। কবিতা মানুষের মনের স্থায়ী পদার্থের সৃষ্টি, স্থায়ী পদার্থকে চরিতার্থ করেও বটে এই সৃষ্টি। এর ওপর কি ক'রে হাত দেবে বিজ্ঞান ? মানুষের নিবিড় ও মহৎ ও প্রায়ই কল্যাণকর তৃষ্ণা ও চরিতার্থতাকে নিঃস্বাক্ষরিত ক'রে ফেলবার শক্তি আছে বিজ্ঞানের ? তা নেই হয়তো সে অভিরুচিও নেই ; নিজে যে সব সত্য বের ক'রে চলেছে সে তাও অনেক ক্ষেত্রেই সাময়িক,—কবিতার সত্য মানুষের মনের স্বভাবপদার্থের সঙ্গে সমসাময়িক। উপনিষদ শেক্‌সপীয়র বা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যেটুকু তথ্য বিজ্ঞানের দান তা' পর পর কালের বিজ্ঞানই এসে অনেক সময় নাকচ ক'রে ফেলছে, কিন্তু নানা যুগের রুচির ইতরবিশেষ কতদূর আর খণ্ডন করছে শেকসপীয়রকে রবীন্দ্রনাথকে জ্ঞানের দিক দিয়ে কিছু ব্যর্থ কিছু অব্যর্থ উপনিষদের বড় স্বভাবকবিতাকে ?

এ রকম একটা বৃহৎ সময়ের ভিতর ফলিত হয়ে থাকবার সম্ভাবনা

কবিতার। মানুষ যতদিন আছে ততদিন কবিতা প্রতিটি যুগের কিছুটা নতুন নমনীয়তায় নিজের নতুন সঙ্গতি লাভ ক'রে অর্থ ও বিশেষত্বের নবতায় যুগকেও সঙ্গতি বোধ করতে সাহায্য ক'রে—থেকে যাবে, আশা করা যাচ্ছে, মানুষের সভ্যতায়। মানুষের মন আশ্চর্য্যভাবে বদলে যেতে পারে বটে—নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কিংবা উন্নতির স্বর্গ লাভ করতে পারে, যদিও তার নিদর্শন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

আমাদের কবিতা আজ পর্য্যন্ত আমার মনে হয়, বাংলাদেশের রাষ্ট্রকর্ম্মের বৃত্তান্তে তেমন কিছু আবেগ ও মননভূমি না পেয়েও গভীরতর প্রসার পেয়েছে—বিশেষতঃ শেষের দিকে—পৃথিবীরই আধুনিককালের মহত্তম তাৎপর্য্যগুলোর সঙ্গে অনেকখানি যোগ রেখে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের থেকে বাংলাদেশে স্বভাবতই ভালো কবি জন্মায় শুনে এসেছি। সত্য কিনা নির্দ্ধারণ করা আমার পক্ষে কঠিন। প্রদেশ-ভাষাগুলো আমার প্রায়ই তেমন কিছু জানা নেই। স্পষ্ট অনুবাদ পাচ্ছি না। ওসব দেশের চেয়ে বেশি সংখ্যক কবি বাংলাদেশে জন্মায় খুব সম্ভব। এদেশে এক আধটি কবি প্রায় প্রতি যুগেই থাকে—অথবা সমগ্র কবিতার একটা আবহ—যাকে বলা যেতে পারে বিশেষ কুশল। ধারণা করবার ও লিখবার কুশলতা কোনো না কোনো দিকে সিদ্ধিতে পৌঁছবে এরকম আভাস পাওয়া যায় ;—যেমন মধুসূদনের ভিতর, উনিশশতকের কোনো কোনো কাব্যে, রবীন্দ্রনাথের আগের ও সমসাময়িকদের ভিতরে ; আরও আগে অনেকখানি সীমা ও তুচ্ছতায় খণ্ডিত হয়ে তবুও—ঈশ্বর গুপ্তে। আরও কম স্থলে প্রকৃত সিদ্ধি দেখা যায়—যেমন বৈষ্ণব কবিতায় (একটা বিশেষ দিকে), —রবীন্দ্রনাথে। রবীন্দ্রনাথের পরে আধুনিক কালে কবিতার যে যুগ চলেছে তা' স্তিমিত হয়ে পড়েছে—মাঝে মাঝে এরকম বোধ হতে থাকলেও এ সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনো মীমাংসায় পৌঁছনো এখনই সম্ভব নয়। এ পর্য্যন্ত যা লেখা হয়েছে স্থিরভাবে সংকলিত ক'রে টের পাওয়া যাবে প্রায় একটা প্রধান কাব্যের যুগের ভিতর দিয়ে চলেছি আমরা। সকলকে অতিক্রম ক'রে একজন কি দু'জন কবির নিঃসন্দেহ শ্রেষ্ঠতা এ যুগে ফুটে উঠেছে কিনা এখনও ঠিক ধরতে পারা যাচ্ছে না, পনের কুড়ি বছর পরে আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যাবে আশা আছে। সেই সময়, আমার মনে হয়, এ যুগের পরিসমাপ্তিও হবে। কাব্যের একটা বিশেষ যুগ বলে স্থির করা হবে—কবিতার আরও আয়ত্ত নিদর্শন সব ইতিমধ্যে রচিত না হ'লেও—আমাদের এই যুগকে। এ সময়টায় খুব দীর্ঘ

কবিতা রচিত হয় নি, কাব্যনাট্যও নেই, শ্লেষও মহান কবিতা হয়ে উঠতে পারে নি। আসছে দশ পনেরো বছরে আমাদের দেশে আধুনিক কবিতা এসব পরিণতির দিকে কোথাও কোথাও মোড় ঘোরাবে কিনা ভাবছি। বাংলা কবিতা পরে—হয়তো অদূরেই যা হবে তার আলো এতদিনে কিছু কিছু এসে পড়বার কথা আধুনিক কবিতাকে সপ্রতিভ ও সজাগ ক'রে তোলবার জন্যে; এসেছে ব'লে মনে হচ্ছে না। এ কালের কবিতার কোনো কোনো অভাব ও অস্পষ্টতার দিক এভাবে টিঁকে থাকবে না; বাংলা কবিতার আধুনিক সময় যদি তা দান না করতে পারে ভবিষ্যৎকালে (খুব দেরি না করেও) দীর্ঘ কবিতা ও শ্লেষে লিখিত মহা কবিতা আসতে পারে; এবং কবিতায় নাট্য। ইতিপূর্ব্বে গিরিশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ যা দিয়েছেন তার চেয়ে বেশি দেশী ও গ্রীক (কারো হাতে) ও বেশি শেক্‌সপীয়রীয় (অপরদের হাতে—কিন্তু নতুন, জটিল সময়ের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শ্রীধারণ ক'রে) বাংলা দেশে খুব শীগগির না হ'লেও সৃষ্টি হবে একদিন; কেবলই খণ্ড কবিতার সিদ্ধি নিয়ে দূরতর ভবিষ্যৎ তৃপ্ত হয়ে থাকবে ব'লে মনে হয় না।

২

কবিতার ভবিষ্যৎ ? অবশ্য অতীতেই তার নির্ভর।

যার উন্মেষ 'কল্লোলে', এবং 'পরিচয়', 'কবিতা'র প্রথম কয়েক বছরে যার বিকাশ, তারই বর্তমান নাম আধুনিক বাংলা কবিতা। কিংবা, আরো একটু আগে থেকে, নজরুল ইসলাম থেকে হিশেব ধরলে, ১৯১৯-১৯৩৯-এর দুই দশকে বাংলা কবিতার আধুনিক চেহারা স্পষ্ট হ'লো। অর্থাৎ, দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী অনুকূল অবকাশে আমাদের কবিতায়, সাহিত্যে, পরিশ্রমের পারম্পর্য দেখতে পাই; তাতে অনেক আবর্জনা গজিয়েছিলো সে-কথা সত্যি, কিন্তু যেটুকু নতুন সোনা তখন জমা হ'লো তারই সুদ খাটিয়ে আজ পর্যন্ত কারবার চলছে। অর্থাৎ, ঐ কুড়ি, কিংবা হয়তো দশ-বারো বছর ধ'রে আধুনিক কবিতা নামক রীতিমতো একটা আন্দোলন ছিলো; সে-আন্দোলন রুদ্ধ হ'লো জাপানি যুদ্ধের প্রারম্ভে। সেই সময়ে কলকাতার রাস্তার আলোই শুধু নিবলো না, অনেকের মনেরও আলো নিবলো। কলকাতায় যেটা আমাদের সবচেয়ে গর্ব করার বিষয় ছিলো, যে-উজ্জীবনী আবহাওয়া, যে-পরিশীলিত সাহিত্যসমাজ,

তার ভাঙা-ভাঙা শোচনীয় টুকরো এখনো চারদিকে ছিটকে আছে। এই ক্ষতির পরিপূরণের প্রশ্ন ওঠে না।

অবশ্য সাহিত্যসমাজ না-থাকলেও সাহিত্য থাকে, সাহিত্যিক থাকেন। কবিতার আন্দোলন থামলেই কবিতা থামে না। বাংলা কবিতাও থেমে নেই; পুরোনো কবিদের বিভিন্ন ব্যক্তিগত ক্রমবিকাশ লক্ষ্যণীয়, নতুন কবিরাও দেখা দিচ্ছেন। কিন্তু আন্দোলন নেই, এবং তাতে অবস্থার অনেকটা প্রভেদ ঘটে।

আন্দোলনের অন্তর্গত যাঁরা হ'য়ে পড়েন, এক হিশেবে তাঁরা ভাগ্যবান। শক্তিশালীর ক্ষেত্র আছে সেখানে, দুর্বলের প্রতি দাক্ষিণ্যও আছে। শক্তিশালীরা আন্দোলন আনেন, অন্যেরা সুযোগ পায়, সুবিধে নেয়। ১৯৩৬, ৩৭, ৩৮-এ যে-রকম লিখে 'নাম' হ'তো, হয়েছে, এখন তরুণতর কেউ-কেউ তার চেয়ে অনেক ভালো লিখছেন, কিন্তু সমবয়সী সমধর্মীর বাইরে তাঁদের নাম কম লোকেই জানেন। দেশের মধ্যে সাহিত্যের আবহাওয়া নেই, সাহিত্যসমাজ নেই; তাইতে এই প্রভেদ ঘটলো।

অর্থাৎ, এখনকার নতুন কবিরা, আমাদের কবিতার যাঁরা ভবিষ্যৎ, দৈবাৎ বছর কয়েক দেরিতে জন্মেছিলেন ব'লেই, তাঁরা একটু বেকায়দায় প'ড়ে গেছেন। এক হিশেবে বলবো ভালোই হ'লো যে তাঁদের কাজ আরো কঠিন, উৎকর্ষের আরো পরিষ্কার প্রমাণ তাঁদের দিতে হবে। নিশ্চয়ই ভালো যে আত্মচেতনাই এখন তাঁদের আশ্রয়। কিন্তু অন্য হিশেবে? কবির উৎসাহ চাই, পাঠক চাই, শত্রু মিত্র প্রকাশক সমালোচক সমস্তই চাই। শুধু লেখকদের নিজেদের মধ্যে নয়, সমস্ত শিক্ষিত সমাজেই আলোচনার একটি অস্পষ্ট পরিমণ্ডল যদি না থাকে, তাহ'লে যথাস্থানে সৃষ্টির তেজ ক্ষীণ হ'য়ে আসে। সেই অবস্থাই এখন বাংলাদেশের; সাহিত্যের প্রতি—নতুন সাহিত্যের প্রতি—বিরুদ্ধতাও এখন আর নেই; এখন উদাসীনতা, শুধুই উদাসীনতা।

এই রকম সময়ে নতুন কবির অবস্থা কি ঈর্ষাযোগ্য? কবিতার ভবিষ্যৎ কি আলোচ্য?

সত্য, কোনো নতুন 'নতুন' কবিতা এখনো দেখা যায় নি। নৈপুণ্য দেখছি, লক্ষ্যণীয়তার প্রমাণ পাচ্ছি, কিন্তু নতুন গলার আওয়াজ দিচ্ছে না। তার কারণ এখনকার তরুণদের শক্তির অভাব নয়। তার কারণ আমার যা মনে হয় এখানে নিবেদন করি।

যৌবনের ধর্ম বিদ্রোহ। সমস্ত 'আধুনিক' আন্দোলনে বিদ্রোহের একটা প্রধান অংশ থাকে। অনেকটা ভাঙচুর হয়, অনেকটা গ'ড়েও ওঠে। এতে বিশেষভাবে প্রশংসনীয় বা নিন্দনীয় কিছু নেই ; এটাই জীবনের নিয়ম, এটা প্রয়োজন, অপরিহার্য।

'কল্লোলে'র সময়ে এই বিদ্রোহ খুব স্পষ্ট ছিলো। বিদ্রোহের বিষয় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, ছিলো বিবিধ প্রচলিত সামাজিক অবরোধ, যৌন বিষয়ক গোপনতা, ছন্দ মিল ইত্যাদিতেও প্রতিবাদের অবকাশ ছিলো বিস্তর। এই সব প্রয়োজনীয় ভাঙন তখনকার কবিরা ঘটিয়েছেন। ঐ বিদ্রোহ তাঁদের পথ দেখিয়েছে, যৌবনের একরকমের অসীম অসহায় ব্যাকুলতায় 'মানি না'র তীর বেঁধে বাঁচিয়েছে। 'মানি না' মানেই নেগেটিভ নয়, তাও একরকমের মানা ; কিছু না-মানলে অন্য কিছু না-মানা যায় না। এই অবিশ্বাস এবং স্বকীয় বিশ্বাসের যুগপৎ উচ্চারণেই 'কল্লোল' 'পরিচয়ে'র প্রধান কবিদের বৈশিষ্ট্য।

এখনকার কবিদের প্রধান অভাব এই বিদ্রোহের সুর। তাই, কবি তাঁরা নতুন হ'লেও কবিতা তাঁদের নতুন নয়। তাঁদের বিদ্রোহী পূর্ববর্তীদের বিরুদ্ধে এখনই আবার প্রতিবিদ্রোহের যথেষ্ট উপকরণ তাঁদের হাতে নেই। কোন প্রতিবাদ আজ জানাবেন তাঁরা ? যৌন বিষয় পুরোনো, সামাজিক অবিচার, অন্যায়, এ-সব তো রবীন্দ্রনাথ থেকেই চ'লে আসছে, কলকারখানা বস্তিতেও আর অপূর্বতা নেই, আর সবচেয়ে পুরোনো তো নাস্তিকতা। বিশেষভাবে কম্যুনিস্ট প্রেরণাজাত যে-নতুন বিদ্রোহ, কোনো-এক কালে যা আশাপ্রদ ছিলো, তা 'পদাতিকে'র এক বসন্তেই নিঃশেষ হ'লো মনে হয়। এবং কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সর্বতোভাবে 'কবিতা'-'পরিচয়ে'র প্রাথমিক ইতিহাসেরই অন্তর্গত, সেই 'কল্লোল' আন্দোলনেরই শেষ নিশ্বাস। অন্তত, এখন, 'পদাতিকে'র প্রেরণা নবনত্বহীন।

ফলত, নতুন কবিরা আপাতত বিদ্রোহবর্জিত। সেটা তাঁদের দোষ নয়, কিন্তু সেখানেই তাঁদের দুর্বলতা।

এটা নৈরাশ্যজনক কথা নয়, কেননা এই অবস্থা সাময়িক। ইএটস-এর যৌবনদশা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সংকটের মধ্যে কেটেছিলো, তার কারণ তাঁর নাস্তিক পিতা। পিতা নাস্তিক হ'লে পুত্রের অবশ্য বিশ্বাসী হওয়া কর্তব্য, এদিকে ইএটস ছিলেন স্বভাবতই ভগবৎবিমুখ। এই দ্বন্দ্বের সমাধান তিনি

কেমন ক'রে করেছিলেন তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর তাঁর আজীবন কাব্যে আমরা দেখেছি। লক্ষণ দেখে মনে হয় পাশ্চাত্ত্য দেশেও তরুণ লেখকের অবস্থা এখন অনুরূপ; এই অবস্থার মধ্যে হয়তো বিশ্বব্যাপী যুগপ্রভাবের কথাও আছে। কিন্তু আমরা এখনো 'বিরাট বিশ্বে'র কিঞ্চিৎ বহির্ভূত আছি ব'লে আমাদেরই হয়তো আশু আরোগ্যের সম্ভাবনা।

বুদ্ধদেব বসু

দুই গণিকা

আলবার্তো মোরাভিয়া

গ্রীষ্মের শেষ দিকে এসে জিয়াকোমো নিতান্ত একা পড়ে গেল। বন্ধুসংখ্যা অনেক বলেই তার ধারণা ছিল, বান্ধবীও কম নয়, কিন্তু পরিচিতদের মধ্যে দু'চারজন ছুটির সুযোগে শহর ছাড়তেই তার একেবারে ফাঁকা ঠেকল। আসলে জিয়াকোমের আসা-যাওয়া ছোট গোষ্ঠীর মধ্যেই বাঁধা ছিল, যেমন আর সকলের থাকে; হঠাৎ তার মনে হল বৃদ্ধ বয়সের শেষ বিদায়ের কথা। সেদিনকার বিদায় আর ক'দিনের জন্য নয়, চিরকালের জন্য। পরিপূর্ণ নিঃসঙ্গতা।

সকালে ঘুম থেকে দেরীতে ওঠা, সিগারেট খেয়ে যা-খুশী বই পড়ে দুপুর পর্যন্ত বোর্ডিং-হাউসের ঘরে বসে বা বিছানায় গড়িয়ে সময় কাটানো জিয়াকোমোর অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেল। দুপুরে খাওয়ার পর এক পেয়ালা কফির জন্য বাইরে বেরুনো, খবরের কাগজ কেনা, তারপর আবার ঘরে ফেরা। খুব ক্লান্তি বোধ করলে হাত থেকে কাগজখানা ফেলে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে বেশ লাগে জিয়াকোমোর। বিকেল গড়িয়ে গেলে সে উঠল, হাত মুখ ধুয়ে জামাকাপড় পরে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

বেরিয়ে ধীরে সুস্থে জিয়াকোমো শহরের সবচেয়ে সৌখিন পাড়ার একটি কাফেতে গেল; এখানে আলাদা বোতলে তার বিশেষ প্রিয় জার্মাণ বিয়ারের ব্যবস্থা। ঠাণ্ডা বিয়ারে চুমুক দিয়ে জিয়াকোমো চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। দোকানের বাইরে ফুটপাথের ওপর কয়েকটি টেবিল পাতা; রাস্তার এই মোড়ে এবং এই টেবিলগুলির চারপাশেই শহরের যত অলস লোকের, সুন্দরী মেয়েদের আর সৌখিন যুবকদের আড্ডা। কাফের জানালার ঠিক সাম্নে দাঁড়িয়ে অনেকে কথাবার্তা বলার ছলে অন্যদের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। সিগারেট হাতে মেয়েরা সহাস্যে কলরব করে এ টেবিল থেকে ও টেবিলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ট্রে হাতে তাদের ভিড় কাটিয়ে কোনোক্রমে যাওয়া-আসা করছে বেয়ারারা। প্রচুর হাসিঠাট্টা চলছে, এ টেবিল থেকে ও টেবিলে ডাকাডাকি, খামখেয়ালী কথাবার্তা; রকম সকম দেখে মনে হয়

যেখানে সবাই বসে আছে সে জায়গাটা যেন খোলা পথের কিনার নয়, বন্ধুজনের বৈঠকখানা। সাদাসিধে পোষাকে একাকী কেউ যদি সেখানে গিয়ে পড়ে, তবে অনাদৃত, অবাঞ্ছিত অতিথির মতো সবাই তার দিকে তাকায়। সমস্ত ব্যাপারটা যেন অত্যন্ত ঘরোয়া—কেবল টেবিলে যারা বসে আছে এবং যারা চারিদিকে ঘোরাঘুরি করছে তাদের নিয়েই। এই দৃশ্যের ওপরে গেলাস, টেবিল ও পোষাকে বিস্তীর্ণ হয়ে পড়েছে গাছের ছায়া। গুমোট নেই, কিন্তু যথেষ্ট গরম, মেঘহীন আকাশ যেন আগুন হয়ে রয়েছে।

একবোতল বিয়ার শেষ করে সাধারণতঃ জিয়াকোমো আরেক বোতলের অপেক্ষায় থাকে। সূর্যাস্ত হতে হতে ওঠে, ধীরে সুস্থে বাড়ীর দিকে রওনা হয়। রাত্রির দিকে আবার কাফেতে ফিরে আসে। একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। সেই ঘরোয়া আড্ডা, লোক-দেখানো সাজপোষাক। কেবল ভিড় একটু কম, আর দিনের আলোর বদলে বিজলীর বাতি। পাহাড় বেয়ে বিরাট বাড়ী ও বাগানের মধ্য দিয়ে চওড়া রাস্তা, হাওয়ায় চারিদিক চঞ্চল। সারাদিনের পর ঘুরে বেড়াবার পক্ষে জায়গাটি মনোরম। গাছের পাতার মধ্য দিয়ে শিরশির করে হাওয়া বয়, সন্ধ্যার ক্লান্তির মধ্য থেকে হঠাৎ কারুর সতেজ কণ্ঠস্বর বেজে ওঠে, আলোছায়ার মধ্যে মেয়েদের মুখ রহস্যময় মনে হয়। লোকচলাচল দিনের বেলার চেয়ে কম, তাই পরস্পরের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখার সুযোগ বেশি। লম্বা গেলাসে ঠাণ্ডা পানীয় নিয়ে জিয়াকোমো বসল। গভীর মনোযোগের সঙ্গে তার খাওয়া আর লোকের দিকে চেয়ে থাকা দেখে মনে হয় যেন এই তার কাজ, তার অর্থোপার্জনের জীবনধারণের উপায়।

শূন্য, শান্ত মনে জিয়াকোমো বসে থাকে। মাঝে মাঝে নিজের মনকে প্রবোধ দেয় যে এই সঙ্গীহীন পরিত্যক্ত অবস্থাও মন্দ নয়; বেশ মানিয়ে নিয়েছে সে নিজেকে এই অবস্থার সঙ্গে। কিন্তু কী যেন একটা ভয় থেকে থেকে মনের মধ্যে নাড়া দেয়, যেতে চায় না। এই বিয়ার আর বরফের পরিতৃপ্তি—এর অর্থ জিয়াকোমো হঠাৎ খুঁজে পায়না। এসব সামান্য সুখ ছাড়া তার জীবনে কি আর কিছুই জুটবে না? অন্যদিকে চেয়ে হঠাৎ কারুর চাউনি বা হাতনাড়া বা নিতান্ত সাধারণ অঙ্গভঙ্গী চোখে পড়ে, মনে হয় কী টলোমলো পরিপূর্ণ ওদের জীবন! চাপা একটা বেদনা আবার টনটন করে ওঠে। হঠাৎ জিয়াকোমো স্থির করল গ্রীষ্ম শেষ হবার আগে তাকে এই অবাঞ্ছিত একাকীত্বের থেকে মুক্তি পেতেই হবে, এর মধ্যে তার কোনো

স্বাধীন ইচ্ছা নেই, যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এই বন্ধন তার নিজের গড়া, যে কোনো মুহূর্তে এর থেকে সে ছাড়া পেতে পারে।

একদিন রাত্রে বাড়ী ফেরার পথে জিয়াকোমোর চোখে পড়ল অনেক দূরে এক নাইটক্লাবের নীচুতলার জানালার রহস্যময় আলো। শীতকালে নাকি ওখানে বহু কামসেবার্থী মেয়েদের আসা-যাওয়া হয়ে থাকে। হঠাৎ তার কৌতূহল হল, এই গ্রীষ্মের রাত্রেও ওখানে কী একজন শয্যাসঙ্গিনী জুটবে না?

মাটির নীচে সেলার। সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ নেমেই একটা কাঁচের দরজা ঠেলে জিয়াকোমো ঢুকল। সাম্নেই 'বার'। ঢাকা আলোয় ঘর আধো-অন্ধকার। গ্রীষ্মের গরমের সঙ্গে পুরোনো তামাকের গন্ধ মিশে ঘরটাকে আরো গুমোট করে তুলেছে। বোতলে ঠাসা তাকের সাম্নে 'বারম্যান'-এর মুখ জেগে রয়েছে—গরমে পোড়া—মনে হয় সন্ন্যাস রোগে দেহের সমস্ত রক্ত মাথায় টেনে নিয়েছে। অথচ লোকটা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই চলে ফিরে বেড়াচ্ছে, চকচকে শাদা কোটের হাত দ্রুতগতিতে ঘুরছে ফিরছে—জলের কল, জলপাই-তেলের বোতল আর নানা সাজ-সরঞ্জামের মধ্যে। টুলে বসে জিয়াকোমো ভেবে পেল না এক গ্লাস বিয়ার চাওয়া ছাড়া আর কী করা যেতে পারে।

একটু গুছিয়ে বসে নীচু ছাতের গরমে ঘামতে শুরু করতে না করতেই জিয়াকোমোর খেয়াল হল—যে সন্ধানে সে এসেছে তার এলাকা এদিকে নয়, অন্যধারে, যেখানে একটি টেবিল ও জানলা-ঘেঁষে গদি-আটা দুটি বেঞ্চি নিয়ে সারি সারি খোপ চলে গেছে। আরো দেখল দূরে জানলার তলায় বসে আছে দুটি মেয়ে। আর কোথাও কেউ নেই।

প্রথমটায় ভালোভাবে নজর করেও জিয়াকোমো ঠাহর করতে পারল না যে এরা কোন জাতের মেয়ে। দু'জনেই বেশ সংযত অথচ আধুনিক পোষাক পরা, একজনের বয়স হয়ত দ্বিতীয়ার চেয়ে সাত-আট বছর কম হবে, খোলা চুল তার ঘাড়ের ওপর এলানো। এ মেয়েটির মুখে ঘষা-মাজার কোনো চিহ্ন নেই; চোখ হাল্কা সবুজ, উঁচু নাক, বেশ ভরা লাল দুটি ঠোঁট; মাথায় টুপি নেই, জামার হাতা খুব সংক্ষিপ্ত, একটা স্পোর্টস্ জ্যাকেট পাশেই রাখা। বয়স্কা মেয়েটির চুল সযত্নে কোঁকড়ানো, কপালের একদিকে আলগোছে রাখা একটি ছোট্ট টুপি, এই বুঝি পড়ে যায়। এর চোখও হাল্কা রঙের, কিন্তু আরো কাছাকাছি, মাংসল পাতার তলায় ঢোকানো তাতে একটা কুৎসিৎ কৃত্রিমতার

ভাব এসেছে। এ মেয়েটির চোখ ও গাল এবং সরু ঢেউ-খেলানো ঠোঁট—সবি পাউডার, তুলি আর রঙের ভারে পীড়িত। অপর মেয়েটির চেয়ে এর সাজ-পোষাক আরো হাল ফ্যাশানের, প্রথম দৃষ্টিতে হয়ত মেয়েটিকে দ্বিতীয়ার চেয়ে সুন্দরী বলে মনে হয়, কিন্তু সৌন্দর্য যেন বড় বেশি সাজানো, বদরকমের শহুরে। আরেকবার ভালো করে দেখে জিয়াকোমোর দ্বিতীয় মেয়েটিকে ভালো লাগল, আর কিছু না হোক কেবল নতুনত্বের স্বাদটুকুর জন্যই।

মেয়ে দুটি নিশ্চল হয়ে বসে; জিয়াকোমো কখনো টুপি পরা মেয়েটির দিকে সোজাসুজি তাকায়, কখনো আড়চোখে চেয়ে থাকে অন্য মেয়েটির দিকে।

হঠাৎ সে বুঝতে পারল যে এরা গণিকা ছাড়া কিছু নয়। বড় মেয়েটির অতিরিক্ত গাম্ভীর্য আর আভিজাত্যের ভাব, টেবিলে-রাখা কালো হাত আর বেগুনে রং-করা নখ দেখে সন্দেহ একেবারে মিটে গেল। অল্পবয়সী মেয়েটির আঙুলেও রং-মাখানো, কিন্তু হাতগুলো ফর্সা, মসৃণ।

গেলাসটা নামিয়ে রেখে জিয়াকোমোকে চমকে দিয়ে বার-ম্যান বললে—এই আপনার ড্রিঙ্ক্ রইল। অন্য সময়ে মেয়েটির সম্বন্ধে প্রশ্ন করার সাহস তার হত না, কিন্তু এই অবাস্তব পরিবেশের মধ্যে গ্রীষ্মের রাত্রিতে বসে জিয়াকোমোর সাহস এল, তার স্বাভাবিক অপ্রতিভ ভীরুতা চাপা পড়ল।

হঠাৎ সে জিগ্যেস করল,—ওরা দুজন কে?

লোকটা ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে বার-টাকে পরিষ্কার করছিল, কাজ না থামিয়ে মাথা নীচু রেখেই বলল,—জানিনা স্যার। সেদিন সন্ধ্যে বেলাও এসেছিল, কিন্তু তার আগে কখনো দেখিনি।

লোকটার গলার স্বরে স্পষ্ট বোঝা গেল জিয়াকোমো যে ধরণের মেয়ের খোঁজে এসেছে এরা তাদেরি দলের।

'আমার গেলাসটা ওই টেবিলে নিয়ে যাও', বলে,—উঁচু টুল থেকে নেমে জিয়াকোমো মেয়ে দুটির পাশে একটি টেবিলে গিয়ে বসল।

এখানে এসেও ওদের সঙ্গে সম্পর্কটা মূলে একই রয়ে গেল—অর্থাৎ জিয়াকোমো বড় মেয়েটির দিকে চাইতে লাগল সোজাসুজি ভাবে, ছোটটির দিকে আড়চোখে! বয়স্কা মেয়েটি জিয়াকোমোর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই চোখ নামাল, চোখাচোখি না হয়ে তার উপায় ছিল না; কিন্তু জিয়াকোমো যে মেয়েটির দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছিল, সে তার দৃষ্টিকে ইচ্ছা করলেই অগ্রাহ্য

করতে পারত। তা না করে মেয়েটি স্পষ্ট, নির্ভীক চাহনিতে জিয়াকোমোকে দেখে নিল। জিয়াকোমোর মনে হল যে বড় মেয়েটি দ্বিতীয়ার এই নির্লজ্জ দৃষ্টি দেখে তাকে ইঙ্গিতে শাসন করছে। কিন্তু পরমুহূর্তে ভাবল, এ বোধ হয় তার চোখের ভুল।

বার-ম্যান্ জিয়াকোমোর গেলাস তার নতুন টেবিলে নামিয়ে রেখে ফিরে গেল। তারা তিনজন ছাড়া কাছাকাছি কেউ রইল না। অল্পবয়সী মেয়েটি বেশ জোরে বলে উঠ্‌ল,—তোমার সে বন্ধু আর আসছে না, একদম ছোটলোক।

বিরক্ত হয়ে বয়স্কা মেয়েটি বললে,—চুপ্।

—কেন বলব না। আমি বলছি যদি না আসে তা'হলে বুঝব তোমার বন্ধু ছোটলোক।

—বেশ! তাই বলে তা নিয়ে চেঁচামেচি করা কেন? মেয়েটি স্থির হয়ে বসে এমনভাবে কথাটা বলল যে মনে হল টুপিটা পিছলে নাকের ওপর দিয়ে নেমে আসার ভয়ে সে নড়তে পারছে না।

—চেঁচাচ্ছে কে?

—তুমি, আবার কে?

—আচ্ছা, আর তর্ক বাড়িয়ে লাভ নেই। মেয়েটি বেশ সহজভাবেই বলল, রাগ না করে। জিয়াকোমোর মনে হল এটা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার ছল।

—এখন সিগারেট দাও দেখি একটা! মেয়েটি বললে।

নিজের সিগারেট কেসটা টেবিলের ওপরেই রাখা ছিল, জিয়াকোমো চট্ করে এগিয়ে দিলে। মেয়েটিও অত্যন্ত সহজভাবে সেটা নিয়ে নিজের বোনের দিকে এগিয়ে ধরল। সে তখন সিগারেট খাবার ইচ্ছা আর কনিষ্ঠার অভদ্র আচরণের জন্য রাগের মাঝখানে আন্দোলিত।

—এত অল্প পরিচয়েই সিগারেট নেওয়াটা ঠিক নয়! গম্ভীর মুখে একথা বলে কিন্তু মেয়েটি একটি সিগারেট নিলো ঠিকই। মুখে লাগাবার আগে নামটা পড়ে নিল। তারপর সম্ভ্রান্ত মহিলারা নিখুঁত ভদ্রলোকদের দিকে যে ভাবে সিগারেট ধরিয়ে নেবার জন্য ঝোঁকেন, ঠিক সেই ভঙ্গীতে মুখটা বাড়িয়ে দিলে জিয়াকোমোর লাইটারের শিখার দিকে। দ্বিতীয়ার সিগারেট ততক্ষণে ধরানো হয়ে গেছে এবং অজস্র ধোঁয়া বেরুচ্ছে নাক দিয়ে।

জিয়াকোমো বয়স্কা মেয়েটির দিকে চেয়ে বললে,—দারুণ গরম পড়ছে, কী বলেন! এ মেয়েটি যে তখনও তার প্রতি প্রসন্ন নয়, সেটা ভেতরে ভেতরে বুঝেই তার প্রতি জিয়াকোমোর এত মনোযোগ।

এই মামুলি কথাটা শুনে মেয়েটি খুশী হল, যেন তার প্রতি অপ্রত্যাশিত রকমের শ্রদ্ধা দেখানো হচ্ছে। বেশ সহজ সংসারী গলায় সে বললে,—ভীষণ! এরকম গরম আগে কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না। সিগারেটে ছোট ছোট টান দিয়ে ধোঁয়াটা না গিলে মুখ দিয়ে বার করে দিতে লাগল মেয়েটি। ঠিক সম্ভ্রান্ত মহিলাদের মতো।

—আমি তো ঘেমে অস্থির হচ্ছি বলে একটু হেসে অল্পবয়সী মেয়েটি হাতটা তুলে দেখাল, তার জামা কি রকম ভিজে গেছে। তার হাতের এই উর্ধ্বগতিতে সিল্কের জামায় ভাঁজ পড়ল, অবশ্য তাতে স্তনের চেহারার চেয়ে ওজনটাই চোখে পড়ল বেশি। আবার সে বললে,—এই গুহার মধ্যে আর নিঃশ্বাস ফেলা যায় না।

দেহের প্রতি এভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করাটা বড় মেয়েটির মোটেই পছন্দ হয়নি, কনিষ্ঠাকে সে ইঙ্গিতে শাসন করল। তার পরে জিয়াকোমোর দিকে ফিরে বলল,—শীতকালে আসবার পক্ষে এ জায়গাটা চমৎকার, না? গরমের সময় অবশ্য খোলা কাফেই ভালো।

বোঝা গেল যে অপরিচিত লোককে পাশে বসতে দেওয়া সত্বেও ড্রইংরুমের কথাবার্তা চালাবার জন্য মেয়েটি নিতান্ত উৎসুক, অন্য মেয়েটির নির্লজ্জ ব্যবহারেও তার অভিনয়ের মোহ ভাঙ্‌বার নয়।

জিয়াকোমো উত্তর দিল,—হ্যাঁ, খোলা কাফেগুলোই ভালো, বিশেষতঃ যেগুলো বাগানের মধ্যে।

—আমরা সব সময় সেখানেই যাই।

—সব সময় মানে? অন্য মেয়েটি জিগ্যেস করল।

সিগারেটের অল্প ছাই ঝেড়ে একদিকে ঘাড় হেলিয়ে মেয়েটি বলল,—হ্যাঁ, সব সময়। আজকের কথা আলাদা। আমরা এক বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছি।

অল্পবয়সী মেয়েটি হেসে উঠ্‌ল,—বন্ধুই বটে…তার নাম পর্যন্ত আমরা জানিনা।

আত্মরক্ষার সুরে বড় মেয়েটি বলল,—তার মানে? তার নাম…মেলুশ্চি!

—সে তো আমাদের বাড়ীওয়ালার নাম, তার সঙ্গে তোমার বন্ধুর সম্পর্ক কী ?

—আমার বোন খুব ঠাট্টা ভালবাসে। জিয়াকোমোর দিকে চেয়ে বড় মেয়েটি বলল।

—ঠাট্টা! ঠাট্টা কীসের ? সে তোমার বন্ধু মোটেই নয়, আমার তো নয়ই। আমরা তাকে একরকম রাস্তা থেকেই ধরে এনেছিলাম। মেয়েটির স্পষ্টবাদিতার মধ্যে একটা নিষ্ঠুর যৌনতার ভাব। তার নাসিকা বিস্ফারিত, চোখ আঘাত দেওয়ার আনন্দে জ্বলজ্বল করছে।

বড় মেয়েটি আবার জিয়াকোমোর দিকে ঘুরে বসল—যেন সে-ই একমাত্র তাকে বোঝবার ক্ষমতা রাখে। বলল,—আমরা রাস্তায় ছিলাম না, কাফেতে বসে ছিলাম। ভদ্রলোক অত্যন্ত ভদ্রভাবে এগিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন, যেমন আজ আপনি এসেছেন। তারপর বোনের দিকে ফিরে বললে,—তুমি যদি এরকম কথাবার্তা বলতে থাকো তাহলে উনি আমাদের কী ভাববেন বলোতো ?

হাসির হিল্লোলে সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে তার বোন হাসতে লাগল। আনন্দের আবেগে তার মুখ লাল, চেয়ারের মধ্যে যেন নিজেকে আর কুলোচ্ছে না। হাসতে হাসতে বলল,—যা ভাববার ও ভেবে নিয়েছে, কিছু ভয় নেই···নইলে ওরকম মুখ করে এখানে এসে বসবে কেন ? তাই না ? আপনার নাম কী ? দেখছেন তো কাল নাম জিগ্যেস করে রাখিনি বলে কী রকম বিপদ ?

জিয়াকোমোর বেশ মজা লাগল কিন্তু একটা অস্বস্তির ভাবও এল সঙ্গে সঙ্গে—আমার নাম জিয়াকোমো, বলে সে একটু থেমে, একটু কেশে বললে,—আমি ঐ রকম ভেবেই এসেছিলাম সত্যি, কিন্তু আমার ভুল হয়ে থাকতে পারে।

—না না, কিছু ভুল হয়নি আপনার। বলে মেয়েটি আবার হেসে গড়িয়ে পড়ল।

—আপনার নাম কী ?

বড় মেয়েটি তাড়াতাড়ি বলল,—আমার নাম রিণা, আমার বোনের নাম লোরি।

ছোট বোন আবার হেসে উঠল,—তোমার নাম মোটেই রিণা নয়, তেরিজা। আর আমার নাম লোরি নয়, গিয়োভান্না।

—আমার রিণা আর লোরি-ই বেশি ভালো লাগে, বেশ ছোট নাম। অনেক হয়েছে লোরি, এবার থামো।

—আচ্ছা একটু হাসতেও কি পারব না?

—হাসতে কিছু আপত্তি নেই, কিন্তু তুমি বেহায়াপনা করছ।

—মোটেই আমি বেহায়া নই, মেয়েটি হঠাৎ গলা নামিয়ে বললে, যেন এবারের কথাটায় ওর কোথাও আঘাত লেগেছে।

—তোমার পদবী কী, জিয়াকোমো জিগ্যেস করল।

চোখ নামিয়ে লজ্জার ভাবে রিণা বললে,—পানিগাত্তি।

—সিসিলিতে এক শহর আছে পানিকাত্তি বলে। রিণার অপ্রস্তুত ভাব দেখে জিয়াকোমো বেশ মজা পেল।

—না না, পানিগাত্তি। আমরা সিসিলিয়ান নই···

—তোমরা তাহলে কোথাকার লোক?

—আমরা ভেরেণা থেকে।

লোরি জিয়াকোমোর দিকে চোখ ঠেরে বললে,—আসলে আমরা মেয়োলোর লোক, কিন্তু দিদির কথাটার আওয়াজ মোটেই পছন্দ হয় না, বলে ঠিক বেরালের ডাকের মতো, তাই···

—কী খাবে? জিয়াকোমো জিগ্যেস করল।

কৃত্রিম আবেগের সঙ্গে লোরি বলে উঠ্‌ল,—শ্যাম্পেন, শ্যাম্পেন!

—আর কোথাও যাওয়া যাক, কী বলেন? রিণা টেবিল থেকে দস্তানাগুলো তুলে নিয়ে পরতে শুরু করল।

আর তোমার বন্ধু মেলুশ্চির কী হবে?—জিয়াকোমো জিগ্যেস করল।

মনে হচ্ছে না সে আর আজ আসবে, রিণা বলল। কিন্তু লোরি চিৎকার করে উঠল,—সে আর দেখা দিয়েছে···কোথাকার কোন হতভাগা!

তিনজনে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। জিয়াকোমো বার-এ গিয়ে জিগ্যেস করল কত দিতে হবে।

—আপনি কি তিনজনের মদের পয়সা দিচ্ছেন?

—হ্যাঁ, আর এক প্যাকেট ঈজিপ্সিয়ান সিগারেট।

—সবশুদ্ধ দুহাজার লিরা।

পরিমাণটা সামান্যই। সিগারেটের প্যাকেটটা নিয়ে জিয়াকোমো টাকাটা এগিয়ে দিল। বারম্যান মাথা ঝুঁকিয়ে বললে—গুড্‌-নাইট্‌!

তিনজনে ফুটপাথে গাছের ছায়ার মধ্যে বেরিয়ে এল। পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় পিচের রাস্তা আর দুধারের ফুলের সারি উদ্ভাসিত। জ্যোৎস্নার চাপা আলোয় ফুলের লাল নীল হলদে সবুজ রং মায়াময়, অলীক বলে মনে হয়।

এবার কোনদিকে ?—জিয়াকোমো জিগ্যেস করল।

যেদিকে গেলে কিছু মদ পাওয়া যাবে। অনেকক্ষণ এক ফোঁটা পড়েনি। গলা শুকিয়ে কাঠ,—লোরি বলে উঠ্‌ল।

রিণা, বললে,—স্প্লেনডিড্ বার-এ গেলে কেমন হয় ?

—অসহ্য গরম ওখানে, লোরি আপত্তি জানাল।

গিয়াকোমোই সমস্যার সমাধান করল—আমি বলি আঙ্কাস্ মার্সিয়াস্ গ্রটোতে যাওয়া যাক।

জায়গাটা যেখানে তারা দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকে কাছেই। সেলারে নাইটক্লাব, প্রাচীন কোনো ধ্বংসাবশেষের মতো করে সাজানো, চারিদিকে প্রাচীন ফুলদানি ও অনুশাসনের নকল। নরম 'টুফা' পাথর কেটে বানানো থামের আড়ালে আড়ালে ছোট ছোট ঘর, বসবার কোণ, যেখানে নিরিবিলি কথা বলার সুযোগ যথেষ্ট। রিণা এ ব্যবস্থায় বিশেষ খুশী হয়েছে বলে মনে হল না ; তার পক্ষে জায়গাটা হয়ত যথেষ্ট ফ্যাশনদুরস্ত নয়। কিন্তু লোরি মহানন্দে জিয়াকোমোর হাত ধরে এগিয়ে চল্‌ল : হ্যাঁ, গ্রটোতেই যাওয়া যাক্। আচ্ছা, আঙ্কাস্ মার্সিয়াস্ কে ছিল ?

—প্রাচীন রোমের একজন রাজা।

নির্জন ফুটপাথ ধরে হেঁটে এসে তারা গ্রটোর সাম্নে পৌঁছল। লাল ইঁটের সিঁড়ি নীচে নেমে গেছে, দরজার দুদিকে দুই বিরাট 'এম্ফোরি' গোটা স্থাপত্যেরই নিদর্শন স্বরূপ। সিঁড়ির নীচে কালো পাথরের ওপর ভাঙা ল্যাটিনে লেখা অনুশাসন। এখান দিয়ে এসে নীচের আরেক দফা সিঁড়িতে পা দিয়েই ধোঁয়া আর মদের গন্ধ। নীচের বিরাট ঘরগুলি থেকে কলরবের দূরাগত প্রতিধ্বনি ভেসে আসে। নীচু ভলটগুলোর নীচে টেবিলের সারি দেখা যায়, মদের ক্যারাফে নিয়ে লোকে বসে আছে। থাম আর তোরণ আর কারুকার্য মিলে আদিম ভূগর্ভস্থ বাসিলিকার একটা ভালো নকল সৃষ্টি করেছে।

সশব্দে হাততালি দিয়ে লোরি বলে উঠ্‌ল,—চমৎকার !···খুব পুরোনো, না ? সেই যে সেকালে খৃষ্টানরা কোথায় দেখা সাক্ষাৎ করত, সেখানকার মতো···কী বলে জায়গাগুলোকে ?

—ক্যাটাকুম্ব, জিয়াকোমো বলল।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ক্যাটাকুম্ব্! – দেখ দেখি, আজ পর্যন্ত তুমি কোনোদিন আমাকে এখানে আনোনি! দ্বিতীয় কথাটা লোরি বলল বোনকে লক্ষ্য করে।

—কোনোদিনই জায়গাটা আমার বেশি ভালো লাগেনি।

জিয়াকামো বলল,—ভেতরে যাওয়া যাক।

চারপাশের লোকদের চাহনিতে কোনো উৎসুক্য নেই; নিস্পৃহভাবে সবাই কেবল একবার আগন্তুকদের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলে। অধিকাংশই সাধারণ, নিরীহ যুবক যুবতী। মাঝে মাঝে এক একটি বিরাট দল মদ্যপান ও হল্লায় নিরত। দূরে গুহার শেষে, তিন চারটি বেহালা ও 'চেলো' বাদকের হাত চলছে।

হলঘরের টেবিলগুলো পেরিয়ে লাল ইঁটের সরু গলি দিয়ে এসে তারা পম্পীই যুগের ঢঙে সাজানো একটি ছোট ঘরে পৌঁছল। দেয়ালের ফ্রেস্কো ইচ্ছা করেই শেষ করা হয়নি, তার গাঢ় লাল পটভূমির মধ্য থেকে চেয়ে রয়েছে কিউপিড, স্যাটার ও বহু নগ্ন নারীমূর্তি; দেখে মনে হয় বৈজ্ঞানিক উপায়ে পুরোনো ফ্রেস্কোর পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। তার ওপর নানা রস রসিকতার ফাঁকে ফাঁকে পেন্সিলে বহু খদ্দেরের নাম লেখা। ছাদ থেকে ঝুলছে লোহার ওপর কারুকার্য করা এক বাতি। ঘরের অধিকাংশ জুড়ে রয়েছে একটি বিরাট টেবিল আর তার চারপাশে কয়েকটি টুল। টেবিলের মাথার দিকে বস্‌ল জিয়াকোমো, তার বাঁদিকে ছোট বোন, ডানদিকে বড়।

জিয়াকোমো জিগ্যেস করল,—কী খাবে?

লোরি বলল,—যা ইচ্ছে। ভালো হলেই হোলো।

বড় বোনের লিকার পছন্দ, কিন্তু তা নাকি এখানে পাওয়া যায় না।

—লাল আর শাদা কিয়ান্তি আছে। ওরভিয়েতো আছে, আরো নানা ওয়াইন আছে, ওয়েটার বললে।

—মিঠে মদ কী আছে?

—মারসালা, পাসিতো, আলিয়াতিকো—

—আচ্ছা আলিয়াতিকোই নিয়ে এসো।

পুরোনো কথার জের টেনে জিয়াকোমো বলল,—তাহলে তোমরা মেয়োলোর লোক। লোরি উত্তর দিলে—হ্যাঁ, কিন্তু আমি মিলানে-এ থাকি,

আর আমার বোন থাকে এখানে। মাঝে মাঝে আমি এখানে আসি বা ও আমার কাছে যায়।

—আমার মিলান ভালো লাগে না, বড় বোন বললে,—শীত বড় বেশি। আমার শরীর ভালো নয়, রোদই আমার দরকার।

—কী হয়েছিল তোমার? জিয়াকোমো জিগ্যেস করল। হাত দিয়ে বুক ছুঁয়ে রিণা বললে,—আমার শরীর ভেতরে ভেতরে দুর্বল। তার বুক যে একেবারে সমতল, সেটা জিয়াকোমোর আগেই চোখে পড়েছিল। কিন্তু তার মাংসল চোখের পাতার নীচে কোটরস্থ চোখে কামনার ভাষা কৌতূহলকে জাগিয়ে তোলে। লোরি বললে,—ওসব কিছু নয়; আসলে ও এখানকার একটা লোককে ভালোবাসে।

—কী করে সে? জিয়াকোমো জিগ্যেস করল। নিজের নাম পানিগাত্তি বলে রিণা যেমন লজ্জার সঙ্গে প্রচার করেছিল তেম্নি লজ্জার সঙ্গে বললে,—ব্যবসা করে।

নাকের ডগায় দুটো আঙুল ঠেকিয়ে লোরি বলে উঠ্‌ল,—চিজ বিক্রী করে বেড়ায় লোকটা। তার ভঙ্গীটা এমন যেন লোকটার গা থেকে সর্বদাই তার ব্যবসার গন্ধটা ছড়াতে থাকে।

ওয়েটার ওয়াইন নিয়ে এল। ছিপি খুলে মোটা সবুজ গেলাসে ঢালতে লাগল জিয়াকোমো।

লোরি জিয়াকোমোর দিকে চেয়ে বললে,—ভালো মদ। খুব মিষ্টি।

মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাল বড় বোন,—হ্যাঁ, আলিয়াতিকোই বটে।

প্রথম গেলাসটা এক চুমুকে খালি করে জিয়াকোমো আরেক গেলাস ঢালল। মেয়ে দুটির গেলাসও তখন খালি, জিয়াকোমো সেগুলো আবার ভর্তি করে দিয়ে আরেক বোতলের অর্ডার দিল।

খানিকটা বুদ্ধি খাটিয়ে জিয়াকোমো জিগ্যেস করল,—সে এখন কোথায়?

—শহর ছেড়ে বেরিয়েছে, কাজের ধান্ধায়। ছোট বোন হাসল,—কিচ্ছু ভয় নেই, ও টেলিফোন বা টেলিগ্রাম না করে আসে না। খুব ভালো লোক। হঠাৎ এসে হাজির হবে না।

—লোরি, ওর সম্বন্ধে এসব বোলো না। তুমি ওকে চেনোনা পর্যন্ত।

—কিচ্ছু এমন মহাপুরুষ নয় ও। তুমি ওকে ঠকিয়ে ভালোই কর। আমি তোমাকে দোষ দেই না।

বড় বোন আর কিছু বললে না, চুপ করে গেল। জিয়াকোমো হঠাৎ স্থির করল বড়টিকেই তার চাই। অন্ততঃ এবার একটু অগ্রসর হওয়া উচিত। অলক্ষিতে সে টেবিলের তলায় রিণার হাঁটুর ওপর হাতটা রাখলে। সে তার দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত কৃত্রিম সহজতার সঙ্গে জিগ্যেস করল ঃ

—তুমি কোথাকার লোক ?

—আঙ্কোনার।

জিয়াকোমোর হাত ঝট্‌কা মেরে রিণার বেশবাস সরিয়ে দিয়ে তার হাঁটু থেকে উরুর দিকে চলল। ভীষণ আঁট করে বাঁধা গার্টারের ওপর তার উরুর মাংস যেন ফেটে পড়ছে। তারপরেই নানারকমের অজস্র কাপড়চোপড়, সুতো, ফিতে, বোতাম ইত্যাদিতে চারিদিক ভর্তি। এতটুকু না নড়ে বা জিয়াকোমোর হাত সরিয়ে না দিয়ে বড় বোন বলল,—চমৎকার শহর, না ?

তার স্কার্ট তখন একদিকের হাঁটু ছাড়িয়ে অনেকখানি উঠেছে, উরুকে অনাবৃত করে।

—তোমরা মনে করছ আমি কিছু দেখতে পাচ্ছিনা ? ছোট বোন হঠাৎ বলে উঠল। কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে এতটুকু ঈর্ষার ভাব নেই,—আমার জন্যে ভাবনা নেই, যা ইচ্ছে করো।

জিয়াকোমো হাতটা সরিয়ে নিল, কিন্তু পরমুহূর্তে অনুতাপ হল তার, কেননা রিনা যেন এতক্ষণ আর কিছুই চাচ্ছিল না। হাতটা আবার যথাস্থানে ফিরিয়ে সে ভদ্রতার খাতিরে লোরির কোমর জড়িয়ে ধরল। হেসে তার দিকে বড় বড় কৌতুকভরা চোখের কোণ দিয়ে চাইল লোরি, তার হাতে গেলাসটা ধরা। একটু ঝুঁকে জিয়াকোমো তার গলার উপর দিয়ে একবার ঠোঁট বুলিয়ে নিলে।

এই সময় জিয়াকোমোর হাতটা ঠেলে সরিয়ে কাপড়টা নামিয়ে নিলে বড় বোন। রাগে নয়, কাছ দিয়ে কয়েকজন লোককে যেতে দেখে।

—মিলানে তুমি কী করো ?—লোরিকে জিগ্যেস করল জিয়াকোমো।

হেসে ফেলল লোরি,—কী করি ? তাইতো !

বড় বোন লোরির হয়ে উত্তর দিল,—ও হচ্ছে মডেল।

—মডেল ছিলাম এককালে। এখন তুমি যা এখানে করো আমি তাই ওখানে করি, বেশ দৃঢ়ভাবে লোরি বলল।

বিরক্ত হয়ে উঠল বড়বোন—এসব কথা বলছ কেন ? তুমি যা নও তাই বলে নিজেকে চালাবার চেষ্টা করছ !

অবাক্ হবার ভাণ করে লোরি বললে,—তা তো জানতাম না ! তার চোখে তখন সুরার উত্তেজনা লেগেছে, গালের রং, মুখের ভাব বদলাচ্ছে মুহূর্তে মুহূর্তে।—আচ্ছা তুমি কী করো শুনি তাহলে ?

অবজ্ঞার সঙ্গে ঘাড় নেড়ে বড় বোন বলল—আমি ? আমি কিছুই করি না। আমি হচ্ছি একজন স্বাধীন মহিলা···

—ওঃ, তাই নাকি ? আচ্ছা, আমিও তাহলে স্বাধীন মহিলা, অবসরের সঙ্গিনী ! তুমি যা করো আমিও তাই করি···

রিণা তীব্রদৃষ্টিতে বোনের দিকে চেয়ে রইল, কিন্তু তার কথার কোনো জবাব দিল না। কেবল জিয়াকোমোকে সাবধান করে দিল—দেখ, তুমি যদি ওকে আরো মদ খাওয়াও আর আস্কারা দাও তাহলে ও যে কী বলতে কী বলবে তা কিন্তু আমি জানি না।

লোরি তিক্ত সুরে বলে উঠল,—আমি বেশি মদ মোটেই খাইনি, বলে দিচ্ছি। জিয়াকোমোকে দেখ, ও মোটেই তোমার মতো কেবল ভদ্রতার ভড়ং দেখায় না···

—থাক থাক—বলে জিয়াকোমো লোরির হাঁটুতে রেখে তাকে থামাবার চেষ্টা করলে। লোরির সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই ; জিয়াকোমোর হাত সাহস পেয়ে আরো ওপরে উঠতে লাগল। দুই উরু পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। যতদূর হাত যায় মোজা, শেমিজ বা অন্য কোন অন্তর্বাসের চিহ্ন নেই। মসৃণ ঠাণ্ডা উরু, বোনের থেকে সম্পূর্ণ অন্য রকমের ; সেই মসৃণতা বেয়ে জিয়াকোমোর হাত একেবারে তার পেটের ওপর গিয়ে পৌছল। ঝুঁকে বসার দরুণই বোধ হয় সেখানে একটি ভাঁজ পড়েছে, মনে হয় যেন সুডোল, সুখাদ্যপুষ্ট। বহির্বাসের তলায় লোরির দেহ সম্পূর্ণ নগ্ন, কিন্তু কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে নয়, স্রেফ্ গরমের দিনে ঘর্মাক্ত অন্তর্বাসের অস্বস্তি থেকে ছাড়া পাবার জন্য। জিয়াকোমোর হাতকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে লোরি চীৎকার করে বোনকে বলতে লাগল,—আমি এই নিয়ে ভড়ং করিনা। আমি একজন লোককে ভালোবাসার ঢং করে রোজ সন্ধেবেলা অচেনা লোককে বাড়ি নিয়ে যাই না।

ছোট্ট টুপির নীচ থেকে বড় বোনের দুই চোখ নিষ্পলক দৃষ্টিতে লোরির দিকে চেয়ে রইল।

আরেকটু নরম স্বরে, যেন নিজের হিংস্রতায় একটু লজ্জিত হয়ে লোরি আবার বলল,—আমি এসব নিয়ে ভড়ং করি না। হঠাৎ তার রাগটা গিয়ে পড়ল জিয়াকোমোর ওপর—আর তুমি এবার থামো দেখি!

বড় বোন বললে,—বলেছিলাম অত মদ ওকে খেতে দিও না।

জিয়াকোমোর এদিকে নিজেরই নেশার রং বেশ ধরেছে, লোরির লজ্জামুক্ত নগ্নতায় শরীর মন উত্তেজিত। নেশায় আর উত্তেজনায় হঠাৎ তাকে অধীর করে তুলল।

লোরির কানে কানে সে বললে,—আমরা দুজনে যদি ওকে ছেড়ে সরে পড়ি তাহলে কেমন হয়? বড় বোন তখন হোল্ডারে একটি সিগারেট পরাতে ব্যস্ত।

লোরি জিয়াকোমোকে একেবারে অবাক করে দিলে বড় বোনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে বললে,—ওকে জিগ্যেস করো; যখন দিদির সঙ্গে থাকি তখন ও-ই সব কিছু ঠিক করে।

একটু আশ্চর্য হয়ে জিয়াকোমো বড় বোনের দিকে তাকাল। ছোট বোন শুনতে পাবার ভয়ে নয়, নিজের প্রস্তাবেই খানিকটা লজ্জিত হয়ে গলা খাটো করে বলল,—আমি ভাবছিলাম যে এবার বেরোলে হয় মানে আর কোথাও গেলে হয়, ধরো তোমাদের একজন কারুর সঙ্গে।

—না, একজন কারুর সঙ্গে নয়, বড় বোন স্পষ্টভাবে বলে উঠল,—হয় দু'জনই, নয় একজনও নয়।

—কেন?

—আমাদের তাই নিয়ম।

দু'জনকে নিয়ে কী করব? জিয়াকোমো চিন্তিত হয়ে পড়ল। এরা দুই বোন—ভেবে তার হঠাৎ খুব মজা লাগল। জিগ্যেস করল,—দুজনের জন্য কত?

—কুড়ি হাজার লিরা। এক একজনের দশ হাজার করে।

জিয়াকামো না ভেবে পারল না যে টাকার অঙ্কটা বড় বেশি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বড় বোনের বলার ভঙ্গীর মধ্যে এমন একটা দৃঢ়তা ছিল যে দর কষাকষি করবার সাহস পেলে না সে।

—বেশ। কোথায় যাওয়া যাবে?

—তোমার বাড়ীতে।

—আমার কোনো বাড়ী নেই, হোটেলে থাকি।

—তাহলে জানিনা।

—তুমি যেখানে থাকো সেখানে যাওয়া যায় না ?

গর্বের সঙ্গে রিণা উত্তর দিল,—আমার বাড়ীর সম্মান আমি খাটো হতে দিতে পারি না।

অলস ভঙ্গীতে ছোট বোন বললে,—তুমি তো সব সময়ই ওখানে লোক নিয়ে যাও। মদের আবেশে তার স্বর থেকে তিক্ততাটুকু মুছে গেছে।

—তোমাদের মধ্যে কাকে ফেলে কাকে বিশ্বাস করি বলোতো ? —জিয়াকোমো জিগ্যেস করল। বলেই বুঝল একটু বোকামি হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি রিণার হাত ধরে বললে,—এই একবার নিশ্চয়ই নিয়ে যাবে ?

হেসে মাথা নাড়লো বড় বোন,—না, সে হয় না।

—সে কি ?

—না হয় না। অসম্ভব।

জিয়াকোমো বুঝল যে এবার অন্য পথ ধরতে হবে।

—তাহলে কোনো হোটেলে চলো।

—অসম্ভব। ওখানে গেলেই কাগজপত্র চায়—

একটু রহস্যজনক দ্বিধার সঙ্গে লোরি বলল,—সেদিন সেই ইয়ের সঙ্গে যে হোটেলে গিয়েছিলাম তার নামটা যেন কী—হোটেল করোনা না ?

এবার জিয়াকোমো বিরক্ত হয়ে উঠল—ঠিক আছে। খানিক পরে উঠে যে যার নিজের পথ ধরা যাবে।

মিনিট খানেক সবাই চুপ। রিণা বেশ একটা বিজ্ঞতার ভাব নিয়ে নীরবে সিগারেট টেনে রহস্য সৃষ্টি করতে লাগল। তার গুহাহিত অথচ সুপুষ্ট দুই চোখ সকৌতুক সমবেদনার দৃষ্টিতে চেয়ে রইল জিয়াকোমোর দিকে।

অবশেষে সে জিগ্যেস করলে,—আচ্ছা, তিনজনে মিলে হোটেলে যেতে হলে তোমার কত খরচ হত বল দেখি ?

কী জানি···হাজার দুই লিরা খরচ হত নিশ্চয়ই।

—তার চেয়ে বেশি খরচ হত, অন্ততঃ তিন হাজার লিরা। দুটো ঘর নিতে হত—একটা দুজনের জন্য, আরেকটা একজনের জন্য।

—কী বলতে চাচ্ছ শুনি ?

—যদি কথা দাও যে গোলমাল করবে না, আর হোটেলে তোমার যে

তিন হাজার লিরা খরচ হত, সেটা যদি আমাদের দিতে রাজী থাকো তাহলে তোমাকে আমার বাড়ী নিয়ে যেতে পারি।

জিয়াকোমো ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। ছোট বোন তার দুরবস্থা দেখে আর হাসি চাপতে পারলে না।

—আমার বোন খুব ভালো ব্যবসাদার, কী বলো? টেবিলের ওপর দুই হাতের মাঝখানে মাথা রেখে চোখ বুজে লোরি হাসতে লাগল।

—ঠিক আছে, জিয়াকোমো বললে—এখুনি চলো।

—চলো।

তিনজনে উঠে পড়ল। বড় বোন তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল, যেন তার অনেক কাজ। ইঁটে-গাঁথা দেয়ালের ধার ঘেঁষে, লম্বা তোরণের মতো হলঘর দিয়ে যেতে যেতে জিয়াকোমো লোরিকে জড়িয়ে ধরলো। প্রথমটায় সে কৃত্রিম লজ্জার সঙ্গে ঠেলে সরিয়ে দিলো, যেন বড় বোনের নজরে পড়ার ভয়ে; তারপর হঠাৎ এগিয়ে এসে মুখ তুলে ধরলো জিয়াকোমোর দিকে। চুম্বন শেষ হতেই দুজনে পরস্পরকে ছেড়ে সরে গেল তাড়াতাড়ি।

—মাঝে মাঝে এক-আধটা চুমু খাওয়া মন্দ নয়, কী বলো, লোরি বললো।

—সত্যি।

নানা ঘরের টেবিলের মাঝ দিয়ে তারা ফিরে চলল। নীচু তোরণের মত ছাত থেকে কণ্ঠস্বর আর গেলাস-ছোঁয়ানোর ঠুনঠুন আর বাজনার চাপা গুঞ্জনের একটা মিলিত প্রতিধ্বনি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে; যখন তারা এসে ঢুকেছিল তখনকার চেয়ে হাওয়াটা যেন অনেক ভারী, ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। জিয়াকোমোর মনে হল তারও যেন মদের মাত্রাটা একটু বেশি হয়ে গেছে। বাইরের হাওয়াটা যেন মাটির নীচেকার চেয়েও গরম। গাছের তলায় তলায় জমাট গরম নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, রাস্তার গ্যাসপোস্টের তীব্র আলো পড়েছে ঘন, অসাড় পাতার ওপর।

যেন সবেমাত্র কোনো ফ্যাশনদুরস্ত অভিজাত পার্টি থেকে বেরোচ্ছে এইভাবে রিণা বললে,—এবার একটা ট্যাক্সি দেখো।

চৌকোণো পার্কটা পর্যন্ত তারা হেঁটে গেল, কিন্তু ট্যাক্সির দেখা মিলল না।

—তোমার এই বাড়িটি কোথায় বলো দেখি প্রিয়া! জিয়াকোমো ফুর্তির

ভাবে জিগ্যেস করল। দুজনের মাঝখানে হাতে হাতে সে বন্দী, ওরা তাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

—বাড়ীর সম্মান মনে রেখো!—লোরি খিলখিল করে হেসে বলে উঠল।

বড় বোন দূরের একটা রাস্তার নাম করলো, শহরতলীর দিকে।

জিয়াকোমো বললে,—বাসে চড়তে হবে দেখছি। এই রাস্তার শেষে গিয়ে আবার ট্রাম ধরা যাবে। এছাড়া তাদের আর উপায় ছিল না। ভাগ্য ভালো, বাসটা তাড়াতাড়ি এসে পড়ল। জিয়াকোমো ভাড়া চুকিয়ে দেওয়ার পর তারা বসবার জায়গা খুঁজে নিল। বড় বোন সাম্নের একটা বেঞ্চিতে একা বসল, তার পিছনে জিয়াকোমো ও লোরি।

বাস ছাড়তেই ছোট বোন বেশ জোরগলায় বলতে শুরু করলে,—হোটেলে গেলেই তোমার অনেক সুবিধে হত। বাড়ী ফিরতে যা হাঁটতে হবে! কিন্তু এখানকার হোটেলে বড় গোলমাল করে। মিলানে একটা হোটেল আছে সেখানে কোনো প্রশ্ন জিগ্যেস করে না, এমন কি ঘরের জন্য আগাম টাকা পর্যন্ত চায় না। অর্ধেক-খালি বাসের কয়েকজন লোক জিয়াকোমো ও তার সঙ্গিনীর দিকে ফিরে তাকাল কিন্তু কেউ হাসল না। রাত অনেক, সকলেই ক্লান্ত। দুদিকে বহু-মহলা বাড়ীর মধ্য দিয়ে শহরের মধ্যবর্তী সরু রাস্তা ধরে বাস সশব্দে এগিয়ে চলল। বড় বোন জিয়াকোমোর দিকে ফিরে দৃঢ়ভাবে বললে:

—কতদিন এখানে থাকবেন? আপনার স্ত্রীর নিশ্চয়ই আপনাকে ছেড়ে থাকতে ভালো লাগছে না। আপনি যে রকম 'টুরে' ঘুরে বেড়ান তাতে তিনি যে আপনার বিশেষ দেখা পান তা তো মনে হয় না।

লোরি অবাক হয়ে জিগ্যেস করলে,—স্ত্রী! তুমি ওর স্ত্রীকে চেনো নাকি? তোমার বিয়ে হয়েছে, সত্যি?

হেসে লোরির হাতটা নিজের মুঠোয় পুরে জিয়াকোমো বললে,—হ্যাঁ বিয়ে হয়েছে···তোমার সঙ্গে। লোরি হাতটা টেনে সরিয়ে নিল। বললে, —সাবধান, দিদি দেখতে পাবে। তার গলার স্বরে কৃত্রিম গাম্ভীর্য।

—বাড়ীর সম্মান মনে রেখো! জিয়াকোমো বলে উঠ্‌ল।

—হ্যাঁ বাড়ীর সম্মান আমাদের রাখতে হবেই! এবার খানিকটা কৌতূহলী দৃষ্টিতে কয়েকজন আরোহী তাদের দিকে তাকালো।

পিছন ফিরে বড় বোন বললে,—এক মিনিট তোমরা চুপ করে থাকতে পারো না!

—আমার যখন ইচ্ছে হবে তখন আমি কথা বলব, লোরি বললে।

এই উত্তরের পর বড় বোন মুখ ফিরিয়ে নিল। নিজের বেঞ্চিতে সোজা হয়ে বসে সে বোধ হয় হতাশ হয়ে এমন ভাব দেখাতে চাইল যে এদের সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ নেই। ব্যাগ খুলে সে নাকে পাউডার বুলোতে শুরু করলে। ব্যাগের আয়নায় জিয়াকোমো দেখলে চোখের কোলের মাংসলতার মধ্যে তার বিরক্ত, কঠিন দৃষ্টি।

অন্ধকার একটা পার্কের ধারে এসে বাসটা দাঁড়াল। তালগাছের পাতার মধ্য দিয়ে চোখ পড়ল ট্রামের গোল, হলদে রঙের আলো।

—ঐ আমাদের ট্রাম, বড় বোন বলল, আর সেই সঙ্গে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল।

ট্রাম প্রায় ভর্তি, কিন্তু তবু তারা আবার আগের ব্যবস্থায় বসবার জায়গাটুকু করে নিলে। দ্বিতীয় স্টপে প্রৌঢ় একটি লোক উঠলো। তার চুলে পাক ধরেছে, মাথার আকৃতিটা প্রায় ত্রিকোণাকার। পরণে কালো স্যুট, শাদা শার্ট, কালো টাই। কাঠের মতন শক্ত মুখের মাঝখানে একটি লাল-মাথা বিরাট নাক বসানো। রিণার পাশে বসে পড়ে মাথার টুপিটা সে এমনভাবে তুললে যেন সেটা কোনো একটা পাত্রের ঢাকনি।

—কবে মিলানে যাচ্ছ? জিয়াকোমো তার সঙ্গিনীকে জিগ্যেস করল।

—এখন কিছুদিন এখানেই থাকব, ফুর্তি করে নেওয়া যাবে। দিদি সব সময়ই আমাকে ভালো জায়গা দেখে নিয়ে যায়, কিন্তু যাদের সঙ্গে দেখা হয় তাদের আর পাত্তা পাওয়া যায় না। যেমন আজ সন্ধ্যাবেলা যার অপেক্ষা করছিলাম সে-ও এলো না। আমি বরঞ্চ ব্যবসায়ীদের রেস্তোরাঁতে যেতে রাজী আছি। শুনেছি—বলে সে একটা বিখ্যাত দোকানের নাম করলে—চমৎকার জায়গা।

বড় বোন নড়েচড়ে বসল, কিন্তু কিছু বলল না।

জিয়াকোমো বলল,—হ্যাঁ, ওখানে ভালো খাবার পাওয়া যায়।

—আমি ফুর্তি করতে এসেছি, ফুর্তিই চাই। সেই জায়গাটার নাম যেন কী যেখানে ভড্‌ভিল্ নাটক হয় আর তার ফাঁকে ফাঁকে নিজেরাও নাচা যায়?

—এডেনের কথা বলছো?

—হ্যাঁ। কিছুদিন আগে একটা দক্ষিণী লোকের সঙ্গে ওখানে গিয়েছিলাম, খুব দরাজ হাত ছিল লোকটার। একদিন গেলে কেমন হয়?

—বেশতো, চলো না একদিন।

—আমার ঐ ধরণের জায়গাই বেশি ভালো লাগে।

জিয়াকোমো উত্তর দিলে না। মেয়েটি বলে চলল :

—মিলানে গেলে আমার সঙ্গে দেখা করবে তো ?

—তুমি কোথায় থাক সেখানে ?

—একেবারে পূরো ঠিকানা তোমায় দিয়ে দিচ্ছি। মেয়েটি বেশ একটা মদালস জড়িত দৃষ্টিতে বলল,—যখন খুশি এসো। বাড়ীর সম্মানের জন্য আমি কেয়ার করি না।

কালো পোষাক পরা লোকটা পিছন ফিরে লোরি ও জিয়াকোমোকে ভালো করে দেখে নিলে। রিণা ঘাড় শক্ত করে বসে রইল, ট্রামের দোলানিতে পর্যন্ত তাকে এতটুকু নড়াতে পারল না।

—তোমার ঐ মদটা একেবারে মাথায় গিয়ে চড়েছে। বেশ ভালো জিনিস ছিল কিন্তু।

ট্রামটা থামল। রিণা উঠে বিনা বাক্যব্যয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। কালো পোষাক পরা লোকটা আগে নামল, তারপর রিণার দিকে তাকিয়ে আবার তাকে অভিবাদন করল। রিণা বিশেষ প্রীতির সঙ্গে প্রতিনমস্কার করলে, যেন তার বোনের কথাবার্তা শোনবার পরেও তার প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোতে বিশেষ আনন্দিত।

—কোথায় যাচ্ছ ? আমাদের স্টপটা এসে গেল না কি ? লোরিও উঠে পড়ল।

বড় বোন কিছু বললে না, নেমে দাঁড়াল। জিয়াকোমো এবং লোরিও তার অনুসরণ করে নেমে পড়ল। ট্রামটা বেরিয়ে গেল ; তারা দাঁড়িয়ে রইল বিরাট পিচঢালা খালি জায়গার মাঝখানে। তিনদিকে বিরাট ফ্ল্যাট-ওয়ালা বাড়ী, তার খুব কম জানালারই আলো দেখা যায়। আরেকদিকে তাদের সামনেই পিচঢালা সড়কের ছুপাশ দিয়ে আলোর সারি সাজানো—মনে হয় কোনো মাঠের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। সেদিকে ঘরবাড়ীর কোনো চিহ্ন নেই।

লোরি বললে,—ও, এসে গেছি বুঝি ? আশ্চর্য, আমি এই জায়গাটা কক্ষণো চিনতে পারি না।

কালো কোট-পরা লোকটা চলে যেতেই রিণা লোরির দিকে ফিরে

বললে,—হ্যাঁ, এসে গেছি। কিন্তু আমি আর কখনো তোমাকে আমার কাছে এসে থাকতে বলব না।

—কেন? আবার কী হলো?

—কতবার তোমাকে বলেছি—বলতে বলতে বড় বোনের রাগ আরো বেড়ে গেল—তুমি অন্তত আমি যেদিকে থাকি সে দিকটায় এসে একটু ভদ্র ব্যবহার কোরো, যে ট্রামে চড়ে রোজ বাড়ী ফিরি তাতে অন্ততঃ বাজে বোকো না। সমস্তক্ষণ তুমি চীৎকার করে কেবল যা নয় তাই বলবে আর আমি···

—কেন, কী বলেছি আমি?

—ট্রামের সবাই আমাকে চেনে···কী মনে করবে ওরা? আমার পাশে যে ভদ্রলোক বসেছিলেন তাঁকে দেখেছিলে? মিঃ পিচ্চিও; উনি উকিল, আমার সঙ্গে একই বাড়ীতে থাকেন, একই তলায়। বলবেন যে আমার বোন একটা বাজে মেয়ে, রাস্তার লোক বাড়ীতে নিয়ে আসে···

—বললে ক্ষতি কী?

—ক্ষতি আছে। লোকে আড়ালে আমার নিন্দা করুক আমি চাই না।

বিরাট খোলা জমিটার মাঝখানে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল লোরি,—দেখ, কীসের এত মাথাব্যথা বলো দেখি? তোমার পাড়াপ্রতিবেশী যা বলবে সে তো সত্যি কথা বই আর কিছু নয়! তোমার সঙ্গে আর পারি না। বলে লোরি জিয়াকোমোর দিকে ফিরে এলো।

বড় বোন বললে,—ঠিক আছে। কিন্তু আর তোমাকে আমি এ বাড়ীতে এসে থাকতে বলছি না।

নীরবে হেঁটে চলল তিনজনে। তারপর রিণা একটা বিরাট ফ্ল্যাট-বাড়ীর সদর দরজায় গিয়ে উঠল। তালা খুলতে খুলতে জিয়াকোমোর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললে: দোহাই ভগবানের, একটু চুপচাপ থেকো।

দরজা ঠেলে যে লবিতে তারা ঢুকল তার মেজের কিনারা ধরে কালো মার্বেল পাথরের লাইন চলেছে। ছাত থেকে ঝুলছে বহু কোণবিশিষ্ট কাঁচের ল্যাম্প, তার রকমারি আলোর টুকরো দেয়ালের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে। এর পর সিঁড়ির ঘর। লিফট্ পেরিয়ে রিণা গিয়ে লম্বা হলের শেষে এক দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। আবার বললে,—আস্তে!

তিনজনে ভেতরে ঢুকতে রিণা দরজা বন্ধ করে শাদা চৌকোণো কাঁচের

বাক্সে বসানো এক আলো জ্বাললে। ঘরটা দেখলেই মনে হয় খুব আধুনিক কেতায় সাজানো। চারিদিকে তিনকোণা বা চারকোণা আসবাব, চকচকে ক্রোমিয়মের ল্যাম্প, কাঁচের টেবিল আর টিউবের চেয়ার। সরু গলি দিয়ে রিণা জিয়াকোমোকে নিয়ে একটা বন্ধ দরজার সামনে নিয়ে হাজির করল। বলল,—সোজা শোবার ঘরেই যাওয়া যাক।

শোবার ঘরের প্রায় সবটাই জুড়ে একটা নীচু জোড়া খাট। বিছানার ঢাকায় নানা চৌখুপীর ছকে কাজ করা; একটা চৌখুপীর মধ্যে আরেকটা তার মধ্যে আরেকটা—হরেক রকম রঙের—হাল্কা নীল থেকে বেগুনী, লাল থেকে বাদামী পর্যন্ত। চেয়ারের ঢাকাগুলোও সেই কাপড়ের। ওয়ার্ডরোবটা নানা কোণ জোড়া দিয়ে তৈরী, তার মাঝখানে প্রায় সবটা দেয়াল জুড়ে একটা রিভলভিং আয়না। ছোট ছোট টেবিলের ওপর গোল ল্যাম্প সাজানো। চারিদিক আশ্চর্য পরিষ্কার, অথচ বিছানার ঢাকার রঙের বাহার সত্ত্বেও ঘরটা কেমন যেন অন্ধকার, ম্লান। যেন আধুনিক দ্বিতীয় শ্রেণীর হোটেলের কামরার মতো।

রিণা সাবধানে টুপিটা খুলে ওয়ার্ডরোবে তুলে রাখল। তারপর ঘরের এক কোণায় গিয়ে মাথার ওপর দিয়ে টেনে খুলে নিল জামাটা। গায়ে রইল শুধু একটা কালো জালের অন্তর্বাস। তার দেহের দিকে চেয়ে জিয়াকোমো ভাবল, স্তন বলতে কিছু নেই বটে, তবু ওই বিশাল জঘন আর উরুর আকর্ষণ রয়েছে। কী আর করা যায়; রিণা দাঁড়িয়ে রয়েছে হাতের কাছেই। জিয়াকোমো কোমরে হাত দিয়ে তাকে কাছে টেনে নিলে। রিণা তার চুম্বন গ্রহণ করল, কিন্তু তার মুখভাবের কোনো পরিবর্তন হল না। বললে,—আমি বিছানাটা পাতছি, তুমি এরমধ্যে বাথরুম থেকে জামাকাপড় ছেড়ে আসতে পারো যদি যাও।

বিছানার ওপর ঝুঁকে পড়ে রিণা ঢাকাটা টেনে নিলে, তার উত্তোলিত পায়ের মধ্যে আবার দেখা গেল হাঁটুর ওপর এঁটে-ধরা মোজার গার্টার। তারপর চাদরটা ভালো করে পাত্‌ল। সাদা ধবধবে চাদর, ইস্ত্রির ভাঁজ এখনো যায়নি। বোঝা গেল যে তার 'বাড়ীর সম্মান'টা নিতান্ত অর্থশূন্য নয়। জিয়াকোমো একবার ভাবল জামাকাপড় এবার পরিত্যাগ করি, কিন্তু একা নগ্নদেহে ওই বিরাট বিছানায় শুয়ে থাকার কথা ভাবতেই তার লজ্জা হল। রিণা তখন খাটের কিনারায় তার দিকে পিঠ দিয়ে বসে মোজা খুলছে। ছোট

বোন ইতিমধ্যে অদৃশ্য হয়েছে, বাথরুমের আধ-খোলা দরজা দিয়ে তার নড়াচড়ার শব্দ পাওয়া যায়। বেশ গরম লাগছে দেখে জিয়াকোমো রিণাকে জিগ্যেস করল জানালাটা খোলা যেতে পারে কিনা।

রিণা উত্তর দিলে,—হ্যাঁ, আলো নেভাবার পর। নইলে কেউ দেখতে পাবে হয়ত।

ঠিক তখনই লোরি বাথরুম থেকে ফিরে এল, ওয়ার্ডরোবের আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। জিয়াকোমো লক্ষ্য করল লোরি অদ্ভূত একাগ্রতার সঙ্গে নিজের প্রতিচ্ছবির দিকে চেয়ে আছে আর অন্যমনস্কভাবে ব্লাউজের বোতাম খুলছে ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত। বোতাম খোলা হলে লোরি এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করল ; তারপর আগের মতোই ধীরে সুস্থে ব্লাউজটা টেনে খুলে নিলো তার অন্তর্বাসহীন নগ্নদেহকে অনাবৃত করে। বৃহৎ স্তন আপন ভারেই নত হয়ে পড়েছে, কিন্তু বোঁটা দুটির মুখ ওপরের দিকে, তাছাড়া প্রতি নড়াচড়ার মধ্যে স্তনের কঠিনতা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে তাদের চেহারাটা স্বাভাবিক, বয়স বা দুর্বলতার ফল নয়। জিয়াকোমোর পাশ দিয়ে হেঁটে গিয়ে সে জামাটা একটা চেয়ারের ওপর রাখল, তারপর এগিয়ে গেল ঘরের আরেক কোণায় রাখা গ্রামোফোনটার দিকে। বললে : খানিকটা বাজনা শোনা যাক্।

নীচু হয়ে গ্রামোফোনের হাতল ঘোরাতে ঘোরাতে এলোমেলো চুলের মধ্য দিয়ে লোরি জিয়াকোমোর দিকে তাকাল। তার মুখে একটা সহাস্য উৎসাহের ভাব। জিয়াকোমো আশ্চর্য হয়ে দেখল হাতল ঘোরাবার পরিশ্রমে বাকী সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠছে, কিন্তু স্তনদুটি একেবারে নিশ্চল। অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি সুর এবার বেজে উঠল, লোরি হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল জিয়াকোমোর দিকে। বলল,—এসো একটু নাচি।

তারা ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল, কিন্তু বাজনাটা একটু জোরালো হয়ে উঠতেই ড্রেসিং টেবিলের সাম্নে থেকে রিণা বলে উঠল, ওটা এখুনি বন্ধ করে দাও।

তার কথা না শুনে জিয়াকোমো নিজের সঙ্গিনীকে টেনে বাইরে নিয়ে গেল। তার লজ্জার ভাবটা এতক্ষণে সম্পূর্ণ কেটে গেছে। পুরোপুরি যখন নেমেই পড়েছে তখন কাজটা ভালোভাবেই করা ভালো। এখুনি লোরি আর রিণা দুজনেই সম্পূর্ণ নগ্ন হবে, তারপর তারা তিনজনে মিলে শায়িত হবে ওই বিরাট খাটটায়।

একথা ভাবতেই তার এমন সুখাবেশ হল যে তাড়াতাড়ি কাজ সারার ইচ্ছাটা গেল কমে। লোরিকে নিয়ে সে একটু তফাতে যেতেই চেয়েছিল, কেননা বোনের সাম্নে তার সঙ্গে শারীরিক ঘনিষ্ঠতার মধ্যে একটা সঙ্কোচ এসে পড়ে। এবার সে নাচের একটা তালকে একটু ঘুরিয়ে আলিঙ্গনে পরিণত করতে চেষ্টা করল। কিন্তু তার প্রচেষ্টায় বাধা দিয়ে হঠাৎ থেমে গেল বাজনাটা।

ওই গাধা রিণাটার কাণ্ড,—বলে জিয়াকোমোর বাহুপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে লোরি তীরবেগে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুক্‌ল। জিয়াকোমো অসন্তুষ্টমনে তার পিছু পিছু সেখানে গিয়ে পৌঁছল। রিণা তখন গ্রামোফোনটার ঢাকনা নামিয়ে রাখছে।

—বাজনাটা বন্ধ করে দিলে কেন? আমরা নাচছিলাম দেখনি?

—আমি আগেই বলেছিলাম গোলমাল করা চলবে না। ট্রামে চেঁচামেচি করে কি তোমার সাধ মেটেনি? মিঃ পিচ্চিওর সাম্নে তুমি এমনভাবে আমাকে লজ্জা দিয়েছ যে আমি আর জীবনে ওঁর সঙ্গে মুখ তুলে কথা বলতে পারব না।

দুজনে পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল; একজন অর্দ্ধ নগ্ন, আরেকজনের পরণে জালের শেমিজ।

—মিঃ পিচ্চিও-র জন্যে তো আমার ভারি আসে যায়। কী আর হয়েছে, হয়ত বুঝতে পেরেছে যে তুমি পুরুষ মানুষের পেছনে ছোট। তাতে হয়েছে কী?

—আমার আসে যায়। তাছাড়া তুমি যা বললে সেটা সত্যি নয়। তুমিই তো মিলানে পুরুষদের পেছন পেছন ঘুরে বেড়াও।

—ও, আচ্ছা, তুমি তাহলে কী করো শুনি?

আমি কী করি তা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না···কেবল মনে রেখো যে আমার বাড়ীতে যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ ভদ্র ব্যবহার করতে হবে। আজকে তুমি আমার মুখ হাসিয়েছ···নিজে তুমি অনেক কিছুই করো, কিন্তু দোহাই তোমার এখানে সে সব করতে এসো না।

—বাড়ীর সম্মান, এ্যাঁ? লোরি একটু জোর করে হাসলো, কিন্তু তারপরেই তার মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল,—তোমার এই পচা বাড়ীর জন্য ভাবতে আমার বয়ে গেছে। এখুনি এই বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়াই তার চেয়ে ভালো।

—চলে যাও তাহলে। আমার তাতে সুবিধা বই অসুবিধা হবে না। রিণা কথাগুলো বললে বটে কিন্তু তার গলার স্বর দ্বিধায় খাটো হয়ে গেছে, বলার মধ্যে কোনো জোর নেই।

—কিছু ভয় নেই আমি এখুনি চলে যাচ্ছি। রাগে গরগর করতে করতে লোরি চেয়ারের ওপর থেকে ব্লাউজটা নিয়ে তাড়াতাড়ি বোতামগুলো আঁটতে লাগল।

মুখে বেদনার সুস্পষ্ট ছাপ নিয়েও রিণা কোনোক্রমে বললে,—বেশ, যাও তাহলে।

—হ্যাঁ, যাচ্ছি। আর জীবনে কখনো আমাকে দেখতে পাবে না। বলেই লোরি ওয়ার্ডরোবের পিছন থেকে চামড়ার কিনার-ওয়ালা এক ক্যানভাসের সুটকেস বার করলে। তারপর ড্রয়ার খুলে নিজের জিনিষপত্র যেমন তেমনভাবে সুটকেসে ভরতে লাগল।

জিয়াকোমো তার দিকে এগিয়ে গেল! বলল,—হয়েছে, হয়েছে। এবার থামো।

ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিয়ে লোরি বললে,—বিরক্ত কোরো না।

গ্রামোফোনের পাশে হতভম্ব অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে রিণা। এবার সে বললে,—আমার মতে তোমার যাওয়াই ভালো।

—কিছু ভয় নেই, তোমার এই পচা বাড়ী ছেড়ে আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি।

বিমর্ষমুখে বড় বোন বললে,—তাহলে যাও। যত তাড়াতাড়ি পারো যাও।

এবার আর লোরি উত্তর দিল না। উরুর ওপর সুটকেসটা ঠেস দিয়ে হাঁটুটা একটু তুলে লোরি সেটাকে বন্ধ করলে। তারপরে রাগের ঝোঁকে জিয়াকোমো আর রিণার মাঝখান দিয়ে আলনা থেকে একটা তুমড়োনো টুপি তুলে নিয়ে গটগট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রিণা আর থাকতে পারলে না, আর্তস্বরে ডাকল : লোরি!

কেউ উত্তর দিল না। কয়েক সেকেণ্ড পরে বাইরের দরজা দড়াম্ করে বন্ধ হওয়ার রাগত শব্দে সমস্ত ফ্ল্যাটটা কেঁপে উঠল।

সমস্ত ব্যাপারটা নিমেষের মধ্যে ঘটে গেল। জিয়াকোমোর ফুলে-ওঠা আত্মাভিমানের ঘোর তখনো মোটেই কাটেনি। বেশ ভালো ফূর্তির একটি

ব্যবস্থা করেছে, এখন গা ভাসিয়ে দিলেই মধুরেণ সমাপয়েৎ—এই বিশ্বাসে তার মন ভরপূর, আত্মপ্রসাদে বিহ্বল ; এর মধ্যে হঠাৎ সমস্ত ব্যাপারটা একেবারে ধোঁয়া হয়ে উবে গেল। হতাশায়, রাগে অভিমানে তার মন ভেঙে পড়ল। একটু আগেই শয্যা পেতে তার জন্যে অপেক্ষা করছিল যে মেয়ে, চেয়ে দেখল সে তখনো কালো সেমিজ পরে বিছানার ধারে বসে রয়েছে, দুই চোখে জল আর নিষেধ মানছে না।

ধরা গলায় বড় বোন বলে উঠল,—কী না করেছি ওর জন্য! আমার যখন ষোল বছর বয়স তখন থেকে ওকে মানুষ করার জন্য কাজ করেছি। আমি না থাকলে ওর কী গতি হত ? গরমের ছুটিতে বেড়াতে যাওয়া, কাপড়-চোপড়, জিনিসপত্র সব দিয়েছি···বছরের পর বছর ওকে টাকা পাঠাবার জন্য নিজের সুখের দিকে তাকাইনি।···এখন, এখন দেখছ কী ব্যবহার করল আমার সঙ্গে !

আক্ষেপের সঙ্গে মাথা নেড়ে রিণা জিয়াকোমোর দিকে তাকাল। তার চোখের পাতা তেমনই ভারী রয়েছে, কিন্তু দৃষ্টির মধ্যে আর কোনো বিকার নেই।

জিয়াকোমো খানিকটা কর্তব্যের বোধেই তার পাশে বসে পড়ল, হাত ধরে বলল,—ভেবো না, ও ফিরে আসবে।

—আসবে না, আসবে না, আমি ওকে খুব ভালোভাবে জানি। ও কখনো ফিরে আসবে না। রিণার চোখের জল আর বাধা মানল না। বালিশের তলা থেকে রুমাল বার করে সে চোখ নাক মুছে নিলে।

জিয়াকোমোর একবার মনে হ'ল বলে যে আমরা দুজন তো রয়েছি, কিছুই হয়নি ভেবে নিয়ে সন্ধেটা কাটালেই হয়। চোখে জল আর বিশৃঙ্খল বেশবাস নিয়ে এই অবস্থাতেও রিণা হয়ত রাজী হত কিন্তু শয্যাসঙ্গিনী হিসেবে বিশেষ আনন্দ পরিবেশন করতে পারত না নিশ্চয়ই।

—এবার আমার বাড়ী ফেরাই ভালো, বলে জিয়াকোমো উঠে পড়ল।

—আমিও তোমাকে থাকতে জোর করব না। কিছুই ভালো লাগছে না···তুমি তো নিজের চোখেই দেখলে—কী অকৃতজ্ঞ মেয়ে সত্যি !

বলে করিডরের দিকে এগিয়ে গেল রিণা। দরজার কাছে এসে জিয়াকোমো তাকে টেনে নিয়ে চুমু খেল। কৃতজ্ঞভাবে রিণা উত্তরে তাকে একটি চুম্বন ফিরিয়ে দিলে। বললে,—কী আর বলব। খারাপ লাগছে, তুমি এভাবে চলে যাচ্ছ।

—ঠিক আছে! কিছু ভেবো না,—জিয়াকোমো উত্তর দিল।

বাইরে বেরিয়ে সে আশান্বিতভাবে চারিদিকে চেয়ে দেখল, যদি লোরির দেখা মেলে। কিন্তু চারিদিকে কেবল কালো পিচ, রাস্তার আলোর সারি আর অন্ধকার বাড়ী আর কিছুই চোখে পড়ল না। বিরক্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে জিয়াকোমো ভাবল : আরেকটা দিন কেটে গেল।

আলোর সারির দিকে পা বাড়িয়ে দিলে জিয়াকোমো।

চলচ্চিত্র ও চিত্রনাট্য

চিদানন্দ দাশগুপ্ত

চিত্রনাট্য কি ? নানা খণ্ড খণ্ড জিনিষের জোড়াতালি দিয়ে চলচ্চিত্রের সৃষ্টি। নানা লোকের পরিশ্রম, নানা যন্ত্রের সমাবেশ, নানা চিন্তার সমষ্টি যখন সংহত রূপ নেয় তখন ভালো চলচ্চিত্র তৈরীর পশ্চাৎপট খাড়া হয়েছে। একাকী বসে খেয়ালখুশী অনুযায়ী ছবি আঁকা, কবিতা লেখা, বাঁশি বাজানো চলে; চলচ্চিত্র তৈরী করা যায় না। এইখানেই চলচ্চিত্রকে আর্ট করে তোলবার পথে প্রথম ও প্রধানসমস্যা।

নানা উপাদানকে একত্র মিলিয়ে একটি সংহত সৃষ্টিকে পেতে হলে মেলানোর জন্য একটি মন চাই, মেলাবার একটি আধার চাই। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে সেই মন হল পরিচালকের মন, সেই আধার হল চিত্রন্যাট্য। উপাদানের ব্যবহারের জন্য যেমন চাই আধার, তেম্নি আধারের ব্যবহারের জন্য চাই মন। তবে সব মিলিয়ে একটি সৃষ্টি। তাই ভালো চলচ্চিত্রের প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন হচ্ছে সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য। বাড়ীর নক্সার মতো। নক্সা যদি ঠিক না হয় তবে কোনো স্থপতির পক্ষে ভালো বাড়ী বানানো সম্ভব হয় না। আবার নক্সাই সব নয়। স্থপতির মনে বাড়ীটির একটি সম্পূর্ণ কল্পনা, একটি গোটা চেহারার ছবি থাকে, নক্সা হচ্ছে তার কাঠামো, তার মানচিত্র। এই মানচিত্রের কাজ যখন সারা হয়, তখন বাড়ী তৈরীর কাজ শুরু। স্থপতির কল্পনা তখন নক্সার কাঠামোর সঙ্গে রক্তমাংস জুড়ে একটি গোটা জিনিষ তৈরী করে। বিনা নক্সায় একদিক থেকে ইঁটকাঠ ফেলে বাড়ী বানানো চলে না আবার নক্সা ফেলে দিলেই যে কেউ যে বাকী কাজটা সেরে নেবেন তাও নয়। দুটোই জরুরী, দুটোর কাজই নিখুঁতভাবে সারা হলে তবে ভালো বাড়ী।

স্থাপত্যের এই উপমার মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রের কাজকে ভালো বোঝা যায়। সবচেয়ে বড়ো, সবচেয়ে প্রধান, প্রয়োজনীয় জিনিষ হচ্ছে পরিচালকের কল্পনা। কী চাই, তার স্পষ্ট, সম্পূর্ণ মানসিক ছবি। এই কল্পনার দুটি দিক আছে। এক হচ্ছে গোটা চেহারাকে কল্পনা করার দিক, আরেক হচ্ছে কী জিনিসের ব্যবহারে কেমন চেহারা দাঁড়াতে পারে এই কল্পনার দিক।

কাগজে আঁকা অবস্থায় একটি বাড়ী যেখানে যা দেখায় বাস্তব ইঁটপাথরে হয়ত অনেকখানি অদলবদল ছাড়া তেমনটি দেখায় না। সুতরাং একটি দৃশ্য কাগজে লেখা হবার পর ছবির পর্দায় তাকে ঠিক্ কেমন দেখাবে, এটা স্পষ্টভাবে চোখের ওপর দেখতে পাওয়া চাই, নইলে সেটা অন্ধের চলার মতো তালমান-হীন। অনভিজ্ঞ পরিচালক প্রায়ই যা চান তা পান না, যা পান তা চান না। কারণ কীসে কী হয় সে বোধ তাঁর নেই। ভাবেন এক, হয় আরেক। অবশ্য উপাদানের অভাবও অনেক সময় তার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু সৃষ্টিকার উপাদান বুঝেই সৃষ্টির কল্পনা করেন, তাই সেই কল্পনা যখন রূপ পায় তখন যা চাওয়া হয় তা পাওয়ার সম্ভাবনাও সন্নিকট হয়ে ওঠে। যাই হোক, পরিচালকের এই 'কী চাই' সম্বন্ধে স্পষ্ট কল্পনাটাই হচ্ছে ভালো ছবির গোড়াপত্তন। এই কল্পনা যদি সুষ্ঠু হয়, তারপরের কাজ হচ্ছে চিত্রনাট্যকারের মনে সেই কল্পনাকে সঞ্জীবিত করা, আমি মনে মনে যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছি, সেটি তাকেও দেখানো। আলোচনা, বোঝাপড়া, অনবরত বর্ণনার মধ্য দিয়ে তার মনে যখন এই ছবি ফুটল তখন সে সেই ছবির চিত্রনাট্য লেখবার যোগ্য হয়েছে। এ কাজটা অবশ্য জরুরী, কারণ নক্সা আঁকার বিদ্যে পরিচালকের নাও থাকতে পারে, অথচ নক্সা চাই। চিত্রনাট্য লেখকের দৃশ্যগঠনের, গতিসৃষ্টির ক্ষমতা পরিচালকের কল্পনার অনুবর্তী হয়ে যখন নক্সা আঁকল, পরিচালক যখন দেখলেন এই নক্সা তাঁর কল্পনার বাড়ী তৈরীর পক্ষে সুষ্ঠু, তখন পশ্চাৎপটের সাম্নে প্রথম রেখাটি ফুটল, কল্পনা বাস্তবে আসার পথে দ্বিতীয় ধাপ পার হল, ভালো ছবি তৈরীর দ্বিতীয় প্রয়োজন মিট্‌ল।

এই দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে ভালো ছবির মেরুদণ্ড। এখানে চারিদিক থেকে সমস্ত প্রধান অস্থি এসে মিলেছে, সমগ্র দেহ খাড়া রয়েছে এরই কেন্দ্রিক শক্তিতে। মস্তিষ্কের পরেই প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে এই শক্তি। দেহের নানা অংশকে একত্র করে একটি কেন্দ্রে আঁট করে ধরেছে মেরুদণ্ডেই। অভিনেতা, আলোকচিত্রশিল্পী, প্রসাধনশিল্পী, রাসায়নিক, সম্পাদক, শব্দযন্ত্রী সকলেরই কাজের মানচিত্র এইখানে। এর যেটুকু গলদ, বিভিন্ন অংশে সে গলদ ছড়িয়ে পড়বেই। যত ভালো গল্পই হোক, অভিনেতা যত দক্ষ হোন, আলোকচিত্রের সংযুতি যত উৎকৃষ্টই হোক, চিত্রনাট্য যদি অসার্থক হয়, সেই ছবির পক্ষে দাঁড়ানো শুধু কঠিন নয়, অসম্ভব। অপরপক্ষে ভালো চিত্রনাট্য আংশিক

ত্রুটিবিচ্যুতিকে ঢেকে দিতে পারে। গোটা চেহারা যদি ভীতিপ্রদ হয়, তবে কোথাও একটু বাঁকাচোরায় কিছু আসে যায় না। ঘটনার স্রোত দৃশ্যবস্তুর চলাফেরা ও ক্যামেরার সঞ্চরণের মধ্য দিয়ে যদি গতি মূর্ত হয়ে ওঠে তবে সংলাপের সামান্য দৌর্বল্য, ছাপার কাজে ছোটখাট ত্রুটি চোখে পড়বার অবকাশ ঘটে না।

চিত্রনাট্যেরও দুটি ধাপ আছে। প্রথমটি খসড়া, দ্বিতীয়টি সম্পূর্ণ মানচিত্র, ইংরিজীতে যথাক্রমে যাকে বলে ট্রিটমেণ্ট ও স্ক্রিপ্ট্। স্ক্রিপ্ট্-এর পর আসে শূটিং স্ক্রিপ্ট্। অর্থাৎ সমস্ত আলোচনা সাঙ্গ করে, সমস্ত উপাদানের ব্যবস্থা করে যে চূড়ান্ত এবং যথাসম্ভব সম্পূর্ণ পদ্ধতিটি লেখা হয় সেটিই হল শূটিং স্ক্রিপ্ট্। মঞ্চনাট্যে বিভিন্ন অভিনেতার পার্ট লেখা থাকে। চূড়ান্ত চিত্রনাট্য বা শূটিং স্ক্রিপট্-এ লেখা থাকে শুধু অভিনেতার পার্ট নয়, ফিল্মতৈরীর কাজে যাঁদের সাহায্য প্রয়োজন হয় তাঁদের সকলেরই পার্ট। ক্যামেরা কোথায় এগিয়ে যাবে, কোথায় পাশের দিকে সরবে, অভিনেতা কোথায় হাত বাড়িয়ে অ্যাশ্‌ট্রেটা টেনে নেবেন বা প্রেয়সীর দিকে হাত বাড়াবেন, ছাপাখানা বা ল্যাবরেটরী কোথায় রাত্রির দৃশ্যের যোগ্য ছাপার কাজ করবেন, কোথায় দিনের মতন করবেন,—এ সমস্তেরই ছক এখানে আঁকা থাকে। এই ছক থেকে প্রয়োজনবোধে একচুল এদিক ওদিক সরবার হুকুম দিতে পারেন একমাত্র পরিচালক।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে শুধু ভালো ছবির নির্মিতির দিক থেকেই নয়, সাংগঠনিক দিক থেকে যে পূর্ণ যোগাযোগ ভিন্ন ফিল্ম-নির্মাণ সম্ভব হয় না, তার জন্যও চিত্রনাট্য অপরিহার্য। তাই বিদেশে দেখা যায় এই চিত্রনাট্যের সাহায্যে অভিনেতা, আলোকচিত্রশিল্পী ও অন্যান্য প্রধান কর্মীরা একত্র হয়ে ছবির সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং সেই আলোচনার পর চূড়ান্ত চিত্রনাট্য পুনর্লিখিত হয়। এর ফলে ছবির সমগ্র 'টীম' গল্পের ধাঁচ, মেজাজ, ঘটনা, পরিবেশ—এ সমস্তের সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়ে ওঠেন, তাঁদের অংশটুকু নিখুঁতভাবে সম্পাদন করা, নিজের প্রতিভাটুকু সমগ্রের সঙ্গে যোগ করা অনেক সোজা হয়ে দাঁড়ায়। এর পরে শূটিং স্ক্রিপ্ট্-এর একটি করে কপি যখন প্রত্যেকের হাতে আসে তখন কেবল সজাগ চোখে হাতের কাজটুকু সেরে নেওয়া। হলিউডের অনেক ষ্টুডিয়োতে শূটিং স্ক্রিপ্ট্-এর ৩০০ কপি পর্য্যন্ত বিতরণ করা হয়ে থাকে—আলো সরায় যে 'গ্রিপ্'-এরা

তাদের হাতেও এক কপি দেখতে পাওয়া যায়। কী চাই সেটা সমগ্রভাবে সম্পূর্ণ ফুলের জানা হয়ে থাকে যান্ত্রিক কাজে উৎকর্ষ আসে সহজেই। সাধারণ স্তরের কাজকর্ম আপনিই এগিয়ে চলে সুতরাং পরিচালক মন দিতে পারেন সূক্ষ্মতর ব্যাপারগুলির দিকে।

বাংলা চিত্রনাট্য। মস্তিষ্কে ও মেরুদণ্ডেই বাংলা ফিল্ম-এর প্রধান দুর্বলতা। পরিচালনা বলতে কিছু আমাদের নেই, শুধু সুষ্ঠু সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য নেই তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে চিত্রনাট্যের অস্তিত্বও কৃতিত্বস্বীকারের পর্দায়ই। তার ওপর চিত্রনাট্য যাকে বলা হয় সেটা প্রায়ই প্রকৃত চিত্রনাট্য নয়, সংলাপের সমষ্টির সঙ্গে কিছু নির্দেশের জোড়াতালি এবং দৃশ্য বিভাগ। এই চিত্রনাট্যের সঙ্গে মঞ্চনাট্যের নির্দেশপত্রের পার্থক্য নিতান্ত কম। দৃশ্যবিভাগ সেখানেও আছে, সংলাপ তো নাটকের প্রাণ, আর পতন ও মূর্ছা বা প্রবেশ বা নিষ্ক্রমণের নির্দেশও মঞ্চনাট্যে থাকতে বাধ্য। মঞ্চনাট্যের ঢঙেই আমাদের চিত্রনাট্য তৈরী হয় ফলে আমাদের ছবিও হয় মঞ্চেরই চিত্ররূপ। তবে সবি আছে, কেবল গতি নেই, ছবি আছে অথচ সিনেমা নেই। নাটকের প্রাণ হচ্ছে কথা, চলচ্চিত্রের প্রাণ হচ্ছে ছবি। সুতরাং সংলাপকেন্দ্রিক চিত্রনাট্য যে কিছুই নয় সেকথা বলা বাহুল্য। কথার স্থান ছবির অনেক পরে। সে সহকর্মী নয়, ভৃত্য। যে ছবি বেশী কথা কয় তাতে দ্রষ্টব্যের স্থান স্বভাবতই কম, ছবি হিসাবে সার্থকতায় তার ঘাটতি পড়ে। গল্প বলতে হবে ছবিরই মারফৎ, সাহায্যের জন্য কথার ব্যবহার। নীতিপ্রচার করতে হলেও ছবিতে ঘটনার মধ্য দিয়ে সেই নীতিকে ফুটিয়ে তুলতে হবে, এক বক্তৃতায় সেরে দিলে চলবে না। 'গোল্ড রাশ'-এ চ্যাপ্লিন করুণ রস ও হাস্যরসের পরিবেশন করেছেন বিনা কথাতেই। কাঁটা চামচের নাচের মধ্য দিয়ে 'দি লিট্‌ল ম্যান'এর বঞ্চিত, ক্ষুধার্ত জীবের ছবির মারফৎ যে প্রকাশ হয়েছে সেটা বক্তৃতা দিয়ে সম্ভব হতো না, তার গভীরতা ও বাস্তবতা তৎক্ষণাৎ লোপ পেতো। 'ব্যাট্‌শিপ্‌ পোটেমকিন্‌'-এ সৈনিকদের ও ওডেসাবাসীদের প্রবল বিক্ষোভ নির্বাক চিত্রে আইজেনস্টাইন যেভাবে ফুটিয়েছেন তার তুলনা মেলেনা। চলচ্চিত্রের ইতিহাসের এই দুটি স্তম্ভ নির্বাক চিত্রের ক্ষমতার বিপুল সাক্ষ্য। কথার সংযোজনা অবশ্যই একটা সৌভাগ্যবিশেষ, কিন্তু চলচ্চিত্রের ভিত্তি যে ছবি সেকথা ভুলে গেলে চলচ্চিত্রের সর্বনাশ। এইখানে বাংলা চিত্রনাট্যের ত্রুটি, বিরাট দুর্বলতা। বাংলা ছবিতে

ছবি কম, কথা বেশী, বক্তৃতায় বক্তৃতায় বাংলা চিত্রনাট্য অন্ধকার। ছবিতে গল্প বলা বাংলা চিত্রনাট্য লেখককে শিখতে হবে। 'তোমাকে আমি গুলি করব' বলার চেয়ে রিভলভারে হাত দেওয়ার ক্লোজ আপ্ যে কত বেশী সার্থক তা বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। ব্যবহারের মধ্য দিয়েই চরিত্রের কাঠামো খাড়া করতে হবে, সূক্ষ্ম কারিকুরী করতে হবে। মাঝামাঝি স্থানটা কথার। গড়পড়তায় বাংলা ছবিতে যে পরিমাণ কথা থাকে তার অর্ধেক অনায়াসে বাদ দেওয়া যায়, বাকী অর্ধেক থেকেও অনেক সুচিন্তিত ছাঁটাই চলতে পারে। তাতে ছবিতে গতি আসবে, অনাবশ্যক দৈর্ঘ্য দূর হবে, সিনেমার উপযোগী চিত্রনাট্য লেখার দিকে মন অগ্রসর হবে লেখকের। সিনেমা হচ্ছে চলন্ত চবি। তার চলায় তাল থাকা উচিত, লয় মান থাকা উচিত। যে কোনে উৎকৃষ্ট বিদেশী ছবিতে দেখতে পাবেন, গল্প অনুযায়ী গতি কোথাও দ্রুত, কোথাও মধ্য, কোথাও বিলম্বিত। সঙ্গীতের মতো চলচ্চিত্রও হচ্ছে সময়ের মধ্যে বিধৃত গতি। দর্শকের ওপর কেবল ছবির ও কথার প্রভাব পড়ে না, এই গতি তার মনকে অনেকখানি চালিত করে। সিনেমায় গতির উৎস কী কী? এক, ছবির পর্দায় বস্তুর বা ব্যক্তির চলাফেরা। দুই, ক্যামেরার গতি। তিন, দৃশ্য থেকে দৃশ্যের গতি। এই তৃতীয় গতি দৃশ্যের দৈর্ঘ্য দিয়ে নিরুপিত হয়। পর পর কয়েকটি ছোট ছোট দৃশ্যের যোগফল যেমন দ্রুতগতি। দৃশ্যের এই দ্রুতগতির সঙ্গে যদি দৃশ্যবস্তুরও দ্রুতগতি এসে মেশে তবে সব মিলে ছবি হয় আরো দ্রুত। এর ওপর ক্যামেরাও যদি হঠাৎ সচল হয়ে ওঠে তবে মাত্র কয়েকটি দৃশ্যে দারুণ যুদ্ধের এমন ছবি ফোটানো যায় যা হাজার হাজার ফিটে সম্ভব নাও হতে পারে। এই তিন পৃথক গতির লাগাম চিত্রনাট্য লেখকের হাতের মুঠোয়। তাই ছবির সাফল্য বা অসাফল্যের জন্য তাঁর দায়িত্ব অনেকখানি। পরিচালকের কল্পনাকে রূপ দেবার ভিত্তি একমাত্র তিনিই স্থাপন করতে পারেন। এমন কি যেখানে সেই কল্পনা দুর্বল সেখানেও ছবিতে একটা কোনরকমের বাঁধুনি এনে দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব।

বাংলা ছবিতে যে নানা নৈপুণ্য সত্ত্বেও গোড়ায় গলদ কিছুতেই কাটে না তার জন্য নিকৃষ্ট চিত্রনাট্যই দায়ী। আলোকচিত্রশিল্পী প্রায়ই দেখা যায় শুধু চলনসই নন, নিপুণ; ক্যামেরার কাজে মোটমাট বিচারের অনেকটা স্থান থাকাতে ফাঁকির স্থান কম। অভিনয়ের ঐতিহ্য বাংলা দেশে বরাবরই ছিল, এখনো সেটা লোপ পায়নি। অভিনেতা অনুযায়ী চরিত্র সৃষ্টি করে,

বিভিন্ন নামের একই চরিত্রে অভিনয় করিয়ে আমাদের শিল্পীদের সর্বনাশসাধন করা হয়ে থাকলেও আমাদের পরিচালক ও চিত্রনাট্য লেখকদের তুলনায় তাঁরা ক্ষমতার অধিকারী। পরিচালনা ও চিত্রনাট্যের ব্যাপারে এদেশে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা বা পরিমাপ এখনো গড়ে ওঠেনি বলেই অজ্ঞ ব্যক্তিদের মোড়লীতে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে।

ভালো চিত্রনাট্যলেখক হবার উপায় কি? এক কথায় এই প্রশ্নের কিনারা করা সম্ভব নয়। শিল্পে কুশলী হতে হলে প্রতিভা চাই, সাধনা চাই। কিন্তু তার আগে জানা দরকার যে কেমন প্রতিভা, কেমন সাধনায় এই বিদ্যায় কুশলী করে। এই প্রতিভার সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে, এবার অসম্ভব হলেও সাধনার পথ নির্ণয়ের খানিকটা চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

(ক) চিত্রনাট্যলেখক হতে হলে সাহিত্যিক হতেই হবে, এই ধারণা বর্জন করা চাই। চলচ্চিত্র সাহিত্য নয়। অন্যান্য সমস্ত শিল্প থেকে চলচ্চিত্র ভিন্ন। চলচ্চিত্রকে চলচ্চিত্র হিসাবেই ভাবতে হবে, তার বৈশিষ্ট্যকে বুঝতে হবে। বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পে সত্যকারের কৃতী সাহিত্যিকেরা যে ফল প্রসব করেছেন তা বিষময়। এঁদের মধ্যে অনেকে হয়ত চলচ্চিত্র সম্পর্কে জানেন, অনেক বই পড়েছেন। তবু সাহিত্যিকের মন তাঁদের চলচ্চিত্র রচনায় অক্ষুণ্ণ থাকে অথচ অন্য মাধ্যমে পড়ে জোর পায় না, তাই তাঁদের ছবি হয় কাঁচা সাহিত্য। সাহিত্যিকের কতকগুলি গুণ চিত্রনাট্যলেখকের থাকা দরকার, যেমন দৃশ্য-বর্ণনার ক্ষমতা, গঠনের ক্ষমতা, সংলাপ রচনার কৌশল। কিন্তু আরো দরকার ছবির মারফৎ চিন্তা করার ক্ষমতা, ক্যামেরা আলোকসম্পাত ও শব্দগ্রহণ সম্বন্ধে বোধ, গতি ও লয় সম্বন্ধে ধারণা, চলচ্চিত্রের রসকে কী করে ঘন করে আনতে হয় তার কায়দা সম্বন্ধে জ্ঞান। এই সব জ্ঞান অর্জন করার নানা উপায় আছে। আমার মতে তার মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান হচ্ছে নানাদেশের বিখ্যাত, সার্থক ছবি দেখা। এক একটি ছবি একবার দেখলে চলবে না, অন্ততঃ পাঁচবার দেখতে হবে। খবর রাখতে হবে কোথায় কী ভালো ছবি দেখানো হচ্ছে। অভিনেতার নাম দেখে নয়, পরিচালকের নাম দেখে ও বিভিন্ন বিদেশী উঁচুদরের কাগজে সমালোচনা পড়ে ঠিক করতে হবে কোন ছবি দেখার যোগ্য। প্রথমবার দেখতে হবে সহজ ভাবে, সাধারণ দর্শকের মতো। দ্বিতীয় বার গল্পটা আপনার জানা থাকবে, ছবি দেখতে যাবার আগে গল্পটা মনে মনে ভেবে নেবেন, দেখবার সময় লক্ষ্য করবেন কোন ঘটনাকে কী

ভাবে ভাঙা হয়েছে, সাজানো হয়েছে। বিশেষ করে আরম্ভটা লক্ষ্য করুন। প্রথম সিকোয়েন্সের শেষেই রসটা জমে উঠবে, দর্শকের কৌতূহল ও আগ্রহ বাঁধা পড়বে পরিচালকের হাতে। এটা কেমন করে করা হয় সেটা লক্ষ্য করা দরকার। কেবল একটি যে বাঁধা নিয়ম আছে তা নয়, নানা ছবিতে নানাভাবে এই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। তৃতীয়বার লক্ষ্য করবেন, দৃশ্যবিভাগ ও ক্যামেরার কাজ, চতুর্থবার চোখ রাখবেন ছবির গতির তাল ও লয়ের দিকে, কোথায় কেন দ্রুত, কেন বিলম্বিত ; কোথায় নানা শব্দের ঝঙ্কার, তার পরেই কেন একেবারে মুখোমুখি বসে থাকার নীরবতা। ধ্বনিকে ব্যবহারের মতো নীরবতার ব্যবহারও তীব্রভাবে নাটকীয় হতে পারে। ধ্বনিকে (কথা বাদে) কী ভাবে ব্যবহার করতে হয় সেটা ভালো করে জানা দরকার। পঞ্চমবার আবার সাধারণ দর্শকের মতোই দেখবেন, কেবল লক্ষ্য রাখবেন অন্য দর্শকদের দিকে, তাতে বুঝতে সাহায্য হবে যে কোন 'এফেক্ট' কী ভাবে তৈরী করা হচ্ছে—হাসির, করুণরসের, ইত্যাদি। এ ছাড়াও নানাভাবে ছবিকে বিচার করা যায়, দশবারও দেখা যায়। এখানে নিতান্ত মোটামুটিভাবে বলা গেল। সব ছবি যে পাঁচবার দেখবার যোগ্য হবে এমন নয়। সুযোগও মিলবে কিনা প্রতিক্ষেত্রে বলা শক্ত। কিন্তু মোটের উপর ছবি দেখার প্রয়োজনটা সর্ব্বোচ্চ প্রয়োজন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, এবং শিখতে হলে একবারের বেশী দেখতে হয় এটাও অবিসংবাদিত সত্য। এই সহজ কথাটা এত বড়ো করে বলার প্রয়োজন আছে। কয়েকজন পরিচালকের কথা জানি যাঁরা 'ভিজায়ার মাঁ' ছবি দেখে বিস্ফারিত চোখে বলেছিলেন—'ওরা কী করে!' 'ভিজায়ার মাঁ' হচ্ছে সেই বছরে আমেরিকার নিকৃষ্টতম "অবদান"। এটা আমেরিকান সমালোচক মহলে সর্বজন গ্রাহ্য মত, এমনকি 'লাইফ', 'লুক'-এর মতো শস্তা কাগজেও এই ছবি নিয়ে বহু লেখালেখি হয়েছে, হলিউডকে গালাগালি বর্ষণ করা হয়েছে। আরো বহু পরিচালককে জানি যাঁরা এবছরের ভালো ছবি কোনগুলো জানেন না, হলিউড ছাড়া অন্য চলচ্চিত্রশিল্পের কোনো খবর রাখেন না, শহরে ফরাসী বা জার্মাণ ছবি দেখানো হলে তার সম্বন্ধে উৎসাহ প্রকাশ করেন না। চলচ্চিত্রের বিখ্যাত পত্রিকাগুলির নাম শুনলে আকাশ থেকে পড়েন, পেঙ্গুইনের দু'একখানি চটি বই পড়ে ড্রয়িংরুমে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান, চলচ্চিত্র সম্বন্ধে যারা চর্চা রাখেন তাঁদের পরিহার চলেন শতহস্তেন। একজন বিখ্যাত বাঙালী পরিচালক বিদেশী চলচ্চিত্র দেখেন না এইজন্য যে তাঁর কাজের

ওপর প্রভাব পড়তে পারে, তাতে তিনি নকলনবীশ বলে নিন্দিত হতে পারেন!

পরিহাস বাদ দিলেও এইখানে একটা বড়ো বিপত্তি আছে। এদেশী চলচ্চিত্রমহলে অনেকে বিদেশী ছবি দেখতে গেলেই কোনখানটা নকল করা যায় তার চিন্তায় নিবিষ্ট হয়ে পড়েন। কী করে শেখা যায় সে প্রশ্ন তাঁদের মনে আসে না। নকলের উদ্দেশ্যে ছবি দেখার চেয়ে না দেখাই ভালো। অসংখ্য নকলে বাংলা ছবি পর্যুদস্ত, তার সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ কী? যিনি চিত্রনাট্য লেখা শিখতে চান তাঁকে নকলের চিন্তা ছেড়ে ছবি দেখতে হবে। গ্রহণ করতে পারলে ক্রমে ক্রমে নিজেই সৃষ্টি করার দক্ষতা জন্মায়।

(খ) বই পড়ার সম্বন্ধেও একটা কথা আছে। শুধু চিত্রনাট্য লেখা সম্পর্কিত বই পড়লেই চলবে না, আধুনিক সমাজে চলচ্চিত্রের স্থান, ইতিহাস কান্তিতত্ব, ক্যামেরাবিজ্ঞান, সবই পড়তে হবে। আজকের বাংলা চলচ্চিত্র-মহলে সাধারণ সংস্কৃতির অভাব যে শোচনীয় সেটা বুঝিয়ে বলার দরকার করে না। দেশী-বিদেশী শিল্পকলা, সঙ্গীত, সাহিত্য, নৃত্যকলা ইত্যাদি সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা থাকা দরকার। কয়েকজন সাহিত্যিক থাকা সত্বেও মোটের ওপর ফিল্ম মহলে শিক্ষার অভাবের ফলেই রুচির অভাব, রুচির অভাবের ফলেই বাংলা ফিল্ম-এর উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে আছে। বিদেশে ফিল্ম সম্বন্ধে স্তূপীকৃত বই লেখা হয়েছে, প্রতিমাসে, সপ্তাহে অসংখ্য সাময়িকপত্র আত্মপ্রকাশ করছে। বহু বিখ্যাত ফিল্ম-এর চিত্রনাট্য গ্রন্থাকারে পাওয়া যায়, সেগুলি পড়ে ও সুযোগ পেলে ছবিগুলির সঙ্গে চিত্রনাট্য মিলিয়ে দেখা উচিত। বাংলা ছবিকেও সমালোচনার চোখে ক্রমাগত দেখতে দেখতে ও বিদেশী ছবির সঙ্গে তুলনা করতে করতে এমন অনেক ত্রুটি চোখে পড়বে যা যন্ত্রের বা অর্থের অভাবগত নয়, কেবলমাত্র কল্পনার ক্ষীণতা রুচির বিকৃতি আর সাংগঠনিক দুর্বলতার ফল।

(গ) চিত্রনাট্য লেখা একদিক দিয়ে কবিতা বা গল্প লেখারই মতো, দীর্ঘ অভ্যাসের মধ্য দিয়ে যে সমস্ত গল্প সিনেমার উপযুক্ত বলে বোধ হয় সেগুলির একটি তালিকা রেখে, অন্ততঃ কয়েকটির কাঠামো ও একটির সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য তৈরী করা উচিত।

(ঘ) যাঁরা পেশাদার চিত্রনাট্য লিখিয়ে নন, তাঁদের পক্ষে নানা স্টুডিওতে ঘোরাফেরা ও বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

বাস্তব বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে যোগ না থাকলে কেবল আদর্শবাদী কথায় বাংলা ছবির উন্নতি অসম্ভব। নানা বাধাবিঘ্ন আছে, সুতরাং সমস্ত পরিকল্পনা এমন হওয়া চাই যে এ সমস্তের মধ্য দিয়েই উত্তীর্ণ হয়। কাগজে কলমে চমৎকার চিত্রনাট্য বাস্তব সুযোগসুবিধার অভাবে বানচাল হয়ে যায়।

কী সৌখিন কী পেশাদার সকলেরই ১৬ মিলিমিটারে ছবি তোলার অভ্যাস করা দরকার। ছোট ছোট বিষয় নিয়ে চিত্রনাট্য তৈরী করে ছবি তুললে তাতে অল্পের মধ্যেই ফিল্মের গোটা ব্যাপারটা বুঝতে অনেকখানি সাহায্য হয়। ধরুন আপনি গ্রামে বেড়াতে গেছেন। একটি চাষী পরিবার ভোরবেলা থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কেমন করে কাটায় তার একটি ছবি তৈরী করা শিল্পের দিক থেকে কঠিন হলেও সংগঠনিক দিক থেকে কঠিন কাজ নয়। 'হোম মুভি' অতি শিক্ষাপ্রদ ব্যাপার, তার সম্বন্ধে উন্নাসিক হওয়ার কোনো সার্থকতা নেই। এমেচারের হাতে কখনো কখনো অত্যাশ্চর্য জিনিসের সন্ধান পাওয়া যায়। আমেরিকায় একটি ফিল্ম সোসইটির এক তরুণ সভ্যের তোলা 'হ্যামলেট' নিয়ে কিছুদিন আগে সমালোচকদের মধ্যে আলোড়ন এসেছিল। ব্যয়সাধ্য হওয়ায় এদেশে নিতান্ত বড়লোক ছাড়া অনেকেই এই সখটাকে প্রশ্রয় দিতে পারেন না, কিন্তু কয়েকজনে মিলে চাঁদা দিয়ে বা যাঁর ক্যামেরা আছে তাঁর সঙ্গে জুটে অনেক ক্ষেত্রে ব্যবস্থা করা যায়।

(ঙ) সর্বশেষ হলেও প্রয়োজনীয় হচ্ছে আলোচনা। ছোটখাট দল বেঁধে ফিল্ম সংক্রান্ত আলোচনা ও ফিল্ম-প্রচেষ্টার সার্থকতা খুব বেশী। একজন পরিচালক, আরেকজন চিত্রনাট্য লেখক, তৃতীয়জন আলোকচিত্রশিল্পী—এইভাবে যদি কাজ করা যায় তবে শিক্ষার দিক থেকে তার মূল্য অসীম। বিভিন্ন কাজগুলি যদি পালা করে করা যায় তবে জ্ঞান আরো সম্পূর্ণ হবার সম্ভাবনা। ফিল্ম যেহেতু যৌথ শিল্প সেহেতু তার সাধনায়ও এই পদ্ধতির প্রয়োজন। শিক্ষার উপায়ের অনুবৃত্তি কখনো শেষ হবার নয়। যে ছ'টি উপায়ের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলিকে মোটামুটি একটা ধারণা সৃষ্টি করার জন্যই লেখা, বিশেষতঃ এ জাতীয় সমস্যা নিয়ে বাংলায় আলোচনা হয় না বলেই। অনেকের কাছে সবই জানা জিনিসের পুনরাবৃত্তি বলে বোধ হবে, অনেকে হয়ত বলবেন এসব অর্থহীন। ফিল্ম সম্বন্ধে একজন উৎসাহীর চিন্তায় যা প্রয়োজনীয় বলে বোধ হয়েছে তাই এখানে বলা হল।

আধুনিক সাহিত্য

অর্থনীতির স্বরূপ এবং উদ্দেশ্য নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, এবং বিভিন্ন ধরণের সমাজ-সংগঠনের সমর্থকেরা নিজ নিজ বিশ্বাসের স্বপক্ষে নানা অর্থনৈতিক যুক্তির অবতারণা করেছেন। সকলেরই কিন্তু দাবী যে সমাজ ব্যবস্থার বাস্তব বিবরণ দেওয়াই তাঁদের লক্ষ্য। একথা মেনে নিলে তাঁদের বিভিন্ন বিবরণের মধ্যে অনেক বিষয়ে মতের ঐক্য অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তবু যে এত মতভেদ দেখা যায় তার প্রধান কারণ এই যে সমাজের উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁদের মধ্যে মতভেদ। সবাই একথা মানবে যে যদি কোন একটী জিনিষের দাম বেড়ে যায় অথচ অন্যান্য জিনিষের দাম মোটামুটি ঠিক থাকে, তবে যে জিনিষটার দাম বেড়ে গেল, তার চাহিদা খানিকটা কমবেই। অর্থাৎ আমাদের যে সমস্ত বিভিন্ন অভাব, তার সবগুলিকে সমানভাবে পূর্ণ করবার আমাদের শক্তি নাই। তাই কোন একটির উপর বেশী জোর দেওয়ার অর্থ অন্য কোন একটীকে লঘু করে দেখা। বিভিন্ন অভাব ও দাবীর মধ্যে তুলনা না করে সমাজ তাই এক মুহূর্ত্তও চলতে পারে না। অথচ এ তুলনাকে অর্থনৈতিক বিচার বলা কঠিন। ব্যক্তির অভিজ্ঞতায় তার উদাহরণ প্রতিদিন মেলে। দুটী পরিবারের আয় যদি সমান হয়, তাহলেও তাদের ব্যয়ের তারতম্য থাকবেই। কতকগুলি ব্যাপারে তারতম্যের অবকাশ কম—যেমন ভাতরুটী বা কাড়পচোপড়ের যে প্রয়োজন, তার নিম্নতম মান কেউ লঙ্ঘন করতে পারে না, কিন্তু জীবনধারণের জন্য যা অপরিহার্য্য, তা বাদ দিলে বিভিন্ন ব্যক্তি ও পরিবার নিজ নিজ রুচি অনুসারে বিভিন্ন ধরণের খরচ পছন্দ করবে। কেউ হয়তো যেটুকু অপরিহার্য্য, তার বেশী খোরাকে ব্যয় করতে চাইবে না, পোষাকের প্রতি তার আকর্ষণ বেশী। কেউ হয়তো বলবে যে পোষাক মোটামুটি হলেই হল, খোরাক ভাল চাই। কেউ খোরাক পোষাক যথাসম্ভব কমিয়ে সখের জিনিষের জন্য বেশী খরচ করতে চাইবে।

পছন্দের ব্যাপারকে কেবল অর্থনীতি দিয়ে বিচার করা চলে না, অথচ সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীকে যাঁরা অস্বীকার করেছেন, সে রকম ক্লাসিকাল অর্থনীতিবিদদের প্রায় সকলেই চাহিদা এবং যোগান দিয়ে সমস্ত ব্যাপার বুঝতে চেয়েছেন। চাহিদার মাপকাঠিও তৈরীই ছিল। বাজারে যে দরে যে জিনিষ পাওয়া যায়, তাই দিয়ে তাঁরা বিচার করেছেন যে চাহিদা এবং যোগান বরাবর হল কিনা। এইখানেই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সঙ্গে ক্লাসিকাল অর্থনীতির প্রধান পার্থক্য। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিবিদ বলেন যে সমাজের সম্পদ এমন ভাবে বণ্টন করতে হবে যে জীবনধারণের জন্য যা অবশ্য প্রয়োজনীয়, তা যেন সকলের ভাগ্যেই জোটে। সকলের সেটুকু মিলবার পরে কারু ভাগে বেশী পাবার প্রশ্ন উঠে, এবং কে বেশী পাবে, সমাজের প্রয়োজনীয়তা দিয়েই তা স্থির করতে

হবে। বেশী পাবার দাবী সেই করতে পারে যে খানিকটা বেশী পেয়ে সমাজকে আরো বেশী দিতে পারে। অর্থাৎ সকলের জন্য সমাজসম্পদ বাড়াবার উপায় হিসাবেই ব্যক্তি সাধারণ মানের চেয়ে বেশী দাবী করতে পারে। সে দাবীও কার্য্যকরী হবে কেবল তখন যখন সমাজের সকলের জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন মিটেছে।

অর্থনীতিবিদ হিসাবে জি ডি এচ কোলের নতুন করে পরিচয় দেবার প্রয়োজন নাই—আধুনিক পণ্ডিতদের মধ্যে তাঁর স্থান সর্ব্বোচ্চশ্রেণীতে, এবং তা ছাড়া বর্ত্তমান লেবর গভর্মেন্টের তিনি অন্যতম মন্ত্রবিদ। তাই দেড়শো পৃষ্ঠার এ ক্ষুদ্র পুস্তিকায় তিনি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির যে বিচার করেছেন, এবং পুরোনো ক্লাসিকাল বা আধুনিক কীন্‌সপন্থী অর্থনীতির সঙ্গে তার পার্থক্যের যে বিবরণ দিয়েছেন, তা একাধিক কারণে প্রণিধানযোগ্য। বারোটী সূত্রে তিনি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মর্ম্ম উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছেন। সেই সূত্রগুলির পরিচয় দেওয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। সমালোচনা বা বিচার করবার চেষ্টা বর্ত্তমানের জন্য মুলতবী থাক।

কোল অর্থনৈতিক কার্য্যক্রমের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা স্বরু করেছেন। মানুষ সুখ চায়, এবং অভাব পূরণ করেই সুখলাভ করে। অভাব পূরণের জন্য কিন্তু চেষ্টা চাই, এবং পরিশ্রম বেশী হলে তখন তাতে দুঃখই বাড়ে। কাজেই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রথম সূত্র এই যে মানুষের অভাব পূরণ করতে হবে এমন ভাবে যে অভাব পূরণের জন্য যে শ্রম বা ক্লেশ, তা যেন ইচ্ছা পূরণের আনন্দের চেয়ে বেশী না হয়। মানুষ যেমন একেবারে অলস বসে থাকতে পারেনা, থাকলে ক্লেশ পায়, ঠিক তেমনি পরিশ্রমও মাত্রাতিরিক্ত হয়ে গেলে তা ক্লেশদায়ক। অভাবের তাড়না এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমের পীড়া—এ দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য করাই অর্থনীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত।

কোলের দ্বিতীয় সূত্র এই যে অভাব পূরণের খতিয়ানে মোটামুটি ভাবে সকল মানুষের সমান অধিকার স্বীকার করে নিতে হবে। বিশেষ কারণে তার হয়তো ব্যতিক্রম হতে পারে, এবং ব্যতিক্রমের বিচার অন্যসূত্রে মিলবে, কিন্তু অর্থনীতির গোড়ার কথা এই যে সকল মানুষের যেগুলি মৌলিক প্রয়োজন, সেগুলিকে পূরণ না করে অন্য কোন দাবী মেটাবার প্রশ্ন উঠতে পারেনা। হাজার লোক অর্দ্ধাহারে থাকবে আর দশজন পূর্ণাহারের পর বিলাসের সামগ্রী সঞ্চয় করবে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে এ ব্যবস্থা অচল। মুনাফা দিয়ে বিচার করলে খাদ্যশস্য চাষের চেয়ে মদের ব্যবসায়ে লাভ বেশী হতে পারে, ধানচাষের চেয়ে পাটচাষে বেশী লাভ হতে পারে, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক মানদণ্ডে মুনাফাকে বর্জ্জন করে জীবনের প্রয়োজনকে বড় করতে হবে।

তৃতীয় সূত্র হ'ল যে মানুষের শারীরিক ও মানসিক আরামের জন্য যেমন উপযুক্ত খাদ্যবস্ত্র প্রভৃতির প্রয়োজন, তেমনি যথেষ্ট অবসরেরও প্রয়োজন। কাকে উপযুক্ত বা যথেষ্ট বলা চলে, তা নিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে মতভেদের অবকাশ আছে। কেউ বলবে অভাব কমাও এবং অল্পেই তুষ্ট হও, মেহনতও তবে কম করতে হবে।

কেউ বলবে মেহনত একটু বেশী হোক ক্ষতি নাই কিন্তু আরামের সামগ্রী চাই। এ সমস্ত পার্থক্য সত্ত্বেও বলা চলে যে মানুষের শ্রমের পরিমাণ মোটামুটি বেঁধে দেওয়া দরকার। প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তিকে কমপক্ষে যেটুকু করতে হবে এবং বাধ্যতামূলক ভাবে যার বেশী তার কাছে দাবী করা চলবে না—এ দুটো সীমাই নির্দ্ধারণ করে দেওয়া যায়। ব্যক্তি তার মধ্যে নিজ রুচি পছন্দ বা প্রয়োজন মত যদি কমবেশী করে, তাতে আপত্তি করবার কারণ নেই। যদি স্থির হয় যে অন্ততপক্ষে দু'ঘণ্টা মেহনত সবাইকে করতেই হবে কিন্তু আইন করে কাউকে ছয় ঘণ্টার বেশী খাটানো যাবে না, তবে কেউ হয়তো বলবে যে আমি বেশী চাইনা, দু'ঘণ্টার বেশী খাটতেও রাজী নই, কেউ বলবে বা আমি সাত ঘণ্টা খাটব কিন্তু তার উপযুক্ত আরামের সামগ্রী চাই।

চতুর্থ সূত্রে এই কথাই বলা হয়েছে যে মানুষ কেবল আরামই চায় না, মর্য্যাদাও চায়। যে কাজ করতে হবে, তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ চাই কিন্তু কেবল তাতে মানুষ তৃপ্ত হয় না। যে কাজ করছে তা প্রয়োজনীয় এবং সমাজ সে কাজের উপযুক্ত মর্য্যাদা দেয়, এ বোধও যেমন চাই, সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতাবোধ এবং নিজের শক্তি ও কৃতিত্ব দেখাবার সুযোগও চাই। ক্লাসিকাল অর্থনীতিতে উৎপাদন বাড়াবার উপর এত বেশী জোর দেওয়া হয়েছিল যে মজুরের পছন্দ অপছন্দকে হিসাবের মধ্যে আনা হয়নি। রুজীর তাগিদে মজুর যে কাজ পেয়েছে তাই করেছে, তাই একদিকে কাপড়ের কল বন্ধ থেকেছে, অন্যদিকে মদের ভাঁটী পূরোজোরে চলেছে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সমাজের কল্যাণ দিয়ে কাজের প্রয়োজন বিচার হয় বলে এ ধরণের অনাচার ঘটতে পারেনা। সেই সঙ্গে উৎপাদন পদ্ধতির লক্ষ্য নির্দ্ধারণেও মজুরের অধিকার স্বীকার করে নিতে হবে। অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের অর্থ এ নয় যে সমস্ত মজুর একসঙ্গে মিলে কলকারখানা চালাবে। তার অর্থ শুধু এই যে জনসাধারণ—এবং মজুর জনসাধারণের এক বিরাট অংশ—স্থির করবে যে সমাজের অর্থনিতিক ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়া কিভাবে চলবে। রাজনৈতিক গণতন্ত্রের অভিজ্ঞতা কম বেশী আমাদের আছে। সেখানে এ দাবী কেউ করেনা যে রাষ্ট্রের প্রত্যেক সিদ্ধান্ত মিটিং করে গণভোট নিয়ে করতে হবে, বা কর্মচারী নিয়োগের বেলায়ও প্রতিবারই মিটিং বা ভোট হবে। অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের বেলায়ও এ সব প্রশ্ন তোলার যৌক্তিকতা নাই।

মানুষ অনিশ্চিতকে ভয় করে, নিশ্চিতের আকর্ষণে নিজের স্বাধীনতাকেও ক্ষুন্ন করতে রাজী হয়। তাঁর পঞ্চম সূত্রে কোল মানুষের এই আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করে অর্থনীতির ক্ষেত্রে তার কি প্রয়োগ তার বিচার করেছেন। মানুষ চায় যে যে ধরণের জীবনে সে অভ্যস্ত, তার যেন কোন অবনতি না ঘটে। সেজন্য দু'টী জিনিষ চাই—ব্যক্তির আয় যেন না কমে এবং পছন্দমত কাজ জোটে। সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজন মিটিয়েই এ দাবী পূরণ করা চলে, কারণ যদি সমগ্র সমাজে কখনো অভাব অনটন ঘটে, তবে ব্যক্তিকেও জীবনের মান কমাতেই হবে। দুর্ভিক্ষে অথবা দুর্ব্বিপাকে যদি খোরাক নষ্ট হয়ে যায়, তবে সবাইকে তা সহ্য করতে হবে। সমাজের প্রয়োজনে যদি এক ধরণের কাজের চাহিদা কমে যায়, অন্যধরণের কাজের চাহিদা

বেড়ে যায়, তবে ব্যক্তির অপছন্দ সত্ত্বেও যে কাজ প্রয়োজন, তার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক মজুরের ব্যবস্থা করতে হবে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি এ ধরণের পরিবর্ত্তনকে সহনীয় করে তুলতে পারে, কিন্তু পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তাকে একেবারে অস্বীকার করতে পারেনা। সমাজতান্ত্রিক সমাজের আর একটী বিশেষত্ব আছে। মানুষ যে সামাজিক নিশ্চয়তা খোঁজে, ধনতান্ত্রিক সমাজে সে নিশ্চয়তার লক্ষ্য কেবলমাত্র আয় বা কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়া। শিক্ষা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, এক কথায় সভ্যজীবন যাপনের সমস্ত ব্যবস্থায় সে নিশ্চয়তার দাবী একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজই স্বীকার করতে পারে।

অবসর ভিন্ন মানুষ সুখী হতে পারেনা। একথা স্বীকার করে নিয়েও সামাজিক সম্পদ-বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে। তাই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ষষ্ঠ সূত্র এই যে যতক্ষণ মানুষের কোন অভাব অপূর্ণ থাকবে, ততক্ষণ সক্ষম ব্যক্তি যেন অলস হয়ে বসে না থাকে। সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি কি চায়, তার প্রতিও নজর রাখতে হবে। জনসাধারণের জন্যে যা অপরিহার্য্য, সে অভাবগুলি মেটাবার পর বাকী অভাবের বেলা বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন রুচিকে স্বীকার না করলে ব্যক্তিস্বাধীনতার হানি হয়। এ নীতি প্রয়োগের বেলা বিভিন্ন ধরণের কাজের কথা মনে রাখতে হবে। যে রুটী তৈরী করে সেও মানুষের অভাব পূরণ করছে, আবার যে গান গায় অথবা ছবি আঁকে সেও মানুষের অভাব পূরণ করছে। তেমনি ভাবে বাইরে কারখানায় কাজও যেমন কাজ, বাড়ীতে রান্না ঘরকরণা অথবা শিশুপালনও সমান সমাজ-সঙ্গত কাজ।' এক কথায় সকল মানুষের ন্যুন অর্থনৈতিক অধিকার মেনে নিয়ে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির কাজের ব্যবস্থা করাই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির লক্ষ্য।

সপ্তম সূত্রে সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়েছে। কোন সমাজই নিজের সমগ্র উৎপাদন সাক্ষাৎভাবে ভোগ করতে পারেনা— যদি করে তবে দিনদিন সে সমাজ নিঃস্ব হয়ে পড়তে বাধ্য। যে সমস্ত কলকারখানা ঘরবাড়ী রয়েছে, সেগুলি ধীরে ধীরে পুরোণো হয়ে আসছে, ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। কাজেই একদিন না একদিন তাদের বদলাতেই হবে। যে ধন উৎপাদন করা হয় তার সমস্তটাই খরচ করে ফেললে প্রয়োজনের সময় মেরামত বা বদলের সংস্থান থাকবে না, তাই ভবিষ্যতের প্রয়োজন মেটাবার জন্য প্রতিদিনের উৎপাদন থেকে খানিকটা বাঁচাতে হবে। কলকারখানার পরিবর্তন ছাড়াও সঞ্চয়ের অন্য প্রয়োজন আছে। সমাজের জনসংখ্যা বাড়ছে, তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করতে হবে, সমাজের জীবনমানের উন্নতির চেষ্টা করতে হবে, কিন্তু সে সমস্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও সঞ্চিত মূলধন প্রয়োজন। ধনতান্ত্রিক সমাজে এ সঞ্চয় খানিকটা খামখেয়ালী, খানিকটা অর্থনৈতিক অসাম্যের ফল। কারু এত আছে যে সমস্ত অভাব মিটিয়েও তার উদ্বৃত্ত থেকে যায়, কারু বা সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি এত প্রবল যে নিজেকে বঞ্চিত করেও খানিকটা সঞ্চয় করে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে এ ধরণের অব্যবস্থার বদলে সমগ্র সমাজের কল্যাণের প্রয়োজনে সজ্ঞান সিদ্ধান্তের ফলে সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা হয়। বর্ত্তমান উৎপাদনের এক আনাই হোক আর চার আনাই হোক, যা সঞ্চয়

করা হবে, তা সজ্ঞান সিদ্ধান্তের ফল, এবং সমাজের সকলের প্রয়োজন ও চাহিদা সমানভাবে মিটিয়েই তবে সে সিদ্ধান্ত করা হয়।

সমাজের সম্পদের যে অংশ ব্যক্তির ভাগে পড়ে, তাকেই তার আয় বলা চলে। উৎপাদন এবং বণ্টন—এ দু'টাই অর্থনীতির প্রধান প্রক্রিয়া। কাজেই উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বণ্টন ব্যবস্থারও সামঞ্জস্য করতে না পারলে সুস্থ সামাজিক জীবন টেঁকে না। বণ্টন-ব্যবস্থার সুনিয়ন্ত্রণ তাই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির অষ্টম সূত্র। সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রথম লক্ষ্য যে জীবিকানির্ব্বাহের জন্য যা প্রয়োজন, সমাজের প্রত্যেকটী ব্যক্তিই যেন তা পায়। সমাজের দাবী পূরণ করা ব্যক্তির কর্ত্তব্য, আর ব্যক্তির জীবিকার সংস্থান সমাজের কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্য পালনের পর সমাজের উৎকর্ষসাধনের কথা উঠে। সকলেই যদি কেবলমাত্র জীবিকাঅর্জ্জন করে তুষ্ট থাকে, তবে সমাজের উন্নতি হবে কি করে? ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষসাধনের জন্য নানাভাবে তাকে উৎসাহিত করা তাই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির অন্যতম লক্ষ্য। সেজন্য প্রয়োজন হলে পুরস্কার বা স্বীকৃতির বন্দোবস্ত করতে হবে, অথবা আয়ের পরিমাণের কমবেশীও করা যেতে পারে। কিন্তু সর্ব্বদাই এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে সকলের জন্য জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন মিটিয়ে তবেই উৎসাহবর্দ্ধনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ন্যায়ত সম্ভবপর। সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে সকলের দাবী পুরোপূরি মেটাতে পারে, এমন সমাজ এখনো দেখা দেয়নি, কাজেই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ব্যক্তির ন্যূনতম দাবী সমানভাবে মিটিয়ে ন্যূনতমের উপরে যা কিছু তার জন্য সামাজিক অসাম্যকে অন্ততঃ বর্ত্তমানের জন্য মেনে নেবে। সর্ব্বদাই অবশ্য লক্ষ্য থাকবে যে সে অসাম্য যেন কমে আসে।

অষ্টম সূত্রকে কার্য্যকরী করার জন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির নবম সূত্র যে সমাজের সম্পদ বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা, ব্যক্তির ভাগ্য বা ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিলে চলবে না—সমাজের সংঘবদ্ধ সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্যক্তির আয় নির্দ্ধারণ করতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তির মজুরী বা বেতন যে সরকার স্থির করে দেবে, এ আশা অন্যায় এবং অসম্ভব। কিন্তু সমাজের উৎপাদনের কি পরিমাণ সাক্ষাতভাবে ব্যবহার হবে এবং কি পরিমাণ ভবিষ্যত উৎপাদন বাড়াবার জন্য সঞ্চিত থাকবে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত সমাজকেই করতে হবে। ঠিক তেমনি বিভিন্ন ধরণের কাজের মজুরী, বিভিন্ন ধরণের সমাজসেবার পুরস্কার—এ সব বিষয়ে সিদ্ধান্তও সমগ্রভাবে করা প্রয়োজন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের দোহাই দিয়ে তাকে ব্যক্তির হাতে ছেড়ে দেওয়া চলে না। অভাবের তাড়নায় কেউ উপ-মানবিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করবে, অন্যপক্ষে অনাবশ্যক প্রাচুর্য্যে কেউ সম্পদের অপচয় করবে—বর্ত্তমান সমাজের এ অব্যবস্থা যদি এড়াতে চাই তবে শ্রমিকের মজুরী, চাকুরের বেতন, পেশাদারের উপার্জ্জন, ব্যবসায়ীর মুনাফা ও বিত্তশালীর খাজনা, সুদ, লভ্যাংশ প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের আয় সমাজ-সঙ্গত নীতি অনুসারেই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

সমাজের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যেমন বিভিন্ন প্রয়োজনের গুরুত্ব বিচারের পর উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন, বিভিন্ন সমাজের পারস্পরিক সম্বন্ধের বেলাও

ঠিক সেই রকম বিবেচনা ও ব্যবস্থা করতে হবে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির দশম স্থত্র আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ। ক্লাসিকাল অর্থনীতি সমাজের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ মানে নি। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সাক্ষাৎভাবে না হলেও প্রকারান্তরে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছে। অবাধ বাণিজ্যে বিশ্বাসের ফলে ক্লাসিকাল অর্থনীতিবিদ বলেছেন যে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন ব্যবসায়ে বা শিল্পে উৎকর্ষ লাভ করতে পারে। তাই যে দেশে যে শিল্প উৎকৃষ্ট, সে দেশ যদি কেবল সেই শিল্প নিয়েই থাকে, তবে সমস্ত পৃথিবীর সম্পদ বাড়বে, এবং তখন স্থবণ্টনের দ্বারা প্রত্যেক দেশই লাভবান হবে। একথা মানলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু ক্লাসিকাল অর্থনীতিবিদ সজ্ঞানে তা স্বীকার করেন নি, বলেছেন যে লাভ-লোকসানের খতিয়ান দেখে বিভিন্ন দেশ স্বভাবতই এভাবে বিভিন্ন শিল্প নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেবে। নানা কারণে ক্লাসিকাল অর্থনীতিবিদের সে আশা পূর্ণ হয়নি। ভবিষ্যতে বৃহত্তর লাভের ভরসায় বিভিন্ন দেশ আপাত লাভ ছাড়তে রাজী হয়নি। তা ছাড়া, রাজনৈতিক সংঘর্ষের আশঙ্কা যতদিন থাকবে, ততদিন কোন দেশ প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য পুরোপুরি পরের উপর নির্ভর করতে ভরসা পাবেনা। যদি এ সমস্ত কারণ কখনো দূর হয়, তবু আভ্যন্তরীণ শিল্প-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ না করে বহির্বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার স্বপ্ন ব্যর্থ হতে বাধ্য।

সমাজের সম্পদের স্থবণ্টন করতে হলে তাই সমস্ত পৃথিবীর কথা ভাবতে হবে। এ বিষয়ে ক্লাসিকাল এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মধ্যে মতভেদ নাই। কিন্তু কি ভাবে সে ব্যবস্থাকে কার্য্যকরী করা যায়, তা নিয়ে দু'য়ের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ। ক্লাসিকাল অর্থনীতির আশা ছিল যে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ব্যক্তি নিজ নিজ স্বার্থের খাতিরে যেভাবে চলবে, তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে স্বাভাবিক ভাবে দেশের অভ্যন্তরীণ এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থা আপনা-আপনিই ঠিক হয়ে যাবে। বস্তুতপক্ষে ক্লাসিকাল অর্থনীতিবিদ পৃথিবীর বাস্তব অবস্থাকে ঠিক আমল দেননি। বিভিন্ন জাতির পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ, তাদের জাতীয় মান-অভিমান এবং রাষ্ট্রীয় গণ্ডী সীমানা অবহেলা করে ক্লাসিকাল অর্থনীতিবিদ ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ বিচার করতে চেয়েছেন, ধরে নিয়েছেন যে অবাধ বাণিজ্যের কোন বাধা নেই, এবং যে কোন জিনিষ যে কোন দেশ থেকে আমদানী রপ্তানী হতে পারে, যে কোন মানুষ যে কোনো কাজের খোঁজে যে কোনো দেশে অবাধে যাতায়াত করতে পারে। বর্ত্তমানে এ রকম ভরসা রাখা কঠিন, কারণ নানারকম বাধানিষেধ শুল্ক মাস্থল ট্যাক্সের ফলে না মানুষ না দ্রব্য-সামগ্রী সহজভাবে দেশ দেশান্তরে চলতে পারে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিবিদের একাদশ স্থত্রে এ কথাকেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। বর্ত্তমানে সমস্ত পৃথিবীর জন্য সমগ্রভাবে পরিকল্পনা তৈরী সম্ভব নয়, তাই বিভিন্ন দেশের সংগঠনকে ভিত্তি করে জাতীয় পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে, মানুষের দেশপ্রেমকে স্বীকার করে নিতে হবে এবং স্বদেশে কি ভাবে ব্যক্তি সুস্থ সামাজিক জীবন যাপন করতে পারে, তাই হবে পরিকল্পনার লক্ষ্য।

মানুষের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধিই সমাজতন্ত্রবাদের উদ্দেশ্য। তাই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির দ্বাদশ সূত্র এই যে সমস্ত অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াকে মানুষের কল্যাণের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করতে হবে। কেবলমাত্র সম্পদ-বৃদ্ধিতে মানুষের আনন্দ বা মুক্তি নাই,—প্রথম সূত্রেই বলা হয়েছে সম্পদ সৃষ্টিতে যে পরিশ্রম ও ক্লেশ, তা যেন সম্পদ উপভোগের আনন্দের চেয়ে বেশী না হয়—তাই মানুষের আদর্শ, মানুষের ইচ্ছা, মানুষের সুখদুঃখ বোধকে অস্বীকার করে মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়া কর্মের বিবরণ দিলে সে বিবরণ মিথ্যা হতে বাধ্য। এক সময়ে বলা হত যে অর্থনীতির দৃষ্টিতে মানুষ কেবলমাত্র অর্থনৈতিক জীব। কিন্তু বিশ্লেষণের ফলেই দেখা গিয়েছে যে অর্থনৈতিক জীব অর্থনীতিবিদের কষ্টকল্পনা মাত্র, বাস্তব জগতে তার পরিচয় মেলে না। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিবিদ তাই বাস্তব সমাজের বাস্তব মানুষকে বুঝতে প্রয়াসী, তার বিভিন্ন কাজকর্মের বিচার করে সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় কিভাবে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবিক শক্তির শ্রেষ্ঠ ব্যবহার করা যায়, তাই নির্দ্ধারণ করাই তাঁর লক্ষ্য। মানুষের শক্তি সীমাবদ্ধ এবং প্রাকৃতিক বন্ধনকে বহুক্ষেত্রে তা লঙ্ঘন করতে পারে না, তাই অর্থনীতিবিদকে মানুষের শক্তি এবং তার দৌড় কতদূর, দুইই জানতে হবে। মানুষের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার বিচারে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিবিদ তাই সমাজের বিচিত্র সম্বন্ধ ও বিকাশকে ভুলতে পারেন না, বরং সেই বিকাশের মধ্যে মানুষ কিভাবে সমাজকে সুসংবদ্ধ করতে পারে, সকলের জন্য জীবিকার সংস্থান করতে পারে, তারই সন্ধান করেন।

কোলের সকল কথা হয়তো সকলে মানবে না। কিন্তু তিনি যেভাবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কাঠামো দাঁড় করিয়েছেন, তার কৃতিত্ব মানতেই হবে। বারান্তরে এ সম্বন্ধে আরো আলোচনার ইচ্ছা রইল।

হুমায়ুন কবির

Socialist Economics by G. D. H. Cole. Victor Gollancz 8/6. 1950.

চিত্রকলা

বাংলা দেশের সমসাময়িক শিল্পান্দোলনের ক্ষেত্রে গত এক বৎসরের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনাটি হ'চ্ছে, ইণ্ডিয়ান একাডেমি অফ্ ফাইন আর্টসের উদ্যোগে, শ্রীমতী রাণু মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ ঠাকুরের সৌজন্যে, এবং শিল্পী শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর চেষ্টায় একাডেমি-কর্মশালার একটি গৃহে স্থায়ী একটি শিল্প-প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা। একাডেমির এই উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা সর্বথা প্রশংসনীয়।

সারা বৎসর জুড়ে, বিশেষ করে শীতকালে ক'লকাতায় নানা শিল্পপ্রদর্শনী হ'য়ে থাকে অল্প বিস্তর সমারোহে; জনসমাগমও মন্দ হয়না। সাধারণ ভাবে ভারতবর্ষের সকল শিল্পীদের কাজ নিয়ে বড় প্রদর্শনী আজকাল আর বেশি হয়না; যে দু'একটি হয় তার ভেতর একাডেমির প্রদর্শনীটিই উল্লেখযোগ্য। তবে সেখানে ছবির ভীড় এত বেশি, এবং ভাল'র সঙ্গে মন্দ এমন কি নিকৃষ্ট কাজও এমন ভাবে জট পাকিয়ে থাকে যে, দর্শকের অবসর ও চিত্তবিনোদন ঘট্‌লেও এ-ধরনের বড় প্রদর্শনীতে রুচি, বোধ ও বুদ্ধির প্রকর্ষ ঘটাবার সুযোগ খুব বেশি থাকেনা। সে সুযোগ ও সুবিধের জন্য যে আদর্শ ও পদ্ধতি অবলম্বন প্রয়োজন তার বাধা অনেক, এবং কোনোটিই আমার অজ্ঞাত নয়। আমি জানি, ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় তা' করা যায় না, নানা প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক কারণে। বড় প্রদর্শনী ছাড়া, ছোট ছোট গোষ্ঠী বা একক শিল্পীর শিল্পপ্রদর্শনীও অনুষ্ঠিত হয় মাঝে মাঝে। বাংলা দেশে সমসাময়িক সক্রিয় শিল্পী যে কজন আছেন তাঁরা প্রায় সকলেই এ সব প্রদর্শনীতে তাঁদের কাজ উপস্থিত করে থাকেন। ক্যালকাটা গ্রুপের শিল্পীগোষ্ঠী এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। রুচি, বোধ ও বুদ্ধি প্রকর্ষের দিক্ থেকে এই জাতীয় ছোট প্রদর্শনীর শান্ত পরিবেশ অনুকূল, সন্দেহ নেই।

কিন্তু এ-ধরনের ছোট বা বড় কোনো প্রদর্শনীই স্থায়ী প্রদর্শনী নয়; সপ্তাহ, পক্ষ বা মাসকাল এদের আয়ু। তারপর সম্বৎসর শিল্পামোদীদের উপবাস। শিল্পী বা জনসাধারণ কারো দিক থেকেই এ-অবস্থাটা খুব অভিনন্দন বা সমর্থনযোগ্য নয়। শান্তিনিকেতন কলাভবন একথা বহুদিন আগেই বুঝেছিলেন, এবং তার নিরাকরণ করবার জন্য সেখানে কলাভবনে একটি স্থায়ী প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও করেছেন। কলাভবনের শিল্পীদের এবং অন্যান্য শিল্পীদেরও পুরানো এবং সমসাময়িক কাজ সেখানে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখানো হ'য়ে থাকে। যখন খুসী যে কেউ অবসর প্রয়োজন মত গিয়ে সে প্রদর্শনী দেখতে পারেন, এবং কলাভবনের শিল্পাদর্শ এবং প্রচেষ্টা সম্বন্ধে অবহিত হ'তে পারেন। কিন্তু শান্তিনিকেতন যাবার সময় ও সুযোগ সকলের ঘটে না। এবং ক'লকাতার মত বড় এবং সংস্কৃতিবান শহরে এ-ধরনের

স্থায়ী প্রদর্শনী একটিও ছিল না; একাডেমি সে অভাব দূর করবার দিকে এক পা' বাড়িয়েছেন।

যে দেশে আর্ট গ্যালারী নেই, সেখানে এ-ধরনের স্থায়ী প্রদর্শনী শিল্পবোধ ও বুদ্ধির প্রসারের পক্ষে যে কতদূর সহায়ক তা' বুঝাবার জন্য আজকাল আর বেশি বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন নেই। এমন কি, একাধিক বড় বড় আর্ট গ্যালারী থাকা সত্বেও প্রাগ্রসর সমস্ত দেশের বড় বড় শিল্পকেন্দ্রেই এই ধরনের স্থায়ী প্রদর্শনী থাকে এবং তা' একাধিক। এর প্রধান কারণ আর্ট গ্যালারীতে যে সব শিল্প নিদর্শন রক্ষিত হয়, সাধারণত সে-সমস্তই খ্যাতনামা শিল্পীদের সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পাদর্শ ও পদ্ধতির নমুনা। সমসাময়িক কালে অপেক্ষাকৃত স্বল্পখ্যাত শিল্পীরা যে-সব পরীক্ষা-নিরিক্ষা করেন, যে-সব নূতনতর আদর্শ ও পদ্ধতি তাঁদের অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করে, তার নিদর্শন আর্ট গ্যালারীগুলোতে বড় একটা স্থান পায় না। অথচ, সে জাতীয় চেষ্টার মূল্য নেই, কোনো ইঙ্গিত তা' বহন করে না, একথা মনে করা মূর্খতা মাত্র। একথা সত্য, শিল্পীদের বাড়ীতে নিজস্ব ষ্টুডিওতে ঘুরে ঘুরে দেখে সমসাময়িক শিল্প সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়, কিন্তু ততটা সময়, সুযোগ ও উৎসাহ ক'জনার থাকে, অথবা থাকলেও আমাদের এই দরিদ্র দেশে ক'লকাতার মত শহরে ক'জন শিল্পীর বাড়ীতে ষ্টুডিও করবার মত এবং নিজের কাজগুলো গুছিয়ে সাজিয়ে দেখাবার মত স্থান ও পরিবেশ আছে?

তা' ছাড়া কলকাতার মতন শহরে এমন লোকের সংখ্যা খুব নগণ্য নয় যাঁরা কোনো শুভানুষ্ঠান উপলক্ষে, প্রিয়জনকে উপহার দেবার জন্য, ঘরবাড়ী সাজাবার জন্য অন্য কোনো জিনিস না কিনে একটি শিল্পবস্তু কিনতে চান; অথচ কোথায় তা' পাওয়া যাবে, জানেন না। শিল্পীদের বাড়ীতে গিয়ে কেনার রেওয়াজ নাই আমাদের দেশে; অনেকে যেতে লজ্জা বোধ করেন, এতটা কষ্ট স্বীকারও করতে চান না, চাইলেও অনেক সময় ঠিকানা জানা থাকে না। তা' ছাড়া, শিল্পীদের বাড়ীতে শুধু তাঁদের যাঁর যাঁর নিজদের কাজই শুধু থাকে; দশজনের কাজের ভেতর থেকে নির্বাচনের সুযোগ থাকে না। যেখানে দশজন শিল্পীর সমসাময়িক বা পুরানো কাজের নমুনা দেখতে পাওয়া যায়, বিচার বিবেচনা করতে পারা যায়, এমন একটি স্থায়ী প্রদর্শনী থাকলে শুধু শিল্পামোদী জনসাধারণের উপকার হয়, শিল্পীদের সংসারগত উপকার হয় শুধু তাই নয়, শিল্পবোধ ও বুদ্ধি প্রসারের দিকেও অনেকটা সহায়তা হয়।

বিদেশ থেকে যাঁরা ক'লকাতায় আসেন প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে, তাঁদের মধ্যেও অনেকে আমাদের সমসাময়িক শিল্পপ্রচেষ্টা ও আদর্শ জানতে বুঝতে চান। তাঁদের জন্যও এ ধরণের একটি স্থায়ী প্রদর্শনী থাকা প্রয়োজন।

একাডেমি এই ধরণের প্রয়োজন মেটাবার জন্য চেষ্টার সূত্রপাত করেছেন, এজন্য উদ্যোক্তারা সাধুবাদের যোগ্য। তবে, প্রদর্শনীর স্থানটিতে পৌছানো একটু আয়াসসাধ্য, এবং আমার ধারণা, স্থানটির হদিস কলকাতাবাসী কম লোকেরই জানা আছে। এ জাতীয় প্রদর্শনীর স্থান জনসমাগমের পথে বা কেন্দ্রে হলে ভাল হয়। দ্বিতীয়ত, শিল্পনিদর্শনগুলো

আরো একটু বিচিত্র রকমের—আদর্শ ও পদ্ধতি উভয় দিক থেকেই—হওয়া উচিত, এবং সেই উদ্দেশ্যে আরো শিল্পীদের এ-প্রচেষ্টায় উদ্যোগী ও উৎসাহী করা প্রয়োজন। তৃতীয়ত, মাসান্তরে নিদর্শনগুলো বদলে বদলে দেওয়া বাঞ্ছনীয় এবং সে বদলানোটা ভালো করে বিজ্ঞাপিত হওয়া উচিত। চতুর্থত, শুধু শিল্পনিদর্শন নয়, কিছু কিছু ভাল ভাল নিদর্শনের মুদ্রিত প্রতিলিপি (প্রিণ্টস্) এবং ভারতীয় শিল্পের ছাপা য়্যালবাম জাতীয় গ্রন্থও বিক্রয় ও প্রদর্শনোদ্দেশ্যে সেখানে থাকলে ভাল হয়। শিল্পরুচি, বোধ ও বুদ্ধি জাগাবার পক্ষে তা' খুব সহায়তা করবে। পঞ্চমত, স্থানটিতে শিল্পামোদী ও শিল্পীদের মজলিশ জমানোর মত ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল হয়, যে মজলিশে শিল্প সম্বন্ধে গল্পগুজব ও আলোচনা ইত্যাদিরও ব্যবস্থা মাঝে মাঝে হবে।

নীহাররঞ্জন রায়

সঙ্গীত

ইদানীং সকল লোকের মধ্যে একই কথা শোনা যায় যে ধারায় অধুকার সঙ্গীত চলেছে তা মোটেই শ্রুতিসুখকর নয় এবং এ ধারার পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন। ভারতে তথা আমাদের জানা শোনা জগতে যে ধারার সঙ্গীত এতদিন ছিল তা নিছক সনাতনপন্থী। সঙ্গীতজ্ঞ শ্রোতারা সনাতন সঙ্গীতকেই ভালবাসতেন, তাই দেশে দেশে প্রচারিত হচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ 'সময়' এসে দেখা দিল। 'নির্দ্ধারিত' সময় যেখানেই হোক যখন থেকে আপনকার স্বরূপ প্রকাশ করলে তখন থেকেই ভাঙন ধরে ঘাটে মাঠে মন্দিরে যে পদাংশ চল্ ছিল দরবারী তাগিদে তা দরবারী হয়ে এলো, ধাপে ধাপে নেমে এলো। কিন্তু অন্য সময়ের তাগাদায় গান এক বীভৎস রূপ নিয়েছে···। কারণ সমস্ত সৌন্দর্য্য থেকে কাটতে ছাঁটতে যে শেষ তা মনোমুগ্ধকর তো হয়ই না বরং অন্য ফল হয়। এবং এই গরসৌন্দর্য্যময় সঙ্গীত রাগপ্রধান সনাতন নাম নিয়ে আজও বাজার রেখেছে।

সময় যেমন একটি মস্ত কারণ তেমনি বদ গাইয়েদের নিয়ে হয়েছে সব থেকে বিপদ, এ গাইয়েরা নাড়ার পর নাড়াই বাঁধে, আজ এ ওস্তাদ ও ওস্তাদ করে কিছু কাজ তুলে নেয়; যখন দেশে দশের মধ্যে গান ধরে তখন দেখা যায় তম্বুরা বাঁধা তো কা কথা, ছাড়তেই জানে না। নিষ্ঠা বলে যে গুণটি ভারতের বিধাতা পুরুষ একদা সকলের কপালে লিখতেন, সেই নিষ্ঠা আজ আর লেখা নেই। পূর্ণ স্বর রূপ আসতে সময় নেয়, তার জন্যে ধ্যান প্রয়োজন, নিষ্ঠা চাই। স্বর রূপ আপনা হতেই সঙ্গীতে রূপান্তরিত হয়, স্বর আপনা হতেই নিশ্বাসপ্রশ্বাস প্রমুখাৎ মান লাভ করে। ঠিক এই গাইয়েরাই আরো বিশেষ করে সনাতন রূপকে বিসদৃশ হতশ্রী করে তুলেছে। এবং ক্রমশঃ এদের ছাত্র-ছাত্রী সেই গাইয়েদের স্বকীয়ভঙ্গিতে গাওয়া গান অনুশীলন করে এবং তাই পূর্ণাঙ্গ রাগরূপ বলে আজকাল প্রচলিত।

সময়সঙ্কুচিত এবং অসম্পূর্ণ রাগরূপ সমস্ত শ্রোতাকে অত্যন্ত হতাশ করেছে। ঠিক এ দুইয়ের কবল থেকে সনাতনকে বার করে আনা দুঃসাধ্য। এবং এই রূপের সুযোগ নিয়ে আধুনিক রবীন্দ্রসঙ্গীত পল্লীগীতি বাজার রেখেছে এবং এই সঙ্গে ফিল্মসঙ্গীত। এত গুলোকে কাটিয়ে ওঠা সহজ কাজ নয়।

খর্ব্বাকৃত আধুনিক ফিল্মগানগুলি যথাযথ প্রাণহীন। কিন্তু এত লোক এতে আনন্দ পায় কি করে? এ প্রশ্ন আসতে পারে কিন্তু যেখানে সঙ্গীতকাররা সাবেক রূপটা রাখে সেটুকুই জনপ্রিয় হয়—আর বাকিটুকু যোগবিশেষে আসে···আমরা যদি ভালভাবে সমস্ত সঙ্গীত-জগতটাকে ভেবে দেখি তাহলে দেখতে পারবো, বুঝতে পারবো যে, তার ধারাগতি এক এক জায়গা থেকে এসেছে। তাছাড়া ভারতে লোক ও দেশজসঙ্গীতের অভাব নেই।

পূর্ব্বে নিউ থিয়েটার্সের কয়েকটী কীর্ত্তনাঙ্গ ছবি চলতি হওয়ার পর কীর্ত্তন সিনেমা-জগতে ছড়ায়, কীর্ত্তনই ঢং হয়ে দাঁড়ায়, পরে কালক্রমে লোক-সঙ্গীত দেখা দেয়—এখন যেমন পাঞ্জাবী কিছু পাহাড়ী দিব্যি ধরণ এসে গেছে। এক দেশে বহু পুরাতন লোক-সঙ্গীত বহু কালের পরীক্ষা নিরিক্ষায় সম্পূর্ণ রূপ লাভ করে, ফলে আর এক দেশে তা সহজেই জনপ্রিয় হয়ে যায়। এর মধ্যে আর একটী কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় তা হচ্ছে, যে সব লোক-সঙ্গীত আমরা শুনি তা, কতকটা বিশুদ্ধ লোক-সঙ্গীত। তা কি উদাত্ত অনুদাত্ত এবং কচিৎ স্বরিতেই সীমাবদ্ধ! ' তা একেবারেই নয়। আমরা যদি ভাটীয়ালী শুনি, টহলদারী শুনি, পাহাড়ী পর্য্যালোচনা করে দেখি—তাহলে আমরা অনায়াসে বুঝতে পারবো যে এ গানকে সঙ্গীত বলা অন্যায় যদি-ও একশোবার সত্য যে জনসাধারণ হাঠে মাঠে ঘাটে এই গানগুলো গায়।

একদা সনাতন সঙ্গীত সমস্ত-দেশে ছড়িয়ে পড়ে; তখন সম্ভবত দেশজ গীতকারদের মধ্যে সনাতন রাগ-রূপ প্রভাববিস্তার করেছিল···ফলত লোক-সঙ্গীতে কোথায় যেন সনাতন ধারার একটা সুপ্তরূপ রয়ে গেছে। কোথাও এমনও ঘটেছে, আজও বিশুদ্ধ রাগ লোক-সঙ্গীত বলে চলেছে, সেটা যে একেবারে শাস্ত্রসম্মত তা খুব কম লোকই জানেন।

কিন্তু শুধু লোক-সঙ্গীতের বিরুদ্ধে আমাদের কোন কথা বলার নেই। বলার যা, তা হচ্ছে এই যে এর মধ্যেই দেশে বেশ য়ুরোপীয় বিন্যাস গেড়ে বসেছে। সেটীকে এরা একটু খামখা চিৎকারের মত রেখেছে—যার সঙ্গে আদ্যোপান্ত কোন স্বরমিল নেই।

ঠিক এই সূত্রে এদের বলা যেতে পারে ভারতীয় গীর্জ্জাসঙ্গীতগুলি কেমন করে ভারতীয় গানগুলোকে নিজেদের ধারার আদল দিয়েছে। সে বিষয় আলোচনার অনেক সময় সাপেক্ষ। শুধু যদি ফিল্মসঙ্গীত কর্ত্তারা একবার সে গান গুলো শোনেন তাহলে কিছু প্রেরণা পাবেন এবং একটী সুচিন্তিত পথ বার করতে পারবেন।

কমল মজুমদার

রেডিও

আমাদের দেশে বেতার-প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা যেমন, তার অসুবিধাও তেমনি। এদেশে গড়পড়তায় শতকরা দশজন লোকও বোধ হয় শিক্ষিত নয়। সেইজন্যে জনশিক্ষার বাহন হিসাবে, অর্থাৎ জনচিত্তকে সুসংস্কৃত এবং সুরুচিসম্পন্ন করার কাজে বেতার-কে ভালভাবেই প্রয়োগ করা চলতে পারে। ছাপার অক্ষরের উঁচু দেওয়াল না থাকায় তথ্য আর তত্ত্ব এখানে সহজেই মনের আতিথেয়তা পায়, অবশ্য যদি মনের গ্রহণশীলতার ওপর জুলুম থাকে কম! কিন্তু এই সঙ্গে একটা বড় অসুবিধার দিকও আছে, সেটা দেশের দারিদ্র্য। উচ্চবিত্ত এবং সামান্য জনকয়েক মধ্যবিত্ত ছাড়া ক'জন ভাগ্যবান আছেন যাঁরা বেতার-সেট পোষণ করতে পারেন? সে দিক থেকে বেতার-প্রচার আমাদের দেশে অরণ্যে রোদনই বলতে হবে। যাদের কাছে তার কণ্ঠস্বর সহজেই উপস্থিত তারা বেতারের সাহায্য ছাড়াই রুচিগতভাবে স্বসম্পূর্ণ। আর যে অগণ্য জনসাধারণ এরকম দৈববাণীর মুখাপেক্ষী তাদের বরাতে দক্ষিণা জোগাড় করাই অসম্ভব। মনে হয়, এ ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি হ'তে পারে যদি ছোট ছোট মিউনিসিপ্যালিটি বা ইউনিয়ন বোর্ড নিজের এলাকার লোকেদের জন্যে প্রকাশ্যস্থানে বেতার-সেট রাখে; শিল্পপ্রতিষ্ঠান বাধ্যকরীভাবে সেট সরবরাহ করে এবং শ্রমিকদের শোনবার মতো ফুরসুৎ ক'রে দেয়। এর জন্যে এখনকার মতো 'পল্লীমঙ্গল' বা 'মজদুর মণ্ডলী' না থাকলেও চলবে, কৃষক-শ্রমিকের নিজেদের সমস্যা তাদের নিজেদের মারফৎ-ই আলোচিত হওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ সরকারী রাজনৈতিক দলবিশেষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রচার ছাড়াও কৃষক শ্রমিকের এমন একটা বড় অস্তিত্ব আমাদের জাতীয় জীবনে আছে যেখানে তারা শুধু শ্রোতাই থাকবে তার কোনো কৈফিয়ৎ নেই, বক্তাও হ'তে পারে। আর সেই যোগাযোগের ভিত্তিতেই, আমার মনে হয়, জাতির সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সম্ভব।

বিষয়টা আমি শুধু রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক সমস্যার দিক থেকে যে বিচার করছি, তা নয়। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও আমার সিদ্ধান্তের প্রয়োগ সমানই কার্যকরী হওয়া সম্ভব। অর্থাৎ আমি বলতে চাই, দেশের আপামর জনসাধারণ যে শুধু আমাদের শিক্ষিত শহুরে শিল্পীদের গান-বাজনা-অভিনয় শুনবে তাই নয়, তাদেরও কিছু শোনাবার আছে। হয়তো সে প্রচেষ্টার অনেকখানিই হবে পণ্ডশ্রম, অনেক কিছু আসবে যা রূপকর্ম হিসাবে অসার্থক, কিন্তু এর ভেতর দিয়েই তাজা জীবনের স্পর্শ আসবে,—বেতার-প্রতিষ্ঠান খুঁজে পাবে তার জাতীয় ঐতিহ্যের বনিয়াদ।

অবশ্য কর্তৃপক্ষ বলতে পারেন, তাঁরা গ্রাম্যগীতি, গ্রাম্যবাজনা তো নিয়মিতই প্রচার

ক'রে আসছেন ; শুধু সেই অনুষ্ঠানগুলো প্রচার করা হয় সুশিক্ষিত শিল্পীদের দিয়ে ; এবং তাই হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য এই যে, শহুরে শিল্পীরা যে সব জিনিসকে গ্রাম-জীবনের কাছাকাছি ব'লে মনে করেন সেগুলো এতোই বস্তাপচা যে তা এখন প্রায় জনশ্রুতির পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, তার চলতি মূল্য শূন্যের কোঠায়। সত্যিকার গ্রামপরিবেশে খোঁজ নিলে দেখা যাবে সেই সব সুরের কাঠামো হয়তো ঠিক আছে, কিন্তু তার বিন্যাস হ'য়েছে নতুন পথে, আবার অনেক ক্ষেত্রে নতুন ভাবের কথার সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে পুরানো সুরই পেয়েছে নতুন মর্যাদা। কারণ রবীন্দ্রনাথের বাউল বা আব্বাসউদ্দীনের ভাটিয়ালি যে বাগজালে আবৃত হ'য়ে আমাদের কাছে উপস্থিত হয় বাংলার জীবনে তা হয়তো কোনো একদিন সত্য ছিল, কিন্তু এখনও সে সমাজই অবিকৃত আছে এমন মনে করার কারণ দেখি না। সমাজ অচল অবস্থা নয়, বিভিন্ন সম্পর্কের টানাপোড়েনে নক্সার রূপ প্রতিনিয়তই পরিবর্তনশীল। আর এ পরিবর্তন যে কত ব্যাপক দেশজোড়া নানা আন্দোলনই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এ সত্বেও যদি গ্রাম্য সম্পদ হিসাবে আমরা 'অচিন পাখী'র দেহতত্ত্ব উপস্থিত করি, কিংবা 'কুঁচবরণ কন্যার মেঘবরণ চুলে'র গল্প ফাঁদি তাতে সুরের প্রসাদে ব্যাপারটা গেঁয়ো গেঁয়ো শোনালেও গ্রামজীবনের বর্তমান সত্যের থেকে সে হবে একজীবনের তফাৎ। এবং এই জীবনবিরহিত শিল্পসৃষ্টি যে কী পরিমাণ নির্জীব তা ওপরে উল্লিখিত 'পল্লীমঙ্গল আসর' আর 'মজদুর মণ্ডলী'র অসারত্ব থেকেই টের পাওয়া যায়।

বেতার এখনও আমাদের দেশে মুষ্টিমেয় শহুরে বাবু ও গিন্নীর অবসর বিনোদনের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় বলেই দেশের শতকরা নব্বুইজনের প্রতি এতখানি ঔদাসীন্য। অথচ প্রশ্ন করলেই কর্তৃপক্ষ দেখিয়ে দেবেন ঐ দুটি হাস্যকর অনুষ্ঠান। বেতারকে দেশের জীবনে কর্মিষ্ঠভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে এই যান্ত্রিক কর্তব্য সমাপন ছেড়ে প্রকৃত অনুরাগের পরিচয় দিতে হবে। কারণ শিল্প সংস্কৃতির বাহন হিসাবে সেই মাধ্যমই একমাত্র অনিবার্য হ'য়ে উঠতে পারে, যার সঙ্গে থাকে জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বড় অংশের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। এই আত্মীয়তার সৃষ্টি হ'তে পারে, যদি যাতায়াতটা দু'তরফা হয় —ওপর থেকে নীচে, এবং নীচের থেকে ওপরে। সেইজন্যেই আমি প্রকৃত কৃষক মজুরের মধ্য থেকে শিল্পী নির্বাচনের কথা বলছিলাম।

কিন্তু কৃষক মজুরের মধ্যে যে প্রকৃত শিল্পীর অভাব, এ সত্যও আমি অস্বীকার করতে চাইনা। শিক্ষিত শহুরে শিল্পীরা তাদের কিছুটা ঘষামাজা ক'রে নিতে পারেন, কিম্বা তাদের উদ্দেশ্য আর প্রাণধর্ম আত্মসাৎ ক'রে নিয়ে নিজেরাই প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তাঁরা যেন আত্ম-আরোপ (self-projection) ক'রে না বসেন। আমাদের শিল্পসাহিত্যের সবচেয়ে বড় সর্বনাশটাই আসে ঐ পথে। আর, বেতার আমাদের দেশে এতই নবাগত যে আধা-ঔপনিবেশিক শহরের মধ্যবিত্তদের কলুষ দৃষ্টি থেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে গণঐতিহ্য-আশ্রিত করতে না পারলে তার কোনো ভবিষ্যৎ নেই।

এই প্রসঙ্গে 'বেতার-জগৎ'এর সম্পাদকীয়তে কিছুদিন আগে জনমতের বিষয়ে যা বলা হ'য়েছিল সে সম্পর্কেও কিছু বক্তব্য আছে। ঐ নিবন্ধে সম্পাদক উদাহরণ দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, এদেশে সর্বরুচিগ্রাহ্য বেতার-প্রচার কতটা কষ্টসাধ্য। কিন্তু সকলের ফরমায়েসই বেতার প্রতিষ্ঠানকে যে তামিল করতে হ'বে তা নয়, দেখতে হ'বে কোন চাহিদার কতখানি সামাজিক মূল্য। এই নিরিখে বিচার করলে অনেক জঞ্জালই খ'সে যাবে, বেতার প্রতিষ্ঠা[illegible]মুক্ত হবে চলচ্চিত্রের রেকর্ড বাজানো কিম্বা ভুতুড়ে কৌতুকনক্সার নাগপাশ থেকে। আর, আধুনিকগানের নামে যে মেয়েলীপনার আমদানী হ'য়েছে তার ক্লান্তিকর একঘেয়েমী থেকেও হয়তো শ্রোতাদের অব্যাহতি দেওয়া চলবে। শুধু লক্ষ্যটা আগে পরিষ্কার ক'রে নেওয়া দরকার। ব্যায়াম থেকে শুরু ক'রে সঙ্গীত, হিন্দীভাষা ইত্যাদি নানা শিক্ষণীয় বিষয়ের অবতারণা করা হয় যে তাগিদে তার মূলে জাতীয় কল্যাণ থাক বা না থাক, পাঁচমিশালী সওদা ছড়াবার ব্যবসাদারীটা স্পষ্টই ধরা পড়ে। বেতার কি শুধু তা'হলে যা আছে তারই বোবা-বাহন হিসাবে ব্যবহৃত হবে, নিজে কিছুই যোগ করবে না জাতীয় জীবনে? আমাদের দেশে সর্বকলাবিশারদ হওয়ার মোহ এতই মারাত্মক হ'য়ে উঠেছে যে পল্লবগ্রাহিতাই এখানে জনপ্রিয়তার উপায় ব'লে গণ্য, একটা কোনো বিশেষ বিষয়ে সাফল্য লাভ করাকে শ্রদ্ধণীয় ব'লে মনে করা হয় না।

মনে হয় সেই কারণেই বেতার প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ঐক্যতান সংঘ এবং মাসিক-মাহিনার শিল্পী থাকা সত্ত্বেও সুরযোজনের ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত কিছু নতুন আবিষ্কারের কথা শোনা যায় নি। অথচ, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় এটুকু হওয়া তো একেবারেই অসম্ভব ছিল না। বিশেষ ক'রে যখন আমরা দেখি, বেতারের বাইরে আর একটা জগৎ আছে যেখানে সুরে-কথায় আধুনিক গানের প্রবল পরিবর্তন সূচিত হ'তে যাচ্ছে; বেতারের বিগত দানব পূর্বানুবৃত্তি তখন বিরক্তির কারণ ঘটায়।

অথবা এইটেই স্বাভাবিক? যেখানে প্রচুর সুযোগ, অগুন্তি অর্থ ব্যয় সম্ভব, শিল্পধর্ম্ম সেখানে রূপান্তরিত হওয়ার সুযোগ পায় না। তাদের গয়ংগচ্ছ পথে কাঁটা থাকে না বলেই যাত্রার আনন্দও থাকে না—সবটাই চলে চোখ বুঁজে। বেতার প্রতিষ্ঠানকে গানে অভিনয়ে অর্থাৎ শিল্পকর্মের মাধ্যম হিসাবে—দেশের জীবনে অঙ্গীভূত ক'রে তুলতে হ'লে তাই আমার মনে হয় প্রয়োজন কিছু অস্ত্রোপচারের। অভ্যাসের পাকা সড়ক থেকে একবার ছিটকে মাঠের মধ্যে পড়লেই, নিজের স্বতন্ত্র রাস্তা সে নিজেই ক'রে নিতে পারবে। তখন আর বলে দিতে হবে না কোন পথ সুবিধার, জনসাধারণের রূপ বৈচিত্র্যের অজুহাতে জনসাধারণকে বাদ দেবার কোনো উপায় থাকবে না।

মণীন্দ্র রায়

সিনেমা

মাইকেল—মধু বোস
বিদ্যাসাগর—কালীপ্রসাদ ঘোষ

বাংলা চলচ্চিত্রের সংকট যতই ঘনীভূত হবে ততই প্রকাশ পাবে জনসাধারণের চাহিদা সম্পর্কে প্রযোজকবর্গের ফর্মূলার অকিঞ্চিৎকরতা। এদের মতে দেশের অর্থনৈতিক দুর্গতি যে পরিমাণে দেখা দেয় সেই পরিমাণে দশের মন চায় লঘু, পলাতক প্রমোদ। কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে হাল্কা যৌন আবেদনের সাড়া হিন্দি চলচ্চিত্রে যতটা মেলে ততটা নয়। বরঞ্চ বিমূঢ় জনসাধারণ যেন চলচ্চিত্রের মধ্যে সন্ধান পেতে চায় তার পরিত্রাণের পথেরই। এই তাগিদটা তেমন সচেতন না হলেও তার অস্তিত্বের পরিচয় অপেক্ষাকৃত উন্নত বিষয়বস্তুর সম্বন্ধে আগ্রহের মধ্যেই। ছবির উৎকর্ষের সঙ্গে সাধারণের আদর অনাদরের সম্বন্ধ অবশ্যই আছে, কিন্তু মোটামুটি বলা যেতে পারে যে বাঙালী দর্শকের মন উন্নত বিষয়বস্তুর প্রতি সাড়া দিচ্ছে ভালো ভাবেই।

বিষয়বস্তুই যে বর্তমানে সাফল্যের মানদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে তার প্রমাণ মেলে বিদ্যাসাগর বা মাইকেল-এর মতো চলচ্চিত্রের বিচারে অতি-সাধারণ ছবির জনপ্রিয়তার মধ্যে। প্রযোজকেরাও যথারীতি জনসাধারণের তালে তাল দিয়ে জীবনীর মরশুম শুরু করেছেন। জীবনী-মূলক বা সমস্যামূলক ছবি পূর্বেও হয়েছে, কিন্তু হয়তো বা জনমনের দোলার ফলেই বর্তমানের ছবিগুলি পূর্বের চেয়ে রুচিসম্মত, অবান্তরতা থেকে অপেক্ষাকৃত মুক্ত।

আমার মতে ভারতবর্ষে বিশেষত বাংলায় চলচ্চিত্রের প্রকৃত রূপ এখনো প্রকাশ পায়নি। বাংলার চলচ্চিত্র মঞ্চনাট্য ও যাত্রাগানের বিদেশী রীতিনীতির দ্বারা পরিবর্তিত রূপ। আমাদের চলচ্চিত্রের কল্পনাই এখনো চলচ্চিত্রধর্মী হয়ে ওঠেনি। তাই তার বাহ্যরূপ নিয়ে তৈরী হয়েছে আমাদের গণশিল্পের অভাব মেটাবার এক প্রক্রিয়া, যাকে চলচ্চিত্র ভিন্ন অন্য নাম দিলেও আপত্তির কিছু নেই। এর নানা কারণের অন্যতম কারণ হচ্ছে আমাদের ঔপনিবেশিক দেশে যন্ত্রশিল্পের অনগ্রসরতা ও সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক নানা উপাদানের সম-উপস্থিতি।

এই পরিস্থিতির মধ্যে বাংলাদেশে যে চলচ্চিত্রের উদ্ভব ও বৃদ্ধি, তার আভ্যন্তরীণ নিয়মকানুন নিজস্ব, অতএব তার বিচারও স্বতন্ত্র। তাই আমরা যে চোখে ফরাসী বা রুশ ছবি দেখি সে চোখে বাংলা ছবি দেখি না। প্রশংসা বা নিন্দা দুয়ের মধ্যে এখানে আমাদের চলচ্চিত্রকে স্মরণ রাখতে হয়; চলচ্চিত্রের প্রকৃত রূপের বিচার বাংলা ছবির বিচারের মধ্যে আনা চলে না।

সুখের বিষয় এই যে বাংলার চলচ্চিত্র-সংকটের মধ্যে একটি আন্তরিকতার ভাব ক্রমেই আত্মপ্রকাশ করছে যার ফলে বাংলা চলচ্চিত্রের বিশিষ্ট কাঠামোর মধ্যে একটা উন্নততর মনের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে কোনো কোনো ছবিতে। উদাহরণ স্বরূপ নাম করা যেতে পারে মাইকেল ও বিদ্যাসাগরের।

প্রকৃত চলচ্চিত্রের বিচারে এই দুটি ছবিকে যাচাই করা চলে না, কারণ দুটিতেই সাফল্যের নির্ভর কয়েকটি চলচ্চিত্র-বিরোধী উপাদানের উপর। কী বিদ্যাসাগর কী মাইকেল দুয়েরই গঠন যাকে ইংরিজীতে বলে episodic—অর্থাৎ ঘটনার সমষ্টি, চলচ্চিত্রের প্রাণ যে পরস্পরবিজড়িত গতি তার পরিচয় নেই। জনসাধারণের পরিচিত বিখ্যাত ঘটনাগুলিকে একটা রূপ দেওয়াই এ দুই ছবির উদ্দেশ্য বলে মনে হয়। দশবছর আগে পিকনিকে তোলা প্রিয়জনের ফোটোগ্রাফ পুরোনো অ্যালবাম থেকে আবিষ্কার করে যে আনন্দ পাওয়া যায় এ আনন্দ অনেকটা সেই জাতের। এটা শিল্পের রস নয়। কেননা এর আনন্দ শিল্পবস্তু থেকে আসে না, আসে পরিচিত বস্তুর আবিষ্কার থেকে। ছবি যতই অস্পষ্ট হোক, প্রিয় স্মৃতিকে ফিরে পেতে সব সময়ই ভালো লাগে। বাঙালীর অবস্থা যখন সবচেয়ে শোচনীয় জাতির গৌরবের কথা স্মরণ করে তখনই তার সবচেয়ে আনন্দ। অবশ্য অভিনয় ভালো না হলে এতেও মন ভরে না ; এই অভাব মেটাতে episodic এর সঙ্গে বিদ্যাসাগর-মাইকেল-এ যোগ দিয়েছে rhetoric। মঞ্চনাট্য-ঘেঁষা, detail-বর্জিত জোরালো অভিনয় এই দুই ছবিতেই প্রাণ এনেছে। যে অভিনয়-প্রতিভা বাংলার মঞ্চনাট্যকে একদিন গৌরবদীপ্ত করেছিল এ তারই বেশ, চলচ্চিত্র-ধর্মী অভিনয় নয়। তাই মাইকেল-এ উৎপলের অপূর্ব আবৃত্তি এবং আবৃত্তি-ঘেঁষা অভিনয়, ও বিদ্যাসাগরে পাহাড়ীর উদাত্ত ভাষণ বাঙালী দর্শককে নাড়া দিয়েছে। এটা নিন্দা নয় কারণ অভিনয়ে rhetoric এর একটা বিশেষ স্থান আছে; কিন্তু চলচ্চিত্রাভিনয়ের নির্ভর rhetoric-এর উপর নয়। গতি, ছবির সংযুতি, ও নিকট ও দূর থেকে দেখার নাটকীয়তা চলচ্চিত্রকে তার নিজস্ব রূপ দেয়। মাইকেলে উৎপলের স্বর ও হাতের উত্থান পতন আছে কিন্তু যেখানেই ক্যামেরা তার অত্যন্ত নিকট হয়েছে সেখানেই অভিনয়ের রসভঙ্গ। তাই মাঝামাঝি দূরত্বেই ছবি বিধৃত। অর্থাৎ মঞ্চনাট্যে দর্শক যে দূরত্ব থেকে অভিনেতাকে দেখে সেই দূরত্ব—তার চেয়ে বেশিও নয়, কমও নয়।

তবু মাইকেলের কাহিনী বাঙালীর প্রিয় তাই ঘটনামূলক, বীরত্বব্যঞ্জক হয়েও এই ছবি আমাদের মনকে নাড়া দেয়। অবান্তরতা ও বিকৃতরুচির পরিচয় একমাত্র মাইকেলের আধুনিক গানে ছাড়া প্রায় নেই, শেষ পর্বের হাস্যকরতা সত্ত্বেও মোটের ওপর যে ভাবটা মনে থেকে যায় সেটা প্রীতিকর। রাধারাণীর কীর্তন গান ও দৃশ্যরূপ দুই দিক থেকেই অপূর্ব লাগে।

বিদ্যাসাগরে বিধবা-বিবাহের কয়েকটি দৃশ্য গতিশীল ও জীবন্ত ; রাজা রাধাকান্ত দেবের বিচারসভার দৃশ্যটি বিশেষত ভালো। সমাপ্তির দিকে এসে ছবি অত্যন্ত ঢিলে হয়ে গেছে, তাতে ঘটনা-নির্ভরতার অসাফল্যকেই প্রমাণ করে। কেননা বিধবাবিবাহের উত্তেজক

ঘটনাবলীর পর আর কোনো ঘটনাই মনে লাগে না। বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি যদি পরিচালকের দৃষ্টি থাকতো তাহলে এমন হতে পারতো না। যেহেতু এখানে কেবল দেশোদ্ধারী বিদ্যাসাগরই আছেন, মানুষ বিদ্যাসাগরের আন্তর জীবনের কোনো পরিচয় নেই, তাই বিধবা বিবাহেই দর্শকের উৎসাহের পরিসমাপ্তি ঘটে।

বাংলা চলচ্চিত্রের পরিমাপে বিদ্যাসাগর ও মাইকেল দুই-ই উৎকৃষ্ট ছবি। যে টেকনিকে বাংলা ছবি চলে তার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ এখানে প্রায়ই ঘটেছে। এই দুই জীবনী নিয়ে কেমন ছবি করা যেতো সে আলোচনা এখানে তোলা বৃথা। যাঁরা উয়ারেজ বা এমিল জোলা দেখেছেন তাঁদের স্মৃতিতে ব্যক্তিগত জীবন ও ঐতিহাসিক জীবনের মিলিত ধারার পরিচয় নিশ্চয়ই জাগরূক।

চিদানন্দ দাশগুপ্ত

নাটক

নাটকের উন্নতির একটা মস্তবড় সহায়ক হচ্ছে সমালোচনা। আমাদের দেশে নাটকের বা অভিনয়ের সৎ সমালোচনা খুব কমই হয়। এবং তার জন্যে এই বিভাগের শিল্পীরা প্রায়ই অন্ধের মতো হাতড়ে বেড়ান, সমালোচনার সাহায্য পান না ব'লে।

এমন দেখেছি যে, কিছু লোক অনেক পরিশ্রম ক'রে অনেক ভেবেচিন্তে একটা নাট্যাভিনয় প্রস্তুত করলেন ; সাধারণ নিয়মেই তার মধ্যে কিছু ভালো জিনিষ হল, কিছুটা বা হল ভুল। অনেক বুদ্ধিজীবী ও সমালোচকবৃন্দ দেখতে এলেন। কেউ বল্লেন,—'চমৎকার হয়েছে!' কেউবা সামনে কিছু না বলে আড়ালে বল্লেন—'So So!' কেউ হয়তো খানিকটা প্রশংসা করলেন কাগজে পত্রে লিখে, আবার কেউবা কিছু না লিখে অপছন্দটা বুঝিয়ে দিলেন। কিন্তু এর কোনোটাতেই সেই বেচারী শিল্পীর কোনও সাহায্য হয় না। প্রশংসা শুনেও সে বুঝতে পারে না যে কোনটা তার গুণ আর নিন্দা, বা বিশেষ ক'রে মৌনতায়—সে তো কিছুই বোঝে না।

আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই একটা কথা কথা বলি। সুধীবৃন্দ সেটাকে আত্মবিজ্ঞাপন ব'লে মনে করবেন না আশা করি। অনেকদিন আগে আমরা 'নবান্ন' ও 'জবানবন্দী' ব'লে দুটো নাটক অভিনয় করেছিলাম। এবং দুটোই বেশ প্রশংসিত হয়েছিল, বিশেষ ক'রে 'নবান্ন'। বন্ধুরা লিখলেন বৈপ্লবিক 'ঘটনা'। আর অপছন্দকারীরা লিখলেন—'এটা পুরাতন অন্নেরই নামান্তর'। কিন্তু মুশকিল হল এই যে আমরা—যারা নাকি এটা প্রস্তুত করেছিলাম তারা আদপেই বুঝলাম না যে কী কী কারণে সেটা বৈপ্লবিক, বা কী কী কারণে 'পুরাতন অন্ন'! অ-সমালোচনার ভিত্তিতে নিন্দা বা প্রশংসায় তো শিল্পীর কোনও লাভ নেই।

নিন্দার কথায় গোড়াতেই আশা যাক। যদি সত্যিই কোনও বাজে জিনিষ নিয়ে অহেতুক হৈ চৈ করা হয় তাহ'লে প্রত্যেক সামাজিক দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন সমালোচকের কর্ত্তব্য হচ্ছে বিশদ সমালোচনা ক'রে সে জিনিষের ত্রুটীগুলো দেখিয়ে লোকসাধারণকে সচেতন করার চেষ্টা করা। এক্ষেত্রে মৌনতার মতো পাপ নেই।

অবশ্য, একটা কথা বোধ হয় পরিষ্কার ক'রে রাখা দরকার। সেটা হচ্ছে যে, আমাদের আলোচনা সমালোচকদের সম্পর্কে, সাধারণ দর্শক সম্পর্কে নয়। তাই এই দায়িত্বের কথা উঠ্‌ছে।

কেউ যখন কোনও শিল্প সৃষ্টি করে তখন তার কিছুটা থাকে সচেতন মনের, আর অনেকটা থাকে মগ্ন চেতনার। সেখান থেকে যে কী রঙ, কী রেখা ফুটে উঠ্‌ছে তা কখনোই সে শিল্পী নিজে বোঝে না।

অথচ বোঝা দরকার। সমগ্র ভাবে নিজের সৃষ্টিকে বাইরে থেকে দেখতে না পেলে তার অগ্রস্থতিও নেই, মুক্তি ও নেই। সেই বাইরে থেকে তাকে নিজের বোধ এনে দেওয়ার দায়িত্ব হচ্ছে সমালোচকের।

নাট্যাভিনয় এমন একটা শিল্প যেখানে সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্র, নৃত্য সবকটা শিল্পের সঙ্গমস্থল। সুতরাং নাট্যাভিনয়ের সমালোচনা করতে গেলে এই প্রত্যেকটা শিল্পের বিশিষ্ট ইতিহাস স্মরণ রেখে সমগ্রভাবে তারা একটা নাট্যাভিনয়ের মধ্যে সার্থক হোল কি ব্যর্থ হোল তারই বিচার করতে হবে।

অথচ দেখা যায় যে অনেক ভেবে চিন্তে একটা মঞ্চসজ্জা হয়তো খাড়া করলেন কেউ, হয়তো সেটা দেখতেও যেমন সুন্দর, অর্থেও তেমনি গভীর হোল। কিন্তু কাগজে সমালোচনার সময়ে শেষ লাইনে শুধু উল্লেখ করা থাকলো, 'মঞ্চসজ্জাও সুন্দর হইয়াছিল।' এ যেন— 'বইয়ের প্রচ্ছদপট ও বাঁধাই সুন্দর। মূল্য দেড়টাকা।'

আমাদের দেশে বহুপুরাতন যে সমস্ত মঞ্চসজ্জার প্রচলন ছিল তার ছবি পাওয়া খুব শক্ত। যেটুকু আন্দাজ হয় তাতে মনে হয়, ব্যাপারটা খানিকটা পার্শী থিয়েটারগন্ধী ছিল। একদিকে 'অশ্বপৃষ্ঠে ওসমানের প্রবেশ' অপরদিকে নির্ব্বাক চলচ্চিত্র চালিয়ে বহির্দৃশ্যের অংশ বিশেষ দেখানো। এ ঐতিহ্য কিন্তু অনেকদিন টিঁকেছে। 'নাট্য-ভারতী' মঞ্চে মনোজ বসুর একটা নাটক হয় 'প্লাবন'। যতদূর মনে পড়ে অহীন্দ্র চৌধুরীই ছিলেন তার প্রধান পুরোহিত। সে নাটকের মধ্যেও অকস্মাৎ নির্ব্বাক চলচ্চিত্র চালিয়ে একটুখানি বহির্দৃশ্য দেখানো হয়েছিল। এবং সেটা এমন কিছু বেশীদিনের কথা নয়।

এগুলো যে টেঁকে তার কারণ আমাদের বাঙালী দর্শকের মধ্যে একটা বড়ো সংখ্যা রবি বর্ম্মার ছবির যুগে আটকে আছে তথা কথিত শিক্ষিত সমাজের মধ্যে, যাঁরা বাংলা থিয়েটারের সম্পর্কে নাসিকা কুঞ্চন ক'রে Cecil B. DeMille'র মিলিয়ান ডলার প্রডাকশান দেখতে যান, এবং দেখে মূর্চ্ছিত হন।

শিশির কুমার ভাদুড়ীর 'সীতা'র মঞ্চসজ্জা এই রুচিহীনতার বিরুদ্ধে প্রথম ঘোষণা। মঞ্চসজ্জা করেছিলেন চারু রায়। বৌদ্ধযুগের স্থাপত্য অনুসরণ ক'রে তাতে খিলান বারান্দা ইত্যাদি করা হয়েছিল। যদিও যাথার্থ্যের দিক দিয়ে তা একেবারে ভুল, তাহলেও এমন একটা সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করতো যে তাতেই সে সার্থক।

স্বর্গীয় যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর আর একখনি নাটক "দিগ্বিজয়ী"র দৃশ্য সজ্জাও অভূতপূর্ব্ব ছিল, কেবল মাত্র শেষ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটা ছাড়া। শিল্পী কে ছিলেন জানিনা।

এর অনেকদিন পর ত্রিশ-একত্রিশ সালের অর্থনৈতিক সঙ্কটে বাংলা থিয়েটার যখন টলায়মান তখন সতু সেনের অভ্যাগমনের সঙ্গে এলো ঘূর্ণায়মান মঞ্চ, এবং গৃহাভ্যন্তর সাজাবার পদ্ধতি বদলে গেল।

যাই হোক্ এসমস্ত ইতিহাস এখানে বলার উদ্দেশ্য এই যে আজ যখনই কোনও মঞ্চসজ্জা

দেখ্‌বো তখন যেমন এই ইতিহাসটা স্মরণ রাখবো, তেমনি স্মরণ রাখবো দেশীয় চিত্রশিল্পের ইতিহাস। তবেই না আমরা যথার্থ সমালোচক হবো!

তেমনি মনে রাখতে হবে মঞ্চের বাচনভঙ্গীর ইতিহাস। গিরিশবাবুর বা দানীবাবুর যুগে কেমন ক'রে বলা হোত, তারপর শিশিরবাবু কী স্বর আনলেন, এবং তার পরেই বা এখন কী রকম স্বর লাগানো হয়। অবশ্য একটা কথা আছে। অধুনা বহুক্ষেত্রেই দেখি সমালোচকরা তর্কের সময়ে বলেন যে কোনও স্বরই আদপে থাকা উচিত না, অথচ তাঁরাও আবার শিশিরবাবুর স্বরেলা বাচন ভঙ্গীর প্রশংসা ক'রে থাকেন, অন্ততঃ স্পষ্টতঃ বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন না।

এ বিষয়ে আমরা যা ভেবেছি তা বলি। আমরা মনে করি যে কথোপোকথনে স্বর থাকাটা অনিবার্য্য। ভাষার নিজস্ব স্বর থাকে, প্রত্যেকটা কথার থাকে নিজস্ব পরিমণ্ডল। এবং ঠিক মতো সাম্প্রতিক স্বরটা না ধরতে পারলে এবং ঠিক মতো সেটা অভিনয়ের বাচনের মধ্যে না লাগাতে পারলে অভিনয়ে কোনো দিনই কাব্যরস আসে না, যা নাকি মহৎ অভিনয়ে আমাদের জাতীয় নাট্যমঞ্চগুলিতে স্বর ব্যবহার করা হয় সেটা না মধ্যবিত্ত কেরাণীর স্বর, না কোনও মহৎ চরিত্রের, কোনও বীরের স্বর। দানীবাবুদের আমল পর্য্যন্ত ফিউড্যালী সংসারের পিতার যে বিরাট রূপ ছিল—স্নেহশীল, অথচ কঠোর benevolent tyrant— সে প্রকৃতিতে ক্ষয় ধ'রে গেছে। শিশিরবাবু যে স্বর এনেছিলেন তাতে কাব্যানুগ বুদ্ধিজীবীর প্রকাশ ছিল। কিন্তু সাধারণ মধ্যবিত্ত কেরাণী বা তার আত্মীয় স্বজন—অর্থাৎ এককথায় এই কলোনির ছোট ছোট মানুষগুলো—তাদের প্রকাশের স্বর কিছু তৈরিই হোল না। এক পারতেন স্বর্গীয় যোগেশচন্দ্র চৌধুরী। আমাদের ধারণা, দেশ তাঁর ক্ষমতার ন্যায্য মূল দেয়নি। বাংলা দেশের নতুন অভিনয় পদ্ধতির তিনি প্রথম প্রবর্ত্তক পিতা। আর একজন আছেন শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। "বিন্দুর ছেলে" নাটকে তাঁর 'যাদব' দেখলে বোঝা যায়। শিশিরবাবু চেষ্টা করেছিলেন ঐ ভূমিকায় করতে। কিন্তু ১২৲ টাকা মাইনের মুহুরীর মধ্যে ভাদুড়ী মহাশয়কে পোরা যায় না। অথচ এর উল্টোটাও আর ভাদুড়ীমশায়ের নেই। Epic heroic style আর তাঁর নেই। ছিল। যেমন ছিল দানীবাবুর মধ্যে। কিন্তু যুগ পাল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে বীরের চেহারা বদল হয়। শেষ পর্য্যন্ত খুব স্বল্প একটা আভাস ছিল দুর্গাদাস বাবুর মধ্যে। কিন্তু উপযুক্ত নাটকের অভাবে ও চমকপ্রিয়তায় তিনি তাঁর অলৌকিক অভিনয় ক্ষমতার বহু অপব্যবহার করেছেন।

'ইভান দি টেরিবল্' চিত্রে আইজেন্‌স্টাইন ও চের্‌কাশভ্ মিলে একটা আধুনিক Epic heroic style বের করবার চেষ্টা করেছেন। হয়তো সেটা রুশদেশে সফল হয়েছে। কিন্তু আমাদের তেমন কোনও স্টাইল নেই। অথচ বীর কি নেই আমাদের দেশে? সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে যে লোকটা রক্তলোলুপ জনতার সামনে একা দাঁড়ায় অন্য সম্প্রদায়ের নারীকে কি শিশুকে রক্ষা করবার জন্যে সে কি বীর নয়? কিন্তু তার সেই গভীরতম বীরত্বের প্রকাশ স্পষ্ট করার জন্যে কোনও নতুন স্টাইল আজও আমরা অভিনেতারা বের

করতে পারিনি। স্থতরাং বাচনভঙ্গীর সমালোচনা করতে হবে সেই পরিপ্রেক্ষিতে, সাহায্য করতে হবে অভিনেতাদের সেই নতুন স্টাইলটা খুঁজে বের করার পথে, যাতে সাম্প্রতিক মনের সবটুকু ধরা পড়ে আজকের অভিনয়ে।

এরও পরে আছে অঙ্গ সঞ্চালনের কথা। বাস্তব হবে অথচ কাব্যময় হবে। বাস্তবতা বিহীন হ'লে হয় ন্যাকামি, ঢং। আর কাব্যবিহীন হ'লে শিল্প হয় না। এটা পরে নৃত্যের গণ্ডীর মধ্যে। এবং সেইদিক থেকে বিচার করলে ধরা পড়বে যে নাচের নামে বহুক্ষেত্রেই যা চলে সেটা আর যাই হোক নাচ নয়।

এই ভাবে সমগ্র দৃষ্টিতে বিচার করলে খালি অভিনয়-শিল্পের নয় সকল সতীর্থ শিল্পেরই সাহায্য হবে। আমাদের শিল্প জগৎটাই অনেক সুষ্ঠু হয়ে উঠবে।

অবশ্য এটুকু খুবই সাধারণ ভাবে আলোচনা করা হোল। এবং অনেক কথাই এতে বাদ প'ড়ে গেল, যেমন, সাহিত্যের কথা, সঙ্গীতের কথা। লোকে যদি আগ্রহশীল হ'য় তাহলে ভবিষ্যতে অনেকে মিলে বিভিন্ন কাগজপত্রে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা চলতে পারবে।

শম্ভু মিত্র

সমালোচনা

Portrait of An Anti-Semite *by* Jean-Paul Satre. Seeker & Warburg, 7*s.* 6*d.*

অস্তিত্ববাদ হয়তো অন্য সব দর্শনের মতোই পুরানো, কিন্তু সাম্প্রতিক কয়েক বছরে এই মতবাদ নতুন করে শক্তিলাভ করেছে এবং সার্ত্রের কল্পনা সমৃদ্ধ ও বর্ণনমুখর রচনার বদৌলত এক ধরণের বুদ্ধিজীবী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অস্তিত্ববাদের বর্তমান গুরুত্বের জন্য কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তী কালের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক সংকট দায়ী। এ সংকট আরো ঘনীভূত হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আর তার পরবর্তী অধ্যায়ে। সভ্যজগতের বর্ধমান অংশে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ধারা চিরন্তন ভয়, অনিশ্চিতি আর সংশয়ে ভরা। তাই মানুষ আজ নিজের গণ্ডীতেই আবদ্ধ। সমস্ত অনিশ্চয়ের মধ্যে নিজের আবেগ প্রত্যক্ষ ও নিশ্চিত, তাকে এড়াবার উপায় নেই। সে আবেগ ও অনুভূতি, সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাই ব্যক্তিকে তীব্রভাবে নাড়া দেয়, তাকেই মনে হয় অনন্য সার্থক। তখন মনে হয় নিজের অভিজ্ঞতা আর অনুভূতি পার হয়ে কোন সত্য আবিষ্কার করা যায় না। অস্তিত্ববাদের চলতি দর্শনের মূলে রয়েছে এই তত্ব। সত্যকে এখানে এক করে ফেলা হয় অন্তর্মুখীনতার সংগে কিন্তু সে অন্তর্মুখীনতাকে আবার ব্যক্তিকেন্দ্রিক না ভেবে সাধারণ মনে করা হয়। ফলে প্রচলিত দর্শনের সূত্রগুলি উলটে পালটে যে নতুন দর্শনতত্ব দাঁড় করান হয় তার মধ্যে এত স্ববিরোধ ও অসঙ্গতি যে সাধারণ মানুষেরও দৃষ্টি এড়ায় না।

অস্তিত্ববাদের দর্শনকে এই আলোচনায় টেনে আনার ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে *Portrait of an Anti-Semite*এর প্রমাণ যুক্তি এর মূল দর্শনের একটি বিশেষ রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এই যুক্তি থেকেই ধরা পড়ে একই রকমের বিকৃতি, জটিলতা ও আত্মগত আবেশ। 'য়িহুদীসমস্যা'র কি কোন অস্তিত্ব আছে? সার্ত্রের মতে য়িহুদীদের প্রতি য়িহুদীবিরোধীদের মনোভাবে-ই এই সমস্যার অস্তিত্ব। য়িহুদী কে? য়িহুদীর আবেষ্টনীতে যাকে পড়তে হয় সেই য়িহুদী। এক্ষেত্রে য়িহুদীবিরোধিতার উৎপত্তি খুঁজতে যাওয়া দরকার মনে করা হয়নি। কারণ—

'বাইরের কোন কারণ য়িহুদীবিরোধীর মনে য়িহুদীবিরোধিতা জাগাতে পারে না। স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির ব্যবহারে ব্যক্তি ইহুদীবিরোধী হয়, কিন্তু যে একবার ইহুদীবিরোধিতাকে গ্রহণ করল, তার পক্ষে এটা একটা সামগ্রিক দৃষ্টিভংগী—এক জীবনদর্শন। তার প্রভাব শুধুমাত্র য়িহুদিদের বেলায় নয়, বরং সর্বসাধারণ মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে, ইতিহাস আর সমাজ সম্বন্ধে ধারণায়ও সমানভাবে দেখা দেয়। য়িহুদীবিরোধিতা হোল এক আবেগঘন মানসিক

অবস্থা,—পৃথিবীকে দেখবার বিশেষ এক ভঙ্গী। তারা এমন সম্প্রদায়ের মধ্যে বাস করে যারা তাদের য়িহুদী বলে মনে করে।'

এই অন্তর্মুখীন আতিশয্যের ফলে সম্প্রদায় হিসেবে য়িহুদীরা এক বিষয়বিযুক্ত ধারণায় পরিণত হয়েছে। যদি এ অবস্থার সমাপ্তি আনা যায় (সমস্ত বইটাতে এই আবেদনই করা হয়েছে যে এ অবস্থাকে শেষ করে দিয়ে এ সমস্যার সমাধান করতে হবে) তবে য়িহুদীর য়িহুদীত্ব লোপ পেয়ে মানুষ হিসেবে দেখা দেবে। কিন্তু যে ভাবে সমস্যাটিকে প্রথম উপস্থিত করা হয়েছিল, সে কথা মনে রাখালে এত সহজে তার সমাধান হবে না। আর শেষ অধ্যায়ে যদিও সার্ত্রে উপদেশ দিয়াছেন যে: 'নিজেদের জন্যে আমরা যেমন ভাবে লড়াই করি, য়িহুদীদের জন্যেও ঠিক তেমনিভাবে লড়াই করবো—তার কমও নয় বেশিও নয়।' তা সত্বেও অলিখিত সিদ্ধান্ত রয়েই গেছে যে এ সমস্যার সমাধান হতে পারে না। এই হচ্ছে সেই হতাশা আর চরম অসহায়তার দর্শন—আর অস্তিত্ববাদের সারমর্ম এখানেই। এখানে বলা দরকার যে সাধারণ মার্ক্সবাদী-দৃষ্টিভংগী থেকে এর প্রতীকার হিসেবে শ্রেণীবিলোপের যে কথা বলা হয় তাকে প্রধান যুক্তির অংশ হিসেবেও এখানে পেশ করা হয়নি, করলেও তা নতুন নতুন স্ববিরোধিতার কথা টেনে আনতো।

দুঃখের কথা হোলো যে সার্ত্রে য়ুরোপে য়িহুদীবিরোধীর যে প্রতিকৃতি একেছেন, তা স্পষ্ট ও উজ্জ্বল অথচ সে ছবি ঘোলাটে মতবাদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তার কারণ বোধ হয়, জীবনের প্রতি অন্তর্মুখী মনোভাব কল্পনাত্মক সাহিত্যের মাধ্যমেই ভালোভাবে রূপ পায়, যুক্তিসর্ব্বস্ব দর্শনের ভাব ও ধারণার বিচারে ধরা যায় না। সার্ত্রের অন্যান্য বইগুলির মত বর্ত্তমান বইখানাও সুপাঠ্য, এবং এতে সতেজ চিন্তার ছাপ রয়েছে। সব কথা যদিও বিস্তারিত করে বলা হয়নি তবুও অনেক কথাই অপূর্ব কলানৈপুণ্যে উপস্থিত করা হয়েছে। ইয়োরোপে য়িহুদী সমস্যার যেরূপ, তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি zionism। চোখ ফিরিয়ে আমরা যদি পিছনের দিকে চাই, তখন দেখি যে য়িহুদী বিরোধিতা সমাজে রয়েছে এবং মনে হয় ইতিহাস নির্বিশেষে এর অস্তিত্ব চিরকালীন। 'য়িহুদীদের সম্বন্ধে মানুষের যে ধারণা, তাই ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রণ করেছে, ঐতিহাসিক সংঘাতে য়িহুদী বিরোধিতার উদ্ভব হয়নি'। একথা হয়তো মানা চলে যে একবার জন্ম নিলে মানুষের ভাবনা ধারণাগুলো স্বাধীন সত্বা নিয়ে বেঁচে থাকে এবং মানুষের মনকে তারা প্রভাবান্বিতও করতে পারে। কিন্তু যদি বলা হয় যে কোনো লোকের জীবনদর্শন হচ্ছে জীবননিরপেক্ষ এবং নিজের স্বাধীন ইচ্ছাতেই সে এ দর্শন গ্রহণ করেছে,—তবে সে কথার অর্থ কি ? এ ধরণের চিন্তাবিভ্রাটকে চিত্তভ্রান্তি বা উদ্‌ভ্রান্ত আত্মমুখীনতা ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে ?

সমগ্র যুক্তিজালকে ঘোলাটে করে তুলেছে যে স্ববিরোধিতা তার সুরু এইখানে য়িহুদীসমস্যার 'গণতান্ত্রিক সমাধান' সার্ত্রে চান না। এ সমাধান 'য়িহুদীকে তার ধর্ম, পরিবার, জাতিগোষ্ঠী থেকে পৃথক করার দিকে নিয়ে যাবে। এ সমাধান য়িহুদীর য়িহুদীসত্বার বিলোপ ঘটাবার চেষ্টা করবে, বাস্তব 'য়িহুদি' লুপ্ত হয়ে নাগরিক ও মানবিক অধিকারের

অখণ্ড অমূর্ত প্রতিভূ 'মানুষ' বেঁচে থাকবে।' তাদের পৃথক য়িহুদীসত্ত্বার বিলোপসাধন করে জাতীয় সমগ্রতার মধ্যে (সে জার্মাণ বা ফরাসী যাই হোক না কেন) য়িহুদীদের একত্রীকরণ করা তাই চলবে না।

এ ধরণের ব্যবস্থা মেনে নিতে ইচ্ছে করে, মনে হয় যে একথার মূলতত্ত্ব হচ্ছে, এক পৃথক য়িহুদী সম্প্রদায় স্থাপন যার ঐক্যসূত্র হবে জাতি, ধর্ম ও ইতিহাসের সাধারণ ঐতিহ্য। সার্ত্রে কিন্তু জাতিসম্পর্কিত মতবাদকে অপর্যাপ্ত বলে বাতিল করেছেন, এবং অত্যন্ত ভাসাভাসা রকমের আলোচনা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌচেছেন যে বিশ শতাব্দী ধরে বিক্ষিপ্ত থাকার ফলে য়িহুদীদের সাধারণ ঐতিহ্যে বিচ্ছিন্ন, সাধারণ কোন ঐতিহাসিক অতীত তাদের নেই। ইতিহাস এক নয়, ঐতিহ্যও বিচ্ছিন্ন, তাহলে য়িহুদীরা কী করে পৃথক সম্প্রদায় হিসেবে টিকে আছে ?

নীচের কথাগুলোয় এর উত্তর মিলবে :

'এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমরা আবার অবস্থানের কথায় ফিরে যাবো। অতীত ইতিহাস, ধর্ম বা মাতৃভূমি কোনটাই ইস্রাইলের সন্তানদের ঐক্যবদ্ধ করেনি। যদি তাদের কোন ঐক্যবন্ধন থেকে থাকে, যদি তারা সবাই য়িহুদী নামের যোগ্য হয়ে থাকে, তবে তা হয়েছে এই কারণে যে তারা একই আবেষ্টনীর অংশীদার। এক কথায় এক দুর্ভাগা জাতির স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার সমস্যা। আর এই সমস্যার মীমাংসা আরও কঠিন হয়ে উঠেছে তীব্র জাতীয় আবেগ ও অন্তপ্রর্কৃতির জন্যে।' বইটার বেশীরভাগ এই সত্যকেই অপূর্ব ভাবে বিশ্লেষণ করেছে। আধুনিক যুগের এই প্রধান পাপাচারকে অনুধ্যান করার জন্যেই বইটাকে ভারতীয় পাঠকদের পড়তে বলি। দেশকে বিভক্ত করে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, কিন্তু দেশ বিভাগের ফলে যে সব সমস্যার সৃষ্টি, তারই অনুরূপ অনেক অশান্ত চিন্তার খোরাক এই বইখানিতে মিলবে।

অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায়

ত্রিযামা—সুবোধ ঘোষ। ডি, এম, লাইব্রেরী। দাম ছয় টাকা।
জীয়ন্ত—মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিসার্স। দাম চার টাকা।
মারকে লেঙ্গে—পরিমল গোস্বামী। রীডার্স কর্ণার। দাম আড়াই টাকা।

'ত্রিযামা' পূর্ব্বে কোন একটি শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। পুস্তক আকারে পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত হইবার পূর্ব্বে উপন্যাসখানি বহু পরিবর্ত্তিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। মহারাজপুরের হরভবন স্তূপ খননের পরিপ্রেক্ষিতে দুইটি পরিবারের কাহিনী লইয়া উপন্যাসটি রচিত। দুইটি পরিবারের জীবনের আদর্শই প্রত্যেক ক্ষেত্রে নিজস্ব দ্বন্দ সৃষ্টি করিয়াছে। সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্ম্মী দুইটি আদর্শ দুই পরিবারের, বিজয়বাবুর এবং

মৃগেণবাবুর। এই দুইয়ের মধ্যে মিলিবার সাধারণ কোন ক্ষেত্র নাই। বিজয়বাবুর পুত্র নায়ক কুশল এবং অন্যতম নায়িকা নবলা মিলিতে গিয়া আরও সংঘাত সৃষ্টি করিয়াছে। পরিবার দুইটি পরস্পর হইতে আরও দূরে সরিয়া গিয়াছে। টাকা যে পার্থিব সুখ দিতে পারে সে কামনার অন্ত নাই। মৃগেনবাবু ও নন্দা দেবী টাকার পিছনে ছুটিয়াছেন কিন্তু সুখের সন্ধান পান নাই। বিজয়বাবুও বহু অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে সুখ না পাইয়া তিনি স্বেচ্ছায় অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা ত্যাগ করিয়া শান্তি খুঁজিয়া পাইয়াছেন। তাঁহার জীবনে কোন দ্বন্দের আর স্থান নাই। তিনি দ্বন্দাতীত হইয়া নিত্য শান্তির সন্ধান পাইয়া আত্মসমাহিত। তাঁহার স্ত্রী মিত্রা তাঁহার অনুগামিনী শুধু নয়, আধ্যাত্মিক উন্নতিতে তিনি যেন তাঁহার স্বামীকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন। স্বামীর মৃত্যুর সামান্য পূর্ব্বে তিনি তাই স্বামীর মহাপ্রস্থানের আহ্বান শঙ্খধ্বনি শুনিতে পান।

ইঞ্জিনিয়ার বিজয়বাবুর কিভাবে এবং কেন জাগতিক বিষয় সম্বন্ধে নিস্পৃহ হইয়া গেলেন তাহা এই গল্পের বিষয় নহে, তেমনি মিত্রা দেবীর আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপানগুলি দেখানো হয় নাই বলিয়া অবশ্য লেখককে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ তাহা গল্পের পূর্ব্ব কাহিনী। কিন্তু গল্পে তাঁহাদিগকে একেবারেই অশরীরি মনে হয়। লেখকের নির্দ্দিষ্ট অত্যন্ত পরিমিত এবং শুদ্ধ তাঁহাদের রূপ। আপত্তি এইখানে। লেখক নিজে যাহা শ্রদ্ধার চোখে দেখেন তাহা সশ্রদ্ধভাবে পাঠকের সামনে উপস্থিত করিবার অধিকার তাঁহার আছে। কিন্তু পাঠকের প্রশ্নের মীমাংসা না করিতে পারিলে লেখকের গভীরতম শ্রদ্ধাও ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

কেবলমাত্র এই চরিত্র দুইটির দিক হইতে যে লেখকের পরিকল্পনা unconvincing তাহা নহে। সামান্য একটি ব্যাঙ্কের সেক্রেটারীর পদ হইতে মৃগেনবাবু ভাড়াটে বাড়ী হইতে নিজস্ব প্রাসাদ 'হ্যাপি নুক' হইতে প্রাসাদান্তর 'শুকতারা'য় ক্রমোন্নতি সমানভাবে unconvincing; মফঃস্বল সহরের ছোট একটি ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী যত বড় অসাধু এবং অবিশ্বাস্য রকমের ধূর্ত্ত হউক না, মৃগেনবাবুর ভাগ্য তাহার কাছে অচিন্তনীয়।

কাহিনীর দ্বিতীয় অংশ হরভবনের স্তূপ খননের পটভূমিতে। টু সীটারের অধিকারী দেবী রায় সার্ভে অফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়া আসিবামাত্র সমগ্র মহারাজপুরের চিত্ত হরণ করিয়া ফেলিল। নবলা ও তাহার মাতার সহিত প্রেম করিয়া সে বেশ অগ্রসর হইতেছিল। নবলাকে বিবাহ করিল, কিন্তু হরভবনের মূর্ত্তিগুলি বিক্রয়ের চেষ্টা কুশল ব্যর্থ করিয়া দিল। মিস মেরিডিথকে অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব দান করিবার জন্য যখন শ্বশুরের বাড়ীতে খেসারতের নোটিশ আসিল সেটা তাহার দ্বিতীয় পরাজয় কিন্তু মৃগেনবাবুর পরিবারে তাহাই চরম। শেষের এই অংশটুকু পরিবর্ত্তনের ফলে সংযোজিত। আদিতে মা ও মেয়ের সঙ্গে একই সময়ে প্রেমের ইঙ্গিত ছিল মাত্র।

হরভবনের সহিত জড়িত কুশলের অংশটুকু গল্পে প্রধান। রত্না ব্যাঙ্কে বাবার সঞ্চিত সব অর্থ যাইবার পরে কুশল সমাহিত হইয়াছে। নিজেকে চিনিতে পারিয়াছে যখন এই

কারণেই নবলা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করে। কুশলের চরিত্রে এই পরিবর্ত্তন মানিয়া লওয়া যায়, বিশেষ করিয়া হেরিডিটির কথা স্মরণ করিলে। কিন্তু কুশলের অভিযোগ তদন্ত করিতে আসিয়া সেই অফিসার কর্ত্তৃক কুশলকে হরভবন আর্কেওলজিকাল সোসাইটির ট্রাস্ট গঠন করিবার অধিকার দেওয়া এবং সোসাইটির দারোয়ান এবং রেল প্লাটফর্ম্মের ফিরিওয়ালা নিস্পৃহ অনুপমকে লইয়া ট্রাস্ট গঠন আরব্যোপন্যাস অপেক্ষা কম চমকপ্রদ নহে। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে বাকি থাকে স্বরূপা। বিজয়বাবু ও চিত্রা দেবীকে অশরীরি বলিয়াছি, স্বরূপাকে বায়বীয় ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

আমাদের সমসাময়িক জীবনে লোভ এবং স্বার্থের সংঘাতে সাধারণ পীড়িত। যাহার আছে সে আরও পাইবার জন্য লালায়িত, যাহার নাই সেও কিছু পাইবার চেষ্টা করিতেছে। দ্বন্দ ও কোলাহলে মানুষের মনের শান্তি নষ্ট করিতেছে, সুখও পাইতেছে না। কাজেই দারোয়ান পাঠকজীর মত সামান্য লইয়া, স্বরূপার মত নিঃশব্দে জীবন সংগ্রাম মানিয়া নিয়া, অথবা অনুপমের মত নিস্পৃহ হইয়া চলিলে দ্বন্দের অবসান হইতে পারে, শান্তি ফিরিতে পারে। এই ধরণের একটা ইঙ্গিত আছে উপন্যাসখানিতে। ইহা জীবনাদর্শ হিসাবে গ্রাহ্য কি না তাহা সমালোচনায় অবান্তর। উপন্যাসের ঘটনাবলীতে বা চরিত্রের সংঘাতে তাহা ফুটিয়াছে কিনা তাহাই বিচার্য্য। ঘটনাগুলি অভ্রান্তরূপে সমসাময়িক জীবনের হওয়া চাই, চরিত্রগুলিকে বাস্তবের স্পর্শসহ ভূমিতে দাঁড় করাইতে হইবে। হরভবনের স্তূপ এবং মহারাজপুর তাহার উপযুক্ত মঞ্চ নহে।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক কোন কোন রচনাতে যত্নের অভাব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। আলোচ্য বইটি দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে বাংলা দেশের কোনও একটি মফঃস্বল সহরের কাহিনী। এই সময়কার প্রায় সব রকমের লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় উপন্যাসখানিতে। অল্পপরিসর ক্ষেত্রে এতগুলি বিভিন্ন চরিত্রের অবতারণা করিতে হইলে যতটা সতর্কতা এবং যত্ন প্রয়োজন তাহার অভাব বইখানির বহু জায়গায় চোখে পড়ে। প্রথমত তিনি ১৯২৪ এবং ১৯৩৬'এর রাজনীতি গুলাইয়া ফেলিয়াছেন। ১৯২৪এর পরে কোন জেল ফেরৎ অসহযোগী মন্ত্রী হইবার স্বপ্নও দেখে নাই চেষ্টা করা ত দূরের কথা। কিন্তু জেল ফেরৎ কংগ্রেসী নেতা অনন্তকে তিনি মন্ত্রীর গদীতে বসাইয়া ছাড়িয়াছেন। ১৯২৪ হইতে ১৯২৮ পর্য্যন্ত যে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন তাহার প্রকৃতি মাণিকবাবু একটুও বুঝিতে পারেন নাই। রাজনীতিতে দীক্ষা লইবার পরে তিনি যাহা শুনিয়াছেন, লেখক হিসাবে যাহা কল্পনা করিয়াছেন, তাহার সবটুকু ১৯৩৩ সালের পরেকার বিষয়। তখন উর্দ্ধতন নেতারা জেলে, জেলায় এবং মহকুমায় প্রত্যেক দল নিজেরাই আপন পথ খুঁজিতে বাধ্য হইয়াছে। কেবল শোনা কথায় সন্ত্রাসবাদীদের সম্বন্ধে লিখিতে গেলে কত অদ্ভুত সৃষ্টি হইতে পারে তাহা ইতিপূর্ব্বেও দেখিতে পাইয়াছি। কিন্তু বাস্তব মাণিকবাবু সহজে করায়ত্ত করিতে পারেন বলিয়া সন্ত্রাসবাদীদের চরিত্রগুলি একেবারে ব্যর্থ হয় নাই।

কিন্তু প্রধান চরিত্র পাকাই মাণিকবাবুকে ডুবাইয়াছে। এলিস এবং সেক্সোলজি

পাঠে উৎসাহী, সত্যই দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র পাকা পাকিয়াছিল। কিন্তু সে অসাধারণ। চামড়ার কারখানার মজুরদের কাছে গিয়া সে পচাইয়ের ভাঁড় মুখের কাছে তুলিয়া খাইবার অভিনয় করে, তাহাদের আনন্দে আনন্দিত হওয়া যায় কি না দেখিবার জন্য, খারাপ পাড়ায় যায় কিন্তু তাহার বীভৎসতায় ছিটকাইয়া বাহির হইয়া আসে। এ হেন পাকা সন্ত্রাসবাদীদের অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখে, ইচ্ছা হয় উহাদের দলে যোগ দেয়। পাকার দলে স্থান হয় না বটে, কিন্তু দলের যে সব কাজ সে করিয়াছিল দলের সভ্যের পক্ষেও তাহা পরম গৌরবের। এই সব anachronism শোনা কথার উপর গল্প লিখিবার চেষ্টাতেই দেখা দিয়াছে। দলের লোকে যে বিপদ স্বেচ্ছায় বরণ করিতে পারে বাহিরের লোকের পক্ষেও তাহা সম্ভব। দল কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত পাকাকে দিয়া তিনি তাহা দেখাইতে চাহিয়াছেন এবং মনে হয় পরোক্ষ বলিতে চাহিয়াছেন যে সন্ত্রাসবাদীদের এই সব কার্য্যকলাপ যে সসম্ভ্রমে উল্লিখিত হয় তাহা অহৈতুক, নিতান্তই যোগাযোগের ব্যাপার।

সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে সঙ্গে দেশে রাজনৈতিক চেতনাও আগাইয়া চলিয়াছে,—যেখানে অসহযোগী কংগ্রেসীদের ফাঁকি নাই, সন্ত্রাসবাদীদের উত্তেজনা নাই,—দৈনন্দিন জীবনের অন্নবস্ত্র সংস্থানের সংগ্রাম হইতে, জীবনের লিপি হইতে সে রাজনীতি সাধারণ চাষা মজুর শিখিয়া লইতেছে। সংহত হইলে এই চাষী মজুরের রাজনীতিই দেশের সত্যকার রাজনীতি হইতে পারে। ইহার উন্মেষ ২৪-২৮ সালে হয় নাই, কিন্তু নেবুলার মত নবজন্মের আভাস আছে আঠুলিগ্রামের ইতিহাসে। পাঁচু এবং গণেশ সে আগামী আন্দোলনের পথিকৃৎ।

শহর এবং এই গ্রাম লইয়া মাণিকবাবু যদি রাজনৈতিক উপন্যাস রচনা করিতেন তাহা হইলে সন্ত্রাসবাদীদের চিত্র অসম্পূর্ণ হইলেও দোষের হইত না। তাহাতে অন্যান্য অসঙ্গতি অবশ্য ঢাকা পড়িত না কিন্তু উপন্যাসখানি একটি সম্পূর্ণতা লাভ করিত। কিন্তু বইখানির ত্রুটি তিনি নিজেই সৃষ্টি করিয়াছেন নতুন মামীকে শেষ পর্য্যন্ত স্থান দিয়া। এই নতুন মামীকে পাকা ভালবাসিত। ইহাকে calf lov হিসাবে না দেখিয়া তিনি এই নতুন মামীটির incest পর্য্যন্ত আনিয়াছেন। তথাকথিত ভদ্রজীবনের নানা ফাঁকি এবং গ্লানি মাণিকবাবু পূর্ব্বে একাধিক গল্প ও উপন্যাসে অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান উপন্যাসের প্যাটার্ণের সহিত এই incest কাহিনীটি খাপ খায় না। খ্যাতনামা লেখকের এই ধরণের ত্রুটি অমার্জ্জনীয়।

উপরে কয়েকটি গুরুতর ত্রুটির কথা উল্লেখ করিলাম। তথাপি একথা স্বীকার করিতে হইবে যে উপন্যাসখানির কয়েকটি ঘটনা এবং পাঁচু, ভুকলি প্রতিমা অমিতাভ প্রভৃতি সত্যই জীয়ন্ত।

পরিমলবাবু হাস্য রসিক। সম্পূর্ণ কাল্পনিক হাস্যকর ঘটনা তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। আবার সমসাময়িক জীবনের ত্রুটি বিচ্যুতি তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় না। তাঁহার গভীর সমাজবোধ ইহাতে পীড়িত হয়, তিনি চাহেন এই ত্রুটি দূর হউক। কিন্তু এই সংস্কারের চেষ্টায় তিনি

কঠোর হইয়া উঠেন না। সামাজিক ও চারিত্রিক ত্রুটি তাঁহার হাসির উদ্রেক করে, তাহাও মৃদুহাস্য।

'মারকে লেঙ্গে' কয়েকটি গল্প সংগ্রহ। রচনাকাল ১৯৪৫ হইতে '৪৭। এই সময়ে আমাদের সমাজ জীবনে অনেক ভাবাবেগের উচ্ছাস এবং নির্লজ স্বার্থপরতার প্রকাশ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ভাবাবেগ লেমনেডের বুদ্বুদের মত খুব গাঁজিয়া মিলাইয়া গিয়াছে বটে কিন্তু সকলকে সমারোহে জানাইয়াই তাহার আবির্ভাব হইয়াছিল। স্বার্থপরতারও শেষ নাই। এই উভয়ই ত্রুটি। এই ত্রুটি কাহাকেও ব্যথিত করে, কাহারও মনে উষ্মার সঞ্চার করে। পরিমলবাবু ব্যথিত হইয়াছেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাসিয়াছেন। এইভাবে হাসিবার ক্ষমতা অত্যন্ত বিরল। বাংলা সাহিত্যে অন্তত তিনিই একক, যিনি এভাবে হাসিতে পারেন।

আলোচ্য গ্রন্থখানি হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিই: '৪৭ এ পনেরই আগস্টের পর আমরা হিন্দু মুসলমান এক হইয়া গিয়াছিলাম। আমাদের সে সাম্প্রদায়িক প্রীতি কত ভঙ্গুর তাহা গত ফেব্রুয়ারী মাসে বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু সেদিন হিন্দু-মুসলমান উভয় উভয়কে দেখিলেই আলিঙ্গন করিয়াছে। এই আলিঙ্গন প্রহসনের চরম প্রকাশ 'এক হো' গল্পটিতে। দুই বৃদ্ধ হিন্দু এবং মুসলমান নব মিলন আনন্দে এত উচ্ছসিত যে কাহাকে কাহাকে আগে ছাড়িবে সেই সমস্যায় পড়িয়া উভয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় মোড়ে দাঁড়াইয়া আছে। লোকের বিপদে সাহায্য করিবার ছলে, দেশের উন্নতির কাজে দেশের লোকের টাকা মারিবার ফিকির স্বদেশী যুগ হইতেই আমাদের দেশে চলিতেছে। স্বাধীনতার পরে তাহা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার একটি নিখুঁত ছবি পাওয়া যায় 'গুহ এ্যাণ্ড পাল' গল্পটিতে। চোরাবাজার, খেলার মাঠ, পরীক্ষার হল সব জায়গায় আমাদের চারিত্রিক ত্রুটি নানাভাবে প্রকাশ পায়। সাহিত্য করিতে গিয়া সাহিত্যিককে অভিনন্দন দিতে গিয়াও আমাদের ফাঁকি ঢাকা পড়ে না।

এ সমস্তই অমার্জ্জনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রকাশ্য কষাঘাতই ইহা দূর করিবার একমাত্র উপায় তাহা পরিমলবাবু স্বীকার করেন না। প্রত্যেকটি গল্পে তিনি আমাদের চারিত্রিক ত্রুটি absurd পর্য্যায়ে লইয়া গিয়াছেন, সেখানে তিনি নিজে হাসিয়াছেন এবং পাঠককে হাসাইয়াছেন। হাসিয়াও সংস্কার সাধন করা যায়। কথিত আছে Cervantes হাসিয়া দেশ হইতে নাইট এরাণ্ট্রি দূর করিয়াছিলেন।

গত কয়েক বৎসরে আমাদের সামাজিক আচরণে যে সকল অসঙ্গতি প্রকাশ পাইয়াছে তাহার একটি নির্ভরযোগ্য দলিল বলিয়া 'মারকে লেঙ্গে' পরিগণিত হইবে।

করালীকান্ত বিশ্বাস

Printed and Published by Atawar Rahman at Sri Gouranga Press, 5, Chintamani Das Lane, Calcutta.

চতুরঙ্গ
দ্বাদশ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৫৭

আশ্রয়হীন ফরাসী বামপন্থী

হারবার্ট লুথি

একদিকে টোটালিটারিয়ান ফরাসী কম্যুনিস্ট পার্টির সুদৃঢ় দুর্গ অন্যদিকে উদারনৈতিক সমাজতান্ত্রিক দলের তাসের ঘর, যেখানে 'তৃতীয় শক্তি'র অবশিষ্টাংশ ঘর গোছাবার চেষ্টা করছে। এই দু'য়ের মাঝখানে ছোট ছোট অগুনতি বামপন্থী দল ও উপদল স্থানলাভের জন্য ঘুরে বেড়ায়। এই ঘুরে বেড়ানোটা অনেকের মতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, শ্রমিক এবং ফরাসী জাতির মাঝখানে কমিউনিস্টরা যে ব্যবধান রচনা করেছে এর ফলে সেটা হয়তো দূর হতে পারে। অথবা যারা আজ এভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারাই আবার ফরাসী গণতন্ত্রের একটি বাস্তব এবং সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করতে পারে। ফরাসী গণতন্ত্রের অবস্থা যেন ব্যারণ মানখাওসেনের মত, শূন্যে নিজের টিকির উপরে ঝুলছে।

রাজনীতিতে আজ যে অচল অবস্থা দেখা দিয়েছে সেটা অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থারই প্রতিচ্ছবি। কিন্তু তাই বলে একথা বলা চলে না যে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা ধীরে ধীরে উন্নত হলেই রাজনৈতিক ও আদর্শগত অচল অবস্থা দূর হবে। সমস্যাটির সমাধান এত সহজ নয়। একদিকে স্বর্ণযুগের প্রতিশ্রুতি, অন্যদিকে মরীচিকাময় বিভীষিকা—দুইয়েরই মোহ এড়িয়ে গতানুগতিক দৈনন্দিন জীবন এবং প্রতিদিনকার সাধারণ রাজনীতিতে ফিরে আসবার পথ অত্যন্ত দীর্ঘ এবং কঠোর। বিভিন্ন আদর্শবাদের ফলে যুদ্ধমান নানা প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়েছে বলে সে প্রত্যাবর্তন আরো কঠিন। এ কথা সত্যি যে বিশ্বাসের আর সে জোর নেই; এমন কি কম্যুনিস্ট পার্টির সাধারণ সভ্যেরাও

আর পার্টির প্যারেডে যোগ দেয় না, যদিও পার্টিকেই ভোট দেয় এবং উপায় নেই বলে চাঁদাও দিয়ে থাকে। এ রকম অবস্থায় নানা রকম ভুল ভ্রান্তির মধ্যেও হয়তো রাষ্ট্র বেঁচে থাকতে পারে, কিন্তু ফ্রান্সের মতন দেশে তাতে গণতন্ত্রের মূলগত সমস্যার সমাধান মিলবে না। ফ্রান্সে ভোটারদের এক তৃতীয়াংশ তাদের অসন্তোষের প্রকাশ হিসাবে হলেও নির্বাচনের সময় কম্যুনিস্টদের ভোট দিয়ে কম্যুনিজম প্রীতি দেখায়। আর এক তৃতীয়াংশ কম্যুনিজমের বিরোধিতা করতে গিয়ে গণতন্ত্রেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে, চায় একজন ত্রাণর্কতা— হোক সে জেনারাল দ্য গল অথবা পুলিশ। শেষ তৃতীয়াংশ 'বাস্তব' রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। তাদের কাজ চক্রান্ত করে হোক জালিয়াতি করে হোক দলীয় শাসন বজায় রাখা। কিন্তু তাদের পেছনে জনসাধারণের সমর্থন নেই, তাই তাদের শাসনব্যবস্থা জনসাধারণকে আদৌ আকৃষ্ট করে না বা প্রেরণা দেয় না।

ফলে কম্যুনিস্ট পুলিশি শাসন থেকে গণতন্ত্রকে বাঁচাবার একমাত্র উপায় এমন একটি বামপন্থী গণতান্ত্রিক দল গঠন করা যা সোভিয়েটের পক্ষে পঞ্চম বাহিনীর কাজ করবে না। আবার শ্রমিকেরা যোগ না দিলে প্রতিনিধিমূলক ব্যাপক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। কিন্তু শ্রমিকেরা আজ কম্যুনিস্টদের বেড়াজালে একেবারে আবদ্ধ। যে সব দল মিলে আজকের শাসন কোনক্রমে চালাচ্ছে এবং নিতান্ত তুচ্ছ বলে তা পরিত্যাগও করতে পারছে না, তাদের কোন দলই অপর বামপন্থীদের মিলন ক্ষেত্র হতে পারে না। কম্যুনিজমে বীতরাগ হয়েও অন্য পথ পাচ্ছে না বলে যারা কম্যুনিস্ট, তাদের 'তবে কোথায় যাই' এ প্রশ্নের উত্তর দেবার ক্ষমতা এসব দলের নেই। এমন কি 'অন্যবার কাকে ভোট দেব' এ প্রশ্নেরও জবাব নেই। এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারে তেমন দল তৈরী করাই হল প্রাত্যেকটি বামপন্থী দল ও উপদলের প্রকাশ্য অথবা গোপন লক্ষ।

বিভিন্ন বামপন্থী দলের প্রত্যেকের ধারণা যে জনসাধারণ অন্য কোথায় যাবে তা জানেনা বলেই কম্যুনিস্টদের বাঁধনে বন্দী— তাই আশ্রয়হীন বামপন্থী জনসাধারণের মুক্তির অগ্রদূত হিসাবেই বাঁধন কেটে বেরিয়েছে। কম্যুনিস্ট পার্টির সাধারণ সভ্যদের আকৃষ্ট করতে পারে কি না, তাই দিয়ে এই দলগুলো নিজেদের যোগ্যতা মাপে, বাইরের লোকেরাও তাই করে থাকে। এই মাপের বিচারে সবগুলি দলই আজ পর্যন্ত অকৃতকার্য হয়েছে। বাইবেলে আছে যে নিরানব্বই জন ধার্মিকের চেয়ে একজন পাপীর পরিত্রাণে স্বর্গে বেশী আনন্দ হয়

তেমনি নিরানব্বইজন অদলীয় সদস্যের তুলনায় দলত্যাগী একজন কম্যুনিস্ট সদস্য লাভ করলে এই সব দল বেশী উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

সমস্যাকে এই ভাবে দেখা হয় বলেই বোধ হয় এসব দলের আদর্শগত ত্যাগ ও বিরোধিতা এবং অকৃতকার্যতা। আশ্রয়হীন বামপন্থীরা অনেককে স্বমতে আনবার চেষ্টা আরম্ভ করেছে, কিন্তু তাদের নিজেদের লক্ষ্যই স্থির হয়নি। কম্যুনিস্ট বিরোধী এই সব বামপন্থীদের নিষ্ঠা সম্বন্ধে কারো সন্দেহ নেই। কিন্তু তাদের সব চাইতে বড় উদ্দেশ্য কম্যুনিস্টদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জনমতকে স্ববশে আনা। কিন্তু তা পারবে কেন? সোভিয়েট রাষ্ট্রের ক্ষমতার যে মোহ, তার আবেদনের সঙ্গে পাল্লা দেবার মত জোরালো আফিম এরা কোথায় পাবে? আরো মুস্কিল যে কম্যুনিস্টদলের সভ্য ভাঙিয়ে আনবার চেষ্টা করতে গিয়ে এ সব বামপন্থীরা নিজেদের কম্যুনিষ্টদের থেকে স্বতন্ত্র বলে দেখাতে চায় না। ফলে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। কম্যুনিস্ট দলের প্রতি এদের একই সময়ে আকর্ষণ এবং বিতৃষ্ণার ফলে আশ্রয়হীন বামপন্থীদের গতিপথের নিশানা পাওয়া শক্ত। তাদের গতিবিধি দেখলে পথের আলোর পাশে রাতের পতঙ্গের অবিরাম আবর্তনের কথাই মনে পড়ে।

এ উপমায় অতিশয়োক্তি নেই। প্যারিতে এই অগণিত বামপন্থীদের আনাগোনা দেখলে প্রথমে সত্যিই অর্থহীন মনে হয়। প্রত্যেক দলই জনসাধারণকে আহ্বান করে— কিন্তু জনসাধারণ কারো কথাই শোনে না। নিশান-বরদারের অন্ত নেই, অভাব শুধু নিশানের পেছনে চলবে এমন লোকের। এক একটি উপদলে হয়তো দশজন সদস্য, তারা অশেষ কষ্টে অনেক টাকা খরচ করে, কোনমতে একখানা পত্রিকা বার করল, তারপরে দলের সমস্ত সভ্য মিলে তাকে বেচবার জন্য রবিবারে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। কোনক্রমে শ'খানেক সভ্য সংগ্রহ করতে পারলেই তারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করবার ষড়যন্ত্রে মেতে যায়, গভীর আলোচনা সুরু করে দেয় যে সম্মিলিত ফ্রন্টের দিকে ঝুঁকবে না সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেবে? তাই নিয়ে আবার মতবিরোধ দেখা দেয়, উপদলটি দুটো বিরোধী দলে ভাগ হয়ে যায়। উভয় দলই তাদের নিজস্ব মত প্রকাশের জন্য পত্রিকার আয়োজন করে— প্রত্যেকে দাবী করে যে তারাই খাঁটি সমাজতন্ত্রের আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে। এদের কাজকর্মকে পুরোপুরিভাবে রাজনৈতিক বলা যায় না, বরং ক্লাবগঠনের মতই এদের কর্মপন্থা। শুনে অবাক হতে হয়— যে প্রথম

ইণ্টারন্যাশন্যালের গোঁড়া অনুসরণকারী ছোট একটা দল আজও ফরাসী দেশে বেঁচে আছে।

উপদলের এই জটলার মধ্যে কেবল কয়েকটা প্রধান দলকেই চেনা যায়। কিন্তু তাদের বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতাও বহু দিন শেষ হয়ে গেছে, কেবল কম্যুনিষ্টদের সম্বন্ধে তাদের আচরণ থেকে তাদের উৎপত্তির ইতিহাস বুঝতে পারা যায়।

প্রথমত, ট্রট্স্কীপন্থী থেকে শুরু করে টিটোইস্ট প্রভৃতি দলগুলির কথা বলা যাক। কম্যুনিস্ট পার্টি বিপ্লবী আন্দোলনের প্রকৃতি হারিয়ে যখন ক্রমশঃ রুশীয় রাষ্ট্রীয় দলে পরিবর্ত্তিত হল, তখন এরা বিরোধী দল হিসাবে কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে বিছিন্ন হয়ে পড়ে। বিদ্রোহী হিসাবে এদের মতামত খাঁটি এবং দৃঢ় ; স্টালিনপন্থী-অধোগতির বিরুদ্ধে এরা মতামতের শুদ্ধতা প্রচার করে এবং মনে করে কমুনিস্টদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম হচ্ছে একটা ভুল সংশোধন করবার সংগ্রাম। যুদ্ধশেষে প্রথম প্রথম এদের একমাত্র আকাঙ্খা ছিল কম্যুনিস্টদের বিপ্লববিরোধী মতিগতি লোকের কাছে ধরিয়ে দেওয়া। কম্যুনিস্টরা যে সব ধর্ম্মঘটের তোড়জোড় করছিল সেগুলোকে বিপ্লবী সাধারণ ধর্ম্মঘটে পরিণত করে রাষ্ট্র ক্ষমতা হস্তগত করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। এক কথায়, তারা মনে করত যে তারাই কম্যুনিস্ট নেতৃত্বের লেনিনিষ্ট বিবেক। প্রথমে আন্তরিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় সহযোগীতা করে শেষে (১৯৪৬-৪৭) সর্ব্বতোভাবে বিরোধিতার আঁকাবাঁকা পথে, ছোট এবং পূর্ব্বে প্রায় অজ্ঞাত ট্রট্স্কীপন্থীরা একটু বড় হয়ে ওঠে। ১৯৪৮ সাল থেকে দল হিসাবে তাদের আর কোন অস্তিত্বই নেই, কিন্তু বুদ্ধির উস্কানিদাতা হিসাবে ট্রট্স্কীবাদের এখনও প্রাধান্য আছে।

সমাজতন্ত্রীদল থেকে আরও অনেক বেশী সংখ্যায় ছোট ছোট টুকরো দল ছিটকে বেরিয়ে আসছে। মূল দল থেকে বেরিয়ে আসবার সময় কোন টুকরোই নেহাৎ ছোট ছিল না, কিন্তু আজ আর তার অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না। কোনও বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শের পোষাক পরেনি বলে এরা রাজনীতির মেলার ভিড়ে হারিয়ে গেছে ; কখন এখানে ওখানে এদের দু'চারটে দঙ্গলের দেখা পেলে তাদেরও রাজনৈতিক অস্তিত্ব আছে বলে ভ্রম হয়। বিপ্লবী কর্ম্মসূচীর অভাবেই এদের অনেকে সমাজতন্ত্রীদল ছেড়েছিল তাই তারা কম্যুনিষ্ট জনতার সঙ্গে মিশে যাবার লোভ এড়াতে পারেনি। সমাজতন্ত্রীদল থেকে বেরিয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক আগে মার্সো পিভার্ত যে সমাজতন্ত্রী শ্রমিক ও কিষাণ

দল গড়েছিলেন, যুদ্ধের সময়ে কম্যুনিষ্টদের সর্ব্বদল দখল নীতির মধ্যে এই দলের সাধারণ সভ্যরা গিয়ে পড়েছিলেন। পরে মার্সো পিভার্ত সহ নেতারা একে একে আবার পুরানো সমাজতন্ত্রী দলে খালি হাতে ফিরে এসেছেন। ১৯৪৭ সালে সমাজতন্ত্রী দলে নূতন করে আবার ভাঙ্গনের মরশুম দেখা দেয়। গ্রীষ্মের সময় ট্রট্স্কীপন্থীদের সঙ্গে সোসালিষ্ট ইয়ুথ দলকে পার্টি থেকে বার করে দেওয়া হ'ল। প্রাক্তন সম্পাদক ডেখেজেলিসের নেতৃত্বে আর একটি দলও বিতাড়িত হল। সমাজতন্ত্রী ও কম্যুনিস্টদের সম্মিলিত ফ্রন্টে বিশ্বাসী 'সংগ্রামী সমাজতন্ত্রী' উপদলকে শীতের সময়ে দল থেকে তাড়ানো হয়, কারণ এই উপদলটি সমাজতন্ত্রী ও কম্যুনিস্টদের মিলে যাবার কথা বলছিল। বিতাড়িত হবার পরে জার্মানদের অভিজ্ঞতা স্মরণ করে, এরা নিরপেক্ষ সোসালিস্ট ইউনিটি পার্টি নাম ধারণ করে। তখন থেকে এরা কম্যুনিস্টদের সঙ্গে মিলিত হবার ক্ষেত্র তৈরী করে আসছে। কিন্তু এদের মধ্যে কিছু ট্রট্স্কিপন্থী ঢুকে পড়াতে এরা টিটোপন্থী বলে সন্দেহভাজন হয়ে পড়েছে। কম্যুনিস্টদের একেবারে পেছনের সারে 'অদলীয়' কয়েকটি দল আছে যাদের সঙ্গে উপরোক্ত 'সোসালিস্ট ইউনিটী পার্টির' বেশ সাদৃশ্য আছে, বিশেষ করে পিয়ের কঁত, কঁত দ্য সাঁক্রঁ এবং অধ্যাপক রিভেতের নেতৃত্বে চালিত রিপাব্লিকান রেজিস্টান্স ইউনিয়ন। এদের অস্তিত্ব কেবল পার্লামেন্টে এবং এরাই জোগাবে ভবিষ্যৎ ফয়েরলিঙ্গারদের যারা কম্যুনিস্টদের ক্রীড়নক হবার জন্যই সৃষ্ট।

কম্যুনিস্ট ও সমাজতন্ত্রী এই দু'টিবড় দলের পিছনে আকৃষ্ট হয়ে যে সব টুকরো টুকরো দল ঘুরছে তাদের পর্য্যায়ে বামপন্থী ক্যাথলিকদের উল্লেখ দ্বিধার সঙ্গেই করতে হয়। ক্যাথলিক সংস্থাগুলোর উৎপত্তি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে এবং তাদের অন্ততঃ একটা সুবিধে হল এই যে কম্যুনিস্টদের সঙ্গে অতীত সম্বন্ধের কোনও জটিলতা এদের মধ্যে নেই। গত একশ' বছরের বেশী ফরাসী দেশে বামপন্থী মত বলতেই বোঝায় গির্জাবিরোধী ও ধর্ম্মবিরোধী মত; অতএব সে দেশে ধর্ম্মগত বামপন্থী দলের উদ্ভবকেই একটা বৈপ্লবিক বিকাশ বলা যেতে পারে। সংখ্যায় এরা দুর্ব্বল হলেও ন্যাশনাল রিপাব্লিকান আন্দোলন এবং ক্রিশ্চিয়ান ইউনিয়নের সমাজতন্ত্রী অংশ গত বছর থেকে কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে অবিচলিত ভাবে প্রচার করে যাচ্ছে এবং বিচ্ছিন্নপ্রায় বামপন্থীদের মধ্যে এরাই বোধহয় শক্তি হিসাবে সবচেয়ে বড়। ১৯০০ সালে অবিমিশ্র রাজনৈতিক আদর্শবাদের উৎস হিসাবে স্থাপিত *Jeaune Republique*, পরলোকগত ইম্যান্যুয়েল

মনিয়ে'র *Espirit*-এর চারপাশে গড়ে ওঠা ব্যক্তিকেন্দ্রিক দলগুলো, প্রগতিবাদী ক্রিশ্চিয়ান—যাঁরা ধর্ম্ম এবং পার্থিব বস্তুর মধ্যে বেশ সুবিধাজনক ভাবে ভাগ করে, পরকাল ভগবানের হাতে সমর্পন করে, ইহকাল স্টালিনের কাছে বাঁধা রাখছে—এদের সকলেরই সম্বন্ধ বামপন্থী ক্যাথলিকদের সঙ্গে। কিন্তু এরা ক্রমেই পৃথিবীর মাটি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

মোহমুক্ত কম্যুনিস্ট, প্রাক্তন সমাজতন্ত্রী এবং বামপন্থী ক্যাথলিক—বামপন্থীদের মোটামুটি এই তিনভাগে ভাগ করলে আরও অনেক এনার্কিষ্ট দল বাদ থেকে যায়। তাদের হিসাব দিতে গেলে স্বতন্ত্র বই লিখতে হয়। যুদ্ধের সময়কার প্রতিরোধ অনেক নূতন বামপন্থীদলকে রাজনীতির মঞ্চে ঠেলে দিয়েছে। আগের কোন মতবাদের সঙ্গে তাদের কোন সম্বন্ধ নেই। সমস্ত দলের ভেতরে এরা এমন জট পাকিয়ে তুলছে যে তা আর ছাড়বার উপায় নেই। এদের জন্যেই যুদ্ধোত্তর ফরাসীদেশে বামপন্থীদের ভবিষ্যৎ ব্যক্তিগত মোড় ঘোরা এবং ক্রমাগত দল বদলানোর ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। নানাভাবে ছয় অথবা আট ডজন নাম সাজিয়ে স্বাধীন বামপন্থীদের ম্যানিফেস্টো প্রকাশিত হচ্ছে। নামগুলোর পেছনে এমন একটা ভিত্তিহীন রাজনৈতিক তাৎপর্য্য সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে তাদের ঘোরাফেরাটাকেই রাজনীতির দৃশ্য পরিবর্ত্তন বলে অনেক সময়ে আমরা ভুল করে বসি। এখানে আবার সেই আলোর চারপাশে পোকার অবিরাম গতির কথা মনে হয়।

এমনি একজনের কাহিনীর একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। এমন একজন লোকের কথা বলা হচ্ছে যার বুদ্ধি অথবা ব্যক্তিত্ব উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু কায়দা করে তাঁর সম্পাদকীয় বক্তব্য বেশ তাগ মাফিক বসিয়ে দিতে পারেন। আশ্রয়হীন বামপন্থী দলে তিনি একটি পরিচিত চরিত্র। মার্সেল কুরিয়ে প্রথম যৌবনে কম্যুনিস্ট পার্টির সভ্য ছিলেন। যুদ্ধের আগে তিনি *Quo Faire* নামে এক অখ্যাত বিরোধী বিপ্লবীদলে যোগ দেন। তারপরে সমাজতন্ত্রীদলে এবং ১৯৪৭ সালে সে দল ত্যাগ করে তিনি 'সংগ্রামী সমাজতন্ত্রী' দলে যোগ দেন। কিছু দিনের মধ্যেই আবার কম্যুনিস্টমার্কা এক প্রগতিবাদী দৈনিকের সম্পাদকীয় গোষ্ঠিতে ঢুকে পড়ে বামপন্থীদের ঐক্যের জন্যে আপ্রাণ লড়তে থাকেন। অধিকাংশ সমাজতন্ত্রী ঐক্যবাদীদের মত তাঁকেও টিটোপন্থী বলে এখন সন্দেহ করা হচ্ছে। আবার হয়ত এখান থেকে আগেকার চক্র পুনরাবর্ত্তিত হতে থাকবে।

এদের বিশেষত্বই এখানে যে এত সব পরিবর্ত্তনেও এদের দৃষ্টিভঙ্গী বদলায় না। এইসব সম্পাদকীয় রচয়িতার রচনায় কোথাও এমন কিছু নেই যা দেখে মনে হতে পারে যে তাদের ধ্বনি কোন নূতন সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। এ তারা জানে। কম্যুনিস্ট, অসন্তুষ্ট কম্যুনিস্ট, সমাজতন্ত্রী আবার ফিরে কম্যুনিস্ট প্ল্যাটফর্মে এসেও মার্সেল কুরিয়ে ঘুরে ফিরে সেই বামপন্থীদের চিরন্তন বুলি আউড়েছেন —১৭৮৯ এবং ১৮৪৮ সালের নীতি যথা জনগণ ও উৎপীড়ক, বিপ্লব ও মানুষের অধিকার, স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী, সমাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্র। এক কথায় আসল কথা বলবার তাগিদ তিনি কোনদিন অনুভব করেন নি। তাঁর রচনাভঙ্গীর বিশেষত্ব এই যে প্রত্যেক বামপন্থী কোনরকম বুদ্ধিখরচ না করেই তা বুঝতে পারে। এটা অন্যকে একেবারে চুপ করিয়ে দেবার বিপ্লবী কায়দা বলা যেতে পারে।

কিছুদিন আগেও *Combat* বামপন্থী বুদ্ধিজীবিদের মুখপত্র ছিল। এই পত্রিকার কথাই ধরা যাক। কাগজখানার আর এক নাম 'প্রতিরোধ থেকে বিপ্লব'। ১৯৪৪ সালের আগষ্ট মাসের প্রথম প্রকাশ্য সংখ্যায় এই ভাবধারা পরিষ্কার করে নেবার চেষ্টা হয়েছে ঃ

"In the days to come we shall define the word revolution by our articles and our acts. But for the moment our sense of energy and honour, our resolution, will be satisfied if we break with the spirit of mediocrity, with the power of money, and with a state of society in which the ruling class has betrayed all its duties and revealed a lack both of intelligence and of heart. Our endeavour is to realize without delay a true people's and workers' democracy."

'আগামী দিনগুলোতে' নানা আঁকাবাঁকাভাবে *Combat* বিপ্লবের সংজ্ঞা দিতে শুরু করল। কেম্যু এবং মালরো সোসালিস্ট হিউম্যানিজম থেকে শুরু করে প্রতিরোধোত্তর দিনের স্রোতে গা ভাসালো রেমন্ত আরোঁ এবং আলবার্ট অলিভেয়ারের সঙ্গে। এঁদের একজন হয়েছেন দ্য গলের জাতীয় সভার সভ্য আর একজন গলের পার্টির মুখপত্রের সম্পাদক। ১৯৪৭ সালে *Combat* সরকারী সমাজতন্ত্রীদলের চড়ায় কিছুদিনের জন্য আটকে গিয়েছিল। মঁসিয়ে স্মাজা নামক এক টিউনিসীয় ব্যবসাদারের পয়সায় এবং ক্লদ বোরদেৎ-এর সম্পাদনায় এবং আঁরি ফ্রেণের 'অক্টোবর' নামক পত্রিকার সহযোগিতায় কাগজ

আবার চলল। বোরদেৎ ১৯৪৭ সালে *Socialisme et Liberte* দলের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নতুন কলেবরে *Combat* কম্যুনিজমের প্রতি প্রণয় নিবেদন করতে লাগল যদিও সে তরফ থেকে বিশেষ কোন সাড়া মিলল না। ইতিমধ্যে স্মাজার পেট ভরে গেল এবং ফ্রেণেও করলেন বিশ্বাসঘাতকতা। তবু বেঁচে থাকবার জন্য এবং কল্পিত পাঠকদের চাহিদা মেটাবার জন্য বামপন্থা ছাড়া চলল না। সত্যিকারের অ-কম্যুনিস্ট বামপন্থীদের সন্ধানে বেরিয়ে স্মাজা স্যুরিয়েলিস্টদের সন্ধান পেলেন। তারা *Combat*কে *St Germain-des-Press* এবং ল্যাটিন কোয়ার্টারের মুখপত্র হিসাবে বেশ কৌতূহলোদ্দীপক পত্রিকায় পরিণত করে ফেললেন, রাজনীতির দিক থেকে এখন আর তার কোন তাৎপর্য্য নেই।

আরও সমস্যার ব্যাপার, যদিও অনেক তুরীয় স্তরের, *Espirit* আর *Les Temps Modernes* দু'টি বুদ্ধিপ্রধান পত্রিকা। এরা ব্যক্তিত্ববাদ এবং অস্তিত্ববাদ নামক নিজ নিজ জীবনবেদের উপর আবর্ত্তিত হচ্ছে। দু'টো পত্রিকাই কয়েক বৎসর ধরে অবস্থা ঘোলাটে করে তুলেছে।

কিছুদিন আগেও *Espirit*এর মত ছিল যে 'পৃথিবী কম্যুনিজমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে' কাজেই কম্যুনিজমের বিরোধিতা আত্মার বিরুদ্ধে পাপ করা এবং সেইজন্য একমাত্র পথ হচ্ছে কম্যুনিস্টদের সঙ্গে থেকেও কম্যুনিজমের উর্দ্ধে ওঠা। সম্প্রতি এরা যেন ক্রেমলিন্-ওয়াল ষ্ট্রীট দ্বন্দ্বের একটা সমন্বয় করে ফেলেছে। স্টালিনের খপ্পর থেকে টিটোর মুক্তিতে এই শ্রেণীর লোকেরা পৃথিবীর সর্ব্বত্র স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ পেয়েছে। অবশ্য যে কাগজ আত্মা নিয়ে কারবার করে তাদের পক্ষে এটা যেন কেমন কেমন ঠেকে।

জ্যাঁ-পল সাত্র্ঁর এবং মরিস মার্লো-পঁতি বহু বৎসর কম্যুনিস্ট লেখকদের সঙ্গে ঝগড়া করবার পরে *Les Temps Moderns*'এর-পৃষ্ঠায় মার্ক্সবাদ আবিষ্কার করেছেন। তার ফলে মার্ক্সবাদের যে খুব উন্নতি হয়েছে তা নয়। সমাজনৈতিক আলোচনা থেকে এঁরা এক নূতন মত সৃষ্টি করেছেন। মার্ক্সবাদ বলে যে ইতিহাসের গতি সমগ্র পৃথিবীতে বিপ্লব দ্বারা সর্ব্বহারাদের একটি মাত্র শ্রেণীহীন সমাজে পরিণত করবার দিকে চলেছে এবং আরো বলে যে মানবতার আদর্শ লাভ করবার এই আন্দোলনকে সফল করতে হবে—তা না হলে ইতিহাসের সংজ্ঞাই মিথ্যা।

"Whether the slaves, in expropriating the masters, are

transcending the alternative of slavery or domination, is another question. But if this development did not occur, it would not mean that the Marxist philosophy of History would have to be replaced by another: it would mean that there is no History. . . .Outside of Marxism there is nothing but the violence of the one group and the submission of the other. . . . . .(Merleau-Ponty, *Essai sur le communisme*.)

অস্তিত্ববাদ কি ভাবে ইতিহাসের এই দর্শন গ্রহণ করলো তা উদ্ভাসিত অলৌকিক আলো ছাড়া বোঝা যায় না। মার্কস যা বলেছেন তার উল্টোটাই তাঁরা শিখেছেন—যথা লোকে যা করে তা না দেখে, যা বলে তাই দেখ। তাঁদের মতে পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্র এবং সমাজই অসম্পূর্ণ এবং অসমাপ্ত। রাশিয়ানরা কোথাও স্বাধীন নির্ব্বাচন হতে দেয় নি; কিন্তু গ্রীক নির্ব্বাচনটা কি? মার্লো-পঁতির কাছে কমবেশীর পার্থক্য নিরর্থক। মানুষের সাধ্য এমন খানিকটা স্বাধীনতা, সমৃদ্ধি এবং মানুষের মাহাত্ম্য লাভ করা—এসব তাঁদের কাছে কিছুই সমর্থন যোগ্য নয়; তাঁরা সমর্থন করবেন রাষ্ট্রের সরকারী মতবাদ যা মার্ক্সের ভবিষ্যৎবাণী সমর্থন করে, কার্য্যত তারা তার উল্টোটা করলেও। বাস্তব তাদের বিবেচনার বিষয়ই নয় কারণ বাস্তব সর্ব্বত্রই জঘন্য। দেখতে হবে সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি, হোক না তা কেবলই ভাঁওতা।

এই ভাবে চিন্তা করলে সোভিয়েট ইউনিয়নের আছে মহান প্রতিশ্রুতি আর ইউনাইটেড স্টেট্‌স আদর্শের কাছাকাছি পৌঁছবার চেষ্টা মাত্র। মার্শাল প্ল্যানকে নতুন মানবতার প্রতিশ্রুতির চাইতে বড় বলা যায় কি করে?—হয়ত এই নতুন মানবতা শবের পাহাড়ের উপর গড়ে উঠবে, তবুও নয়। বিরাট মার্শাল প্ল্যানকে মার্ক্সীয় দৃষ্টিতে আমেরিকার মূলধনের একটি বহির্গমনের পথ হিসাবে দেখলে একথা আরও সত্য বলে মনে হবে। ফরাসী বামপন্থীরা রাজনৈতিক বিষয়ের মূল্য যাচাই করতে গিয়ে বাস্তব ইতিহাস সম্বন্ধে অবিশ্বাস্য রকম অজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে থাকে। যেদিন থেকে ফরাসীদের আদর্শ আর সমগ্র পৃথিবীর আদর্শ হিসাবে গ্রাহ্য হচ্ছে না সেদিন থেকে এই অজ্ঞতা বুঝতে পারা যায়, আর তখন থেকেই ফরাসীরা ভয়ানক ভাবে প্রাদেশিক মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়েছে। সোভিয়েট প্রীতিও এই chauvinisn এর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় না। ফরাসীরা রুশ বিপ্লবের প্রকৃতিই বুঝতে পারে নি। তারা মনে করে রুশ বিপ্লব প্রতিকূল

২

পরিবেশে রবসপিয়েরের জয়লাভের মত একটা ব্যাপার, যাতে ফরাসী বিপ্লবের বাণীই জয়লাভ করেছে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন বাদে আমেরিকা ফরাসীদের কাছে এক অদ্ভুত দেশ—যাকে জ্ঞাত কোন নীতি দিয়ে বোঝানো যায় না। একথা ইংল্যাণ্ডের বেলাতেও সত্য। আমেরিকার চরম সংজ্ঞা হল ধনতন্ত্র। আমেরিকা সম্বন্ধে অজ্ঞতা বিরোধিতায় পরিণত হয়েছে তার কারণ ফ্রান্সের প্রাচীনপন্থী অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর ওপরে নতুন কারিগরি ও সামাজিক পরিবর্ত্তনের চাপকে লোকে ফ্রান্সের ওপরে আমেরিকার চাপ বলেই মনে করছে।

এই মত কার্য্যে পরিণত হওয়াতে *Les Temps Moderns* এর সম্পাদক-গোষ্ঠি থেকে ডেভিড্ রুশেকে বিতাড়িত করা হয়েছে এবং সাত্র্র এবং পঁতি প্রকাশ্যে তাঁর নিন্দা করেছেন। এঁরা বলেন যে একথা সত্যি যে রুশ দেশের প্রায় এক দশমাংশ লোক সংশোধন শিবিরে খেটে খেটে মরতে বসেছে; তাঁরা এ-ও বলেছেন যে সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পর্কে সমাজতন্ত্রের কথা আমরা কোন ভিত্তিতে বলব? কিন্তু তবুও রুশে সংশোধন শিবিরগুলোর বিরুদ্ধে লিখতেন বলে তাঁকে 'শত্রুদলভুক্ত' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। "Assuredly we see the illusions of the present-day Communists. But these very illusions forbid us to equate Communism and Fascism......It is true that these ideas have a disloyal champion in Communism as it is today, and that they serve the present Communists more as eyewash than as an inspiration......[But] we have the same values as a Communist......He has values in spite of himself. We may think that he desecrates them by embodying them in present-day Communism. Nevertheless, they are our values, whereas we have nothing whatever in common with the many opponents of Communism."

"The farther we travel geographically and politically from the Soviet Union, the more we find Communists who are human beings just like us...."

অত্যন্ত সত্য এই চিন্তানায়কেরা গত কয়েক বৎসরে সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে দূরে সরে এসেছেন, আজ সাত্র্র এবং মার্লো-পঁতি সোভিয়েট পদ্ধতির কয়েকটি ত্রুটি মানেন। তিন চার বছর আগে যা তিনি গোয়েবল্সের প্রপাগাণ্ডা

বলে মনে করতেন। যদিও তাঁরা বাস্তব মানেন না, মানেন সংজ্ঞা, তবু এমন কয়েকটি বাস্তব সত্য স্বীকার করেছেন যা সংজ্ঞার পরিপন্থী। এই সত্যগুলো তাঁদের মনে হয়ত আজ সংজ্ঞার তুলনায় ভারী হয়ে উঠেছে—যে সংজ্ঞাগুলো তাঁরা বুদ্ধি গ্রাহ্যবিষয়ের চাইতে বড় বলে মনে করেন। এমন দিনও আসতে পারে যখন তাঁরা চিন্তায় আরও অনেক দূর এগিয়ে যাবেন—অবশ্য ততদিন যদি ইতিহাস তাঁদের সে সুযোগ দেয়।

হঠাৎ কখনো এই সমস্ত বামপন্থীরা একত্র হয়ে একটি বড় আন্দোলনের অংশীভূত হয়েছেন। এ রকম ব্যাপার প্রথম ঘটে মুক্তি আন্দোলনের সময়। জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সমগ্র অ-কম্যুনিস্ট প্রতিরোধ দলগুলোকে এক সুদূর প্রসারী সামাজিক এবং রাজনৈতিক কর্ম্মপন্থার সূত্রে গ্রথিত করে। তিনলক্ষ সভ্য এবং অসংখ্য প্রচারপত্রের জোরে জা,মু,আ, ফরাসী রাজনীতিতে এক বিরাট শক্তি হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। 'এই সংহত শক্তি বজায় রাখতে হলে আমাদের কম্যুনিস্টদের মত একটি আশ্রয় নিতে হবে। অর্থাৎ আমাদের আন্দোলনে কম্যুনিস্টদের মত কঠোর নিয়মানুবর্ত্তীতা, বীরত্ব এবং দৃঢ়তা আনতে হবে।' ১৯৪৫ সালে জা,মু,আ-র যে সভায় কম্যুনিস্টদের সঙ্গে মিশে যাবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয় সেখানে আঁদ্রে মালরো এই কথাগুলো বলেছিলেন। এই নিয়মানুবর্ত্তীতা ও কঠোরতা আনবার ভার নিয়ে তিনি নিজে দ্য গলের দলে যোগ দেন। আর অন্যেরা কম্যুনিস্টদের সঙ্গে যোগ দেয়। অবশিষ্টাংশ সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে গিয়ে দেখল তাদের জন্য দরজা বন্ধ। অনড় পার্টিযন্ত্র পুরানো কমরেডদের দখলে, পুরানো আওয়াজ দিয়েই তারা চলছে; তারা নতুন লোক বা নতুন ভাব আমদানী করতে চায় না। 'ইউনিয়ন অফ সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক রেজিস্টান্সে'র নাম নিয়ে আজ এদের এক অংশের কাজ পার্লামেণ্টের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মালরোর পেছনে পেছনে যারা গলের দলে জুটেছিলেন তাদের কেউ কেউ এর মধ্যে আছেন। আর আছেন যাঁরা 'তৃতীয় শক্তি' সৃষ্টির কোয়ালিশনকে সমর্থন করেন তাঁরা। সমগ্রভাবে দেখতে গেলে এইদল 'র্যাডিক্যাল সোস্যালিস্ট পার্টি'র ছোট অংশীদার। 'র্যাডিক্যাল সোস্যালিস্টদে'র মধ্যেও আবার গলের দল এবং সরকারের সমর্থক দুটো ভাগ আছে।

১৯৪৭ সালের শীতকালে কমিন্‌ফর্ম'এর সৃষ্টি হয় এবং 'ঠাণ্ডা যুদ্ধ' ফরাসী

দেশে চালান দেওয়া হয়। কম্যুনিজম এবং গণতন্ত্রের প্রতি কিরূপ মনোভাব অবলম্বন করতে হবে বামপন্থীদের তা আবার ভেবে দেখবার সময় এল। এই সময় লিওঁ ব্লুম 'তৃতীয় শক্তি' মতবাদ উত্থাপিত করেন। এই মতের রাজনৈতিক কূটচাল এখানে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। 'তৃতীয় শক্তি'র আবেদন লোকের মনে তখন যে সাড়া জাগিয়েছিল তা এখনও আছে। চেকোশ্লোভাকিয়ায় গণতন্ত্রের পতনের কয়েক মাস পরে *Democratic Revolutionary* দলের ম্যানিফেস্টোতে এই মতবাদ উত্থাপিত হয়েছিল—এটা চরমপন্থীদের একটা নূতন মধ্যপন্থা উদ্ভাবন ছাড়া আর কিছু নয়। "Millions of us in France, Europe, and the whole world, are seeking the same road.... a road between the putrefaction of capitalist democracy, the weakness and faults of a certain brand of Social Democracy, and the Stalinist form of Communism. We believe that a union of free men in revolutionary democracy can give new life to the principles of freedom and human dignity, by combining them with the struggle for social revolution......Workers and freemen of all lands, unite!"

Franc-Tirear নামে বহুল প্রচারিত পত্রিকার মারফতে এই আন্দোলন চালু হয়। এক সময়ে কম্যুনিস্টদের সঙ্গে এই পত্রিকার খুবই দহরম-মহরম ছিল। শ্রমিকেরা একে *L'humanite*'র বিদগ্ধ ক্রোড়পৃষ্ঠা বলে মনে করত। ফলে যেন একটা বিপ্লব হয়ে গেল। ডেভিড রুশে, জ্যঁা-পল সাত্র্‌র এমন কি আঁদ্রে ব্রেটনের মত স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় ব্যক্তিরা পর্য্যন্ত এই আবেদন সমর্থন করতে লাগলেন। *Combat, Espirit, Les Temps Modernes* প্রভৃতি পত্রিকারও সমর্থন জানাল। সমাজতন্ত্রীদলের বামপন্থীরা, ট্রট্‌স্কীপন্থীদের অধিকাংশ, ডেখেজেলিস'এর *Socialist Youth, Jeune Republique* এবং আরও অনেক ছোট ছোট দল যোগ দিল, মনে হ'ল যেন আশ্রয়হীন বামপন্থীরা একটা নতুন আশ্রয় পেল। কয়েকটি বিদগ্ধ ম্যানিফেস্টো আন্তর্জাতিক কৌতূহল জাগিয়ে তুলল। নবীনের দল যারা মনে করতো ফরাসী রাজনীতিতে তাদের স্থান নেই তারাও ফ্রান্সের সর্বত্র মিটিং এবং আলোচনায় যোগ দিতে লাগল। গ্যারি ডেভিসের মত 'বিশ্বনাগরিক'কে ঘিরে শান্তিবাদী মত গড়ে উঠতে লাগল। কম্যুনিস্টরা ট্রেড ইউনিয়নে যে কঠিন অবস্থার সৃষ্টি করেছিল সেটা একটা কর্ম্মের ক্ষেত্র হিসাবে গৃহীত হল। লিঁও, প্যারি এবং অন্যান্য সহরে 'বিপ্লবী গণতন্ত্রী'রা

বিমুখ ট্রেড ইউনিয়ন থেকে 'অ্যাকসন' কমিটি গঠন করল। নিয়মভঙ্গকারীরা কম্যুনিস্টদের দ্বারা বিতাড়িত হ'বার পরে এই অ্যাক্‌সন কমিটির আর অস্তিত্ব রইল না।

১৯৪৮ সালের শীত ও বসন্তকালে এই আন্দোলন চরমে ওঠে। তারপরে এল গ্রীষ্মকাল, ফরাসী দেশের রাজনৈতিক ভাঁটার সময়। সভ্যেরা এবং দরদীরা ছুটির শেষে ফিরে এসে দেখল মৃত্যুর কোনও সংবাদ না দিয়েই আন্দোলনের মৃত্যু হয়েছে। জাঁ-পল সার্ত্রের নয়া মার্ক্‌সবাদ আবিষ্কার করেছিলেন, তাঁর সঙ্গে হ'ল ডেভিড রুশের ঝগড়া; *Combat* হ'য়ে গেল যারা গোঁড়া কম্যুনিস্ট নয় তাদের মুখপত্র; গ্যারি ডেভিস ধ্যানস্থ হলেন। সংক্ষেপে বলা যায় যে আর কিছুই রইল না, সাবানের রঙীন বুদ্বুদ মিলিয়ে গেল। আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে দুটো জিনিস দেওয়া, কম্যুনিস্টদের চাইতে অধিকতর বিপ্লবী আওয়াজ এবং আরও গণতান্ত্রিক পন্থা—দুইই ম্যাজিকের চাইতে বেশীক্ষণ স্থায়ী হ'ল না।

কিন্তু এই আন্দোলনের সবটাই যে ব্যর্থ হয়ে গেল তা বলা যায় না। বামপন্থী দল উপদলের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল তা এই আন্দোলনের ফলে অনেকটা দূর হয়েছিল। বাধা দূর করে পরস্পরের মধ্যে একটা সংযোগ স্থাপিত করেছিল। এর আগে সমাজতন্ত্রী, ট্রট্‌স্কীপন্থী, ক্রিশ্চিয়ান সমাজতন্ত্রী প্রভৃতি পরস্পর পরস্পরকে শত্রু মনে করত। কিন্তু এই আন্দোলন নিঃশেষ হয়ে যাবার পরেও তাদের যোগাযোগ থেকে গেল। অল্প বয়স্ক যারা এই প্রথম বাস্তব রাজনীতিতে পদক্ষেপ করেছিল তারা বুঝতে পারল বাস্তবকে আয়ত্ত করা কত শক্ত, কেবল আদর্শ দিয়ে রাজনৈতিক দল তৈরী হয় না, প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেরই চলবার শক্তি কত কম! এরা আরও শিখল রাজনৈতিক দায়িত্বের কথা—যা 'তৃতীয় শক্তি'র উদ্ভাবক দলেরও নাই। এই আন্দোলনের ফলে নূতন গণতান্ত্রিক দলগুলোর একটা শিক্ষা হল। বর্ত্তমানের রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যে যারা এখন নীচের তলায় আছে, যাদের কোনও নাম নেই, যারা জানে না কোন মঞ্চ থেকে বক্তৃতা দেবে, আশা তারাই। ফরাসী দেশের বদ্ধ রাজনীতির তলায় অন্যান্য স্পন্দনের মত এরাও কেবল সম্ভাবনা মাত্র, শক্তি নয়। উপরে কিন্তু কোনই পরিবর্ত্তন হয়নি। অনুসন্ধিৎসু যুবক এবং বহু শ্রমিক ক্রমশঃ বুঝতে পারছে যে কম্যুনিস্টরা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাদের ব্যবহার করতে চায়, তারা বর্ত্তমান বামপন্থী নেতৃত্বের কাছ থেকে পথের

সন্ধান পাবে না। দক্ষিণপন্থীদের মত না হলেও, বামপন্থীরাও দেউলে হয়ে গেছে।

বামপন্থা কি? আমরা যে এই আখ্যা দিই বোধ করি তার মধ্যেই ত্রুটি আছে। বাম বলতে আমরা বুঝি একটা দিক। কিন্তু বামপন্থা বলতে বুঝি অবস্থা। এই প্রাচীন দেশে সমাজের কাঠামো একেবারে জমে গেছে, কাজেই 'বাম' বলতে এখানে ভবিষ্যতের আভাস পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় একটা ঐতিহ্যের সন্ধান অর্থাৎ অতীত। বোধ হয় সমগ্র ফরাসী দেশকেই 'বাম' আখ্যা দিলে ভুল হয় না। ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব যুগের সমর্থক সামান্য কয়েকজনকে—যারা মনে করে গত দেড়'শ বছরের ফরাসী দেশের ইতিহাসে একের পর একটি ভুল করা হয়েছে, তারা অবশ্য ভাল ভাল যুক্তি দিয়ে তা দেখাবে—বাদ দিলে ফরাসী দেশে এমন বিশেষ কেউ নেই যে নিজেকে দক্ষিণপন্থী বলে মনে করে। চরম দক্ষিণপন্থীরা স্বীকার করে যে তাদের পথ নরম। সত্যিকার রক্ষণশীল দল যারা দেশের প্রত্যেকটি কীটদষ্ট ঐতিহ্য সযত্নে রক্ষা করতে চায় তারাও নিজেদের বলে *Radical Socialist Party.*

১৭৮৯ সালের বিপ্লবের ঐতিহ্য যারা মানে তারাই হল বামপন্থী, ফরাসী গণতন্ত্রই বামপন্থা—যা রক্ষাকল্পে দেশের খাঁটি বুর্জোয়াও জানে কি ভাবে একত্র হতে হয়; 'বাম' হল এই বুর্জোয়া শ্রেণী—যারা বিপ্লব, ডিক্টেটরী সাম্রাজ্য এবং অন্যান্য ঝড়ঝাপটার ভেতর দিয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বের পরিধি বিস্তার করে অর্থনৈতিক একচেটে স্বার্থ 'প্রতিক্রিয়াশীল'দের কাছ থেকে রক্ষা করে এসেছে; কৃষকেরাও বামপন্থী, তারা তাদের বিপ্লবী পূর্বপুরুষ কর্তৃক অধিকৃত জমি আঁকড়ে ধরে আছে, সামন্ত প্রভু এবং গির্জার হাত থেকে তা বাঁচিয়ে রেখেছে এবং যে সব গ্রামে কোন অভাব অভিযোগ নাই সেখানে তারা একজোট হয়ে বামপন্থীদের পক্ষে ভোট দিয়েছে; প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকেরা বামপন্থী, ফরাসী রাজনীতিতে এদের প্রাধান্য আছে কারণ এরাই বামপন্থার ঐতিহ্য যুগে যুগে বহন করে আসছে; আরও বামপন্থী হচ্ছে তারা যারা বিপ্লবের ফলে বিপ্লব করবার উৎসাহ ছাড়া আর কিছুই পায় নি। 'আমরা হচ্ছি ১৭৮৯-এর সন্ততি, ১৪ই জুলাই আমাদের ছুটির দিন, আমাদের জাতীয় সঙ্গীত হচ্ছে মার্সেই'—একথা বলেছিলেন তৃতীয় রিপাবলিকের প্রথম অর্থমন্ত্রী লিওঁৎসে, সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেনের পরে নির্বাচনী বক্তৃতার এটা ছিল তাঁর প্রথম কথা। এমন কি বোনাপার্টিজম্‌ও বামপন্থী কারণ নেপলিয়ন ত বিপ্লবেরই

উত্তরাধিকারী। ছ গলের অনুগামীদের উদ্দীপনার উৎসও কম্যুনিস্টদের উৎস থেকে ভিন্ন নয়।

ক্লেমেঁসু বলেছিলেন 'বিপ্লব একটা সমগ্র খণ্ড'। সেপ্টেম্বর বিচার, বিপ্লবী আদালত, গিলোটিন বিভীষিকা সবই 'মানুষের অধিকারে'র মত জাতীয় ঐতিহ্যের অংশ। আজ আমরা দেখলাম বুদাপেস্টে রায়কের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করতে গিয়ে বৃদ্ধ যুক্তিবাদী জুলিয়ান বেণ্ডা জ্যাকস ডুক্লোঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। বিচারের সময় তিনি হাঙ্গারীর সরকারী অতিথি হিসাবে পুৎস্তা সহরে ছিলেন। ক্ষীণ স্বরে তিনি যা বলেছেন তা থেকে এই বিচারের প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁর মতামত স্পষ্ট করে বোঝা যায় না। যখন তিনি বললেন যে, যৌবনে ড্রেফুসের মামলায় তিনি ন্যায়ের পক্ষে লড়েছিলেন তখন উপস্থিত দর্শকেরা বোধ হয় একটু অস্বস্তিই অনুভব করেছিল। যদিও কি নিয়ে বিচার সে সম্বন্ধে তাঁর কিছুই ধারণা ছিল না তবুও তিনি এই বলে প্রাচীন জ্যাকবিন সত্য প্রকাশ করেন যে 'আত্মরক্ষার জন্য ভীতি উৎপাদন করা গণতন্ত্রের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত'। দীর্ঘদিন এই মতবাদ পোষণ করবার ফলে তিনি হয়ত মনে করেন যে ভীতি সৃষ্টি করাই খাঁটি সংগ্রামী গণতন্ত্রের প্রকৃত রূপ। একটি বিপ্লবী-ফর্মুলা অলঙ্কার শাস্ত্রের অক্ষম প্রয়োগে আবার কেমন ভাবে নতুন জীবন লাভ করে এটা তারই একটা নমুনা।

অষ্টাদশ শতকের যে দিনগুলো সমগ্র পৃথিবীকে কাঁপিয়ে তুলেছিল ফরাসী সমাজতন্ত্রীরা তা কখনই বিশ্লেষণ করে দেখে নি। একে তারা ব্যবহার করেছে ফরাসী শ্রোতাকে আবেগে এবং উৎসাহে উদ্দীপ্ত করে তুলবার অস্ত্র হিসাবে— বাস্তবক্ষেত্রে অথবা দেশের জন্য যার কোনই প্রয়োজন নাই। এটা বিশেষ প্রণিধান যোগ্য যে ফরাসী দেশে গণতন্ত্র কথাটা প্রজাতন্ত্র কথার মত কোন দিনই জনপ্রিয় হয় নি। জ্যাকবিন ঐতিহ্য গণতান্ত্রিক নয়, উদারনৈতিক ত নয়ই। ফরাসী গণতান্ত্রিকেরা প্রতিপক্ষ সম্বন্ধে ন্যূনতম শ্রদ্ধাও পোষণ করে না। আলোচনায় নিরপেক্ষতার ভাবও বজায় রাখতে পারে না যা ইংলণ্ডে দেখতে পাই। পরিবর্তে তাদের আছে সন্দেহ।

বিপ্লবী আন্দোলনকে বোতলে পুরে লেবেল লাগানো হয়েছে। বামপন্থী, নরমপন্থী বাম, চরম বামপন্থী প্রভৃতি যে শ্রেণী বিভাগ তা পার্লামেণ্টে বসবার ব্যবস্থাতেই থাকে যায়। তা ছাড়া এর আর কোন মূল্যই নেই। ইংলণ্ডে

মেজরিটি ও বিরোধীদল পাশাপাশি বসে না, বসে মুখোমুখী, সেখানে কন্টিনেন্টের আমদানী শ্রেণীবিভাগ এখনও খাপ খায় না। আজও ইংলণ্ডে কোনও দল কোনও ব্যবস্থার অথবা দলের ডাইনে অথবা বাঁয়ে দাঁড়ায় না। সে হয় পক্ষে না হয় বিপক্ষে। সংক্ষেপে বলা যায় যে ফরাসী বামপন্থীদের নানা রকম পোষাকের মেলা পার্লামেণ্টারি রীতির একটা ছবি ছাড়া কিছু নয়।

একটা নতুন ব্যাপারে এই হিসাবও ভুল হয়ে পড়েছে। চরম বামপন্থীরা ফরাসী পার্লামেন্টের এক তৃতীয়াংশ জুড়ে বসে আছে। কিন্তু এদের পার্লামেণ্টারি দল বলা যায় না এমন কি বামপন্থীও তারা নয়। এরা হচ্ছে বিদেশী একটি রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্ররূপের প্রতিনিধি। যদিও তারা চরম বামপন্থী আখ্যা নিয়ে লোকের মনের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে তা পরিত্যাগ করে নি, তবু তারা এই আখ্যা বিশেষ আমল দেয় না। বহুদিন আগেই থোরেজ ঘোষণা করেছেন 'বাম ও দক্ষিণপন্থীর ধারণা আজ অচল। সোভিয়েট রাশিয়া বামে নয় পূর্ব্বে। শ্রমিকেরা বামপন্থী নয়, তাদের আছে দাবী যা মেটানো যেতে পারে, যাদের সঙ্গে লড়াই হতে পারে যারা নিন্দিত বা শোষিত হতে পারে।' কম্যুনিস্টরা বামপন্থীর খেলা দেখাতে চায় না, খেলতে নামলে ওরা তাসে চিহ্ন করে নিয়ে খেলে। ফলে খেলাটাই অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ফরাসী রিপাবলিকের অবিরাম বাম দিককার গতি ছিল একটা অন্তহীন চেইনের মত, একটা নির্দ্দিষ্ট বিন্দুর চারিদিকে সেটা চলে বলে গতির একটা আভাস আসে ; নতুন নতুন বামপন্থী গভর্ণমেন্টে যোগ দিচ্ছে, ক্ষমতালাভের পরে তারাই আবার গোঁড়া রক্ষণশীলে পরিণত হচ্ছে। ফলে আবার নতুন বামপন্থী সৃষ্টি হয়ে তাদের বিরোধীতা করছে—এইভাবে চলছে অন্তহীন আবর্ত্তন। কিন্তু বর্ত্তমানে এই চেইনের গতি আটকে গেছে। কম্যুনিস্ট পার্টি এগোয় না, তাদের বিরুদ্ধে কোন বামপন্থী বিরোধীদল সৃষ্টি হয় না। ইতিমধ্যে ক্ষমতারূঢ় বামপন্থী ক্ষমতার ভারেই ভেঙ্গে যায়, এবং সমস্ত ব্যবস্থা এলোমেলো হয়ে পড়ে। বিপ্লবী গণতান্ত্রিক বামপন্থীর ঝাঁক জ্যাকবিন ঐতিহ্য অনুযায়ী আবার বামপন্থী বিরোধী দল গঠনের চেষ্টা করে। গণতন্ত্র এবং জ্যাকবিন ঐতিহ্য এ দুটোকে মেলাতে হলে ভাবালুতার প্রয়োজন। কিন্তু আজ যেখানে কম্যুনিস্ট পার্টিযন্ত্র রয়েছে এবং এলবের ওপারে আছে রেড আর্মি, সেখানে এই ভাবালুতা দিয়েও দুইয়ের মিল হতে পারে না।

বামপন্থীদের কাছে আজ একমাত্র পথ হচ্ছে বিপ্লবী ভাবালুতা পরিত্যাগ

করা। এ বড় কঠিন কাজ। প্রতিদিনকার সাধারণ কর্মপন্থা সম্বন্ধে ফরাসীদের দীর্ঘদিনের সন্দেহ। কার্য্যত যা লাভ করা সম্ভব নয় উচ্চ-ফাঁকা আদর্শনিষ্ঠা ঠিক তারই বিপরীত পথ। বিপ্লব সম্বন্ধে সাড়ম্বর ঘোষণা এবং বাস্তবগ্রাহ্য—বিশেষ করে যা সত্যিই পাওয়া গেছে তার প্রতি অবজ্ঞা এখানে একই সঙ্গে দেখা যায়, কারণ তুলনায় আদর্শের সঙ্গে বাস্তব কখনই সার্থক মনে হতে পারে না। এই মনোভাব থেকে কোন কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বন করা যায় না, এবং তা না করতে পারলে গণতন্ত্রও সম্ভব হতে পারে না। রুশেকে বহিষ্কৃত করবার সময় সার্ত্র তাঁকে আমাদের 'আমেরিকান বন্ধু' বলে আক্রমণ করেছিলেন।

"The phenomena of exploitation all over the world represent for them only scattered problems, which can be examined and solved one after another. They no longer have any political idea."

যে রাজনৈতিক ধারণা এক আঘাতে সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে না তা বামপন্থী চিন্তানায়কের কাছে অগ্রাহ্য। যে ধারণার পেছনে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সমগ্রতার দৃষ্টি নেই তাকে সামগ্রিক আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। এবং সেটা 'ধারণা'ই নয়।

এই উক্তিতে সার্ত্র ফরাসী বামপন্থীদের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। বিচ্ছিন্নভাবে সংস্কার বা উন্নতির কোন আকর্ষণ তাদের নাই। এর ফলেই ফরাসী দেশে ছাপমারা পুঁজিপতিসঙ্ঘ গড়ে উঠেছে—যেখানে মূল্য ও মুনাফা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত, যেখানে শ্রমিকের মজুরী কম, উৎপাদন কম, ব্যবহার কম—এক কথায় আবদ্ধতা যেখানে পূর্ব-পরিকল্পিত। আবদ্ধতার অর্থনীতিকে সমাজতন্ত্র অথবা পুঁজিবাদ উভয়েরই ব্যঙ্গ বলা যেতে পারে। এ অর্থনীতিতে ডান অথবা বাম পথের সমস্যা থাকতে পারে না। পরিকল্পিত উপায়ে টাকা খাঁটিয়ে অথবা প্রতিযোগীতা মেনে নিয়ে সংরক্ষণ দূর করে, ইয়োরোপীয় অর্থনৈতিক চুক্তি করে কারিগরি শিক্ষায় আধুনিকতার প্রবর্ত্তনায়, জনসংখ্যার বৃদ্ধিতে—ব্যক্তিগত অথবা রাষ্ট্রীক চেষ্টায় যে ভাবেই হোক না কেন—এর কোন একটি দ্বারা সমাজের অনড়তা দূর করতে পারলেই বলতে হবে যে একটি বিপ্লবের সূচনা হল। এই সম্পদশালী দেশের আত্মরতি থেকে মুক্তি ছাড়া নতুন প্রসারের পথে আর কিছুরই বাধা নাই। এদিকে গতি দেখা দিয়েছে। যদি সময় থাকে তা হলে প্রগতিশীল চিন্তানায়কেরা প্রগতির সন্ধান পাবেন অনুসরণকারী হিসাবে, নেতা হিসাবে নয়।

কবিতা

বিস্মরণে

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

একদিন সব ভুলে যাই।
কিছুই থাকেনা আর তোমার আমার
কোনো কথা, কোনো মন, সময়, আকাশ,
শিহরিত সিঁড়ি দিয়ে হৃদয়ের পাতালে নামার
কোনো চিহ্ন, ইতিহাস—
কিছুই না।
মনে ত পড়েনা আর তুমি ছিলে কিনা
তুমি, কোনো মেয়ে, কোনো মেয়ের মতন
অন্ধকার—অন্ধকার স্বাতী-বিশাখার!

থেমে যায় সময়ের স্রোত
যেন কিছু হতে চায়—হতে থাকে নিটোল, নিবিড়
মেঘ হয়, মেঘের কপোত—
আকাশের বুক জোড়া পাখী!
ভোরের দূরের নীলে,
তাকে নিয়ে, আকাশ নরম
নরম, মেয়ের মতো—
কোনো মেয়ে কোনো পৃথিবীর।
কোনো মেয়ে—তাই মনে রাখি,
শুধু তা-ই! আর তখনোত
ভুলে যাই একদিন তুমি কেউ ছিলে।

বিদায়

কার্ল স্যাণ্ডবার্গ

উষর ধূসর মরুর মরমে আঁকা,
‘বিদায়, বন্ধু, বিদায়’,
নিশীথ শীতল নীল নভোতলে বাঁকা
বিদায়ের চাঁদ, হায়।
মাটির মানুষ, সাগরের ঢেউ গাহে
‘বিদায়, বন্ধু, বিদায়’,
ছুঁড়ে ফেলে দাও উষ্ণীষ, কেবা চাহে?
চলো, প্রাণ-যেথা চায়।
দূরে ফেলে দাও পথের আবর্জনা,
বিপথে লহ-বিদায়,
না পারি সহিতে জীবনের লাঞ্ছনা,
এ হিয়া মরিতে চায়।

যে তারা আকাশে স্থির জ্যোতি পরকাশে,
ডাকে তারা, আয়, আয়,
বাঁধন হারা, সে মৃত্যুরে উপহাসে,
জীবনের জয় গায়।

অনুবাদ : মনীশ ঘটক

অশান্ত কৃষক

মৃগাঙ্ক রায়

এক মুঠো মাটি তুলে তোমার
দু’হাত ভরে দিলাম
সন্ধ্যায়। যখন, প্রদীপের শিখা হাতে
কেউ নেই, শীতের মর্মর

শাখায় ; যখন অন্ধকারে স্তব্ধ
ঘর, জামের পাতায়
ভরেছে উঠোন।

এক মুঠো মাটি তুলে তোমার
দু'হাত ভরে দিলাম। এ মাটির কাছে
দীক্ষা নাও
জীবনের।
বিদীর্ণ বৈশাখে মাঠে
আকণ্ঠ-তৃষ্ণার পাশে হেঁটে
রুদ্রপ্রহর গেছে, তীব্র তাপের
আকাশ ওপরে, লাঙল চলেছে
অতিমন্থর, আষাঢ়ে
করুণাঘন মেঘের আশায়।
আকুল বৃষ্টি ধারায়
ভরেছে মাঠ, থর থর পাতা
ধানের, ঘর
ভেসেছে মাঠের মত, তবুও তোমার চোখে
আনন্দঘন মেঘ! প্রাণে
উত্তাল ঢেউ জ্যোতির্ময়।
হঠাৎ সে ধান উধাও
অগ্রহায়ণে, কুয়াসাকে ছিঁড়ে তীব্র সোনার
বিদ্যুৎ নেই, শূন্য ক্ষেতে
কাকলী নেই
পাখীর।

তখন তোমার চোখে মেঘ শূন্য
সন্ধ্যায়।

সন্ধ্যায় এক মুঠো মাটি তুলে
তোমার দু'হাত ভরে দিলাম, যখন
প্রদীপের শিখা হাতে কেউ
নেই। তখন
এ মাটির কাছে দীক্ষা নাও, দীক্ষা নাও
আকাশের কাছে
আলোকের। বলো, এ মাটির প্রাণ
আমারও
প্রাণ, এ মাটির সোনা
আমার-ই, এ মাটির শীত
আমারও রক্তে
পৌষের। এ মাটি আমার। এ মাটিকে নাও
দু'হাত ভরে।

বাল্যসখী

পরিমল রায়

সেদিন বৈকালে সস্ত্রীক বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম। ঘটনাটি ফলাও করিয়া ঘোষণা করিবার মতো কিছু নয়। আপনারা সকলেই বলিবেন, আধুনিক কালে সস্ত্রীক বায়ুসেবন অতি সাধারণ নিত্যকার ব্যাপার। বলিতে বাধ্য হইতেছি, আমাদের দাম্পত্য জীবনে এ আনন্দটি কিছুটা অ-নিত্য। আমরা প্রতিনিয়ত একত্র বাহির হই না। এই যৌথ উৎসব আমাদের জীবনে ক্বচিৎ কখনো ঘটিয়া থাকে। যাঁহারা জোড়া পায়রার মতো বকম্ বকম্ করিতে করিতে প্রতি সন্ধ্যায় হাওয়া খাইতে বাহির হন আমরা সে-দলের নই। বিশুদ্ধ হিন্দু দম্পতী বলিয়া আমরা সপ্তপদী-গমনে ঘোরতর বিশ্বাসী, উহার অতিক্রমে বিবাহ অধিকতর সিদ্ধ হয় বলিয়া আমরা মনে করি না। যুক্তিটা আমার আবিষ্কার হইলেও, আমার স্ত্রী ইহা সম্পূর্ণ মানিয়া লইয়াছেন। তাঁহার রাজ্য আমার এলাকা হইতে পৃথক। তাঁহার চরণের বিচরণ স্বামীর শ্রীচরণের ছায়া বহুদিন পরিত্যাগ করিয়াছে।

অবশ্য মাঝে মাঝে আমাদের এই নিয়মের ব্যতিক্রম না ঘটে এমন নয়। হয়তো কখনো কোথাও যুগলে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতে হয়। কোথাওবা সস্ত্রীক ভিজিট ফিরাইবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এরূপ দুএকটি আকস্মিক উৎপাত মাঝে মাঝে আসিয়া উপস্থিত হয় বটে। কিন্তু উহা মিটিয়া যাইবামাত্র আমরা পুনরায় বিভক্ত হই, এবং আমাদের চিরাচরিত স্বাবলম্বী দাম্পত্য প্রথার পুনপ্রবর্তন ঘটে।

সেদিন এই রকমই একটি সামাজিক উৎপাতের তাড়না আমাদের একত্র বাড়ীর বাহির করিয়াছিল। স্ত্রী জনৈকা বাল্যকালীন সখীর নিকট হইতে এক পত্র পাইলেন, আগামী রবিবার চায়ের নিমন্ত্রণ রহিল, আসিতে হইবেই, কেবল তাহাই নয়, আসিবার কালে বরানুগমন বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ স্ত্রীর সঙ্গে আমাকেও যাইতে হইবে। পত্নীর সেই বাল্যসখী হঠাৎ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহারা দুই বন্ধুতে এই একই শহরে বহুকাল বসবাস করিতেছেন, অথচ এ যাবৎ কেহ কাহারো সন্ধান না পাওয়াতে দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। অতএব চায়ের নিমন্ত্রণে অবশ্যই

আসিতে হইবে, অন্যথা না হয়। পত্র পাইয়া আবধি স্ত্রী লাফাইতেছেন। সে-উল্লম্ফনের প্রকৃতি বাল্যসখীসম্পন্না পত্নীদের স্বামিগণ অবশ্যই অবগত আছেন।

'ওমা, বাণীটা এখানে নাকি? বাণী এখানে? উঃ কী মজা, কতদিন পর দেখা হবে! জানো, আমার বিয়ের ঠিক সাতদিন পর ওর-ও বিয়ে হ'য়ে গেল। তারপর আর দেখা হয় নি। ঈস্, কত দি-ই-ন পর যে দেখা হবে। ঠি-ক বারো বছর। ওর বর এখানে কী করে? কী মজা? তুমি যাবে তো?'

প্রশ্নটিতে একটা ঝড়ের পূর্বাভাষ সূচিত হইল। যথাসম্ভব সংযত কণ্ঠে বলিলাম—'কিন্তু তোমার বন্ধু তো আর আমারও বন্ধু নয়। আমি গিয়ে কী করবো? বোকার মতো বসে থাকবো তো?'

'কেন, তুমি ওর বরের সঙ্গে কথা বলবে।'

'ওর বরকে তো আমি চিনি না।'

'দেখা হ'লেই চেনা হয়। আগে থাকতেই সকলের সঙ্গে চেনা থাকে নাকি? আর, সেটাই বা কী কথা? নেমন্তন্ন করেছে, যেতে হবে।'

শেষ চারিটি বাক্যে একটি, অলঙ্ঘ্য না হইলেও, দুর্লঙ্ঘ্য সামাজিক অনুশাসন নিহিত। তাহা উপলব্ধি করিয়া বলিতে বাধ্য হইলাম—'সেটা ঠিক, যেতে হবেই।'

শুনিয়া বিনা বিদ্যুৎ-চমকানির মতো স্ত্রী সহসা ঝল্‌সাইয়া উঠিলেন।

'যেতে হবেই কেন? না যেতে চাও, যেয়ো না। তোমার বাড়ীতেও কেউ আসবে না। তোমার মতো এমন অভদ্র লোক খুব কমই আছে।'

বলিয়া দ্রুত কক্ষান্তরে অন্তর্হিত হইলেন।

স্ত্রী-র এই আচরণ আমার কাছে কিছু নতুন নয়। তিনি ইহা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে অর্জন করিয়াছেন। সকল স্ত্রী-ই করিয়া থাকেন। অর্থাৎ, গোলমেলে ব্যাপার বুঝিলে প্রতিপক্ষকে কথা বাড়াইতে না দিয়া সহসা চরমে উঠিয়া একেবারে ফাটিয়া পড়া। আপনি চিড় খাইয়া একেবারে চিৎপাত, মুখে আর কথাটি নাই। এক্ষেত্রে, আমারো তুষ্ণীভাব অচিরে ঘনাইয়া আসিল।

বাল্যসখীর নিমন্ত্রণপত্র বৃহস্পতিবারে আসিয়াছে। মাঝখানে আর দুই দিন। আমি অগত্যা এই দুই দিবস সেই অনতিলুব্ধ রবিবারের সম্বর্দ্ধনার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। মনে মনে বলিতে লাগিলাম, রবিবারে ছুটিটা বিলকুল মাটি হইল।

রবিবার বৈকালে সখিসম্ভাষণে বাহির হওয়া গেল। নিমন্ত্রণ বাড়ীটি বহু দূরের পাল্লা, এবং আমরা বে-কার। তদুপরি দিল্লীর বাস্, একেবারে মনিকাঞ্চন যোগ। পঁয়তাল্লিশ মিনিট অপেক্ষার পর যখন বাস্ আসিল তখন পা ধরিয়া গিয়াছে। তবে বাস্-এ উঠিবার পর আর বিশেষ বিলম্ব হইল না, মিনিট কুড়ির মধ্যে গন্তব্যস্থলে গিয়া পৌঁছিলাম। বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিতে সামান্য সময় লাগিল। দেখিলাম একটি কাষ্ঠফলকে গৃহস্বামী নামাঙ্কিত হইয়া আছেন। নামের পিছনে বহু বিলাতী অক্ষর, আমার মতো নিরক্ষর নয়।

বাড়ীর বারান্দায় উঠিয়া আসিতেই একটি বিজাতীয় কাণ্ড ঘটিল। ইহা আগে থাকিতেই কল্পনা করিয়াছিলাম। আমাদের পৌঁছিবার খবর পাইয়া স্ত্রীর সেই বাণী নাম্নী বাল্যসখী কোথা হইতে আকুলিবিকুলি হইয়া ছুটিয়া আসিলেন, এবং তন্মুহূর্তে দুই বন্ধুতে হুড়াহুড়ি লুটাপুটি সহকারে পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া যুগপৎ তীব্র ও তীক্ষ্ণ কিচিমিচি শব্দ করিতে করিতে গৃহাভ্যন্তরে অন্তর্হিত হইলেন। গোলমালটা কাটিয়া যাইবার পর ভিতর হইতে একটি ভদ্রলোক বাহির হইয়া আসিলেন। অবশ্যই গৃহস্বামী। বলিলেন, 'নমস্কার আসুন'। আমি স্মিতহাস্যে প্রতিনমস্কার জানাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

বাস্-এ আসিতে আসিতে সকৌতুক কল্পনা করিতেছিলাম, হয়তো এ দুই দিন এই গৃহেও একটি দাম্পত্যঝটিকা বহিয়া গিয়াছে। স্বামী বলিয়াছিলেন, তোমার বন্ধুকে একলা নিমন্ত্রণ করিলেই হয়। ভদ্রলোককে আমি চিনি না, তাঁহার সহিত আমার কী কথা হইবে? ইহাতে স্ত্রী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, পরিচয় হইলেই কথা হয়, আগে থাকিতেই সকলের সঙ্গে সকলের পরিচয় হইয়া থাকে নাকি? স্বামীটি আমারই মতো চুপ করিয়া গিয়াছিলেন, এবং মনে মনে বলিয়াছিলেন, রবিবারের আড্ডাটি মাটি হইল।

ভদ্রলোক আমাকে বসিতে দিয়া ভদ্র আলাপ আরম্ভ করিলেন। বলিলেন,

'আপনার কথা আমার স্ত্রীর মুখে শুনেছি'

ইহার উত্তরে আমি আর কী বলিতে পারি? বলিলাম,

'হ্যাঁ, আমিও শুনেছি আপনার কথা! এতদিন দেখা যে হয় নি, তাই আশ্চর্য্য।'

ভদ্রলোক আমার উক্তিটির পুরাপুরি অর্থ স্বীকার করিয়া লইয়া বলিলেন,

'দেখা হলে তো আর পরিচয় হতো না। কেউ কাউকে চিনতুম?'

শুনিয়া আমি হাসিয়া উঠিলাম। ভদ্রলোক রসিকতা করিয়াছেন—প্রথম

আলাপের প্রথম রসিকতা—আমি তো আর চুপ করিয়া থাকিতে পারি না। উঁহার কথার উৎকৃষ্ট সরসতার প্রমাণ স্বরূপ প্রচুর হাসিয়া ফেলিলাম।

'সিগারেট খান তো?' ভদ্রলোক টিন আগাইয়া দিলেন। একটি ধরাইয়া লইয়া খানিকটা ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলাম,

'আপনি বিলেত গিয়েছিলেন কবে?'

'থার্টিসিক্সে'

'যুদ্ধের আগে?'

'তাই তো দাঁড়ায়'

শুনিয়া আবার হাসিতে লাগিলাম এবং এবারে আরেকটু উচ্চস্বরে। কিন্তু দ্বিতীয় দফার হাঁসির মধ্যপথে হঠাৎ যেন মনে হইল, ভদ্রলোককে বোধহয় আমি সম্পূর্ণ ভুল বুঝিয়াছি। ভদ্রলোকের যে-সকল উক্তিকে আমি তাঁহার রহস্যালাপের অক্ষয় প্রচেষ্টা মালুম করিয়া মনে মনে মুচকি হাসিয়া, মুখে বেদম হাসিতেছি, সে-সকল উক্তির আসল অর্থ হয়তোবা আর কিছু। আমার কথাবার্ত্তার নমুনা দেখিয়া সম্ভবত তিনি-ই আমাকে নির্ব্বোধ ঠাওরাইয়াছেন এবং অনতিসম্বৃত অসন্তোষে ঐরূপ জবাব দিতেছেন। ১৯৩৬ সন যে যুদ্ধের আগে, সে তো জানা কথা-ই। নিতান্ত নির্বোধের মতো ঐ প্রশ্নটি করিয়া নতুন তথ্য আর কী সংগৃহীত হইতে পারে? তাই বোধ করি, আমি যখন বলিলাম। 'যুদ্ধের আগে?' তিনি বিরক্ত হইয়া মন্তব্য করিলেন, 'তাই তো দাঁড়ায়।' অর্থাৎ মনে-মনে বলিতেছেন, লোকটা একেবারে নিরেট!

আরেকটি কথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল। ভাবিলাম, আমি যেমন স্ত্রীর সঙ্গে জড়াইয়া পড়িয়া নেহাৎ ভাগ্যদোষে ইঁহার সম্মুখীন হইয়াছি, ইঁহার অবস্থাও তো ঠিক তদ্রূপ। দুইটি কাণ্ডজ্ঞানহীন বাল্যসখীর স্বার্থপরতায় আমাদের এই অবাঞ্ছিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ। আমি ইঁহার তেমন কিছু সমাদৃত অতিথিও নই। একথা মনে হইতেই হাস্য স্তিমিত হইল, এবং কেমন-একটু আত্মসচেতন হইয়া উঠিলাম। ক্ষণপরে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ক'দিন হ'লো আপনারা এখানে?'

'আমাদের? বছর পাঁচেক। আপনাদের?'

'আমরা এসেছি গেল অক্টোবরে। মাস নয়েক।'

আলাপটা নেহাৎ খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে অগ্রসর হইতে লাগিল। কোথাও কোনো যোগসূত্র পাওয়া যাইতেছে না। অসংলগ্ন কথাগুলি পিং পং

বলের মতো হু'একবার এদিক-ওদিক করিয়া বারবার গড়াইয়া পড়িয়া যাইতেছে। এক্ষেত্রে একমাত্র উপায় ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দেশের বর্ত্তমান অবস্থার আলোচনা করা, কিন্তু ভাবিলাম, তাহাই-বা কতদূর আগাইবে ? স্বাধীন ভারত যে গোল্লায় যাইতেছে, এ সম্বন্ধে ইদানীং কাহারো মনে আর সংশয় নাই, সুতরাং ইহা লইয়াও বেশিক্ষণ কথাবার্ত্তা চলিতে পারে না। পদে পদে পরস্পরের কথা আনিয়া লইলে তো আর কথা চলে না। ও দিকে পাশের ঘর হইতে সখিদ্বয়ের অশ্রান্ত কলভাষ কানে আসিতেছে। তাঁহারা বিবাহোত্তর বারো বৎসরের হিসাব নিকাশ লইতেছেন। স্বামীর কথা, শ্বশুর বাড়ীর কথা, ছেলেমেয়ের কথা, ঘর সংসারের কথা। যুগ্মনারীকণ্ঠের উচ্চহাস্যে ঘরখানি ঘনঘন মুখরিত হইতেছে। কথার অনর্গল কলস্রোতে অবগাহন করিয়া ইঁহারা যেন একেবারে অকূলে ভাসিয়াছেন। এদিকে এঘরে আমরা হুইটি প্রাণী কাষ্ঠাসনে পুত্তলিকবৎ বসিয়া বসিয়া মাঝে মাঝে ঠোঁট নাড়িবার চেষ্টা করিতেছি।

ক্ষণপরে ভগবৎ প্রেরিত হইয়া একটি ফ্রক-পরা ছোট্ট মেয়ে ঘরে ঢুকিল। ইঁহাদেরই কন্যা, বছর তিনেক বয়স হইবে। ভদ্রলোকের বাহু ঘেঁসিয়া কাছে গিয়ে দাঁড়াইল। মেয়েটিকে দেখিয়া নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলাম। যাক্, কথা-বার্ত্তার একটি নতুন বিষয় অন্তত পাওয়া গেল। ইহাকে লইয়া কম করিয়া ধরিলেও মিনিট দশেক কাটিবে। বলিলাম, আপনার কন্যা ? হ্যাঁ, তাঁহারই কন্যা। ছেলেমেয়ে ক'টি ? হু'টি। ছেলে বড়, এইটি ছোটো। অতঃপর নিতান্ত অবধারিত প্রশ্নটি ফাঁদিয়া বসিলাম।

'এসো তো খুকু এদিকে। তোমার নাম কী ?' মেয়েটির বড় লজ্জা। অপরিচিতের সম্ভাষণে মুখ ঘুরাইল, চোখ ফিরাইল, এবং ক্ষণপরে মুখে আঙ্গুল দিয়া অপ্রতিভ ভাবে অন্যদিকে তাকাইয়া রহিল। ভদ্রলোক মৃহু ভর্ৎসনার সুরে বলিলেন, 'বলো তোমার নাম কি, বল্‌তে হয়।' কিন্তু মেয়েটি নির্বিকার। পিতার আদেশ উপেক্ষা করিয়া সম্পূর্ণ নীরবে মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। জবাব না পাইয়া আমার কোনো ক্ষোভ নাই, বরং কন্যাটি নাম জানাইতে যত বিলম্ব করিবে আমার দিক হইতে সময় তত কাটিবে। কিন্তু কন্যার পিতার হিসাব অন্যরূপ। মেয়েটির অবাধ্য নৈঃশব্দ্যে তাঁহার বিরক্তি বাড়িতে লাগিল, পাছে আমার ধারণা হইয়া যায়, কন্যাটি তেমন চটপটে চালাক-চতুর নয়। সুতরাং মৃহু ভর্ৎসনা ক্ষণ মধ্যে উচ্চ তিরস্কারে পরিণত হইল, এবং কন্যাটি কিঞ্চিৎ বিচলিত বোধ করিতে লাগিল। এ সময় আমি আমার অতিথিজনোচিত কর্ত্তব্য

পালন করিলাম। বলিলাম, 'না, বকবেন না ওকে, এসো তো আমার কাছে, তোমার নাম কী ?' মেয়েটি অবশেষে মুখ খুলিল। বলিল, 'কিছু না।'

'কিছু না ? ভারী অন্যায় ! তোমার এখনো ভালো দেখে একটা নামই রেখে দিলেন না বাবা ?'

মেয়েটি পুনরায় বলিল, 'আমার নাম কিছু না।' কন্যার পিতা বুঝাইয়া দিলেন, উহার নাম কৃষ্ণা। অস্ফুট রসনায় উৎকট 'কিছ্না' শুনাইতেছে। আমি শুনিতেছি, কিছু না।

'ও, তোমার নাম কৃষ্ণা ? তাই বলো। কিন্তু এ-ও তো ভারী অন্যায় ! এত ফর্সা মেয়ের নাম কৃষ্ণা।'

কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রসঙ্গটি অপ্রত্যাশিত ভাবে হাতছাড়া হইয়া গেল। পিতার অসদাচরণে আহত হইয়া-ই হোক, কিম্বা নতুন কোনো সওয়াল জবাবের আশঙ্কাতেই হোক, মেয়েটি দৌড় দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। অনুপায় দেখিয়া, উহার পলায়নটা লক্ষ্য করিয়াই কিছুক্ষণ হাসিয়া দু'দণ্ড কাটানো গেল। বলিলাম, ভারী শান্ত মেয়েটি, এবং বলিয়া অবশ্যই ভুল করিলাম। ইদানীং লজ্জা, নম্রতা, স্থিরতা ইত্যাদি সেকেলে সদ্‌গুণগুলি শিশুদের উপর আরোপ করিলে তাহাদের মাতাপিতাগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হ'ন। মেয়েরা চিঠি লেখেন, বাবুলটা অত্যন্ত দুষ্টু হইয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। অর্থাৎ দুষ্টামিটা বুদ্ধির লক্ষণ, ছেলেটি ধীরস্থির প্রকৃতির হইলে বিশেষ আশঙ্কা থাকিয়া যাইত, উহা হয়তো আসলে বুদ্ধিহীনতারই নিদর্শন। উপস্থিত ক্ষেত্রেও, কন্যাটিকে শান্তশিষ্ট বলাতে ভদ্রলোক তেমন খুশি হইলেন না। তিনি মনে করিলেন, আমি উঁহার সম্প্রতিক আচরণের উপর কোনো কটাক্ষ করিতেছি। প্রতিবাদ স্বরূপ বলিলেন, 'শান্ত ! তাহলে তো বাঁচা যেতো। থাকুন না দু'দণ্ড। দেখবেন, কী দৌরাত্মটা করে।'

বুঝিলাম, ইঁহাকেও দুষ্টু-কম্‌প্লেক্সে পাইয়াছে। এ রোগটি সাধারণত মায়েদেরই দেখা যায়, এ ক্ষেত্রে বাপকেও ধরিয়াছে।

নীরবে আরো দু'দণ্ড কাটিল। দু'পক্ষ হইতেই নতুন প্রসঙ্গের সন্ধান চলিতেছে, কিন্তু কাহারো মাথায় কিছু খেলিতেছে না। একবার উঠিয়া গিয়া পুস্তকের শেল্‌ফের বইগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলাম, কোনোটার ছবি দেখিলাম, কোনোটার পাতা উল্টাইয়া গেলাম। কোনোটাকে শ্রেণীবদ্ধ সারি হইতে খানিকটা হেলাইয়া বাহিরে আনিয়াই ঠেলিয়া রাখিয়া দিলাম। দ্বিতীয় দফায়

উঠিয়া দেয়ালের ছবিগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিলাম। ছবির সংখ্যা কম নয়। বেশির ভাগই আলোকচিত্র, পরিবারের বহুবিধ অতীত আলোকিত করিয়া আছে। প্রথম পরিণয়ের যুগল মূর্ত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণার সাম্প্রতিক শৈশব পর্য্যন্ত ব্যক্তিগত ইতিহাসের বহু পৃষ্ঠা দেয়ালে ঝুলিতেছে। কতকগুলি প্রবাসের চিত্র, ভদ্রলোকের ইউরোপ ভ্রমণের দিনপঞ্জী। তৃতীয় বার উঠিয়া আলমারিতে সাজানো কতকগুলি খেলনার কলকব্জা পরীক্ষা করিলাম। ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে পুনস্থাপিত হইয়া বলিলাম, 'খেলনাগুলি বেশ মজার'।

ভদ্রলোক এতক্ষণ আমার গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া চুপচাপ বসিয়া ছিলেন। বলিলেন, 'হ্যাঁ, ছেলের ছোটবেলাকার খেলনা, বিলাত হইতে আনা হইয়াছিল। সিগারেট নিন।' দু'জনে ধূমায়িত অবস্থায় চুপচাপ বসিয়া রহিলাম, কথা আবার আটকাইয়া গেল।

এই মূক অভিনয়ের মধ্য অঙ্কে দুই সখী হাসিতে হাসিতে ঘরে ঢুকিলেন। ইতিপূর্ব্বে পরকীয়াটিকে ভালো করিয়া দেখিবার সুযোগ হয় নাই। এইবার দেখিলাম। ভদ্রমহিলার বিশেষত্ব তাঁহার হাসি। সদাহাস্যময়ী বলিলে ভুল হইবে, দেখিলাম, হাসিটা তাঁহার রোগবিশেষ। অকারণে হাসি মেয়েদের স্বভাব। কিন্তু এক্ষেত্রে সেই নারীসুলভ স্বভাবটির কিঞ্চিৎ মাত্রা বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, মহিলাটি সর্ব্বক্ষণ হাসিয়া অস্থির হইতেছেন। আমার গৃহিনীও কিঞ্চিদধিক হাস্যপরায়না। তদুপরি বন্ধুর ছোঁয়াচ লাগিয়াছে। অর্থাৎ বলিতে গেলে, দুইটি হাসির জাহাজ ধাক্কাধাক্কি করিতে করিতে আসিয়া ঘরে নোঙর ফেলিল।

ভদ্রমহিলা বলিলেন, 'চলুন একটু চা খাবেন।' বলিয়া হাসিয়া লুটোপুটি। হাসি দেখিয়া প্রথম দু'এক সেকেণ্ড একটু বোকা বনিয়া গিয়াছিলাম। বোকা-বানানো হাসিই বটে। আমি বলিলাম, 'দু'বন্ধুতে তো খুব হাসছেন দেখছি। আমাদের নিয়ে পরিহাস নয় তো ?'

তিনি বলিলেন, 'আপনারা বুঝি এতক্ষণ একটুও হাসতে পারেন নি ? আমরা যে কী নিয়ে হাসছি, তা আমরা নিজেরাই জানি না।' বলিয়া হাসিয়া গড়াগড়ি।

কক্ষান্তরে চা'য়ের ব্যবস্থা। দেখিলাম, খাদ্য পানীয়ের প্রচুর আয়োজন। গৃহকর্ত্রী জানাইলেন, সবই ঘরে তৈরী,—কিছু ভয় নাই,—সব খাইতে হইবে,—ফেলিয়া উঠিলে চলিবে না। এতক্ষণ একরকম বেকার বসিয়া বসিয়া কথা

খুঁজিয়া মরিতেছিলাম। এখন অন্তত একটা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারিয়া আমরা দুইটি হতভাগ্য যেন একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। এবং দুজনে রীতিমতো আস্তিন গুটাইয়া যেন উঠিয়া পড়িয়া লাগিলাম। উনি আড়ম্বরে চিনি আগাইয়া দেন, আমি দ্রুত করিয়া খাদ্যের প্লেট পৌঁছাইয়া দিই, 'এ কী করছেন ?' 'আর দেবেন না' বলিয়া ভদ্রমহিলাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করি, 'এ জিনিসটি অতি উপাদেয় হইয়াছে, ওটিও চমৎকার, চা'য়ে আরেকটু দুধ আবশ্যক,—বহু কথা জুটিয়া গিয়া মুখে খই ফুটিতে লাগিল। আরো কত কথা বলিয়া ফেলিলাম ; আপনারা তো কিছুই খাচ্ছেন না—আমাদের ওপরই যতো অত্যাচার—হ্যাঁ অত্যাচার বই কি—আমি বিকেলের দিক মোটেই কিছু খাই না—হ্যাঁ সত্যি বলছি—ওঁকেই জিজ্ঞেস করুন না, ছোটো ছোটো কথার টুকরা যেন দু'হাতে ছড়াইতে লাগিলাম।

চা'য়ের টেবিলে বসিয়া দুই সখীর 'স্বামীনিন্দা' আরম্ভ হইল। মেয়েদের এই অভ্যাসটি জানেন নিশ্চয়ই। নিন্দার ভাণ করিয়া স্বামীর উৎকর্ষ প্রমাণের প্রয়াস বিবাহিতাদের একটি বিশেষ দুর্ব্বলতা। সখিদ্বয়ের একজন মহাদুঃখ জানাইয়া বলিলেন, ইঁহাকে দিয়া সংসারের এক কানাকড়ি কাজও হইবার নয়, অপর কোনো পুরুষকে তিনি এতখানি নিষ্কর্ম্মা হইতে দেখেন নাই। এই উক্তির কালীপক্ষে ও বিদ্যাপক্ষে দুই তাৎপর্য্য। প্রথম অর্থের পিছনে অনতিপ্রচ্ছন্ন দ্বিতীয় অর্থ, আমার স্বামী তোমারটির মতো সংসারের আলুপটল গুনিয়া সময় কাটান না, তাঁহার বিদ্যা ও রুচি উচ্চশ্রেণীর এবং ভিন্নধর্ম্মী। দেখা গেল, অন্য সখীটিরও তাঁহার নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে ঠিক একই অভিযোগ। তিনিও অষ্ট প্রহর পুস্তক মুখে লাগাইয়া পড়িয়া আছেন। অন্য কোনো দিকে যদি এতোটুকু খেয়াল থাকে। অর্থাৎ প্রমাণ হইয়া গেল, আমারা উভয়েই অতি উচ্চশ্রেণীর পুরুষ, সংসারের কাদামাটির বহু ঊর্দ্ধে কোঁচা সামলাইয়া বসিয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসায় নিমগ্ন আছি, এবং ইঁহারা দয়া করিয়া সংসারটা চালাইয়া দিতেছেন বলিয়াই সংসার চলিতেছে। অর্থাৎ, ইঁহাদের বিবাহ না করিলে আমরা মরিয়া যাইতাম। সেই মর্ম্মে একটি রসিকতা করিয়া অবশেষে সভাভঙ্গের আয়োজন করা গেল।

কিন্তু আয়োজন করিলেই সভাভঙ্গ হয় না। মেয়েদের আসল কথাগুলি এই সময় হইতেই সুরু হয়। সুতরাং চাপান অন্তে পুনরায় আধঘন্টা খানেকের জন্য পৃথক সভা বসিল, ইঁহারা অন্তপুরে চলিয়া গেলেন, আমরা সত্যসত্যই যেন কোঁচা সামলাইয়া বসিয়া যে-যাহার তত্ত্বজিজ্ঞাসায় ধ্যানস্থ হইলাম।

অবশেষে কোনো এক সময়ে বিদায়ের পালা আসিল এবং আমরা যাইবার উদ্যোগে বারান্দায় আসিয়া সমবেত হইলাম। প্রস্থানের প্রাক্কালে দুই সখীতে আর এক দফা জাপটা-জাপটি হইল, রাশি রাশি হাসি, বহুসংখ্যক 'যাস্ কিন্তু' 'আসিস্ কিন্তু' 'তা'নাহলে কিন্তু' দ্রুত উচ্চারিত হইয়া গেল। আমি স্মিতহাস্যে বলিলাম, 'আচ্ছা চলি, নমস্কার।' উঁহারা বলিলেন, 'নমস্কার।'

ইহার পরই যবনিকা পতনের কথা। পতনটা হইতেও ছিল। কিন্তু হঠাৎ পড়িতে পড়িতে আবার উঠিয়া গেল। ভিতর হইতে ইতিমধ্যে কৃষ্ণা আসিয়া বারান্দায় জুটিয়াছে। মাতা বলিতেছেন, 'নমস্তে বলো।' শুনিয়া আমরা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া উহার বিদায় সম্ভাষণের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কিন্তু শিশুর সময়োচিত কাণ্ডজ্ঞান নাই, কাজটি দ্রুত সারিবার কোনো চেষ্টাই তাহার দেখা গেল না। আমরাও স্নেহাবিষ্ট কৌতুকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য দাঁড়াইয়া রহিলাম। অবশেষে বহু সাধ্যসাধনার পর কৃষ্ণা যুক্তহস্তে বলিল, 'নমস্তে।' আমরাও সমস্বরে বলিলাম, 'নমস্তে।' ইহার পর, জয়হিন্দ্। উহার অপেক্ষায় আরো মিনিট দুই। মেয়েটি বলিল, 'দয়্ইন্দ।' আমরা প্রত্যুত্তর করিলাম, 'জয়হিন্দ্'। 'আবাল্ আছবেন।' 'নিশ্চয়ই আসবো, তোমরাও এসো।'

রাস্তায় নামিয়া পড়িয়া স্ত্রী বলিলেন, 'বেশ কাটলো কিন্তু। বাণীটা একেবারে ঠিক সেই রকমই আছে। তোমরাও তো দেখলাম, খুব জমিয়ে বসেছিলে। তোমার হাসি শুনছিলুম পাশের ঘর থেকে।'

আমি বলিলাম, হুঁ।

পদ্মা

হুমায়ুন কবির

পদ্মার কূলে দাঁড়িয়ে নজুমিয়া একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখল। সামনে বিরাট নদীর প্রসার—জলের স্রোত চলেছে তো চলেছেই। আজ সকালে আলোর ছড়াছড়ি, নদীর বুকে হাসির আভাস। দুরন্ত মেয়েটীর মত নদী চঞ্চলা, কিন্তু সে চাঞ্চল্য খুসীতে ভরপূর। স্ফূর্ত্তি আছে তেজ রয়েছে, কিন্তু আবেগ যতই থাক, সর্ব্বনাশী শক্তির ইঙ্গিত নেই।

সকালের আলোতে পদ্মার সে কি রূপ! দূরে বহু দূরে অন্য পাড়ের আভাস, মাঝে মাঝে যেন ডাঙা জেগে উঠেছে, চরের কাছে জলের স্রোত সূর্য্যালোকে ঝলসে উঠছে। কি বিপুল মুক্তি, কি উদার বিস্তার। আকাশ দূরে পৃথিবীর উপর এসে নুয়ে পড়েছে—সেই আসমান এবং জমিনের মধ্য দিয়ে বিরাট জলের প্রবাহ, দিন নাই রাত্রি নাই উদ্দাম জলের ধারা কখনো সগর্জ্জনে কখনো নিঃশব্দে বয়ে চলেছে।

নজুমিয়ার চোখে পুরোনো দিনের স্মৃতি—উদাস চোখে চারিদিকে তাকিয়ে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। দুঃখে নয়, ক্ষোভে নয়, স্বস্তিতে আরামে। শোকর্ আল্লাহ্—দিন তার ভালই কেটেছে। মনে পড়ল প্রথম যৌবনের কথা—বন্ধুহীন বিত্তহীন বিদেশী এসে পদ্মার পাড়ে অবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সঙ্গে ছিল দেশের লোক, কিন্তু তারা সবাই বয়সে বড়, সংসারী। দেশে নেই জমিজমা, পরের ক্ষেতে মজুর খেটে পেট চলেনা। বিদেশে এসে যদি নসীব খোলে, তাই দেশ ছেড়ে বেড়িয়েছে। তাদেরই সঙ্গে জুটে গিয়েছিল নজুমিয়া—বাপ নেই মা নেই, পেছুটান কম, তার বিদেশে যেতে বাধা কিসের?

সারাদিন ধরে পথ চলে একদিন ঠিক সাঁঝের মুখে পৌঁছল পদ্মার ধারে। সাঁঝের আলোতে পদ্মার সে কী ভৈরবিনী রূপ! একেও নদী বলে? নজুমিয়ার বাড়ীর ধারেও তো সে নদী দেখেছে,—শান্ত, ঘরোয়া জলের ধারা গ্রামের কিনারা দিয়ে ধীরে ধীরে বয়ে যায়। তার সঙ্গে পদ্মার মিল কোথায়? এ যে এলোকেশী উন্মাদিনীর মতন ছুটে চলেছে, জলের স্রোত ফুলে ফুলে উঠছে, চারিদিকে চাপা ক্রন্দনের সঙ্গে যেন গর্জ্জনের রোল। আর থেকে থেকে বিরাট শব্দে মাটীর চাপ

ভেঙে পড়ছে। নদীর সীমানাই বা কই? যতদূর দেখা যায় জল শুধু জল। দূরে আবছায়া পাড় চোখে পড়ে তো পড়ে না—সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে জলের স্রোতে এক অপার্থিব দীপ্তি। ভয়ে ভয়ে নজুমিয়া জিজ্ঞাসা করেছিল—এ কি সমুন্দরে পৌঁছলাম?

দলের লোকে হেশে উঠল, বলল না রে না—এ হ'ল পদ্মা নদী। এখানে জমি মিলবে—এখানেই আমরা ভিটে বাঁধব।

হলও তাই—সেখানেই রয়ে গেল। দলের মাতব্বর ছিল রহিম বখ্স। সে বল্ল যে জমিজমার খোঁজেই যখন দেশ ছেড়ে এত দূরে এলাম, তখন নিজের জমি না হলে চলবে কেমন করে? তাতে যদি বস্তি ছেড়ে নতুন ডাঙায় যেতে হয়, ক্ষতি কি? গাঁয়ের ধারে জমিজমা বিলী হয়ে গেছে, গাঁয়ে থাকলে সেই দিন-মজুরীই করতে হবে, আবার জন্মভর মজুর খাটতে তো আর বিদেশে আসিনি।

বেশীর ভাগ লোক রহিম বখসের কথাতেই সাড়া দিল—বল্ল, ঠিক বলেছ পঞ্চায়েত মজুর-ই যদি খাটবো, তবে আর দেশ ছাড়লাম কিসের জন্য? দুয়েকজন কথা শুনলো না—তারা বল্ল, বিদেশ বিভুঁয়ে এসেছি এই ঢের, তার ওপর যদি জনমানুষহীন সাপে কুমীরে ভরা বনবাদাড়ে থাকতে হয়, তবে তার চেয়ে দেশে ফিরে গিয়ে আবার মজুর খাটব, সেই ভাল।

নজুমিয়ার জোয়ান বয়স, সবে সতেরোতে পা দিয়েছে। দরাজ বুক, অদম্য সাহস। সে পিছু হটবে কেন? রহিম বখসকে বল্ল, চাচা তুমি ঠিক বলেছ। যদি নিজের জমিজমাই না হ'ল তো বিদেশে এলাম কেন? আমি তোমার সঙ্গে থাকব।

জলা সাফ করে জঙ্গল কেটে নতুন মাটী ভেঙে ক্ষেত বসানো—সে কি সহজ কথা? যে জমিতে কোনদিন লাঙলের ফাল বসেনি—তাকে আবাদ করতে হলে চাই মুরোদ, চাই সাধনা। উড়ু-উড়ু মনদিয়ে অভাঙা জমির মন জেতা যায় না। রহিম বখসের কড়া হুকুম—যতদিন না নতুন গাঁয়ে সকলেরই ঘরবাড়ী তৈরী হবে, প্রথম ফসল উঠবে, ততদিন কেউ ঘরে বউ আনতে পারবে না।

রহিম বখসের এ কড়া হুকুম সকলের পছন্দ হয়নি, দুয়েকজন একটু কানাঘুষোও করেছিল, আপত্তি করতে চেয়েছিল, কিন্তু রহিম বখসের শাসন বড় জবরদস্ত। থাকতে চাও, হুকুম মানতে হবে। পছন্দ না হয়, যেখানে খুসী চলে যাও। জমি আর জরু এক সাথে সায়েস্তা হবেনা। যে জমি চায়, তার এখন জরুর কথা ভুলতে হবে। আর যে জরু চায় রহিম বখসের দলে তার জায়গা নেই।

নজুমিয়া তখন হাসতো, ভাবতো সর্দ্দারের এ কি খেয়াল ? এলই বা বউ বিবি, তাতে ক্ষেতের কাজে ব্যাঘাত হবে কেন ? বরং ঘরে মেয়েছেলে থাকলে কত সুবিধে। রান্নাবান্নার কাজ মেয়েরা যেমন পারে, বেটাছেলেদের দিয়ে কি তা হয় ? সারাদিন খেটে খুটে এসে একটু দাওয়ায় বসবে, না তখন আবার কাঠকুটো জোগাড় করে রান্নার জোগাড় দাও। পাকশাক ছাড়াও ঘরে মেয়েছেলে থাকলে ঘর যেন একটু উজালা থাকে—সর্দ্দার এত বুদ্ধিমান হয়েও এ কথা বোঝে না ?

আজ নজুমিয়ার আবার সে সব দিনের কথা মনে এলো—সর্দ্দারের হুকুমের মর্ম্ম আজ সে বুঝল। ঠিক কথাইতো বলেছিল সর্দ্দার—সর্দ্দারের সব কথা মেনে চললে আজ কি নজুমিয়ার মনে এ দুঃখ থাকত ? চমকে উঠল নজুমিয়া—কি কথা ভাবছে সে ? একবার গাছাড়া দিলে কি আর ভাবনার অন্ত আছে ? কতইতো ভেবেছে সে—তাতে কি আর তার দুঃখ মিটেছে ?

না, সেদিন আর ফিরবেনা—প্রথম যৌবনের আনন্দে ভরা দিন। ভরা পদ্মায় পাল তুলে বোঝাই নৌকো যেমন সহজে চলে যায়, তেমনি সেই কাজ-ভরা দিনগুলোও কি সহজেই তার কেটেছে। আজ হেমন্তের পদ্মা শান্ত—তার জীবনও সেই নদীরই মত ঢিমে হয়ে এসেছে। ভাদ্রের নদীর যে দুরন্ত যৌবন, তার আমেজ আজো একটু একটু রয়েছে কিন্তু যৌবনের সে উদ্দামতা, সে দুর্ব্বার শক্তি কি আর কোনদিন ফিরবে ?

নজুমিয়ার বুকের মধ্যে আবার যেন মোচড় দিয়ে উঠল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে ভাবল—না, এই ভাল। বয়সের সঙ্গে রক্তের জোর কমে আসছে, চোখের তেজ কমে আসছে, সঙ্গে সঙ্গে মনের জ্বালাও যেন কমে আসে।

ভরা পদ্মার দিকে তাকিয়ে নজুমিয়ার মনও যেন ভরে উঠল। বর্ষার পদ্মার উদ্দাম স্রোত আজ শান্ত, আশ্বিনের শেষে এখনো জলের ভার রয়েছে কিন্তু ধার এসেছে কমে। তাকিয়ে তাকিয়ে নজুমিয়ার মনে হল পদ্মা যেন তার ঘরের বউ। কতদিন কত সন্ধ্যা একসাথে কেটেছে, কত ঝড় ঝাপটা বিপদ-আপদ একসঙ্গে সয়ে আজ মাথার চুলে পাক ধরতে সুরু করেছে।

প্রথম যেদিন পদ্মার ধারে এসে দাঁড়িয়েছিল, নজুমিয়ার আজ বারে বারে সেই কথাই মনে পড়ছে। একেতো সর্ব্বনাশা নদী, স্রোত ডাক ছেড়ে ছুটে চলেছে, জলের যেন কোথাও সীমানা নাই। তার উপর সে অনাবাদী ডাঙার কি রুক্ষ চেহারা। জনমানুষের চিহ্ন নাই, খানিকটা সাদা বালি খানিক জলা আর তারই

মধ্যে শন গাছের জঙ্গল। সর্দ্দারের দিকে তাকিয়ে নজুমিয়া ভাবল, এ জমি চষবো কি করে?

রহিম বখ্‌স তার মনের কথা বুঝল—কাছে ডেকে বলল, জমির চেহারা দেখে ভয় পাস নে বেটা। এ তো জমি নয়—এ যে সোনা। একবার ঘাসকেটে জঙ্গল সাফ করে চাষ করলে দেখবি দুগুণো তিনগুণো ফসল পাওয়া যাবে। নতুন চরের মাটী, হেসে খেলেও এতে বর্ষায় ধান আর চোত বৈশাখে চৈতালী পাওয়া যাবে। তবে তার জন্য খাটুনী চাই।

খাটতে নজুমিয়ার আপত্তি ছিলনা, আর কি খাটুনিই খেটেছে সে। রাত না পোহাতে সুবহে ফজরের প্রথম অনিশ্চিত আলোকে সে চমকে জেগে উঠেছে, ভেবেছে বেলা হয়ে গেল। আর ঘুম যদি একবার ভাঙলই, তবে আর আলসেমি করে লাভ কি? তখন থেকেই খাটতে সুরু করেছে—সকালের আলো চারদিকে ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, প্রখর সূর্য্য এসে মাথার উপরে থমকে দাঁড়িয়েছে কিন্তু তার খাটুনির বিরাম নাই। দুপুর বেলা না খেলেই নয়, হাড়ভাঙ্গা মেহনতে শরীর অবশ হয়ে আসে, তাই কোন মতে কাজ বন্ধ করে রহিম বখ্‌সের বাড়ী গিয়ে নাকে মুখে দুটো গুঁজে আবার ছুটে এসেছে মাঠে। নিজের বাড়ী তার তখনো হয় নি, আর বাড়ীর ভাবনা করবার সময়ইবা কই তার? রহিম-বখ্‌সেরও যেন তার উপর কেমন মায়া পড়ে গিয়েছিল, জোয়ান বাচ্চা, শক্ত মজবুত দেহ, কচি শালগাছের মতন তাজা তরুণ মন। নজুমিয়ার পিঠ চাপড়ে রহিম বখ্‌স বলত, হবেরে বেটা, তোর হবে। এমনি সিধে হয়ে থাকিস। সিধে পথে চলিস, তোর ভাবনা নাই।

নজুমিয়ার শরীরে মনে সেদিন যেন অসুরের মতন শক্তি। খাটুনির বিরাম নাই, কাজেরও অন্ত নাই, তার স্ফূর্তিরও যেন কোন সীমানা নাই। দুপুরের কড়া রোদে দু' মুঠো খেয়ে মাঠে নামত, আর বিকালের রোদ যখন পশ্চিমে হেলে পড়ত, দূরে গ্রামের ঘন ছায়ার মধ্যে অন্ধকার জমাট হয়ে উঠ্‌ত, ক্লান্ত হাতে লাঙলের মুঠি আলগা হয়ে আসত—তখনও নজুমিয়ার কাজের শেষ নাই। তারপরে হঠাৎ বন্যার মত অন্ধকার নেমে আসত, নিজের হাত পর্য্যন্ত অস্পষ্ট হয়ে উঠত—ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনিচ্ছায় নজুমিয়া লাঙল তুলে ধীরে ধীরে ঘরের দিকে ফিরত।

কাজেরও শেষ ছিলনা তার। জঙ্গল কেটে সাফ করে ডাঙা মাটী ভেঙে চাষের জন্য জমি তৈরী করতে হবে, গর্ত্ত খন্দ বিল ভরাট করে এলাকা বাসের

উপযুক্ত করে তুলতে হবে—সে কি সোজা কাজ ? কোনদিন যেখানে লাঙলের দাগ পড়েনি, যে জমি মানুষের বশ কোনদিন মানেনি, সেই জমিকে উর্ব্বরা করে তোলা কি সহজ কথা ? ভিটেছাড়া জমিহীন গতরসর্ব্বস্ব ক্ষেতমজুরের দল—গরুবলদই বা তারা পাবে কোথায় ? সারা গাঁয়ে দু' জোড়া বলদ—তাই পালা করে সবাই ভাগ করে নেয়, দুক্ষেত জমিতে চাষ পড়ে, বাকী সবাই তাকিয়ে দেখে, না হয় মাটীর ঢেলা ভাঙে, আগাছা ঘাস পাতা নিড়োয়। কিন্তু তাতে কি আর কাজ এগোয় ? বিশেষ করে যখন বাইনের সময় আসে, তখন কে চাষ দেবে আগে, তা নিয়ে পড়ে যায় কাড়াকাড়ি।

নজুমিয়া বসে থাকার পাত্র নয়—নিজের জমিতে কুঁয়ো খুঁড়তে সুরু করে দিল। যে মাটী উঠবে, তা দিয়ে ভিটে তৈরী করার সুবিধে, একসাথে দু' কাজ হয়ে যাবে। একদিন কুঁয়ো খুঁড়ছে, এমন সময় হঠাৎ তার মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল। বাইনের সময় এসে পড়েছে, আজ বর্ষণ নামে কি কাল নামে, অথচ বলদ মোটে দু জোড়া, তার পালা যে কবে আসবে সে জন্য বসে থাকলে হয়তো ঠিক মত বাইন হবেই না। কিন্তু সে দশাতো কেবল তার একার নয়! কম বয়সের আরো পাঁচ সাত জন চাষীরও তারই অবস্থা।

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। মাটী খোঁড়া ফেলে রেখে ছুটে গেল সে তার দোস্ত আসগরের কাছে। আসগরও তখন তার নিজের খেতে বসে ঘাস নিড়োচ্ছিল। দু' চার মিনিট সলাপরামর্শ হল দু'জনের, তারা গিয়ে আরেক স্যাঙাতকে ডেকে নিয়ে এল। বুড়োর দলকে তাজ্জব বানিয়ে হালে কাঁধ দিল নজুমিয়া আর আসগর, দেখাদেখি আরো কয়েকজন সুরু করে দিল। বলদের অভাবে তাদের চাষ আর ঠেকে থাকবে না।

মেহনত ছিল কিন্তু মনে আনন্দও ছিল সেই প্রথম যৌবনের দিনে। নজুমিয়ার মুখের হাসি মিলিয়ে এল—সে সব পুরোনো দিন কি আর ফিরবে ? তখন আসগর ছিল তার প্রাণের বন্ধু—আর সেই আসগর আজ তার জানী দুষমন! পাশাপাশি জমিজমা আজও রয়েছে—নজুমিয়া তাকিয়ে দেখল যে ছোট্ট একটা নালার এপারে তার, ওপারে আসগরের ক্ষেত খামার। বাইরের ছবি বদলায়নি, কিন্তু তাদের মনের মধ্যে একি পরিবর্ত্তন! তাকিয়ে তাকিয়ে তার মন আরো খারাপ হয়ে এল। তার ক্ষেত যেমন সোনার ফসলে ভরে উঠেছে আসগারের ক্ষেতেও তেমনি সোনার ছড়াছড়ি। নজুমিয়া ভাবল, হায় আল্লা, তোর একী বিচার, আমাকে দুটো দিবি বলে আমার দুষমনের ভাণ্ডারও ভরে দিবি ?

সেদিনের মত আজও নজুমিয়া আর আসগর পড়শী—কিন্তু সেদিনে এদিনে কি তফাৎ? তখন ছিল ভালবাসা, হাসি আর মহব্বৎ,—আর আজ দুজনের মধ্যে হিংসা, ক্রোধ আর দুঃখের সমুদ্র। এত বছর কেটে গেল, তবু ভুলতে পারছে কই, আর কোনদিনই কি সে সব কথা ভুলতে পারবে?

জোর করে নজুমিয়া চোখ ফিরিয়ে নিল—দেখবেনা সে আসগরের ক্ষেতে সোনার ছড়াছড়ি। ভাববেনা সে আসগরের দুষমনির কথা। খোদা তাকে যা দিয়েছেন তাই নিয়ে শোকরানা করবে সে—অন্যের মন্দ ভেবে কি হবে আর তার সে ভাবনার সময়ই বা কই। ক্ষেতে রয়েছে ধান, কিষাণ চাই, মজুর চাই। নৌকোগুলো মেরামত করতে হবে। ছেড়া পাল সেলাইয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। ধান রাখবার মরাই তৈরী করাতে হবে। এত কাজ তার হাতে, সে কিনা পুরোনো শত্রুতার কথা ভেবে মন খারাপ আর সময় নষ্ট করছে? এ কথাই বা সে ভুলবে কি করে যে খোদা মেহেরবান? খালি দুখানি হাত ছিল তার সম্বল, আর আজ খোদার ফজলে তার অভাব কিসের? নিজের জমি, নিজের ভিটা, নিজের খামার—নিজের বাগবাগিচা পুকুর বিল। আর গায়ের লোকেও তো তাকেই পঞ্চায়েত বলে মানে, পঞ্চায়েত বলে খাতির করে। তবে তার মনে অভিযোগ কেন? আলহামদোলিল্লাহ, হাজার শোকর আল্লাতালার, কোন খেদ বা অভিযোগ সে মনে রাখবেনা!

এক

বড়নদীর বাঁকের মুখ থেকে বেরিয়েছে উজান ডাঙার খাল। সেই খালের কোলে নদীকে আঁকড়ে ধরে নজুমিয়ার দহলিজ। মাটীর ঘর, মাটীর দেয়াল, শনের ছাউনি, কিন্তু দিনরাত্রির ঘষামাজায় যেন ছবির মতন ঝকঝক করছে। লেপা উঠোনে এক টুকরা খড়কুটো পড়বার জো নাই—অন্দর মহলে বসেও আয়েষা বুড়ীর চোখে কিছুই বাদ পড়ে না।

একটু ফাঁক দিয়ে অন্দরমহলে তিনখানি ঘর। মাঝে পাটখড়ির একটু খানি বেড়ায় আবরু বাঁচিয়ে রাখে। আয়েষা হাসে, বলে যে তিনকাল গিয়ে যার শেষকালে ঠেকেছে, তার আবার এত ঢাকাঢাকির কি দরকার?

আয়েষার দিন জনমনিষদের তদারক, বাঁদীদের কাজের তলব করেই কাটে। ভোর থেকে সুরু হয় তার খবরদারী, আর রাত্তিরে সকলের খাওয়া-

দাওয়া শেষ হলে দুটো ভাত মুখে গুঁজে ঘরের দাওয়ায় মাদুর বিছিয়ে গা ছেড়ে দেয়।

নজুমিয়া বারবার বলে, তোমার এত খাটবার কি দরকার মা? সারা জীবন তো মেহনত করেছ, এখন খোদার ফজলে দুমুঠো ভাতের সংস্থান হয়েছে, এখন একটু গতর মেলে আরাম কর।

আয়েষা হাসে, বলে, আগে মালেকের বিয়ে দিই, বউ এসে ঘরসংসার গুছিয়ে নিক, তখন খালি দিন ভরে চরকা কাটব আর পান খাব।

পরে একটু হেসে অনুযোগের সুরে বলে—কিন্তু সেদিকে তো তোমার একটুও খেয়াল নাই। একমাত্র ছেলে, তার বউ একটু দেখে শুনে আনতে হবে।

নজুমিয়া হাসে, বলে কি যে বল মা! মালেকের তো সবে আটবছর বয়স হলো—এখনই তার বিয়ে না দিলে কি দিন ফুরিয়ে যাবে?

আয়েষা মানে না, রাগত সুরে বলে, কচি বয়সের এক ফুটফুটে বউ আনবো, তাকে নিয়ে একটু আমোদ আহ্লাদ করব, নিজের হাতে তাকে মনের মত তৈরী করে নেব। তোমার আলসেমির জন্য তা হবার জো নাই।

নজুমিয়া কথা কয়না, হাসতে হাসতে চলে যায়। রেগে মেগে আয়েষা আরো জোরে চরকা চালায়, দাসীবাঁদীদের উপর ঝাল ঝাড়ে।

আজো সকালে দাওয়ায় বসে চরকা কাটছিল। অঘ্রানের সকাল, বাতাসে সামান্য শীতের আমেজ। ছায়ায় বসলে গা একটু শির শির করে—সকালবেলার রোদ্দুর মিষ্টি মনে হয়। হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এল মালেক। দূর থেকেই চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, শীগ্‌গির চল দাদী, শীগ্‌গির।

আয়েষা তার দিকে তাকিয়ে বলল, ব্যাপার কি? ছুটতে ছুটতে মুখটা একেবারে লাল হয়ে উঠেছে, এত তাড়া কিসের?

মালেক বলল, এতকথা এখন বলতে পারব না—চলবে তো চল, তা নইলে আমি চললাম। কিন্তু না এলে ঠকবে বলে দিচ্ছি। জীবনে যা কোনদিন দেখনি, দেখবে তো জলদি এসো।

আয়েষা হেসে উঠ্‌ল, বল্ল, এ বুড়ীকে তুই আজ নতুন কি দেখাবি দাদু? চার কুড়ি বয়স্ হতে চলল, এ পোড়া চোখে কত কিই না দেখলাম। আর আজ কিনা তুই এসে বল্লি যে জীবনে যা কোনদিন দেখিনি, তাই দেখাবি।

মালেক মাথা ঝাঁকি দিয়ে বলল, তোমার পুরোনো কাহিনী নিয়ে তুমি থাক,

আমি চললাম দাদী। তুমি দেখতে না চাও, দেখো না, আমি কিন্তু থাকতে পারব না।

একটু থেমে ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, চল না দাদী। তোমাকে দেখাব বলে আমি ছুটতে ছুটতে এলাম, আর তুমি খালি বাহানা করছ।

হাসতে হাসতে আয়েষা বলল, কি বাহানা করলাম রে দাদু! তা চল, চল, তুমি যখন একবার ধরেছ তখন কি আর না গিয়ে রক্ষে আছে। তোমাকে আমি চিনিনে?

খুসীতে মালেক লাফিয়ে উঠ্‌ল—বলল, তবে শীগ্‌গির চল দাদী। একটুও দেরী করতে পারবে না।

আয়েষা উঠতে উঠতে বলল, আরে রোসো বাপু, রোসো—এ বুড়ো হাড় কি তোমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে পারে?

তুলোর পাঁজা তুলতে তুলতে আয়েষা ডাক দিল, কুলসুম, অ কুলসুম।

কুলসুম তখন দুধ জ্বাল দিচ্ছিল—বিশ বাইশ বছরের সোমত্ত মেয়ে, দেহের গড়ন আঁটসাট, কোমরে আঁচল জড়িয়ে হাতা দিয়ে দুধ নাড়ছিল।

আয়েষার স্বর শুনে চমকে উঠ্‌ল, বলল, আমায় ডাকছ আম্মা?

আয়েষা ঝামটা দিয়ে উঠ্‌ল—ডাকছি না তো রঙ্গ করছি নাকি? শুনতে পাস না? কালা হয়ে গেছিস?

উঠতে পড়তে কুলসুম ছুটে এল, বলল, কি করতে হবে আম্মা?

আয়েষা তার হাতে তুলোর পাঁজা দিয়ে বলল, চরকা আমার ঘরে তুলে রাখো। তুলোর ভাঁজ যেন না ভাঙে।

মালেকের দিকে ফিরে বলল, চল দাদু, এবার কোথায় নিয়ে যাবে।

যেতে যেতে খিড়কির কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াল আয়েষা। আওয়াজ উঁচু করে বলল, শুনছিস কুলসুম, যা যা কাজ বলে দিয়েছি সব যেন মনে থাকে। গোলাপীকে বলিস যে মাছ কুটে তরিতরকারী সাজিয়ে রাখে। আর তুই চরকা ঘরে রেখে, উঠোন লেপে রাখবি। এসে যেন সব তৈরী পাই। তা নইলে—

মালেক আর সইতে পারছিল না, বাধা দিয়ে আয়েষার হাত ধরে টানতে লাগল। বলল, তোমার খালি কাজ আর কাজ হুকুম আর ফরমায়েস। আমার যে দেরী হয়ে যাচ্ছে।

আয়েষা বলল, চল দাদু চল।

মালেক পারে তো দেয় ছুট—আয়েষার হাত ধরে ঝুলতে ঝুলতে চলতে

লাগল, বলল, তুমি জান দাদী কি হয়েছে? তোমাকে কতদিন বলেছি যে জেলেদের সঙ্গে গাজীর টেকে যাব। বড় গাঙে ওদের মাছধরা দেখব। তা তুমি তো আমার কথা শোন না। আর বাবাকে বললে খালি হাসে। বলে যে বড় গাঙে সে কী স্রোত, ঘুর্ণির মধ্যে পড়লে জেলেডিঙি পর্য্যন্ত তলিয়ে যায়। কিন্তু তাহলে জেলেরা মাছ ধরে কেমন করে দাদী?

আয়েষা বলল, ছুটতে ছুটতে আর বকতে হবে না—এমনিতেই হাঁপাচ্ছিস। তাতে আবার খালি বকর বকর।

মালেক তার কথায় কান দিল না। আপন মনে বলে চলল, বাবা বলে যে জেলেরা সব জোয়ানমরদ। সাঁতরে পদ্মা পার হয়ে যেতে পারে, আর নৌকো ভাসাবার আগে কী যেন সব মানত করে নামে। সত্যি দাদী?

আয়েষা বলল, আমাকে আর বকাসনে, তোর সঙ্গে চলে তো আমার হাঁপ ধরে এসেছে।

মালেক বলল, শোন তবে। সেদিন মধু আর তার বেটা এসেছিল বাবার কাছে। বলছিল যে এবার হাজিগঞ্জের বাঁকে মাছের ঝাঁক পড়েছে, সেখানে জাল ফেলতে পারলে হালি হালি মাছ উঠবে। বাবার কাছে এসেছিল বড় নৌকা আর বেড়াজাল চাইতে। আমি বললাম আমাকেও নিয়ে চল সঙ্গে। বাবা বললেন যে তোর যেয়ে আর কাজ নেই, তুই মাছ ধরবি না মাছ তোকে ধরবে।

আয়েষা হেসে ফেলল, বলল, তা ঠিকই তো বলেছে। রাঘব বোয়াল তোকে ধরলে তোর কোন নিশানাই থাকবেনা।

মালেক রাগতস্বরে বলল—হ্যাঁ তাই বুঝি, আমি যেন বোয়াল মাছ খেলাতে পারিনা। বাবাকে বললাম যে তুমি আমাকে যেতে দাও, আমি একা বড় বোয়াল তুলে আনব। বাবা বললেন যে না তার জন্য আর বড় গাঙে যেতে হবে না,—বড়শি দিয়ে এখানে একটা মাছ গাঁথো দেখি।

মালেক আয়েষার আরো একটু কাছে ঘনিয়ে এল, বলল জানো কি করেছি? কাল রাত্তিরে মাচান থেকে বড় কাঁটা নিয়ে তাতে ব্যাঙের চার দিয়ে নদীতে ফেলেছিলাম, আর আজ ভোরে তোমারও ঘুম ভাঙবার আগে ছুটে গেছি নদীর ধারে। বলতো কি উঠেছে আমার বড়শিতে?

মালেক হাঁপিয়ে উঠেছিল। খানিকটা ক্লান্তিতে, খানিকটা আয়েষাকে ভাল করে বোঝাবার জন্য থমকে থেমে গেল। তার মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

আয়েষা বলল যে সাত রাজার ধন কোন মানিক তুমি বড়শিতে গেঁথেছ, আমি জানব কেমন করে ?

মালেক মাথা ঝাঁকি দিয়ে বলল, তোমার কেবল সব কথাতেই ঠাট্টা, কিন্তু এবার তোমার হাসিতে কুলাবে না। শোনো তবে। নদীর ধারে গিয়ে দেখি যে বড়শিতে শিকার গেঁথেছে, সুতোয় সেকি টান। যত আমি সুতো গুটোতে চাই, তত শক্ত হয়ে থাকে, আর খালি তাই নয়, যেই বড়শির সুতোয় হাত দিয়েছি, নদীর মধ্যে যেন সে এক ঝড় জেগে উঠ্‌ল। নজর পড়ল, যে খুঁটোতে সূতো বেঁধেছিলাম, সে খুঁটো আমি ভাল করে পিটিয়ে মাটীতে গেঁথেছিলাম, কিন্তু তাও প্রায় অর্দ্ধেক আলগা হয়ে উঠে এসেছে। অনেক টানাটানি করেও যখন মাছ তুলতে পারলাম না, তখন খুঁটোটা আবার ভাল করে গেঁথে গেলাম ইদ্রিসের খোঁজে।

আয়েষা হেসে উঠ্‌ল, বলল যে তবে তোমার বাবা তো ঠিকই বলেছে—বোয়াল মাছ গেঁথে তোলা তোমার সাধ্য নয়।

মালেক বললে, আগে কথা শোনো, তার পরে টিপ্পনি কাটতে চাও, কেটো। ইদ্রিসকে ডেকে নিয়ে এলাম কিন্তু জানো, সেও মাছ তুলতে পারল না। পানির কাছে গিয়ে সুতো ধরে টান দিয়েছিল যে বেশী জোর পাবে। উলটো সে নিজেই প্রায় নদীতে পড়ে গিয়েছিল। আমি বললাম যে ইদ্রিস চাচা, চল একটা ডিঙি নিয়ে নদীতে নামি। শড়কী দিয়ে মাছ গেঁথে তুলব।

ইদ্রিস বলল, খবরদার, পানিতে পা দিওনা। এ রাঘব বোয়াল নয়—এ কুমীর না হয়ে যায় না। শীগ্‌গির বাড়ী যাও, তোমার বাবাকে খবর দিয়ে জন দশেক লোক নিয়ে যত শীগ্‌গির পারো, ফিরে এসো।

মালেক একটু থেমে আয়েষার দিকে তাকিয়ে বলল, বাবাকে খবর দিয়েই তোমার কাছে ছুটে এলাম। কিন্তু তুমি এত দেরী করে দিলে, এতক্ষণে বোধ হয় তারা কুমীর মেরে ডাঙায় তুলে ফেলেছে।

গাছে ঢাকা গাঁয়ের পথ হঠাৎ শেষ হয়ে গেল—খোলা জমিতে এসে সামনেই চোখে পড়ল বিরাট নদী, হেমন্তের স্নিগ্ধ আলোকে বিরাট অজগরের মতন পড়ে রয়েছে। পাড়ে জটলা, বিশ পঁচিশ জন মানুষ কি বলাবলি করছে, ব্যস্তভাবে চলাফেরা করছে, রসারসি নিয়ে টানা হেঁচড়া করছে। মালেকের আর তর সইল না—আয়েষার হাত ছেড়ে নদীর ধারে ছুটল।

কুমীর মারা যায় কি করে তাই নিয়ে তখন জল্পনা চলছে। বড়শীতে যে

মাছ গাঁথেনি—গেঁথেছে কুমীর তার চাক্ষুস প্রমাণ হয়ে গেছে। যন্ত্রনায় এবং রাগে পাগলের মতন দাপাদাপি করে কুমীর ভেসে উঠেছিল—বড়শীতে টানও দিয়েছে দুচার বার, কিন্তু এমনি গেঁথে গেছে যে বাছার আর পালাবার পথ নেই।

একজন কিষাণ বলে উঠ্‌ল,—শালাকে হিঁচকে টেনে তুলি ডাঙায়—কি বল সর্দ্দার ?

নজুমিয়া মাথা নেড়ে বলল,—তা হবে না রমজান, বেশী টানাটানি করতে গেলে শেষে বড়শি ছিঁড়ে যাবে। এখনো যে কেন বড়শি কেটে ফেলেনি এটাই তাজ্জব, কিন্তু হ্যাঁচকা টান দিলে বড়শিতে সইবে না।

রমজান বলল,—বড়শি কাটা অত সহজ নয়, সর্দ্দার। গুণের সুতো তিনবার পাকিয়ে তাতে লোহার তার জড়িয়ে দিয়েছি, আর যেখানে বড়শির মাথা, সেখানে তারও চৌগুণো। যদি কাটতে চেষ্টা করে, শালার দাঁতই ভেঙে যাবে।

নজুমিয়া বলল,—তাইতো বেটা এখনো পালাতে পারেনি, কিন্তু তাহলেও সাবধানের মার নেই। বেশী টানাটানি করলে তারও কেটে যেতে পারে। তার চেয়ে বরং নদীতে নৌকো নামাও, বড়শীতে টান দিলে বেটা ভেসে উঠবে, তখন সড়কি দিয়ে গেঁথে ফেলব।

মালেক চোখ বড় করে এতক্ষণ কথা শুনছিল। নৌকোর কথা শুনে আর চুপ থাকতে পারল না। বলল, আমাকেও কিন্তু নৌকোয় নিতে হবে।

সবাই হেসে উঠ্‌ল, বলল, ঠিক কথা, মালেক না হলে সড়কি চালাবে কে ?

রমজান বলল, তা নিলেই বা আপত্তি কি ? আমরা সবাই থাকব—

নজুমিয়া গম্ভীর ভাবে বলল, এত খেলার কথা নয় রমজান। ঘা-খাওয়া কুমীর আর ঘা-খাওয়া বাঘ, তাকে নিয়ে তামাসা করা চলে না। মালেক দাদীর কাছে থাকবে, পাড় থেকে যা দেখবার দেখবে।

রমজান বলল, নৌকো না হয় নামালাম, কিন্তু শালার কাছে আসব কি করে ? একেইতো চোট লেগে তেতে রয়েছে, নৌকো দেখলে আরো খেপে যাবে। লেজের এক ঝাপটায় নৌকো গুঁড়ো হয়ে যাবে।

নজুমিয়া বলল, তা ঠিক কথাই বলেছ রমজান। একটু বড় দেখে নৌকো নাও আর চারিদিকে বাঁশের ঘের দাও। তার মধ্যে লগি হাতে দাঁড়িয়ে থেকো, আর বেটা কাছে এলেই লগির ধাক্কায় সরিয়ে দিও। গলুইয়ের উপর পাটাতনে সড়কি হাতে আমি নিজে থাকব।

সবাই সমস্বরে প্রতিবাদ করে উঠ্‌ল, তা হয় না পঞ্চায়েত। তোমার এখন বয়স হয়েছে, চোখের সে তেজ, হাতের সে কসরৎ নেই। এ জোয়ান মানুষের কাজ—তুমি মাতব্বর, মুরুব্বি, সলাপরামর্শ দাও, কাজ হাসিল করব আমরা।

নজুমিয়া বলল, না সে হয়না—সড়কি আমিই নেব। এখনো খোদার ফজলে তোমাদের দু'জনের মহড়া নিতে পারি, আর তোমরা আমাকে অথর্ব্ব বানাতে চাও ?

আয়েষা একধারে দাঁড়িয়েছিল, নজুমিয়াকে ডেকে পাঠাল। বলল, তোমার কি ভীমরতি হয়েছে ? খামখা বাহাদুরী করে বিপদ ডেকে এনো না। মালেক এখনো কচি বাচ্চা—খোদা না করে, তোমার একটা কিছু বিপদ আপদ হলে তাকে দেখবে কে ? বুড়ো মায়ের কথা না ভাবো, অন্তত নিজের ছেলের কথা মনে রেখো।

নজুমিয়া বলল, তুমি যদি হুকুম না দাও, তবে আর আমি যাই কি করে ? কিন্তু আম্মা, একটা কথা ভেবে দেখো। সারা গাঁ আমাকে পঞ্চায়েত বলে, সর্দ্দার বলে মান্যি করে। আজ যদি অন্যকে বিপদের মুখে পাঠিয়ে আমি পিছু হটি, তবে কি আর আমার মুখ থাকবে ? না আম্মা, তুমি খুসীমনে আমাকে অনুমতি দাও।

আয়েষা কোন জবাব দিল না—মুখভার করে দাঁড়িয়ে রইল। নজুমিয়া আবার বলতে সুরু করল, তুমিতো জানই আম্মা, পঞ্চায়েত হবার জন্য আসগর কি ভাবে উঠে পড়ে লেগেছে। আমি বাগে পেলে তাকে ছাড়ব না, সেইবা সুযোগ পেলে আমাকে রেয়াৎ দেবে কেনো ? আম্মা তুমি বাধা দিও না, আমি সাবধানে কাজ করব। নৌকোয় তো আরো লোক থাকবে, আর কুমীরের বেটা বড়শিতে গেঁথে তার তেজ এমনি কমে এসেছে, এখন তার আর বেশী জারীজুরী চলবে না।

আসগরের নাম করতেই আয়েশার মুখ কঠিন হয়ে এল, খানিকটা চুপ করে থেকে বলল, যদি যেতেই হয় তবে যাও, তোমাকে আল্লার হাতে সঁপে দিলাম, খোদা তোমার পানা দিন। তবে খুব সাবধান, আর ইদ্রিস এবং রমজানকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

আয়েষা তাদের কাছে ডেকে বলল—তোমরাও আমার বেটার মত, নজু তোমাদের বড় ভাই। আমাকে কথা দাও যে তার কাছ ছাড়া হবে না, দেখবে তার যেন কোন বিপদ না ঘটে।

তারা একস্বরে জওয়াব দিল,—তোমার কোন ভাবনা নাই আম্মা। আমাদের জান থাকতে পঞ্চায়েতের একটা কেশেরও হানি হবে না। দোওয়া কর সবাই যেন ভালোয় ভালোয় ফিরে আসতে পারি।

আয়েষা মালেককে কোলে টেনে নিয়ে চাপা গলায় তীব্র সুরে বলল,—অন্তত তুমি আমার কাছে থাক দাদু।

আয়েষা দোওয়া পড়তে সুরু করল, কেবল তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল, গলার আওয়াজ বেরোল না।

ততক্ষণে নৌকোর সাজ তৈরী হয়ে গেছে। সে বছরই নজুমিয়া একখানি বড় ডিঙি তৈরী করেছিল, একে হিজল কাঠ, তাতে নতুন ডিঙি। জোড়ে জোড়ে গাবের পোঁচ—তার উপর কালো আলকাতরার রঙ চিকচিক করছে। খালি গলুইয়ের কাছে সিঁন্দুরের পাঁচটী রেখা, পাঁচ পীরের মানত। যে দেখে সেই বলে, এ তল্লাটে এমন নাও আর দ্বিতীয় একখানিও নেই।

বড় নৌকো, মাঝি ছাড়াও দু'জন মাল্লা লাগে। তারা কখনো বৈঠে ধরে, কখনো দাঁড় বায়, কখনো লগি ঠেলে। মস্তবড় পাটাতন, তার চারিদিকে তাড়াতাড়ি নতুন বাঁশের বেড়া দিয়ে সবাই মিলে নৌকো নদীতে নামালো। মধু জেলের হাতে বড়শির রশি দিয়ে নজুমিয়া বলল, দেখো শিকার যেন হাতছাড়া না হয়।

গলুইয়ে ছোট একটা মাচা তৈরী করে তার উপর দাঁড়াল নজুমিয়া। তার হাতে একটী সড়কি, পায়ের কাছে আর একটী সড়কি। তার ঠিক পিছনে রেড়াতে ভর দিয়ে দাঁড়াল ইদ্রিস আর রমজান। তাদের হাতে বড় বড় লগি, কুমীর যদি নৌকোর কাছে আসতে চেষ্টা করে, তবে লগি নিয়ে ঠেলে সরিয়ে দেবে। তাদের পায়ের কাছেও সড়কি, যদি দরকার হয়, তারাও চালাবে।

দু'জনের বদলে নজুমিয়া চারজন মাল্লা নিলো। গাঁয়ের সবচেয়ে পাকা মাঝি বসির ধরল হাল। বদর বদর করে নৌকো নদীতে নামাল, মাঝি মাল্লা সবাই চেঁচিয়ে উঠ্‌ল বদর বদর। ডাঙ্গার লোকেরাও যোগ দিল, সকলের গলা ছাপিয়ে মালেকের সরু গলার আওয়াজ। খালি আয়েষার মুখে কথা নাই, পাথরের মূর্ত্তির মতন নিঃশব্দ, নিশ্চুপ।

নদীর স্রোতের ধাক্কায় নৌকো একবার কেঁপে উঠল। কিন্তু পাকা মাঝির হাতে নৌকোর হাল, মূহূর্ত্তে সামলে নিয়ে যেখানে কুমীর ডুব দিয়েছিল সেখানে নৌকো নিয়ে এল। নজুমিয়া চেঁচিয়ে উঠল, বড়শির সুতোয় ঢিল দাও। সুতো

আলগা হতেই কুমীর মাঝনদীর দিকে রওয়ানা দিল—সঙ্গে সঙ্গে মধু হেঁচকা টান দিতেই কুমীর ভেসে উঠল আর চোখের পলক পড়বার আগেই নজুমিয়ার সড়কি গিয়ে ঠন্ করে তার মাথায় লাগল। কুমীরের হাড়, সে কি অত সহজে বেঁধে? সড়কি ছিটকে নদীর জলে তলিয়ে গেলো, ব্যথার চোটে গর্জ্জন করে কুমীর ফিরল, নৌকোকে তাড়া করল, কিন্তু ফিরে লেজের ঝাপটা মারবার আগেই রমজান আর ইদ্রিস লগির ঠেলায় তাকে ঘুরিয়ে দিল। লগির ধাক্কা খেয়ে কুমীর যে ডুব মারল, আর কিছুতেই তাকে জাগানো গেল না।

ডাঙ্গার জটলা, নৌকোর মধ্যেও সকলের সলাপরামর্শ। যদি কোনক্রমে একেবারে কুমীর ছুটে যায়, তবে সর্ব্বনাশ হবে, কারণ জখমী কুমীর মানুষ-খেকো হতে বাধ্য। মানুষের মতন সহজ শিকার তো আর দ্বিতীয় নাই!

নানান ফন্দি নিয়ে আলোচনা, কিন্তু কারু মাথায় আর বুদ্ধি খেলে না।

রমজান বলে উঠল,—শালা অথই জলে ঘাপটী মেরে রয়েছে। ঠাঁই জলে আনতে পারলে আমি পানিতে নেমে ওকে একাই সাবাড় করতে পারি।

নজুমিয়া ধমক দিয়ে বলল, অত বাহাদুরী করতে হবেনা। একে কুমীর, তাতে জখমী, এ সময় পানিতে নামলে আর রক্ষা আছে? তুমি কি বল মাঝি?

বসীর এতক্ষণ চুপ করে ছিল। সে এমনিতেই কথা কয় কম—তাতে এত হট্টগোলে একেবারে চুপ মেরে গিয়েছিল। সর্দ্দারের প্রশ্ন শুনে বলল, আর একবার রসিতে টান দিলে যদি না ওঠে, তবে বেড়াজালে ঘেরাও করা ছাড়া আর উপায় নাই। কিন্তু জালে কি মানবে?

নজুমিয়া উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল,—ঠিক বলেছো মাঝি! এতক্ষণ কেন এ খেয়াল হয়নি?

চেঁচিয়ে উঠল,—মধু, ও মধু, আর একবার বড়শিতে ঢিল দাও তো, যদি বাছাধন পালাতে চেষ্টা করে তবে হেঁচকা টানে ভাসিয়ে তোলো। আর যদি ঘাপটী মেরে থাকে, তবে আস্তে আস্তে টেনে পারের দিকে নিয়ে এসো, ঠাঁইজলে পেলে ওকে পানির মধ্যেই গেঁথে ফেলব।

কুমীরের বাচ্চা ততক্ষণ চালাক হয়ে গেছে। মধুর সমস্ত কসরত সত্ত্বেও তার নড়ন-চড়ন নেই—ঘাপটী মেরে চুপ করে রইল। বিরক্ত হয়ে মধু চেঁচিয়ে উঠল, কিছুতেই বাগ মানছে না সর্দ্দার। শালাকে জাল দিয়ে ছেঁচে না তুললে শালা পালিয়ে যাবে—বেশী টানাটানি করলে রসি ছিঁড়ে যাবে।

নজুমিয়া বলল,—ঠিক কথা বলেছ, মাঝিরও অই মত। শক্ত দেখে নতুন জাল এনে নামাও, দেখি পালায় কি করে।

রমজান বলল,—জালে কি মানবে? শালা জাল কেটে পালিয়ে যাবে।

নজুমিয়া ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, যাবেতো যাবে, কিন্তু তাই বলে জাল নামাবো না? জাল ফেললে হয় জালে উঠবে, নয় উঠবে না। যদি ওঠে, তবে জালের কিছুটা লোকশান হলেও দুঃখ নাই, আর যদি না ওঠে, তবে বড় জোর একখান জাল গেল।

জোরে চেঁচিয়ে বলল, ঠিক বলেছ মধু, ভাল করে দেখে নতুন মজবুত জাল ফেল, ঠিক ধরা পড়বে।

হলও তাই। ধীরে ধীরে জাল নামাতে লাগল, কুমীরের গায়ে জাল ঠেকতেই জলে বুড়বুড়ি উঠল, পালাবার চেষ্টায় কুমীর বড়শির রসীতে দিল টান, কিন্তু ততক্ষণে তার গায়ে আষ্টেপিষ্ঠে জাল জড়িয়ে গেছে, ধীরে ধীরে জাল তোলার সঙ্গে সঙ্গে জলের মধ্যে কুমীরের শকল দেখা দিল। প্রাণপণ শক্তিতে তাকে লক্ষ্য করে নজুমিয়া সড়কি ছুঁড়ল। কঠিন পিঠের চামড়ায় বিঁধল না বটে, কিন্তু সড়কির ধাক্কায় কুমীর এক পাশে কাৎ হয়ে পড়ল। পেটের কোমল সাদা চামড়া মুহূর্ত্তের জন্য বেরিয়ে এল এবং চক্ষের পলক না পড়তে আর একখানি সড়কি তুলে নজুমিয়া তার পেটের মধ্যে গেঁথে দিল। ব্যথায় রাগে চাপাগর্জ্জন করে কুমীর জলের মধ্যে লাফিয়ে উঠল, যেন এখুনি জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়বে। সঙ্গে সঙ্গে লেজের ঝাপটায় নৌকে চুরমার করবার চেষ্টা করল, কিন্তু রমজান এবং ইদ্রিস দু'জনেই তৈরী ছিল, তারা লগি ধরতেই লগির উপর লেজের বাড়ী পড়ল। টুকরো টুকরো হয়ে তাদের হাত থেকে ছিটকে পড়ল লগি, আর ধাক্কা সামলাতে না পেরে দু'জনেই পাটাতনের উপর পড়ে গেল। সড়কি-বেঁধা কুমীর জলের মধ্যে লুটোপুটী খেতে লাগল, ভারে জাল ছিঁড়ে যায় আর কি। মধু ওস্তাদ জেলে, জাল আলগা করে দিল, নদীর জলে প্রচণ্ড তুফান তুলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই কুমীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল, তখন সকলে মিলে ধীরে ধীরে মরা কুমীর সুদ্ধ জাল টেনে তুলল।

মাঝিরা চেঁচিয়ে উঠল,—বদর বদর। পাড় থেকে সবাই সাড়া দিল—বদর বদর।

নৌকো পাড়ে ভিরল, কুমীরকে ডাঙ্গায় তুলে নজুমিয়া বলল,—ভাগ্যিস বাচ্চা কুমীর, তা নইলে আজ সর্ব্বনাশ হ'ত।

রমজান বলল,—বাচ্চা হলে হবে কি? এ যে জাত মগর। দাঁত দেখো শালার।

আয়েষা এগিয়ে এল, বলল,—খোদার শোকর সবাই ভালয় ভালয় ফিরে এসেছো। সিরনি পাঠিয়ে দাও মসজিদে, আর একদিন মৌলুদ শরীফের বন্দোবস্ত কর। মনে থাকে যেন এ আমার দাদুর শিকার—দাদুর ধরা প্রথম কুমীর।

মালেক হাঁ করে কুমীরের দিকে তাকিয়ে ছিল—আয়েষার কথা শুনে হঠাৎ লজ্জা পেয়ে তার কোলে মুখ লুকোল।

দুই

দিনতিনেক পরের কথা—সেদিন ধুলদীর হাটবার। এ তল্লাটে ধুলদীর হাট কে না জানে? পদ্মার একটা শাখা চরের মধ্যে চলে এসেছে, তারই বাঁকে প্রকাণ্ড অশথ গাছের ছায়ায় ধুলদীর হাট। নজুমিয়ার মনে পড়ে প্রথম প্রথম সেই অশথ ছায়াতে টুকরী নিয়ে বসতো চাষীর দল, দু'একজন পাইকার নিয়ে আসত তাদের বেসাত, বেতের প্যাঁটরা থেকে বের করত রঙ বেরঙের কাপড়, সন্ধ্যা হতে হতেই বেচাকেনা শেষ হয়ে যেত, সবাই দোকানপাট তুলে নিয়ে আপন আপন ঘরে ফিরে যেতো। পড়ে থাকত নদীর ধারের খালিমাঠ আর তার কিনারায় প্রকাণ্ড অশথ।

সেও ছিল দিন আর আজও একদিন। আজ ধুলদীর হাটে পাকা ঘর উঠেছে, আর সার দিয়ে টিনের কুঠুরীতে দোকান বসেছে। সে অশথ গাছ আজও রয়েছে, কিন্তু এখন আর তা হাটের মাঝখানে নয়, এক কোনে পড়ে যেন কোনঠেঁসা হয়ে রয়েছে। আগের সে জৌলুষ নেই—পুরোনো কাণ্ড ফাঁক হয়ে ফাঁপড়া হয়ে গেছে, আর চারদিকে নতুন নতুন শিকড় মাটীতে ঝুলে পড়ে একটা পুরোনো কেল্লার মতন মনে হয়। দোকানী সেখানে বসেনা—কেবল রাখাল ছেলেরা তলায় বসে বিড়িতে টান দেয়, দুপুরের রোদ্দুরে ছায়ায় বসে গরুবাছুরের উপর নজর রাখে।

আসল হাট এখন সরে এসেছে আরো নদীর ধারে। মস্ত বড় গঞ্জ, ব্যাপারী এসে সেখানে বেচাকেনা করে। খালি যে বেচাকেনাই করে, তা নয়। দেশবিদেশের খবরাখবরও সেখানে এসে জমে, চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এক

গাঁয়ের কথা অন্যগাঁয়ে চলে যায়, অন্যগাঁয়ের খবর এ গাঁয়ে এসে পৌঁছে। চালাচালিতে খবরের রূপও যায় বদলে, দশ মুখে তিলকে তাল করতে কতক্ষণ ?

নজুমিয়া তাই হাটে এসে শুনল যে তার দশবছরের ছেলে মালেক একলা বিশগজা কুমীর মেরেছে। কি করে মারল তা নিয়েও কত জল্পনা কল্পনা। কেউ বলে যে মালেক নদীতে নাইতে গেছিল, হঠাৎ পায়ের কাছে এক বিশগজা কুমীর ভেসে উঠল আর চক্ষের পলকে শড়কী দিয়ে মালেক তাকে গেঁথে ফেলল। কেউ বলে, শড়কী নিয়ে লোক নাইতে যায় নাকি ? মালেক গিয়েছিল বোয়াল মারতে, অন্ধকারে স্পষ্ট দেখেনি, ভেবেছে বোয়াল আর নসীব ভাল যে শড়কী কুমীরের চোখে গেঁথে গিয়েছিল। সহজে কি কেউ হটবার পাত্র; তাই যে প্রথম বলেছিল যে মালেক নাইবার সময়ে কুমীর মেরেছে, সে ঠেস দিয়ে বলে, রেখে দাও ওসব তক্কাতক্কি—তোমার কথায় চোখের দেখাকে অবিশ্বাস করব ?

কথায় কথা বেড়ে চলে আর তাই হাটের পথে যেতে বারে বারে নজুমিয়াকে এসে সবাই জিজ্ঞেস করে, সবাই জানতে চায় কি হয়েছিল। সত্যি মালেক বিশগজা কুমীর শড়কী দিয়ে গেঁথেছিল ? নাইবার সময় না নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে ? অন্য সময় হলে নজুমিয়া বোধ হয় এত সওয়াল জওয়াবে খেপে যেতো, কিন্তু আজ তার ভালই লাগছিল—দশজনের আদর সম্মান কার না ভালো লাগে ?

যেখানে দরজিদের লাইন শেষ আর মনিহারী দোকান স্বরু হয়েছে, সেখানে এক সাইন বোর্ড লাগিয়ে দোকান তুলেছে এক হাকিম। হাকিমতো হাকিম, কেউ বলে দরজিপাড়ার এক ছেলে পালিয়ে পশ্চিমে গিয়েছিল, সেখানে গিয়ে হিন্দুস্থানী বুকনী আর দু'চারটা দাওয়াইয়ের নাম শিখেছে, আজ তারই জোরে সে হাকিম সাহেব। কেউ বলে হিন্দুস্থান ফিন্দুস্থান তো দূরের কথা, বাঙলামুলুকের বাইরে কোনদিন পা বাড়ায়নি। তবে নাপিতের ছেলে, চালাক-চতুর, এক বিদেশী হাকিমের তল্পী বয়েছিল বছর খানেক, সেই তার বিদ্যার দৌড়।

তা দরজিপাড়ার ছেলেই হোক আর নরসুন্দরই হোক, এখন জোব্বা এঁটে কাল চাপদাড়ির মধ্যে আঙ্গুল চালাতে চালাতে যখন সে আরবী ফারসী বয়েৎ ঝাড়ে, তখন দশ গ্রামের লোকে অবাক হয় তার দিকে তাকিয়ে থাকে। কি সে বলে তা হয়তো নিজেই জানেনা, আর সত্যি সত্যি আরবী ফারসী কিনা, তাই

বা কে বলবে ? গাঁয়ের মুখ্যু মানুষ তো আর অত পণ্ডিত নয়, তারা হাকিম সাহেবের বয়েৎ শোনে, গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়া দেখে আর অবাক হয়ে যায়।

সাইনবোর্ডও হাকিম সাহেবের ব্যবসার একটা অঙ্গ। কাল রঙ করা কাঠের উপর বড় বড় লাল হরফে তার নাম লেখা, আর একপাশে এক হাড়পাঁজড়া বেরকরা কঙ্কাল মূর্তি আর অন্য পাশে ইয়া তাগড়া এক পালোয়ানের চেহারা। গাঁয়ের অন্য লোকের কথা না হয় বাদই দিলাম, হাকিম সাহেব নিজেও দিনে দুবার তিনবার এসে সাইন বোর্ড দেখত, মনে হত যে অক্ষরগুলো যেন তার সাতরাজার ধন মানিক, দেখে দেখে তার মন আর ভরে না।

দুষ্টলোকে হাকিম সাহেবের বিষয় নানান কথা বলত—বলত যে তার হাকিমী সব জারীজুরী, কিন্তু তবু অসুখ বিসুখ হলে ছুটে আসত। হাকিম সাহেবও কখনো দিত পানিপড়া, কখনো কাউকে দিত দুটো হজমিগুলি, কখনো বা চিড় বিড় করে কি সব আউড়ে ফুঁ দিয়ে দিত, বলত, যাও ভাল হয়ে যাবে। বলত সুরা ইয়াসিন পড়ে তিনবার ফুঁকে দিলাম, এবার আর ভয় নাই।

হাকিম সাহেবকে তার জোব্বা ছাড়া কেউ কোনদিন দেখেনি। এককালে হয়তো সাদা ছিল কিন্তু এখন তেলকুটে হয়ে ধূলো বালিতে তার যে রঙ হয়েছে তাকে কালোও বলা চলে, ছাইরঙাও বলা চলে। লম্বা ঝোলা পিরানের উপর আঁট সাট কালরঙের ছিদরিয়া, তার কিনারাগুলোতে লাল সূতোর কাজ। হাকিম বেশী লম্বা নয়, কিন্তু ঢোলাপিরহান আর আঁটসাঁট ছিদরিয়ার জন্য তাকে লম্বাই মনে হ'ত। ধীরে ধীরে পা ফেলে চলত, কথা বলত গুণে গুণে, হাটের লোক তাকে দেখে সম্ভ্রমে পথ ছেড়ে সরে যেত, বলত, সেলাম হাকিম সাহেব, আর হাকিমও গম্ভীর হয়ে উত্তর দিত, আসসালামো আলায়কুম ইয়া রহমত উল্লা ইয়া বরকতাহু!

আজ নজুমিয়াকে দেখে কিন্তু হাকিম সাহেবের সে গাম্ভীর্য্য ভেঙে গেল—ঘর থেকে প্রায় ছুটতে ছুটতে বাইরে এসে বলল, সেলাম পঞ্চায়েত সাহেব, সেলাম,—এই আপনার কথাই হচ্ছিলো একটু আগে, আসুন, এক ছিলুম তামাক খেয়ে যান।

নজুমিয়া আশ্চর্য্য হয়ে গেল। হাকিম সাহেব তো কোনদিন কাউকে ডেকে ঘরে বসায়না, তামাক খেতে বলেনা, হ'লকি? মনে মনে খানিকটা খুসীও হল। বলল, একটু তাড়া ছিল হাকিম সাহেব, কিন্তু আপনি যখন তলব করেছেন, তখন কি আর ফেলতে পারি?

হাকিম সাহেবের ঘরের মধ্যে মস্ত একটা তক্তা, আর দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দুটো আলমারী। একটা আলমারীর দরজা ভেঙে ফাঁক হয়ে গেছে, সাজানো বোতল সারি করে রয়েছে। তক্তার বেশীর ভাগই খালি কাঠ, কেবল দেয়ালের দিকে খানিকটা জায়গায় একটা সতরঞ্চি বিছিয়ে তার উপর ময়লা একটা ফরাস পাতা। গোটা দুই তাকিয়া রয়েছে, আর ছোট একটা বেতের হাতপাখা। তাকিয়ার পাশে পিতলের ডিবেতে পান সুপারী আর জরদা।

হাকিম সাহেব ঘরে ঢুকে নজুমিয়াকে বলল, — আসেন পঞ্চায়েত সাহেব, বসেন বসেন।

নজুমিয়া খালি তক্তার উপর বসতে যাচ্ছিল, হাকিম বলল, ওদিকে কেন ? এখানে আসেন, তাকিয়ায় হেলান দিয়ে পা মেলে আরাম করে বসেন। আপনারা হলেন মানী লোক, আপনাদের কি আর শক্ত কাঠে বসতে দিতে পারি, তাই তো এই ফরাস রেখেছি আপনাদের জন্য।

নজুমিয়া ব্যাপার দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেছিল, এবার তার খানিকটা সন্দেহ হল, ভাবল যে হাকিমের মতলবটা কি ? যাই হোক, কোন কথা না বলে ফরাসে ভাল করে গ্যাঁট হয়ে বসল। তাকিয়ায় হেলান দিয়ে হাকিম-সাহেবের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

হাকিম সাহেব দু'একবার কেশে নাক ঝাড়ল। ঢোলা পিরহানের হাতায় নাক ভাল করে মুছে এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, —এক ছিলুম তামাক আজ্ঞা হোক, পঞ্চায়েত সাহেব।

নজুমিয়া মনে মনে ভাবল, ব্যাপার কি ? মুখে বলল, হাকিম সাহেবের মর্জ্জি।

হাকিম চেঁচিয়ে ডাক দিল, কেদার, অ কেদার।

ধুকতে-ধুকতে হাড়-বের-করা পাঁজর-সর্ব্বস্ব এক কঙ্কালমূর্ত্তি বেরিয়ে এল। এই হল হাকিম সাহেবের কেদার। ফাইফরমায়েস খাটে, ওস্থধপত্তর আলমারী থেকে বের করে দেয়, কোথাও হাকিমের ডাক পড়লে দাওয়াইয়ের বাক্স মাথায় করে সঙ্গে চলে। হাটের লোকে বলে, হাকিমের দাওয়াইয়ের কেরামতি আছে, তা নইলে এ তালপাতার সেপাই কবে ঝড়ে উড়ে যেত।

কেদারের জাত কি, কোথায় তার বাড়ী সে খবর কেউ জানে না। তার মস্ত বড় গুণ যে জিজ্ঞেস না করলে সে কথা বলেনা। আর কথা যখন বলেও,

তখনো 'হুঁ হাঁ না' দিয়ে সেরে দেয়। হাকিম সাহেবেরও সেজন্য কেদারকে পছন্দ, যতই বকাঝকা করুক, কেদারকে না হলে তার দু'দণ্ডও চলে না।

কেদার বেরিয়ে এসে হাকিম সাহেবের দিকে তাকিয়ে রইল।

হাকিম বলল, উজবকের মতন দাঁড়িয়ে আছিস কেন? শীগ্‌গির পঞ্চায়েত সাহেবের জন্য এক ছিলুম তামাক সেজে আন।

কেদার তবু নীরবে হাকিম সাহেবের দিকে চেয়ে রইল, কথা বলল না।

হাকিম ফোঁস করে উঠলো,—কথা কানে যায় না? যা শীগ্‌গির তামাক সেজে নিয়ে আয়।

কেদার তবু ইতস্ততঃ করছে দেখে হাকিম বলল, কি বোবা হয়ে গেলি নাকি? কথা থাকে ত বল্‌না?

এতক্ষণে কেদার কথা বলল, ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, কোন হুঁকো?

রাগে হাকিমের পিত্তি পর্যন্ত জ্বলে গেল—ঠিক এই প্রশ্নেরই ভয় ছিল তার মনে। নজুমিয়াকে সে নিজে ডেকেছে, তামাক খেতে বলেছে—এসব কথা ঠিক, কিন্তু তবু সে যে হেলে চাষী, নিজের হাতে লাঙল ধরে—সে কথাটা হাকিমের মনে খচখচ করছিল। সে ভেবেছিল যে কেদার সরকারী ডাবা হুঁকো নিয়ে আসবে, কিন্তু কথাটা যখন নজুমিয়ার সামনে উঠেছে, তখন আর কি করে? মুখটা খানিকটা বেঁকিয়ে বলল, তোর আজো আক্কেল হলনা? সব কথা বলে দিতে হবে। দেখছিস্‌না পঞ্চায়েত সায়েব এসেছে, যা গড়গড়ায় এক ছিলুম তামাক ভাল করে সেজে আন্।

কেদার ভিতরে চলে গেল। হাকিম সাহেব আর একবার কেশে গলা ঝেড়ে বলতে সুরু করল, পঞ্চায়েত সাহেব, আপনারা দু'চার ঘর আশরাফ আছেন বলেই এ তল্লাটে থাকা যায়, তা নইলে এ গেরদে সব খালি জংলী চাষার দল।

নজুমিয়া রহস্য ঠিক বুঝতে না পেরে গম্ভীর ভাবে দাড়ীর মধ্যে আঙ্গুল বুলোতে লাগল। হাকিম বলল, না, না পঞ্চায়েত সাহেব, হক কথা বলব, তাতে কাউকে রেয়াৎ দেবনা। এ তল্লাটে আপনার কথা কেনা জানে? সেদিন পদ্মাপারের বিদেশী কয়েকজন এসেছিল দাওয়াইয়ের জন্য, জিজ্ঞেস করলো এ অঞ্চলের পঞ্চায়েত কে? আপনারা নাম বলতেই হাঁ হাঁ করে উঠলো, বলল, হ্যাঁ নাম শুনেছি—নামদার গুণী লোক।

নজুমিয়া মনে মনে খুবই খুসী হল, কিন্তু বাইরে ভাবখানা দেখাল যে এ আবার কি একটা নতুন কথা! তার মত পঞ্চায়েত পদ্মার এপারে ওপারে

কোথাও নাই এতো জানা ব্যাপার। তাই দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে একটু মাথা হেলিয়ে বলল, কি যে বলেন হাকিম সাহেব, আপনারা আছেন বলেই দূর দেশবিদেশ থেকে লোক আসে, আমাদের মতন গরীব গোরবার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়। দু'চার জনে যে চেনে শোনে সেওতো আপনারই দোয়ার বরকত।

গড়গড়া সাজিয়ে কেদার ফরাসের উপর রাখল, টিকে ধরিয়ে ছিলুমে ফুঁ দিতে লাগল।

হাকিম বলল, তাহলে আজ্ঞা হোক পঞ্চায়েত সায়েব।

নজুমিয়া বলল, সেকি হয়, আপনি হলেন গণ্যিমান্যি লোক, মুরুব্বী। আপনি দুটান দিলে তবে আমরা পাব।

হাকিম বলল,—না না পঞ্চায়েত সায়েব, আপনি হলেন একে অতিথি, তাতে পঞ্চায়েত। আপনি সুরু করুন, আমি পরে নেব।

নজুমিয়ার মনের ইচ্ছাও তাই—তবু ভাবল সেইবা ভদ্রতায় কম যাবে কেন? বলল, সে হয় না হাকিম সাহেব, এ তল্লাটে আপনি সকলের মাথার মণি, আমরা ত খালি হুকুম বরদার। আপনার না হলে কি আমরা হুঁকো নিতে পারি?

হাকিম সাহেব আর কিছু না বলে হুঁকোয় টান দিল—এক রাশ ধোঁয়া বের করে চোখ বুজে আরামের স্বরে বলল,—আঃ।

নজুমিয়া ভেবেছিল যে হাকিম বুঝি আরো সাধাসাধি করবে, আর ঠিক করে রেখেছিল যে আর একবার বললেই সে হুঁকো নেবে। হাকিম তা না করায় একটু মনোক্ষুণ্ণ হল। কিন্তু সে নিজেই হাকিমকে পীড়াপীড়ি করেছে, তাই কোন কথা না বলে চুপ করে বসে রইল।

হাকিম হুঁকোয় জোর জোর দু'চার টান দিয়ে নাকে মুখে ধোঁয়া বের করে হাসতে হাসতে বলল, এবার একটা কাজের কথা বলি পঞ্চায়েত সায়েব। আমার একটা কাজ করে দিতেই হবে, না বললে শুনবনা।

নজুমিয়া একটু বিনীত হয়ে বলল, হুকুম করুন হাকিম সায়েব। আপনার কথা কি কোনদিন ঠেলেছি, সাধ্যমত করিনি?

হাকিম দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলল,—সাতগাঁ থেকে লোক আসে এ হাটে, সকলের মুখে এক কথা, এ তল্লাটে পঞ্চায়েত থাকে তো নজুমিয়া। এইতো সেদিন কয়েকজন বিদেশী এসেছিল। নোয়াখালি না ত্রিপুরা কোথাকার

লোক। হাটে এসে কি জোরজার, প্রথমে কারো কোন কথাই শুনবেনা, তারপরে যেই বেপারীরা বলল যে তবে চল পঞ্চায়েত নজুমিয়ার কাছে, সালিশ বসবে, অমনি বাছাধনেরা জব্দ। একেবারে ভিজে বেড়াল, আর কথাটী নাই।

নজুমিয়া মনে মনে আবার খুসী হয়ে উঠলো, নিজের সুখ্যাতি শুনে কে না খুসী হয়? একবার হুঁকোর দিকে তাকাল, ভাবল হাকিম একবার হুঁকোটা ছাড়লে হয়, দু'টানে একেবারে কলকে সাফ করে দেব। মুখে বলল, আমরা সামান্য লোক, আপনাদের আশ্রয়ে আছি, আপনারা দুটো ভালকথা বলেন বলেই অন্যলোকে সুখ্যাতি করে। হাকিমের হঠাৎ চোখ পড়ল—নজুমিয়ার দৃষ্টি হুঁকোর দিকে। তাড়াতাড়ি হুঁকো এগিয়ে দিয়ে বলল,—আমার যে কি হয়েছে, সামনে গণ্যিমাণ্যি অতিথি, আর আমি নিজে হুঁকো টেনে চলেছি! নেন, নেন পঞ্চায়েত সায়েব।

নজুমিয়া হুঁকো নিয়ে জোরে টান দিল—কল্কিতে তামাক বিশেষ ছিলনা, নারকোলের ছোবড়া আর টিকেতেই কল্কে ভর্ত্তি—ফস করে জ্বলে নিবে গেল। নাকে মুখে খানিকটা ধোঁয়া ঢুকে পড়ায় নজুমিয়ার খকখক করে কাশতে লাগল।

হাকিম যেন একটু বেজার হল। মনে মনে ভাবল, কি জঙলী। হুঁকো একটু রয়ে সয়ে টান দেবে, তার আর তর সইলনা, গোঁয়ারের মতন একটানে কল্কে সাফ করে দিল! কিন্তু নজুমিয়ার কাছে তার দরকার। তাই অসন্তোষ চেপে হাসি হাসি ভাবে বলল, তা আপনাদের দোয়ায় দু'দশ গাঁয়ের লোক এ গরীবের কাছে দাওয়াই নিতে আসে, আর সুযোগ পেলেই আমি আপনাদের কথা দু'চারটা বলি। গাঁয়ের পঞ্চায়েতের মান বাড়লে তাতে আমাদেরই মান বাড়ে। কিন্তু লোকে যে আমার কাছে আসবে, তার জন্য আমারও তো কিছু মালমশলা চাই।

নজুমিয়া সায় দিয়ে বলল অবশ্য, অবশ্য। দরকার পড়লে আমরা সবাই আপনার কাছে ছুটে আসি, আর ওস্তাদের দোওয়ায় আপনার হাত যশ তো দিন দিন বেড়েই চলছে।

হাকিমের দাড়ীর ফাঁকে একটু হাসি দেখা দিল, বলল, আপনারা দু'দশ রকমের মালমশলা এনে দেন বলেই আমার হাত যশ! আর সেই জন্যই তো আজ আপনাকে কষ্ট দিলাম পঞ্চায়েত সায়েব। শুনলাম আপনার দশ বছরের ছেলে, এখনো যার নাক টিপলে দুধ বেরোয়, সে নাকি একলা বিশ হাত কুমীর মেরেছে। একবার মনে হল সে কি করে হবে, দুধের বাচ্চা

কি অত পারে? আবার ভাবলাম এতো কেউ কেটা নয়, পঞ্চায়েতের ছেলে, বাপ্‌কা বেটা—বাচ্চা বলে হবে কি, একেবারে জাতসাপ!

নিজের রসিকতায় হাকিম নিজেই হো হো করে হেসে উঠলো। 'জাতসাপ' কথাটা নজুমিয়া পছন্দ করেনি, কিন্তু হাকিম সুখ্যাতি করেই কথাটা বলেছে, তাই আর রাগ করে কি করে? একটু শুখনো হাসি হেসে বলল,—মুখের উপর তো আর ট্যাক্সো নাই, যার যা খুসী বললেই হল।

হাকিম সায়েব নজুমিয়ার কথা শুনে খানিকটা দমে গেল। তার কাছে কুমীরের কলজে আর গুরদো পাবে এই আশাতেই নজুমিয়াকে এত খাতির, তা নইলে হাকিম সাহেব কখনো চাষাভূষোর সঙ্গে এত মাখামাখি করে? একটু হতাশসুরে বলল,—তাহলে কি এ কেবল বানানো কথা? আপনার ছেলে কুমীর মারেনি? এমন ভাবে অকারণে যারা মিছে কথা বলে, কোন দোজখে যে তাদের জায়গা হবে কে জানে!

নজুমিয়া হেসে উঠে বলল,—একেবারে ষোল আনা মিছে কথা নয় হাকিম সায়েব, আর খাঁটি সত্যি কথাও নয়। কুমীর একটা মারা পড়েছে, তবে আমার ছেলেও একলা হাতে তাকে মারেনি, আর কুমীরও বিশহাতি কুমীর নয়।

হাকিম সাহেব বলল,—তা বিশহাতি না হোক, দশহাতি তো হবে, আর যদি দশহাতি না হয়, তবে পাঁচহাতি তো নিশ্চয়ই। আমার কাজ তাতেই হবে। বহুদিন থেকে কুমীরের কলজে আর গুরদো খুঁজছি, একবার যদি পাই তবে এমন দাওয়াই বানিয়ে দেবো যে হুই কুড়ির বুড়ির মুখে পনেরো বছরের ছুঁড়ির জেল্লা আসবে, থুরথুরে বুড়ো বিশ-বছরের জোয়ানের মুরোদ ফিরে পাবে। পঞ্চায়েত সায়েব, ও কলজে আর গুরদো আমাকে দিতেই হবে। বলে উৎসাহে আর উত্তেজনায় হাকিম নজুমিয়ার হাত চেপে ধরল।

নজুমিয়া অপ্রস্তুত হয়ে আমতা আমতা করে বলল,—আমরা মুখ্য সুখ্যু মানুষ, আমরা কি এত সব জানি? কুমীরের নখ আর চামড়া রেখে বাকী কুমীর ফেলে দেয়েছি। আগে যদি জানতাম হাকিম সায়েব আপনার দাওয়াইয়ের কাজে লাগবে, তবে গোটা কুমীর এনে হাজির করতাম।

নিস্ফল রাগে হাকিমের পিত্তি পর্য্যন্ত জ্বলে গেল। মিছামিছিই সে নজুমিয়ার এত তোয়াজ করেছে! কোথাকার হেলে চাষা—হলোইবা পঞ্চায়েত—সে কখনো জায়গা পায় তার ফরাসে, তার দহলিজে? যার সঙ্গে তুই, বড় জোর তুমি বলা চলে, তাকে কিনা এতক্ষণ আপনি আপনি করেছে? আর নজুমিয়ার

আক্কেলই বা কি ! হাকিম না হয় ভদ্রতা করে তাকে ফরাসে বসতে বলেছে, তাই বলেই কি এসে চেপে বসতে হবে ? একটা কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান তো থাকা চাই।

হাকিমের একবার ইচ্ছা হ'ল, নজুমিয়াকে বলে যে কাঠের তক্তপোষই তার জন্য ঢের, সে এল কোন সাহসে ফরাসে বসতে ? কিন্তু সে তো নিজেই তাকে ডেকে বসিয়েছে। তাই মুখ ফুটে কিছু বলতে ভরসা পেল না, একে গোঁয়ার গোবিন্দ, তাতে আবার পঞ্চায়েত, মুখের চেয়ে আগে চলে হাত, ধাঁ করে এক চড় বসিয়ে দিলে হাকিমের ইজ্জত থাকবে কোথায় ?

কোনো মতে রাগ চেপে হাকিম বলল, তা কুমীর যদি ফেলে দিয়ে থাকা হয়, তবে আর কি করা যাবে ? সেদিন আসগর মিয়া বলছিল সে আমাকে একটা গোটা কুমীর এনে দিবে।

একে আসগরের নাম, তাতে হাকিমের ঠেস দিয়ে কথা, নজুমিয়া কম যাবে কেন ? সমান শ্লেষের স্বরে সে বলল, তাহলে আর দেরী কেন ? কেদার হামামদিস্তা নিয়ে আসুক, অসুদ তৈরী সুরু হয়ে যাক, আমরা গরীব মানুষ বিদেয় হই।

হাকিম অনেক কষ্টে রাগ চাপা দিল। হঠাৎ তার নজর পড়ল নজুমিয়া ফরাসে পা মেলে বসেছে। মস্ত বড় চাষাড়ে পা, রোদ্দুরে বিষ্টিতে জলকাদা ভেঙে কড়া পড়ে গেছে। হাকিম ভাবল,—চাষার বেটার আস্পদ্দা ত কম নয়, এক হাঁটু ধূলো নিয়ে বসেছে আমার ফরাসে। ফস করে বলে বসল, তা এখন যখন টাকা পয়সা হয়েছে, জুতো ব্যবহার করা হয় না কেন ?

হাকিমের কথায় নজুমিয়ার এত হাসি পেল যা তার শ্লেষ নজুমিয়ার দৃষ্টি এড়িয়ে গেল। এমন জোরে হেসে উঠল যে হাকিম ভয় পেয়ে গেল। প্রচণ্ড হাসির তোড় কোন রকমে সামলিয়ে নজুমিয়া বলল, কি যে বলেন হাকিম সাহেব—চাষার ছেলে দেবো জুতো পায়ে ? খোদা তাহলে পা দিয়েছে কিসের জন্য ? আর আপনাদের জুতোর মজাও বুঝি না। একবার চাপাচাপিতে জুতো কিনে পায়ে দিয়েছিলাম। ফোস্কা পড়ে সাতদিন সে কি কষ্ট ! না হাকিম সায়েব, আমাদের চাষাভুষোর জন্য এসব নয়—এসব হ'ল আপনাদের জন্য।

হাসির তোড়ে নজুমিয়ার মন আবার প্রসন্ন হয়ে উঠল, কিন্তু হাকিমের রাগ পড়ল না, বরং বেড়ে গেল। তার মনে হল যে নজুমিয়া বুঝি তাকেই ঠাট্টা করছে। মুখ কালো করে কঠিন স্বরে বলল, তা জুতো পরতে যদি এতই কষ্ট,

তবে ভদ্দর লোকের ফরাসে বসার সখ কেন ? আর বসতে হলেও অন্ততঃ পা দুটোতো ধুয়ে নেওয়া যায়।

নজুমিয়ার হাসি বন্ধ হয়ে গেল—চোখ দু'টো ধক্ করে জ্বলে উঠল। দাঁত কামড়ে মুঠো পাকাতেই হাকিমের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল, ভাবল এই বুঝি নজুমিয়া তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। রসিকতার ব্যর্থ চেষ্টা করে তাড়াতাড়ি বলল, তা এখানে তো আর লাল টুকটুকে পা-ধোওয়ানী মিলবে না। কেদারকে পানি আনতে বলব ? বলেই চেঁচিয়ে উঠলো—কেদার।

নজুমিয়া তাকে গ্রাহ্যও করলো না—খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। চার হাত লম্বা জোয়ান, রাগে যেন আরো লম্বা দেখাচ্ছে। বহুকষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে তিক্ত কণ্ঠে বলল, আমরা চাষী—চাষীর ছেলে, ভদ্দর লোকের রেওয়াজ জানিনা। ঘরে ডেকে এনে মানুষকে অপমান করাই বোধ হয় আপনাদের মতন ভদ্দর লোকের ব্যবহার।

উত্তরের অপেক্ষা না করে লম্বা লম্বা পা ফেলে নজুমিয়া বেরিয়ে গেল। হাকিমও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো, কেদারকে আবার চেঁচিয়ে ডাকল। সে এসে হাজির হওয়া মাত্র তার উপরে ঝাল ঝাড়তে সুরু করল। কেন সে ফরাস উঠিয়ে রাখেনি ? কেন গড়গড়ার কথা জিজ্ঞেস করতে গেল ? কেন বলেনি যে গড়গড়া ভেঙে গেছে ?

হাকিম গজর গজর করতে লাগল, আর কেদার নিঃশব্দে ফরাস উঠিয়ে হাকিমের সামনেই ঘটা করা ধূলো ঝাড়তে সুরু করলো।

তিন

ধুলদীর হাট তো কেবল হাট নয়—ও তল্লাটের জীবন কেন্দ্র। সওদা করতে যারা আসে, তারা তো আসেই, সঙ্গে সঙ্গে আসে গাঁয়ের মোড়ল মাতব্বর আর যত বেকারের দল। বেচা-কেনা চলে, সঙ্গে সঙ্গে চলে গল্প গুজব গুলতানি, খবরাখবরের লেন-দেন। কারু ধান কাটবার জন্য কিষাণ চাই—ধুলদীর হাটে চলে যাও, দু'জন চাই তো চারজন মিলে যাবে। গরু চরাবার রাখাল চাই, ঘর ছাইবার ঘরামি চাই—একবার হাটে পৌঁছুলে আর লোকের অভাব থাকবে না। কত বিয়ে-সাদীর ফয়সালাও এই হাটে বসেই হয়ে গেল। এক ছিলুম তামাক আর দু'গণ্ডা বিড়ি খরচ করতে পারলে বাঘের দুধেরও হদিস মিলে যাবে—হাট বাজার তো খেলার কথা।

নজুমিয়াও কিষাণের খোঁজেই এসেছিল হাটে, হাকিমের পাল্লায় পড়ে তার সারা সকালটাই মাটি হ'ল। মনখারাপ হয়ে গেল তার। সকালে যখন হাটে এসেছিল, তখন এমনভাবে চলাফেরা করছিলো যেন যুদ্ধ জয় করে এল। সবাই সমীহ করেছে, কানাঘুষা করেছে, বলেছে, দশ বছরের বাচ্চা একলা হাতে কুমীর মেরেছে—সে কি সহজ কথা ? এমন বাপের ব্যাটা না হলে কি তা হয় ?

হাকিমের পাল্লায় পড়ে সারা সকালটাই মাটি হয়ে গেল। মনে হল, হাটের লোক যেন তাকে তামাসা করেছে, টিটকারী দিচ্ছে। ডাইনে বাঁয়ে কোন দিকে না তাকিয়ে হনহন করে চলল হাটের মধ্য দিয়ে, দু'একজন কথা বলতে এসেও কোন সাড়া পেল না। এতে তারাও বলাবলি করতে সুরু করল, ভারীতো পঞ্চায়েত, না হয় এক বাচ্চা কুমীরই মেরেছে, তাতেই এত গুমোর।

নজুমিয়া কোন কথায় কান না দিয়ে সিধে নিজের নৌকায় ফিরে গেল। ঘাটে নৌকো বাঁধা, ইদ্রিস বসে হুঁকো খাচ্ছে, বাকী কারু দেখা নাই।

রাগে নজুমিয়া ফুলছিল। এখন সামনে উপযুক্ত পাত্র দেখে জ্বলে উঠল। বলল, রমজান কই ? কিষাণ নেওয়া হয়েছে ?

ইদ্রিস ধীরে সুস্থে হুঁকোয় আর একটান দিয়ে বলল, তোমার জন্যই তো বসে আছি সর্দ্দার। কয়েকজন কিষাণ এসেছিল, মজুরীর কথাবার্ত্তাও খানিকটা হয়েছে। তুমি ছিলে না বলে পাকা কথা হয়নি। তারা আবার আসবে বলে গেছে। আর রমজানও তোমাকে খুঁজতে গেছে।

ইদ্রিসের কথায় নজুমিয়ার গা জ্বলে গেল—বলল, আমাকে ডাকতে গেছে তো ভারী কীর্ত্তি করেছে! সব কাজ যদি আমাকে করতে হয় তবে তোমাদের এনেছি কেন ? কিষাণ পাওয়া আজকাল একে মুস্কিল, তাতে হঠাৎ কাজের চাপ বেড়ে গেছে। সবাই কিষাণ চায়। সেই কিষাণই যদি এল, তবে তাদের সঙ্গে কথা পাকা না করে ছেড়ে দিলে কেন ?

ইদ্রিস বলল, তোমার হুকুম ছাড়া দর ঠিক করব, শেষে যদি তোমার মনমত না হয়।

নজুমিয়া বলল, কু'কাজের বেলা তো আমার জন্য বসে থাকনা—দরকারী কাজ না করবার বেলা খালি আমার দোহাই। আমি ভাবছি এতক্ষণ সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে, এসেই নৌকা ছেড়ে দেব। দেখছি একটা কাজও হয় নি। রমজান বেটাই বা গেল কোথায় ? ষাঁড়ের মতন চেহারা, বুদ্ধিও ষাঁড়ের মত।

ইদ্রিস নজুমিয়াকে ভাল করেই জানে, তাই তার কথার সোজা উত্তর না দিয়ে বলল, কি হয়েছে পঞ্চায়েত ? হাটে কারো সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছে নাকি ? হুকুম কর, তার মাথা নিয়ে আসি।

নজুমিয়া বলল, সব কথায়ই ফোড়ন দেওয়া চাই তোমার। সামান্য কাজ দিলে তা-ও পার না, আর কথার বেলায় তো বাহাদুর সিং। যাও, নিজের চরকায় তেল দাও গে।

ইদ্রিস দমবার পাত্র নয়, বলল, তাইতো তোমার হুকুম চাই পঞ্চায়েত। মনিষ না পেয়ে রমজান তোমার খোঁজে গেছে। আর আম্মাজানের ফরমায়েসও ছিল কয়েকটা, সেগুলোও কিনে আনবে। তসবি ছিঁড়ে গেছে, তার গোটাকয়েক দানা চাই। কালিজিরে চাই, আর চাই সুঁই সুতো। মালেক মিয়া বলে দিয়েছে যে তার জন্য ছোট একটা দাও কিনতে হবে। আর আসল কথাই বলতে ভুলে গেছি পঞ্চায়েত, আম্মাজান বলছিলেন যে আবার তার বাতের ব্যথা উঠেছে। হাকিম সায়েবের কাছে একটা ভাল মালিস নিতে হবে। তা শুনলাম তুমি হাকিমের ওখানে গিয়েছিলে। মালিস এনেছো তো ?

নজুমিয়া বারুদের মতন জ্বলে উঠলো, হাকিম না তোর মাথা— কোথাকার এক ঠক উজবগ এসেছে, আর তোর মতন বেওকুফদের মাথায় হাত বুলিয়ে পয়সা লুঠছে।

এবার ইদ্রিস একটু আশ্চর্য্যই হল। নজুমিয়ার সঙ্গে হাকিম সায়েবের সদ্ভাবই সে দেখেছে—আজ সকালেও হাকিমের দহলিজে বসে নজুমিয়া গল্প করছে একথা লোকের মুখে শুনেছে। নজুমিয়াকে বলল, বা, বেশ কথা পঞ্চায়েত! তোমার দোস্ত বলেই তো সবাই হাকিমকে এত খাতির করে, আজও শুনলাম যে সারা সকাল তার ফরাসে বসে তামাক খেয়েছো। আর এখন বলছ—হাকিম বেটা ঠগ উজবগ!

নজুমিয়া নিজেও একটু লজ্জিত হয়েছিল—গাঁয়ের মাতব্বর সে, দশ গাঁয়ের লোক তার কাছে আসে বিচার আচারের জন্য, তার কি এমন ছেলেমানুষের মতন চেঁচামেচি সাজে? সত্যিই তো সে হাকিমের দহলিজে গিয়েছিল, আর এখন মনে পড়ে গেল যে তার মার বাতের ব্যথার জন্য অসুদ চাইবে বলেই গিয়েছিল। রাগারাগিতে সে কথা আর মনে পড়েনি। বলল, তোমরা বাড়াবাড়ি কর বলেই রাগ লাগে। একটা লোকের সঙ্গে দুটো কথা বললেই সে দোস্ত হয়ে গেল ? অসুখ বিসুখের সময় সামনে যাকে পাওয়া যায়, লোকে

তার কাছ থেকেই অসুদ নেয়, আমরাও দু' একবার হাকিমের দাওয়াই নিয়েছি। কিন্তু তাই বলে আমাদের কোবরেজ মশায়ের সঙ্গে ওর তুলনা হয়? এবার কোবরেজ মশাইয়ের কাছ থেকে এমন অসুদ নেবো যে আর কোনদিন আম্মার বাতের কষ্ট হবে না। শুনেছি, কুমীরের কলজের তেল মালিস করলে বাত সারে, একটা বড় কুমীর পেলে কোবরেজ হাকিম কারু কাছেই যাওয়ার দরকার হবে না।

এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে রমজান এসে হাজির। এসেই বলল,—চল পঞ্চায়েত, চল শিগগির।

রমজানকে দেখে নজুমিয়া আবার জ্বলে উঠলো, বলল, নওয়াব সাহেবের এতক্ষণ দেখাই ছিল না, আর এখন এসেই হুকুম—চল শিগগির। কোথায় যেতে হবে? কোন চুলোয়?

রমজান দাঁত বের করে হাসতে লাগল—বলল, কি যে কথা বল পঞ্চায়েত। আমি এলাম ছুটতে ছুটতে খবর দিতে। খবর শুনবে, না আমাকে গালমন্দ দিতে সুরু করলে।

নজুমিয়া বলল, কাজকর্ম্ম ছেড়ে কোন ধান্ধায় ঘুরে বেরাচ্ছ, তুমিই জান। এখন নওয়াব সাহেব ফিরে এসেছে, ফুলের মালা নিয়ে তার খাতির করতে হবে।

রমজান বলল, আগে কথা শোনো, তার পরে যা খুশী হুকুম দিও। এখানে কয়েকজন কিষাণ এসেছিল, তাদের সঙ্গে দরে বনিবনা হচ্ছিল না বলে আমি তোমার খোঁজে গেলাম। এর মধ্যে দেখি সে লোকগুলো ঘোরা ফেরা ক'রে আসগর মিয়ার নৌকোতে উঠলো।

আসগর মিয়ার নাম শুনে নজুমিয়ার পিত্ত পর্য্যন্ত জ্বলে উঠলো, বলল, হায়রে আমার কপাল। এমন মানুষ আমি রেখেছি যে আমার দরকারের কিষাণ পাঠিয়ে দেয় আমার দুষমনের ঘরে। খোদা তোদের মোষের মতন গতর দিয়েছেন বলে আক্কেলটাও মোষের মতন হতে হবে? একথা বুঝলি না যে আমার ফসল যদি ঘরে না উঠে, তবে তোরাও না খেয়ে শুকিয়ে মরবি?

রমজান মুখ ভার করে বলল,—তোমার সঙ্গে পারা যায় না সর্দ্দার। আমরা প্রাণপণ খাটি তোমার ভালোর জন্য, আর তুমি আমাদের গালমন্দ কর। আমার কথাটা আগে শোনো, পরে যা বলবার বলো।

নজুমিয়া বলল, কি এমন কথা, বলো?

রমজান গম্ভীর ভাবে এদিক ওদিক তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, জানো পঞ্চায়েত, এখানে এক মস্ত ফকীর এসেছে—কামেল ফকীর।

এত রাগের মধ্যেও নজুমিয়া না হেসে পারল না। বলল, ফকীর এসেছে তো আমার মাথা কিনে নিয়েছে।

রমজান কানে হাত দিয়ে বলল, এসব কথা বোলো না পঞ্চায়েত—অলিআল্লা, দরবেশ—আমাদের মনের কথা জানে। তার নাম নিয়ে হাসি ঠাট্টা কোরো না।

নজুমিয়া বলল, বুঝলাম, মস্ত ফকীর, কিন্তু তাতে তো আর আমাদের ক্ষেতের ধান ঘরে উঠে আসবে না।

বলতে বলতেই তার রাগ ফিরে এল, বলল, তোমাদের বললাম যে কিষাণের খোঁজ কর, তা একজন নৌকোয় বসে হুক্কা টানছেন, আর একজন হাটভরে ফকির দরবেশ তল্লাস করে বেড়াছেন।

রমজান বলল, ফকীর দরবেশ কিনা পারে? জানো সে তোমার কথা সব জানে। জিজ্ঞেস করছিল। আর তোমাকে তলব দিয়েছে। তাই তো আমি উঠতে পড়তে ছুটে এলাম।

নজুমিয়া বলল, ছুটে এসেছো তো আমার মাথা কিনে নিয়েছ। কিন্তু ক্ষেতের ধান কাটবে কে সে মামলার তো ফয়সালা হোল না।

রমজান বল্‌ল, ফকীরের দোওয়া পেলে তারও দেরী হবে না—অই আসগর মিয়ার নৌকা থেকেই তোমার কিষাণ মিলবে।

দৈবাতের কথা কে বলতে পারে? রমজানের কথা প্রমাণ করবার জন্যই যেন কিষাণের দল আসগর মিয়ার নৌকো থেকে ফিরে এল। তারা মজুরী চেয়েছিল অসম্ভব বেশী। সে জুলুম আসগর মিয়া সহ্য করেনি, সাফ জওয়াব দিয়ে দিয়েছে। এখন তারাও একটু ভড়কে গিয়েছে, অন্য দিকে নজুমিয়াও লোক পাওয়ার জন্য ব্যস্ত। আর তাছাড়া আসগর মিয়ার উপর টেক্কা দেওয়ার ইচ্ছাও খানিকটা রয়েছে। তাই বেশী দরাদরির প্রয়োজন হ'ল না, সহজেই একটা রফা হয়ে গেল।

রমজান বলে উঠলো, দেখলে পঞ্চায়েত ফকিরের কেরামতী? তোমার উপর ফকির সাহেবের নজর ভাল। অলি আল্লার দোওয়ার বরকতে অসম্ভব সম্ভব হয়ে যায়, আর পয়সা দিয়ে মজুর রাখবে, এতো মামুলী কথা।

নজুমিয়া এবার আর কথাটা একেবারে ঠেলতে পারল না। একটু চিন্তা

করে বলল, আসগর যে কঞ্জুষ, তার সঙ্গে বনিবনা হওয়া সোজা কথা নয়। সেখানে কাজ পায়নি বলেই মজুরেরা ফিরে এল, তা নইলে ফকিরের জারিজুরি খাটত না।

রমজান নিজের দু'গালে থাপড় দিয়ে বলল, তোবা, তোবা, এমন কথা বোলোনা, পঞ্চায়েত। কামেল দরবেশ যেমন ভালও করতে পারে, ওনারা বেজার হলে তেমনি বেহদ লোকসানও করতে পারে।

নজুমিয়া তার আতঙ্ক দেখে হেসে ফেলল, বলল, আরে এখনও তো ফকীরের বরদোওয়া লাগেনি, এখনই এত ডর কেন? আর যে মানুষ অলি আল্লা, সে কি অত সহজে বেজার হয়?

রমজান বলল, ওনাদের কথা বলা যায় না। কখনো হাজার গুণা মাফ করে দেন, আবার কখনো একটা কথার তর সয়না।

নজুমিয়া বলল, আর যাই হোক, ফকীরের একটা কেরামতী না মেনে উপায় নাই—একবার দেখেই তোমার দেখছি অগাধ ভক্তি।

রমজান ব্যগ্র ভাবে বলল, তা পঞ্চায়েত আমি যা দেখেছি, তা দেখলে তোমারও মন গলে যেতো।

খানিকটা কৌতুহলের সঙ্গে নজুমিয়া জিজ্ঞাসা করল, কি দেখেছ?

রমজান অনেক কথা বলল তার মধ্যে বাজে কথা আর দ্বিরুক্তি বাদ দিলে এই দাঁড়ায়—নজুমিয়াকে সে সারা হাট খুঁজে বেড়াচ্ছে, এমন সময় দেখল যে হাটের পূব কোনে যে বুড়ো বটগাছ, তার চারদিকে লোকের হুল্লোড়। এমনি তো জায়গাটা এককোণে, তাতে আবার ওখানে এসে বেদেরা প্রায়ই আড্ডা গাড়ে, এত ময়লা করে রাখে যে ও তল্লাটে কেউ যেতে চায় না, ওখানে এত ভিড় দেখে সে ভাবল ব্যপার কি? কাছে গিয়ে দেখে গাছের পাশে ছোট ঝোপড়া উঠেছে। চারদিকের জায়গাটা সাফ করে লেপে ধোওয়া পোছা—মাঝখানে গেরুয়া আলখাল্লা পরে জায়নামাজ বিছিয়ে এক ফকীর বসে আছে। মাথায় সবুজ পাগড়ী, হাতে তসবীহ, মুখে সাদা ধবধবে দাড়ী, চেহারায় শান্ত ভাব। দেখলেই ভক্তি আসে। চারদিকে ভিড়, ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ সবাই জটলা করছে, কিন্তু সবাই চুপচাপ—ফকীরের ধ্যান ভাঙাবে সে সাহস কারু নাই। শেষে মতির মা—তাকে তো জান, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে আর ছেলে বিবাগী হওয়ার পর থেকে তার নিজেরও মাথার ঠিক নাই—সে এগিয়ে বলল, বাবা, হুকুম দাও তো একটা কথা বলতে চাই।

ফকীর চোখ মেলে তার দিকে তাকাল, বলল, কি জিজ্ঞেস করবে মা? তোমার ছেলের কথা?

ভিড়ের মধ্যে যেন একটা চমক খেলে গেলো—ফকীর বিদেশী, কেউ তাকে আগে কোনদিন দেখেনি। সে কি করে জানল যে ছেলে হারিয়ে মতির মা পাগলাটে হয়ে গেছে।

মতির মা ফকীরের দু'পা জড়িয়ে ধরল, বলল, বাবা তুমি'ত সব জানো, দয়া করে বল যে আমার মতি কোথায়? বেঁচে আছে তো? কবে ফিরবে? বিয়ে সাদী করেছে? ছেলেপুলে ক'জন?

পা সরিয়ে নিয়ে ফকির বলল, পা ছুঁও না মা—আল্লার হুকুম যে বান্দার পা ছুঁতে নাই। আর তা ছাড়া তুমি মায়ের বয়সী।

মতির মা বলল, ছল কোরোনা বাবা—তুমি দরবেশ, সব জানো, কথার উত্তর দাও।

ফকীর বলল,—একসঙ্গে এত কথা জিজ্ঞেস করলে জওয়াব দেব কেমন করে?

হঠাৎ ফকীরের চোখ বন্ধ, শরীর শক্ত হয়ে গেল। মতির মা কি বলতে যাচ্ছিল, ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন চাপা গলায় ধমক দিল, দেখছনা, ফকীর সাহেব চেল্লায় বসেছে।

ফকীরের মুখের দিকে তাকিয়ে মতির মাও একটু ভড়কে গেল। কোন কথা না বলে চুপ করে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

খানিকক্ষণ সবাই চুপচাপ। হঠাৎ বিকট শব্দে সোবহান আল্লা বলে ফকীর চোখ মেলে চাইল। শূন্য দৃষ্টিতে এদিকে ওদিকে তাকিয়ে মতির মার উপর চোখ পড়তেই বলল, তুমি তোমার ছেলের কথা জানতে চাইলে? সে ভাল আছে এবং শীগগিরই বউ নিয়ে দেশে ফিরবে।

মতির মা'র মুখ খুসীতে ভরে উঠলো। বলল, কবে আসবে বাবা?

ফকীর কিন্তু তার কথার আর কোনো উত্তর দিল না—এক কোণে দাঁড়িয়ে এক থুড়থুড়ে বুড়ো ফকীরের নজরে আসবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছিল, তার দিকে তাকিয়ে বলল, কিছু বলতে চাও বাবা?

বুড়ো কিছু বলবাব আগেই মতির মা আবার বলে উঠলো, আগে আমার কথার জওয়াব দাও ফকীর সাহেব।

এবারও ফকীর তার কথার জওয়াব দিল না। ভিড়ের দিকে তাকিয়ে

বলল, আমার পীর মোরশেদের হুকুম ধুলদীতে আমাকে থাকতে হবে। যদি আল্লার রহম হয়, তবে দু'চার জনকে হেদায়েতও করতে পারি।

মতির মা আবার বলে উঠলো—বাবা, আমার কথাটার জওয়াব দিলে না ?

এবার তার দিকে তাকিয়ে ফকীর গম্ভীরভাবে বলল, কে কার কথার জওয়াব দেয় মা ? আল্লাতালার দয়া হলে মাঝে মাঝে পরদা খুলে যায়, আগামীকালের দু'একটা ছবি দেখতে পারি। বেশী যারা ভবিষ্যৎ নিয়ে টানা হেঁচড়া করে, আল্লাতালা তাদের শাস্তি দেন।

তার গলার আওয়াজ যেন গমগম করতে লাগল। মতির মা সহজে কারু পরোয়া করে না, সেও একটু ভয় পেয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল।

আবার খানিকক্ষণ সব চুপচাপ। হঠাৎ তার মধ্যে খিনখিনে সুরে কথা কয়ে উঠলো হামদুমিয়া। রোগা লিকলিকে ছোটখাট মানুষ। মুখের চামড়া এমন কুঁকড়ে গেছে যে কোনদিন সমান ছিল বলে মনে হয় না। বিনিয়ে বিনিয়ে নিজের দুঃখের কাহিনী বলতে সুরু করল। ইয়া জোয়ান বেটা ছিল ছয় ছয়টা। এখন ঘর শূন্য, ভিটেতে বাতি দেওয়ার লোক নেই। ফকীরের সামনে মাটীতে উপুড় হয়ে পড়ল, কপাল চাপড়িয়ে বলল যে ফকীর যদি তাকে দয়া করে, ভাল দাওয়াই দেয়, তবে আবার ছেলেপুলে হলে ঘরের জৌলুষ ফিরবে।

ভিড়ে একটা চাপা হাসির হররা লাগল। এক ছোকরা টিটকারী দিয়ে বলল, ছেলে চাও এ বয়সে, বউ কই ? সাত-সাতটা বউয়ের তো মাথা খেয়েছো, তোমাকে মেয়ে দেবে কে ?

হামদুমিয়া ফকীরকে মিনতি করে বলল, এসব হতভাগাদের কথা শুনো না বাবা। তুমি আমাকে দাওয়াই দাও, আমি নতুন বিয়ে করব।

মতির মা এবার ভেঙচি দিয়ে উঠলো—নতুন বিয়ে করব ? তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছ, এখন বিয়ের কথা বলতে লজ্জা করে না ?

হামদুমিয়া তারস্বরে বলে উঠলো তোমাকে কে ফোঁপড় দালালী করতে বলেছে ? আমার খুসী, আমি হাজারবার বিয়ে করব, তাতে তোমাদের কি ?

ফকীরের দিকে চেয়ে বলল, বাবা তুমি এদের কথায় কান দিও না। আমার বয়েস বেশী হয় নি, মোটে দুই কুড়ি দশ, খালি রোগে শোকে মন ভেঙে গেছে। রোদ বিষ্টিতে পুড়ে দেহ জ্বলে গেছে, তাই বুড়ো দেখায়। তুমি আমাকে দাওয়াই দাও বাবা! এসব আজকালকার বয়াটে ছোঁড়ারা আমার কাছে দাঁড়াতে পারবে না।

মতির মা হাঁ করে তাকিয়ে রইল, বলল, অবাক করলে তুমি হামদু চাচা। তোমার বয়স যদি দুই কুড়ি দশ হয়, তবে আমার তো এখনো জন্মই হয়নি। সেকি আজকার কথা, আমার যখন বিয়ে হয়, তখনই তো তোমার বয়স তিন কুড়ির কাছাকাছি।

ভিড়ের মধ্য থেকে আর একজন কে সায় দিল। বলল, আমারই তো বয়স আজ দু'কুড়ি দশ, যত দিন মনে পড়ে হামদু চাচাকে ঠিক একই রকম দেখে আসছি।

হামদু এবার খেঁকিয়ে উঠলো, আমার বয়স দু'কুড়ি দশই হোক আর তিন কুড়ি দশই হোক তাতে তোদের কি? আমার খুসী হয়েছে আমি বিয়ে করব—একবার করব, দশবার করব, হাজার বার করব।

ভিড়ের মধ্যে সবাই হেসে উঠলো, বলল, আমরা তো জানি যে চার বিবির বেশী পাঁচ বিবি চলে না। কোন নতুন সরায় হামদুমিয়া তুমি দশ বিশ হাজার বিয়ে করতে চাও?

ফকীর চোখ গরম করে তাকাতেই সবাই চুপ হয়ে গেল। সবাইকে শুনিয়ে ফকীর বলল, বুড়োকে জওয়ান করবার দাওয়াই অবশ্য আছে হামদুমিয়া, কিন্তু সে তো সহজে হয় না—তার জন্য অনেক খরচ লাগে।

হামদুমিয়ার চোখ খুসীতে ফেটে পড়ে, বলল, যা লাগে দেব বাবা। শুধু তুমি আমাকে দাওয়াই বাৎলে দাও। দরকার হয়, জমিজমা বেচে পয়সা জোগাড় করব। একবার জওয়ানী ফিরে পেলে যদি কোলে বেটা আসে, তবে জমি জমা আবার হবে।

ফকীর বলল, যদি সত্যি সত্যিই দাওয়াই চাও, তবে শনিবার দিনভর উপোষ করে বাদ মগরেব আমার সঙ্গে দেখা কোরো—আমি দাওয়াই দেব।

ভিড়ের মধ্যে এবার একটা ভাগাভাগি হয়ে গেল। ছেলেছোকড়ার দল চটে গেল, মুরুব্বী মাতব্বরেরা না থাকলে ফকীরকে হয়তো তারা খানিকটা নাজেহালই করত। বুড়োর দলের ভক্তি বেড়ে গেল—ফকীর বলে কি হামদুমিয়ার মতন চিমশে খটখটে পাটখড়ির মধ্যে আবার নতুন জওয়ানী ফিরিয়ে আনবে? কে জানে? ফকীর দরবেশ অনেক রকম কেরামত জানে, হয়তো এ ফকীরও তেমনি কিছু একটা শিখেছে। সোনার যৌবনের দিন, তাকে ফিরিয়ে আনতে মানুষ কিনা দিতে পারে?

ছোকড়ার দল খসে পড়ল, বুড়োরা আর মেয়েদের দল ফকীরকে ঘিরে

ধরল। কেউ চায় তাবিজ, সোয়ামির মন ফেরাবে। কেউ চায় যে ছেলে হোক, কেউ চায় যে ভুত পেত্নীর দৃষ্টি না লাগে। দেখতে দেখতে ফকীরের পসার জমে উঠলো কিন্তু ফকীর চালাক লোক, তাবিজই দিক আর দাওয়াই দিক, সবাইকে বলে, এ সব ইমানের কথা। ভক্তি থাকে তো ফল হবে আর ভক্তি না থাকলে ফল হবে না, তখন যেন দোষ দিও না।

চার

রমজানের ব্যাখান শুনে নজুমিয়া খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। দাড়ীতে হাত বুলোতে বুলোতে শেষে বলল, ফকীর সাচ্চা না মেকী বলা কঠিন। মতির মা'র কথা সবাই জানে, ফকীরও শুনে থাকবে। আর মতি ফিরবে বলছে, সে তো ভবিষ্যতের কথা। এখনো তো মতি ফেরেনি। হামতুকে যা বলেছে তা তো ষোল আনা বুজরুগি—তাতে ভক্তি না হয়ে বরং ঘেন্নাই হয়।

রমজান বলল, এমন কথা বোলো না পঞ্চায়েত। ফকীরের কেরামতি কে না জানে, আর ওনারা হলেন গায়েবী মানুষ—মনের কথা জানতে পারে। ভক্তি করলে যেমন ফল মেলে, অভক্তি করলে তেমনি সাজাও দেন। কিষাণ নিয়ে তোমার যে অবস্থা হয়েছিল, তার হিল্লে তো হাতেহাতেই হয়ে গেল।

নজুমিয়া হেসে বলল, ঝড়ে বক ওড়ে আর ফকীরের কেরামতি বাড়ে। তবে আমি ফকীরকে হেলা করছি না। সব খোদার বান্দা—কে জানে কার মধ্যে কি কেরামতি লুকিয়ে আছে!

রমজান বলল, তোমাকে তো আগেই বলেছি পঞ্চায়েত, ফকীর তোমাকে তলব দিয়েছে। তাই তো আমি উঠ্‌তে পড়তে ছুটে এলাম।

নজুমিয়া গম্ভীরভাবে বলল, আচ্ছা ঢের হয়েছে, এখন যাও, মুদির দোকান থেকে কালজিরে আর সুই সূঁতো নিয়ো এসো।

রমজান চলে গেল, খানিকটা নিজের মনেই নজুমিয়া বলল, তা ফকীরের সঙ্গে দেখা করলে ক্ষতিটাই বা কি? যদি ঠক বুজরুক হয়, আমার কি করবে? আর যদি সাচ্চা হয়, তবে দোয়ার বরকতে ফল ভালই হবে।

ইদ্রিস এতক্ষণ হাঁ করে রমজানের কথা গিলছিল। সুযোগ পেয়ে এবার বলে উঠলো, ফকীর দরবেশের কাছে নানা রকমের দাওয়াই থাকে, তারা ঝাঁড়-ফুঁক করেও অনেক অসুখ সারিয়ে দেয়। হাকিমের কাছ থেকে তো আম্মাজানের অসুদ নিলে না, এবার দেখ ফকীর হয় তো একটা হিল্লে করে দেবে।

কথাটা নজুমিয়ারও মনে লাগল। ভাবল, দেখিইনা পরখ করে।

ফকীর যেন নজুমিয়ার জন্যই অপেক্ষা করছিল। যেতেই উঠে দাঁড়িয়ে তার খাতিরদারী করল, বলল, এসো পঞ্চায়েত সাহেব এসো, তোমার কথাই হচ্ছিল।

আশে পাশে তখনো ভিড় জমে রয়েছে, তাদের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমরা এবার যাও, পঞ্চায়েতের সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে।

নজুমিয়ার মনে যেটুকু সন্দেহ ছিল, তা কেটে গেল—দেখেই লোক চিনতে পারে ফকীর। যে নিজে খাঁটি, সেই সাচ্চা মানুষের কদর জানে। হাটভরা এত লোক, আসগর মিয়া ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কই তাদের কাউকে তো ডাকেনি ফকীর—ডেকেছে নজুমিয়াকে।

ফকীর বলল, এসো পঞ্চায়েত সাহেব, দাঁড়িয়ে কেন ?

ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বলল, কই তোমরা গেলে না ?

ভিড় খানিকটা কমে গেল, তবে একেবারে ভাঙল না। আর যারা রইল, তারাও খানিকটা সরে দাঁড়াল।

নজুমিয়া বলল, তোমার কেরামতির কথা অনেক শুনেছি ফকীর সাহেব—এবার আমার উপর দয়া করতে হবে।

ফকীর হাসল—তোমার মতন আকেলমন্দ মানুষের মুখে একি কথা পঞ্চায়েত ? সবাই আমরা খোদার বান্দা—সকলেই তাঁর দয়ার ভিখারী। মানুষ আবার মানুষের উপর দয়া করবে কেমন করে ?

নজুমিয়া বলল, তোমার কথা ঠিক ফকীর সাহেব ; কিন্তু যারা আল্লার পেয়ারা, তাদের দোওয়ার বরকত অনেক বেশী। দয়া না হোক, অন্তত দোওয়া করো বাবা !

ফকীর বলল, দশ গাঁয়ের লোক নিয়ে তোমার কারবার—তোমার সঙ্গে কথায় কে পারবে পঞ্চায়েত ? দোওয়া চাও, দোওয়া নিশ্চয় করব, তবে এ গুণাগারের দোওয়া খোদা কবুল করবেন কিনা, তা খোদাই জানেন। কি দোওয়া চাও বাবা।

নজুমিয়া বলল, দোওয়া কর বালবাচ্চা নিয়ে যেন সুখে থাকি, মানইজ্জত বাঁচিয়ে জীবন কাটে, মরবার সময় শান্তিতে যেন চোখ বুজি।

ফকীর বলল, যদি দোওয়াই চাও তবে সবচেয়ে বড় দোওয়া—খোদা তোমার মনে শান্তি দিন। মানুষ যত পায়, তত চায় আর তাতেই অশান্তি। খোদা করুন তোমার মন শান্ত হোক, খোদা তোমার ভাল করুন।

নজুমিয়ার মন গলে গেল, বলল, বাবা তুমি জীবনের মানে খুঁজে পেয়েছো, তোমার দোওয়ার বরকতে আমার অমঙ্গল কেটে যাবে।

ফকীর আবার বলল, মঙ্গল অমঙ্গল কাকে বল? সবই খোদার ইচ্ছা। রাগ হিংসা আর ভয়—যতদিন এ তিনটি সাপকে না মারবে, ততদিনই অশান্তি।

নজুমিয়া বলল, এসব বড় কথা বাবা, আমার জন্য তুমি একটা খাস দোওয়া কর।

ফকীর বলল, শান্তি পাও, এর চেয়ে বড় দোওয়া কি আছে! তোমার অনেক ভাবনা। নানা অশান্তিতে তোমার মন বিষে ভরা, যত দিন এ বিষ দূর না করবে, ততদিন কেমন করে শান্তি পাবে? যে ছিল তোমার প্রাণের বন্ধু, আজ সেই হয়েছে জানী দুষমন। তার সঙ্গে শত্রুতা ভুলতে পারবে? আল্লার হুকুম দুষমনকে দোস্ত বানাও, আর তুমি দোস্তকে দুষমন বানিয়ে বসে আছ! তোমার ছেলের জন্য ভাবনা, মায়ের জন্য ভাবনা—ভেবে কি করবে পঞ্চায়েত? আল্লার হুকুম ছাড়া কারু মাথার একটি চুল পর্য্যন্ত খসে না। তাঁর উপর ভরসা না করে কেন তোমার এত দুশ্চিন্তা?

পরের কথাগুলি আর নজুমিয়ার কানে ঢোকেনি। দোস্ত দুষমন হয়েছে শুনেই তার মাথা গরম হয়ে উঠেছিল, বলল, ফকীর সাহেব, তোমরা দরবেশ, দুনিয়াদারী জানো না। সহজে কি দোস্ত দুষমন হয়, আর একবার যদি দুস্তি টুটে যায়, তবে সে ভাঙা পীরিত কি আর জোড়া লাগে? তুমি আসগরকে চেনো না, তাই বলছ যে তাকে দোস্ত বানাও। যদি জানতে, তবে এমন কথা বলতে না।

ফকীর বলল, সেই কথাই তো বললাম পঞ্চায়েত। মন থেকে হিংসা দূর করতে হবে, তা নইলে হাজার ফকীরের দেওয়াতেও কিছু হবে না।

নজুমিয়া বলল, সে কথা পরে হবে, কিন্তু আজ তোমার কাছে এসেছি একটা দাওয়াইর জন্য। আমার মা বুড়ো মানুষ, বাতে বড় কষ্ট পায়। তাকে একটা দাওয়াই দাও।

ফকীর বলল, আমি ফকীর মানুষ, দাওয়াই পাব কোথায়?

নজুমিয়া জেদ করতে লাগল, বলল, শুনেছি তোমার দাওয়াই, তোমার তাবিজ পেলে কঠিন রোগ আরাম হয়ে যায়, আর এ তো সামান্য বাত।

ফকীর বলল, আচ্ছা তাবিজ পরে দেবো কিন্তু এখন আমার এবাদতের সময় হল। আজকের মতন ওঠো পঞ্চায়েত সাহেব।

নজুমিয়া বলল, আমি তো এমনি আসিনি, তুমিই ডেকে পাঠিয়েছ। কি জন্য ডেকেছিলে না বলেই বিদায় দিচ্ছ ?

ফকীর কথা না বলে তার আস্তানায় ঢুকে পড়ল, চেলারা ইসারা করে নজুমিয়াকে বলল এবার ফকীর সাহেব আর কথা বলবেন না। নজুমিয়া এবার উঠুক।

নজুমিয়ার রাগ হল, আবার ভয়ও পেল। কে জানে, ফকীর দরবেশ মানুষের কখন কি মর্জ্জি ? বেশী ঘাঁটিয়ে দরকার নাই, বরদোওয়া করলে শেষে মুস্কিলে পড়বে। উঠি উঠি করছে এমন সময় হঠাৎ দেখল যে দু'হাতে ভিড় ঠেলে আসগরমিয়া আসছে। রাগে তার মুখচোখ লাল, কপালের কাছে শিরা ফুলে উঠেছে।

নজুমিয়াকে দেখে তার রাগ যেন আরো বেড়ে উঠলো। ধীরে ধীরে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, তোমার অবশেষে এই অধঃপতন। আমার মন্দ করবার জন্য তুক্‌তাক্‌ আরম্ভ করে দিয়েছ ?

নজুমিয়া রাগে শক্ত হয়ে উঠলো। বলল, মুখ সামলে কথা বোলো, নইলে—

তাকে বাধাদিয়ে আসগর বলল, নইলে কি ? আমার ক্ষতি করতে কম চেষ্টা করনি, কিন্তু তাই বলে ফকীর ফোকরার শরণ নেবে একথা কখনো ভাবিনি।

নজুমিয়া বলল, মিথ্যা কথারও সীমা আছে—

আসগর বলল, মিথ্যা কথা ? হাট শুদ্ধ লোক জানে তুমি এসে ফকীরের কাছে ধর্ণা দিয়েছ, আর তোমার পেয়ারের রমজান তো সকলকে বলে বেড়াচ্ছে যে এবার আমার মাথায় বাজ পড়বে।

নজুমিয়া তেজের সঙ্গে উত্তর দিল,—বাজে কথা।

আসগর বলল, বাজে কথা ? তাহলে এখানে ফকীরের আস্তানায় কি করছ ?

নজুমিয়া বলল, তোমার কাছে তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকি ?

আসগর বলল, সোজা কথার উত্তর দিতে তোমার যদি এত আপত্তি, তবে ফকীরকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারব।

নজুমিয়া ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল, বেশ, তাই কর—যাও ফকীর সাহেবের কাছে।

আসগর বলল,—নিশ্চয় যাব।

নজুমিয়া কর্কশ স্বরে হেসে উঠলো। ফকীর তাকে নিজে ডেকে এনেছে, সবাইকে সরিয়ে তার সঙ্গে আলাপ করেছে, তবু এবাদতের সময় তাকে কাছে থাকতে দেয় নি। বলেছে এবার যাও। আসগর যদি এবাদতের মধ্যে গিয়ে তাকে বিরক্ত করে, তবে ফকীর তাকে শাপ না দিয়ে যায় কোথায় ?

নজুমিয়ার হাসির শব্দে আসগর এক মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়াল, চোখ পাকিয়ে তাকাল। কিন্তু কোন কথা না বলে কেউ বাধা দেবার আগেই ফকীরের আস্তানার পরদা ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়ল।

উৎসুক ভাবে নজুমিয়া বাইরে দাঁড়িয়ে রইল—কি বলে ফকীর, কিন্তু কোথায় গালমন্দ, কোথায় বরদেওয়া ? নজুমিয়া শুনল ফকীর আসগরমিয়াকে ডেকে আদর করে বসাচ্ছে। রাগে দিশাহারা হয়ে নজুমিয়াও আস্তানায় ঢুকে পড়ল। ফকীর আশ্চর্য হয়ে তার দিকে তাকাল, বলল, তুমি এখনো যাওনি নজুমিয়া ? কোনো দরকারী কথা আছে ?

ফকীরের কথায় নজুমিয়ার রাগ আরো বেড়ে গেল। তাকে বিদায় করে আসগর মিয়ার সঙ্গে খোস গল্প ! রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল, আলখাল্লা পরে ফকীর সেজেছেন, আর পেটের মধ্যে সয়তানী গজ গজ করছে।

নজুমিয়া রাগে হাঁপাচ্ছিল। দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, চালাকী করবার জায়গা পাওনি ? এই জন্য আমাকে বলেছিলে যে এখন যাও। আমার পেটের কথা বের করে নিয়ে এবার আমার দুষমনের কাজে লাগাবে ? ঢের ঢের বুজরুগ দেখেছি, বুজরুগী ভাঙবার অসুদও জানি।

ফকীর অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল, বলল, কি হয়েছে তোমার নজুমিয়া ?

আসগর বসেছিল, নজুমিয়ার কথা শুনে সেও উঠে দাঁড়াল। এক মুহূর্ত্তের জন্য দু'জনে মুখোমুখী হয়ে দাঁড়াল। দু'জনেরই লম্বা দীঘল চেহারা, দেহের বাঁধুনি মজবুত, কেবল কপালের দুপাশে সাদা চুল দেখে বোঝা যায় যে তাদের বয়স হয়েছে।

আসগর কি বলতে যাচ্ছিল, ফকীর তাকে বাধা দিয়ে শান্ত সুরে আবার জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে নজুমিয়া, এত রাগ কেন ?

ফকীরের শান্ত কথায় নজুমিয়া ক্ষেপে উঠলো। তাকে ভেঙচিয়ে বলল, কি হয়েছে নজুমিয়া, এত রাগ কেন ? ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির এসেছেন, কিছু

জানেন না। বলি ফকীরের পো, আসগর মিয়ার সঙ্গে ফিস ফিস করে কি তুক্‌তাক্ করছিলে ?

আসগর কি বলতে যাচ্ছিল, তাকে মানা করে ফকীর বলল, তোমাকে আগেই বলেছি নজুমিয়া যে নিজের চেয়ে বড় শত্রু নাই। মনকে যদি না মানাতে পারো, তবে সেই মনের জ্বালাতেই খতম হয়ে যাবে।

নজুমিয়া খেঁখিয়ে উঠলো, কি এত বড় আস্পদ্দা, গালমন্দ সুরু করেছো। দেব দু'ঘা বসিয়ে।

নজুমিয়ার চেঁচামেচিতে আবার ভিড় জমে গেল—তারা ঠেলাঠেলি করে প্রায় আস্তানায় ঢোকে আর কি। একটা চাপা গুঞ্জনের শব্দ উঠলো, যারা নজুমিয়ার পক্ষে তারা মারমুখো, আর দেখাদেখি আসগর মিয়ার দলও রুখে দাঁড়াল, মনে হল এখনি বুঝি একটা হট্টগোল মারমারি সুরু হয়ে যাবে।

হঠাৎ সমস্ত হট্টগোল ছাপিয়ে ফকীরের গলার আওয়াজ শোনা গেল। কি পড়ছে সে, দোওয়া দরুদ হতে পারে, মন্তর তন্তরও হতে পারে, কিন্তু কথা না বুঝেও সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। গম্ভীর শব্দের তরঙ্গ, আরবী ধ্বনির গভীর রেশ মনকে উদাস করে দেয়, ফকীর পড়েই চলেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত শরীর দুলছে, চোখ বন্ধ।

হঠাৎ চোখ মেলে দাঁড়িয়ে দু-হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠলো ফকীর, এখনও তোমরা এখানে ? সরে যাও, সবাই সরে যাও—এখান থেকে সরে যাও। হায় বেওকুফ নজু, দোস্তকে দুষমন বানালি আর এখন জীবনের শেষ পাড়ি দেওয়ার সময় আবার নতুন ঝগড়া ফ্যাসাদ! ঈষাণ কোণে ঝড়ের রেখা, নদীর জল দুলছে, তুফানে নৌকো মাতালের মতন টলছে, বাজ পাখীর মতন অন্ধকার মেঘের ছোঁ—সে বিপদের দিনে কে তোমাকে বাঁচাবে ? যাও, যাও, সব ঝুট, দু'দিনের দুনিয়া, দু'দিনের জিন্দেগী, আর তাই নিয়ে এত ঝগড়া ফ্যাসাদ। এত কাজিয়া। রহম কর আল্লা, রহম কর গুণাহগার বান্দার দোষ খণ মাফ করে দে।

ফকীর হঠাৎ বেহুঁষ হয়ে মাটীতে পড়ে গেল। সাকরেদেরা ছুটে এল, সবাইকে বলল, যাও, এখন থেকে বেরিয়ে যাও।

[আগামীবারে সমাপ্য]

যাত্রী

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

জুন মাসের সে এক রৌদ্র-ঝলমল সকালবেলা। ট্রেন পৌঁছলো গিয়ে এক বিরাট ষ্টেশনে। ক্যুপের দরজার সামনে দাড়িয়ে ট্রেনের কন্‌ডাক্টর বল্লে—মস্‌ক্‌ভা। বুঝলুম মস্কোয় এসে পৌঁছেছি। একটি লোকও পরিচিত নয়, ভাষাও জানিনে। মনে ছিল ঠিকানা—হোটেল লুক্‌স্‌, রাস্তার নাম তেভেরস্কায়া। ষ্টেশনের বাইরে এসে ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে চল্লুম হোটেল লুক্‌স্‌। বড়ো চওড়া রাস্তা পার হয়ে ঢুকলো গাড়ী এক মাঝারি গোছের রাস্তায়। দুধারে দোকান, বড়ো বড়ো কাঁচ-দেওয়া জানলা দিয়ে দোকানের ভিতরটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দোকানের ভিতরে, রাস্তায় অগুনতি লোকের ভীড়। রাস্তায় বাড়ীগুলো মাথায় সমান নয়—প্রকাণ্ড উঁচু একটা বাড়ীর পরে মাথায় খাটো দোতলা একটা বাড়ী, তারপরেই একটা আকাশ-ছোঁয়া বাড়ী। ইয়োরোপের রাস্তার মত একরঙা বৈচিত্র্যহীন রাস্তা নয়। সেখানে একটি রাস্তার সব বাড়ীগুলো যেন একই ছাঁচে ঢালা। এ যেন আমাদের চিৎপুর রাস্তা। প্রকাণ্ড বাড়ীর পাশে ছোট বাড়ী তার নিজস্ব বিশেষ অস্তিত্ব নিয়ে নিঃসঙ্কোচে দাঁড়িয়ে আছে। ফুটপাথের ধারে সূর্যমুখী ফুলের বীচি বেচছে ফেরিওয়ালারা। গাড়ী গিয়ে থামলো একটী প্রকাণ্ড বাড়ীর সামনে। গাড়োয়ান হেঁকে বল্‌লো—হোটেল লুক্‌স্‌। জিনিসপত্তর নামিয়ে নিয়ে গাড়ী বিদায় করে ঢুকলুম হোটেলের ভিতরে। সৈনিকের বেশধারী একটী লোক এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলে কাকে চাই। জানালুম চাই কমরেড্‌ লোহানীকে। আমাকে অপেক্ষা করতে বলে টেলিফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বল্‌লে। কিছুক্ষণ বাদে নেমে এলেন এক ভদ্রমহিলা। সৈনিক-বেশধারী লোকটী আমাকে দেখিয়ে দিলো। ভদ্রমহিলা এগিয়ে এলেন আমার কাছে,—নিজের পরিচয় দিয়ে বল্লেন—আমি মাদাম লোহানী। বল্লুম—লোহানীর সঙ্গে দেখা করতে চাই। তিনি রুশীয় ভাষায় যা উত্তর দিলেন তার বেশীর ভাগই আমার বোধগম্য হোলো না। তাকিয়ে রইলুম তাঁর দিকে। তখন জর্মান ভাষায় বল্লেন—কমরেড লোহানী এখন এখানে নেই, তিনি কমিণ্টার্ণের দপ্তরে

গেছেন। চলুন, আমি আপনাকে নিয়ে যাই সেখানে। ঘোড়ার গাড়ী করে চল্লুম সেখানে তুজনে।

রাস্তা ঢালু হয়ে নেমে গিয়ে মিশলো একটী বড় রাস্তার সঙ্গে। গাড়ী ঘুরলো ডান দিকে, পাথরে বাঁধানো রাস্তা দিয়ে গাড়ী চললো লাফিয়ে লাফিয়ে। পাটকিলে রঙের বিরাট উঁচু পাঁচিল নেমে গেছে নদীর ধারের রাস্তা পর্যন্ত। পার্কের ধারেই প্রকাণ্ড তিনতালা বাড়ী—কমিন্টার্ণের দপ্তর। ছোট্ট দরজা দিয়ে ঢুকলুম বাড়ীর মধ্যে। ভিতরে ঢুকতেই প্রবেশপথের বাঁ দিকের দেয়ালের ছোট্ট জানলা থেকে একজন জিজ্ঞেস করলে আমরা কাকে চাই। মাদাম লোহানী উত্তর দিলেন। অফিসর টেলিফোন জুড়লেন, মাদাম কথা বল্লেন। তুটী ছাড়পত্র তৈরী হোলো আমাদের জন্যে। প্রবেশ পথের শেষ প্রান্তে আর একটী দরজার কাছে একজন প্রহরী বসেছিল। তাকে ছাড়পত্র দেখিয়ে ঢুকলুম আমরা বাড়ীর ভিতরে। সিঁড়ি দিয়ে তেতালায় উঠে গেলুম। একটী ঘরের দরজায় মৃত্থু করাঘাত করে মাদাম লোহানী আমাকে নিয়ে ঢুকলেন সেই ঘরে। ঘরের একপ্রান্তে জানলার ধারে টেবিলের সামনে বসেছিলেন একটী ছোট্ট-খাট্ট লোক। মাদাম লোহানী তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন। লোহানীর কথা আমি অনেক শুনেছিলুম বীরেন চট্টোপাধ্যায় আর এ্যাগনেস্ স্মেড্‌লীর কাছে থেকে বার্লিনে।

সিরাজগঞ্জের একটী মধ্যবিত্ত বাঙালী মুসলমান পরিবারের ছেলে লোহানী। লণ্ডনে যান ব্যারিষ্টারী পড়বার জন্যে। সেখানে তাঁর আলাপ হয় বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। কোথায় রইলো লোহানীর ব্যারিষ্টারী পড়া, ভোজ খাওয়া আর নেচে বেড়ানো! এমনি ছিল চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিত্বের জাতু। লোহানী লণ্ডন ছেড়ে প্যারীতে চলে আসেন সেখান থেকে বার্লিনে এসে বীরেনের সঙ্গে যোগ দেন। বার্লিনকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষীয় বিপ্লবীরা তখন যে বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন সেই প্রতিষ্ঠানে শামিল হন লোহানী।

লোহানীর বুদ্ধি ছিল তরোয়ালের মত ধারালো। ফরাসী, জর্মান ও রুশীয় ভাষায় তাঁর দখল ছিল, পড়াশুনো ছিল যথেষ্ঠ, রসিকও ছিলেন তিনি। এত গুণ সব ব্যর্থ হয়ে গেল, তাঁর ব্যক্তিত্ব নিষ্প্রভ থেকে গেল তাঁর চরিত্রের একটী মাত্র দোষে। প্রত্যেক বিপ্লবীর যেটা একান্ত থাকা দরকার, চরিত্রের সেই নির্লোভ অনমনীয়তা সেটি আদবেই ছিল না লোহানীর। বুদ্ধির দ্বারা

বিচারের দ্বারা যে মতবাদকে গ্রহণ করেছে বিপ্লবী সাময়িক ও ব্যক্তিগত স্থবিধের জন্যে তাকে কখনো ত্যাগ করবে না, ছোটো করবে না, চরিত্রের এই অটল ভূমিতেই বিপ্লবী আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করে। তবেই সে পথ চলতে পারে আদর্শ-ভ্রষ্ট না হয়ে। অতলস্পর্শী স্থবিধাবাদের অবতার ছিলেন লোহানী। ভূপেন দত্ত, এ্যাগনেস্ স্মেড্‌লী আর লোহানীকে নিয়ে বীরেন চট্টোপাধ্যায় মস্কো যান ভারতীয় বিপ্লবীদের তরফ থেকে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে যোগ স্থাপন করবার উদ্দেশ্যে। ভারতবর্ষের বিপ্লব-আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁদের মতামত লিপিবদ্ধ করে চট্টোপাধ্যায় লেনিনের কাছে পাঠিয়ে দেন। সেই খসড়ার প্রাপ্তি স্বীকার করে লেনিন চট্টোপাধ্যায়কে চিঠি লেখেন ও একটি নির্দিষ্ট দিনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন। চট্টোপাধ্যায়কে লেখা লেনিনের সেই চিঠি আমি দেখেছি। বার্লিনে থাকাকালীন চট্টোপাধ্যায় আমাকে দেখিয়েছিলেন সেই চিঠি।

লেনিনের সঙ্গে চট্টোপাধ্যায়ের দেখা কিন্তু ঘটলো না। বৈপ্লবিক আন্দোলনের ঐতিহাসিক গতিতে কূটনীতির কারসাজি ও চক্রান্তের নমুনা এই প্রথম নয়। মানব রায় এর কিছুদিন আগে মেক্সিকো থেকে মস্কো এসে পৌঁছন। বরোদিনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় মেক্সিকোতে, বরোদিনই তাঁকে মস্কো নিয়ে আসেন। কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনাল তার বছর খানেক আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পরাধীন ভারতের একজনও প্রতিনিধি নেই কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশানালে এটা কেমন সোয়াস্তি দিচ্ছিলো না বলশেভিক নেতাদের। মানবেন্দ্রনাথ রায়কে মেক্সিকো থেকে মস্কোতে আমদানী করেন বরোদিন এই অভাব মিটনোর মতলবে। মস্কোতে চট্টোপাধ্যায়ের আগমন বরোদিন একেবারেই ভালো চোখে দেখেননি। চট্টোপাধ্যায়কে যদি লেনিন স্বীকার করে নেন ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রতিনিধি হিসেবে, ভারতের বিপ্লবের ধারা সম্বন্ধে চট্টোপাধ্যায়-প্রদত্ত 'থিসিস' যদি লেনিন গ্রাহ্য করেন তাহলে এক ভারতীয় বিপ্লবীকে স্থদূর মেক্সিকো থেকে নিয়ে এসে হাজির করবার জন্যে বরোদিন যে তারিফ পাচ্ছিলেন সে তো আর থাকে না। তাই কি করে লেনিনের সঙ্গে চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎ বানচাল করে দেওয়া যায় আর চট্টোপাধ্যায়কে ঠেলে ফেলে দিয়ে তাঁর নিজের হাতের লোক মানব রায়কে কেমন করে এগিয়ে দেওয়া যায় এরই জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেলেন বরোদিন। লেনিনের সঙ্গে চট্টোপাধ্যায়ের দেখাসাক্ষাৎ সব ঠিক হয়েও যে বন্ধ হলো সেটা

বরোদিনের কারসাজিতেই। মাসখানেক মস্কোতে অপেক্ষা করে লেনিনের সঙ্গে দেখা করতে অসমর্থ হয়ে চট্টোপাধ্যায় তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে বার্লিনে ফিরে আসেন।

আগেই বলেছি যে লোহানী মস্কো গিয়েছিলেন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। লোহানী যখন দেখলেন যে মানব রায় বরোদিনের সাহায্যে হারিয়ে দিয়েছেন চট্টোপাধ্যায়কে, মানব রায়কেই বলশেভিক নেতারা তৃতীয় ইণ্টারন্যাশানালের ভারতীয় প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন, অমনি লোহানী চট্টোপাধ্যায়কে ত্যাগ করে ভিড়ে গেলেন মানব রায়ের দলে। নিজের সুবিধে বাদ দিয়ে আর কি আছে সুবিধাবাদীর উপাস্য! আমার সঙ্গে যখন লোহানীর দেখা তখন তিনি মানব রায়ের অনুচর হিসেবে কমিনটার্ণে কাজ করছেন।

লোহানীর কাছ থেকে শুনলুম যে মানব রায় শীঘ্রি চীন থেকে মস্কোতে এসে পৌঁছবেন। তখন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা হবে। আপাততঃ আমাকে দুটো রিপোর্ট দাখিল করতে হবে কমিন্‌টার্ণে—একটী ভারতবর্ষে কমিউনিষ্ট পার্টির সংগঠন সংক্রান্ত রিপোর্ট আর অন্যটী ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে রিপোর্ট। আমাকে সেই রিপোর্ট দুটী তৈরী করতে বল্লেন লোহানী। অল্প আলাপের পর লোহানী বল্লেন—চলুন, আপনাকে পেত্রভ্‌স্কির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। পেত্রভ্‌স্কি যে কে তা আমার জানা ছিল না তখন। পরে জানলুম যে তিনি হচ্ছেন কমিণ্টার্ণের বৃটিশ বিভাগের সেক্রেটারী। ভারতবর্ষের কমিউনিষ্ট পার্টির সব ভার তখন ছিল বৃটিশ কমিউনিষ্ট পার্টির উপর। পেত্রভ্‌স্কিকে তাই এক কথায় নাবালক ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির অছির অছি বলা যেতে পারে। ভারত-ইংলণ্ডের কমিউনিষ্ট বিপ্লবের একছত্র নায়ক এ হেন পেত্রভ্‌স্কির কাছে আমাকে হাজির করলেন লোহানী। পার্টির দাখিলাপত্র যেটি আমি মাথার টুপির মধ্যে সেলাই করে নিয়ে এসেছিলুম সেটা দিলুম পেত্রভ্‌স্কির হাতে। পেত্রভ্‌স্কি হেসে বল্লেন—আপনি ভারতবর্ষে থেকে নিরাপদে এটা নিয়ে আসতে পেরেছেন এতদূর? দু'চারটি কথার পর লোহানীকে বলে দিলেন হোটেলে নিয়ে গিয়ে আমার থাকার সব বন্দোবস্ত করে দিতে।

লোহানীর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে এলুম ফের তেভেরস্কায়ায়। হোটেল লুক্‌স্ পার হ'য়ে আরো কিছুটা এগিয়ে পুস্কিন বুলভারের কাছাকাছি এসে দুজনে উঠলুম গিয়ে ব্রিষ্টল হোটেলে। দোতলায় একটি ছোট্ট ঘরে আমার স্থান

হোলো। লোহানী চলে গেলেন। আমার ঘরের জানালাটি ছিল উঠোনের দিকে। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দেখছিলুম জনমানুষশূন্য উঠোন। উঠোন যেন নিরালায় আপন মনে রোদ পোহাচ্ছে। উঠোনের এক কোণ দিয়ে দেখা যাচ্ছিল কাছের ও দূরের বাড়ীর উঁচুনীচু মাথাগুলো ঝলমল করছে সোনালী রোদে। বিকেল বেলা লোহানী এলেন একজন রুশীয় ভদ্রলোককে সঙ্গে করে। শুনলুম তিনি ষ্টালিনের সেক্রেটারীদের মধ্যে একজন নাম তার টিভেল। ছিপ্‌ছিপে লোকটী, পাৎলা মুখে বেমানান নাকটী তার ইহুদীত্বের নিঃসংশয় প্রমাণ দিচ্ছিল। টিভেলের কথাবার্তা তাঁর চেহারার মতোই ধারালো কিন্তু তবুও তাঁর চেহারায় কি যেন একটা ছিল যাতে মন সায় দিচ্ছিল না। আমার মন বলছিল এ লোকটীকে বিশ্বাস করা যায় না।

পরে যখন টিভেলের পূরো পরিচয় পেলুম তখন বুঝলুম যে বাঙালী লোহানীর রুশীয় সংস্করণ হচ্ছেন টিভেল। জিনভিয়েভ্‌ যখন কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশানালের কর্তা তখন টিভেল ছিলেন তাঁর সেক্রেটারী। লেনিনের মৃত্যুর পরে পাছে ট্রট্‌স্কি বলশেভিক দলের আর সোভিয়েট রাষ্ট্রের কর্ণধার হন এই ভয়ে সুচতুর ষ্টালিন জিনভিয়েভ্‌ আর কামেনেভ্‌কে নিয়ে দল পাকায় ট্রট্‌স্কির বিরুদ্ধে। একলা ষ্টালিনের সাধ্যি ছিলো না ট্রট্‌স্কিকে সরিয়ে দেবার। লেনিনের অন্তরঙ্গ সহকর্মী হিসেবে জিনভিয়েভ্‌ আর কামেনেভের যে খ্যাতি ছিলো, ষ্টালিনের সে খ্যাতি থাকবার কোনই কারণ ছিলো না কেননা ষ্টালিন কোনো দিনও লেনিনের অন্তরঙ্গ সহকর্মী ছিলো না। জিনভিয়েভ্‌ আর কামেনেভের সাহায্যে ট্রট্‌স্কিকে সরিয়ে দেবার পর ষ্টালিন যখন নিঃসংশয় হলো যে ট্রট্‌স্কির দিক থেকে তার কোনো ভয়ের কারণ আর নেই তখন ষ্টালিন মিথ্যে প্রচারের দ্বারা জিনভিয়েভ্‌ আর কামেনেভ্‌কে হেয় প্রতিপন্ন করে বলশেভিক দল থেকে তাড়াবার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেলো। জিনভিয়েভ্‌ তখন কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশানালের প্রেসিডিয়ুমের চেয়ারম্যান। পৃথিবীর নানান দেশের কমিউনিষ্ট দলের সঙ্গে জিনভিয়েভের এই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ষ্টালিনের আদবেই পছন্দসই ছিলো না। ষ্টালিনের অপকর্মের বিরুদ্ধে পাছে জিনভিয়েভ্‌ কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশানালের সুযোগ নিয়ে একটা আন্তর্জাতিক বিপক্ষতার সৃষ্টি করে এই আশঙ্কায় ষ্টালিনেব দুশ্চিন্তার অন্ত ছিলো না। যেমন করে হোক জিনভিয়েভকে কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশানাল থেকে সরাবার জন্যে ষ্টালিন সুরু করলো চক্রান্ত। টিভেল যে শুধু জিনভিয়েভের সেক্রেটারী ছিলো তা নয়,

জিনভিয়েভের লঙ্গে তার বন্ধুত্ব ছিলো। তবে বন্ধুত্বের জন্যে নিজের ভবিষ্যৎ মাটি করবে এমন ভাবুকতার প্রশ্রয় আর যেই দিক টিভেল কিছুতেই দিতে রাজী ছিলো না। চতুর টিভেল যখন বুঝলো যে ক্ষমতালোলুপ ষ্টালিনের কারসাজিতে জিনভিয়েভের ভাগ্যতরী মাঝ দরিয়ায় ডুবলো বলে—তখন তাড়াতাড়ি সে সুরু করে দিলে জিনভিয়েভের ঘোর বিপক্ষতা করতে। সহকর্মী-হন্তারক হিসেবে পৃথিবীর ইতিহাসে যার জুড়ি নেই সেই চরম বিশ্বাসঘাতক এই ক্ষুদে বিশ্বাসঘাতককে বকশিস দিলো হাতে হাতে। তার সেক্রেটারী-গোষ্ঠীর মধ্যে টিভেলকে ভর্ত্তি করে নিল ষ্টালিন। ইতিহাস কিন্তু কখনো ভোলেনা তাকে যার কাছে সে ঋণী। দু'চার বছর বাদেই টিভেলের কাছে তার ঋণ শোধ করলো ইতিহাস। ষ্টালিনের আদেশেই মরলো টিভেল ঘাতকের গুলিতে। জিনভিয়েভের পরে কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশনালের প্রেসিডিয়ুমের চেয়ারম্যান হন বুখারিন। কমিন্টার্ণের সেক্রেটারী ছিলেন প্রথম যুগের বলশেভিক, বৃদ্ধ পিয়াৎনিস্‌কি। টিভেল জানিয়ে গেলেন যা তার পরদিন সকালে আমাকে হাজির হতে হবে পিয়াৎনিস্‌কির দপ্তরে। তিনি আমাকে তলব করেছেন।

পরদিন সকালে গেলুম কমিন্টার্ণের দপ্তরে। টিভেল নিয়ে গেলেন আমাকে পিয়াৎনিস্‌কির ঘরে, আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তিনি চলে গেলেন। আমি ভারতবর্ষ ছেড়ে ইয়োরোপে যাবার অল্পদিন পরে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির তরফ থেকে একটী পুস্তিকা বের হয়। ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির সেন্ট্রাল কমিটীর সভ্যদের নামের তালিকা ছিল সেই পুস্তিকায়। ১৯২৭ সালের সেন্ট্রাল কমিটীর সভ্যদের মধ্যে ছিলুম আমি, ডাঙ্গে, শৌকত ওসমানী, মুজফ্‌ফর আহমেদ, ঘাটে ও আরো দুএক জন। দেখলুম সেই পুস্তিকাটী রাখা রয়েছে পিয়াৎনিস্‌কির টেবিলে। ভারতবর্ষে আমাদের কাজের সব খবর জানতে চাইলেন পিয়াৎনিস্‌কি। কতোটুকু আমরা করতে পেরেছি, কি অসম্ভব বাধার উজান ঠেলে আমাদের এগোতে হচ্ছে, কমিউনিষ্ট সাহিত্য ইত্যাদি কোনোরকম সাহায্যই যে আমরা পাচ্ছিনে—সব জানালুম তাঁকে। পিয়াৎনিস্‌কি বল্লেন—কেন, আমরা তো যথেষ্ট টাকা দিয়েছি ভারতবর্ষে কমিউনিষ্ট সাহিত্য পাঠাবার জন্যে! টাকা তাঁরা যাকেই দিয়ে থাকুন বই কিম্বা আর কোনো রকম সাহায্যই যে আমরা পাইনি সেটা জানিয়ে দিলুম তাঁকে। ভারতবর্ষে কমিউনিষ্টদের সংখ্যা কত তার একটা মোটামুটি খবর পিয়াৎনিস্‌কি চাইলেন। টেবিলের উপর ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির যে পুস্তিকাটি পড়ে ছিলো সেটার দিকে দেখিয়ে বল্লুম

তাঁকে যে ভারতবর্ষে যে কয়জন কমিউনিষ্ট আছে তাদের তালিকা ঐ পুস্তিকাতেই আছে, তিনি নিশ্চয়ই তা দেখে থাকবেন। পিয়াৎনিস্‌কি একেবারে নির্বাক হয়ে গেলেন। আমার দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপরে বল্লেন—ভারতবর্ষে মাত্র আটটি দশটি কমিউনিষ্ট? বল্লুম—অবস্থাটা ঠিক তাই। কমিউনিজমের দিকে মানুষকে টানবার শক্তি আমাদেরই বা আছে কোথায়? আমরা তো কিছুই জানিনে। অনেক হাত্‌ড়ে কমিউনিজমের যে ক্ষুদ কুঁড়োটুকু সংগ্রহ করেছি তা নিজেদের পক্ষেই যথেষ্ট নয়, অন্যদের মধ্যে বন্টন করবো কোন সাহসে? পিয়াৎনিস্‌কি বল্লেন—রায় তো আমাকে বলেছিলেন যে কয়েক হাজার কমিউনিষ্ট তৈরী হয়েছে ভারতবর্ষে? বল্লুম—মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁর সেই কয়েক হাজার কমিউনিষ্টদের কোথায় কোন পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে রেখেছেন তিনিই বলতে পারেন, আমরা তাদের কোনো খবর জানিনা। বাঙলার টেরারিষ্ট দলগুলির সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক তা জানতে চাইলেন পিয়াৎনিস্‌কি। বাঙলার টেরারিষ্ট দলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের যে চেষ্টা আমি করেছিলুম তার খবর জানিয়ে দিলুম তাঁকে।

পিয়াৎনিস্‌কির কাছ থেকে চলে আসবার পথে দেখা হলো পেত্রভ্‌স্কির সঙ্গে। তিনি বল্লেন যে আর দুদিন বাদে আমাকে অর্গানিজেশনল রিপোর্ট দাখিল করতে হবে কমিটির সামনে। মনের তখন যা অবস্থা তার বর্ণনা রাজা রামমোহন রায় কয়ে গেছেন তাঁর গানে—'মনে করো শেষের সে দিন কি ভয়ঙ্কর'! কখনো রিপোর্ট তৈরী করিনি, কি লিখবো, কেমন করেই বা রিপোর্ট তৈরী করবো এই সব চিন্তা পাহাড়ের খসে-পড়া পাথরের মতো দুমদাম করে পড়তে লাগলো বুকের মধ্যে। যার তার সামনে দাখিল করবার কথা হলেও না হয় সহ্য করা যেতো, এ যে দাখিল করতে হবে কমিউনিষ্ট ইন্‌টারন্যাশানালের কমিটির সামনে! ভয়ে দুর্ভাবনায় অস্থির হয়ে হাজির হলুম গিয়ে লোহানীর কাছে। জানালুম তাঁকে আমার অসহায় অবস্থার কথা। লোহানীর মন যে লোহা হয়ে গেছে বলশেভিকদের প্রসাদগুণে তা বুঝতে পারলুম। তিনি যে এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করতে পারবেন না, আমাকে যে নির্ভর করতে হবে একান্ত-ভাবে নিজের উপরে সেটুকু তিনি সোজাসুজি জানিয়ে দিলেন আমাকে। বুঝলুম এখানে আমি একেবারে একলা, যা কিছু আমাকে করতে হবে তা' মানবেন্দ্রনাথ রায় আর তার অনুচর লোহানী, এই দু'জনের বিরুদ্ধতাকে প্রতি পদে লড়াই করে করতে হবে। হোটেলে ফিরে এসে বসে গেলুম রিপোর্ট লিখতে।

কোথা থেকে যে সুরু করবো তাই স্থির করতে ঘণ্টা কেটে গেল, কাগজের উপর কলমটি পড়ে রইল নাক গুঁজে নিশ্চল হয়ে। একবার মরিয়া হয়ে সুরু করে দিলুম। অর্গানিজেশনাল রিপোর্টে লিখবার ছিলোই বা কি এতো বেশী! সবে'ত ভারতবর্ষের দু'একটি প্রদেশে শ্রমিক-কৃষক দল প্রতিষ্ঠা করে আমরা কাজ শুরু করেছি। পরদিন সকালে রিপোর্টটি টাইপ করিয়ে নিলুম কমিণ্টার্ণের দপ্তরে। লোহানীর সঙ্গে দেখা করলুম। একটি কথাও তুললুম না কিন্তু রিপোর্ট সম্বন্ধে।

কমিণ্টার্ণের কাজ সেরেই চলে আসতুম আমার হোটেলের ঘরে। অসহায়তার লজ্জা থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে কচ্ছপের মত নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে একলা থাকা ছাড়া উপায় ছিল না আমার সেদিন। তাছাড়া ভিতরটা তখনো নরম ছিল, তখনো বিরুদ্ধতার প্রচণ্ড দহনে পুড়ে মনটা পোড়ামাটীর মত কঠিন হয়ে ওঠে নি। বিরুদ্ধতা তখন বড় ব্যথা দিত আর সেই ব্যথা থেকে বাঁচবার জন্যে নিজেকে নিয়ে সরে পড়তুম সেই এলাকায় যেটা একান্ত নিজের। এখন নিজেকে আর সরিয়ে নিইনে আঘাতের এলাকা থেকে; উপরে কঠিনতার বর্ম পরে আঘাতকে বরণ করি আঘাত হেনে। অনেক দিন হোলো বুকের ভিতরটা প্রচণ্ড দহনে পুড়ে চৌচির হয়ে গেছে, অবিশ্রান্ত আঘাতে কঠিন হয়েছে মন, কালো হয়েছে কষ্টিপাথরের মত। তবু বারবার দেখেছি সেই কঠিন মনকে ব্যথা পেতে, নজরে পড়েছে তার অভিমান। তখন নিজের জীবনের আয়নায় নিজের মনের যে চেহারাটি দেখেছি সেটি মর্মান্তিক। বুঝেছি তখন যে অন্তরের বেদনা ও অভিমান নিজেদের গোপন করে চলে কঠোরের ছদ্মবেশে। পরদিন সকালে কমিণ্টার্ণে গিয়ে হাজির হলুম। ন'টার সময় কমিটীর অধিবেশন সুরু হবার কথা ছিল, সুরু হোলো প্রায় এগারোটার সময়। রুশীয়দের সঙ্গে এই বিষয়ে আমাদের আশ্চর্য মিল। আমাদেরই মত সময়মত ওরা কখনো কিছু করে না। আমাদেরই মত ওদের চালচলন কাজ করবার ধরণ ঢিলেঢালা আর মন্থর। এই ঢিমে তেতালা ধরণ যেন এই কথাই বলতে চায়—পড়ে আছে অসীম অনন্ত কাল আমাদের সামনে, তাড়া করে লাভ কি? রুশীয়দের কোনো কিছু করতে বললেই উত্তরে তারা বলে —সিচাস্—আর এই রুশীয় কথাটার মানে হচ্ছে—এখনি। এই এখনি কিন্তু কখন ঘটবে তা বলা যায় না। দু'ঘণ্টা বাদে ঘটলেও রুশীয়েরা তাতে আদবেই আশ্চর্য হবে না। ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে কোনো কাজ করে খণ্ডকালের কাছে নতি স্বীকার করতে তারা যেন রাজী নয়! কেমন করে যে এরা অন্তত একবার

একেবারে ঠিক সময়ে কাজে নেমে পড়ে বিপ্লব করেছিল, তখন 'সিচাস্' বলে যে ঝিমতে সুরু করে নি সেটা সত্যিই আশ্চর্য! তবে এটাও ঠিক যে সেই বিপ্লবের যিনি কর্ণধার ছিলেন তিনি এই 'সিচাসের' মন্দাক্রান্তা লীলার কাছে কখনো আত্মসমর্পণ করেন নি। সময়ের মূল্য তিনি জানতেন ; অনন্তের আরকে ভিজিয়ে মনের ও কর্মের গতি তিনি কখনো মন্দা করে দেন নি।

কমিটির অধিবেশনে সভাপতিত্ব করলেন পেত্রভ্স্কি। বৃটিশ, মার্কিন, রুশীয় ও জার্মান কমিউনিষ্ট পার্টিগুলির প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন সেই অধিবেশনে। আমার রিপোর্ট নিয়ে ঘণ্টাখানেক আলোচনার পর শেষ হোলো অধিবেশন। বিপদ তো কাটলোই না বিপদ আরো বেড়ে গেল। অধিবেশনের পরেই পেত্রভ্স্কি জানিয়ে দিলেন যে রাজনৈতিক রিপোর্ট শীঘ্রি দাখিল করতে হবে, ওটা যেন শীঘ্রি তৈরী করে ফেলি। মনে হোলো যেন হিমালয়ের চূড়ো ভেঙ্গে পড়েছে মাথায়। দলের সংগঠন সংক্রান্ত রিপোর্ট না হয় কোনো রকমে তৈরী করেছি, সে রিপোর্ট তৈরীর কাজে রাজনৈতিক জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল না বল্‌লেই চলে। এবারে যে রিপোর্ট লিখতে হবে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থার উপর! আমার সে রাজনৈতিক জ্ঞান কোথায়? ভাসাভাসা ধারণা দিয়ে যা কিছু বুনবো সেই বুনুনির মধ্যে যে অজ্ঞানতার শত ছিদ্র সহজেই ধরা পড়বে। কমিউনিষ্ট মতবাদে সত্যি করে ওয়াকিবহাল হবার কোনো সুযোগই যে পাইনি আমি দেশে থাকবার সময়। মানব রায়ের লেখা হু'চারটি পুস্তিকার প্রসাদের উপর নির্ভর করে কতদিন চলে! সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাগুলিকে কেমন করে বিশ্লেষণ করতে হয় কমিউনিজমের সেই বিশ্লেষণ-নীতির সম্বন্ধে আমার সত্যিকরে কোনো ধারণাই ছিল না তখন। দেশে থাকতেই 'কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো' পড়েছিলুম। এমন কি তার অনুবাদও সুরু করেছিলুম 'গণবাণীর' পাতায়। কিন্তু যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-নীতির সূত্রে মানব-ইতিহাসের গতির ধারাকে গেঁথে ছিলেন মার্ক্স ও এঙ্গেল্‌স্ সেটি আয়ত্ব করবার মত সমাজ-বিজ্ঞানের জ্ঞান আমার আদবেই ছিল না। একতলায় কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশনালের লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে রিপোর্টের ছাপানো খণ্ড কয়েকটি বের করে রিপোর্ট লেখবার কায়দাটা বুঝতে চেষ্টা করলুম। সাজানোর ধরণ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করে নিলুম সন্ধ্যে পর্যন্ত সেই রিপোর্টগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করে। হোটেলের ঘরে ফিরে এসে শুয়ে পড়লুম দরজা বন্ধ করে। মনে হতে লাগলো যেন আমার অসহায়তাকে নিয়ে নিষ্ঠুর বিদ্রূপ করছে

সমস্ত পৃথিবী, আমার আবেষ্টনী যেন শত শত বিষাক্ত ফণা তুলে ছোবল্ মারছে আমাকে। অসহায়তার এই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা লাভ করেছি আমি আমার জীবনে ; তাই মানুষের অসহায়তার ছবি আমার মনকে নিবিড়ভাবে ব্যথিত করে, ক্ষেপিয়ে তোলে আমাকে এই সমাজ-ব্যবস্থার ও সমাজপতিদের বিরুদ্ধে।

রাত্তিরে যখন চারিদিক ঘুমন্ত, ঘরের বাইরে আনাগোনার পথে মিলিয়ে গেছে পায়ের শব্দ ; তখন রিপোর্ট লেখবার জন্যে তোড়জোড় করে বসলুম জানালার পাশে টেবিলের সামনে। বাইরে মস্কোর জুনের রাতে। আমাদের দেশে বিকেল আর সন্ধ্যের সন্ধিক্ষণে যে রকম আলো থাকে সেই রকম আলো থাকে মস্কোয় গ্রীষ্মের রাতে। জানালা দিয়ে চোখে পড়ছিলো ঘন লীল আকাশ আর গোধূলির আলোভরা উঠোন। সারা রাত লিখে শেষ করলুম রিপোর্ট লেখা। বিকেলে লোহানী এলেন, বল্লেন—রায় এসেছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চলুন। তখুনি গেলেম আমরা হোটেল লুক্সে যেখানে রায় থাকতেন। রায়ের কথা দেশে থাকতে এত শুনেছি, তাঁরই লেখা বই পড়ে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যাকে দেখতে শিখেছি নতুন দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে। তাই তাঁকে দেখবার ও জানবার কৌতূহল ছিল যথেষ্ট। লোহানীর সঙ্গে ঢুকলুম গিয়ে রায়ের ঘরে। এক দীর্ঘকায় পুরুষ দাঁড়িয়ে উঠে নমস্কার করলেন। ঘরের মধ্যে দেখি আরো দু'জন রয়েছেন। তার মধ্যে টিভেলের সঙ্গে আগেই পরিচয় ঘটেছিলো, দ্বিতীয়টি একটি ভদ্রমহিলা। আলাপ করবার সময় সেই সুদর্শনা অপরিচিতার পরিচয় দিয়ে লোহানী বললেন—ইনি কমরেড্ লু। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর রায় বল্লেন—বড় ক্লান্ত হয়েছি, সাতদিন সাতরাত ট্রেনে কেটেছে। দু'একদিন পরেই আপনার সঙ্গে বিস্তারিত ভাবে আলাপ করবো। চলে আসছি এমন সময় রায় বললেন—আপনারা যদি আমাকে না চান কমিণ্টার্ণে ভারতীয় কমিউনিষ্টদের প্রতিনিধি হিসেবে তা যাঁকে চান তাঁকে পাঠাবেন ; আমি সরে যেতে রাজী আছি। আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না এই ধরণের কথার জন্যে ; তাই আকস্মিকতার ধাক্কা সামলে উঠে বল্লেম—আমরা কেউ এখানে থেকে যাবার জন্যে আসিনি। কাজ শেষ করেই দেশে ফিরে যাব। সেখানেই আমাদের কাজ। তাই আপনার জায়গায় ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হিসেবে অন্য কারোর আসার প্রশ্নই ওঠে না।

হোটেলে ফিরে এসে ভাবতে লাগলুম রায় এ কথাটা বল্লেন কেন ? এ ধরণের তো কোনো কথা কারো সঙ্গে হয়নি। কোনো কারণই ভেবে উঠতে

পারছি না ; এমন সময় হঠাৎ মনে হোলো যে পিয়াৎনিস্‌কির সঙ্গে আমার যে আলাপ হয়েছে তার সারাংশ যে কোনো উপায়েই হোক রায়ের কাছে নিশ্চয়ই পৌঁচেছে। ষ্টালিনের সেক্রেটারী হিসেবে টিভেলই যে পিয়াৎনিস্‌কির কাছ থেকে আমাদের আলাপের খবর নিয়েছে, আর পরে রায়কে জানিয়েছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ রইলো না মনে। রায় ও লোহানীর বিরুদ্ধতা যে এবারে কি রকম বিষাক্ত হয়ে উঠবে তা সহজেই অনুমান করে নিলুম। একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে আসছে যারা অনেকদিন ধরে তাদের সেই অধিকারে হাত পড়লে ক্ষেপে ওঠা তো স্বাভাবিকই। আর এই একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখবার খেলা যে শুধু জমিদার আর কলওয়ালা করে থাকে তা নয় রাজনীতির ক্ষেত্রে কালো, ফিকে লাল, লাল সব রঙের রাজনৈতিক পেশাদারেরা একচেটিয়া অধিকারের জন্যে যে কি জঘন্য লোলুপতার সঙ্গে পরস্পরের মধ্যে লড়তে পারে তার প্রমাণ তো অতীতের রাজনৈতিক ইতিহাস বারে বারে দিয়েছে। আর এ বিষয়ে সর্বকালের রাজনৈতিক নজিরকে ম্লান করে দিয়েছে বিংশ শতাব্দীর ষ্টালিন। হু'দিন বাদে কমিন্টার্ণের কমিটিতে পলিটিকাল রিপোর্ট পেশ কররার জন্যে আমার ডাক পড়লো। সেদিন কমিটির মিটিংয়ের সভাপতিত্ব করলেন কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনালের প্রেসিডেন্ট-গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান নিকোলাই বুখারিণ। আমার রিপোর্টে আমি দেখালুম যে প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময় থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ কেমন করে বাধ্য হয়েছে ভারতবর্ষে তার বনেদী উপনিবেশিক নীতি বদলাতে। এতোকাল ভারতবর্ষ ছিলো কাঁচামাল লুণ্ঠনের অবারিত ক্ষেত্র আর বৃটিশ পণ্যের একচেটিয়া বাজার। যুদ্ধের মাল যোগাবার জন্যে যুদ্ধের সময় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বাধ্য হয়েছে ভারতবর্ষে বহু কলকারখানার পত্তন করতে দিতে। ভারতবর্ষের শিল্প-উন্নয়নে প্রাণপণ বাধা দেওয়াই সচ্ছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নীতি। তবে ইচ্ছে থাকলেও যুদ্ধের কারণে সেটা সম্ভব হয়নি। ভারতবর্ষকে কিন্তু ইনডাষ্ট্রিয়ালাইজড্ দেশ বলা যায় না কেননা উৎপাদনের যন্ত্রের তৈরী আদবেই হয় না ভারতবর্ষে। এই রিপোর্টে জাতীয় কংগ্রেস সম্বন্ধে আমার যে মত ব্যক্ত করেছিলুম সেটা ছিল এই—কংগ্রেস ভারতবর্ষের বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক দল। বোম্বাইয়ে কাপড়ের কলের পত্তনের ইতিহাসের সঙ্গে কংগ্রেসের জন্মের ইতিহাস অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ভারতবর্ষের বুর্জোয়াদের অর্থনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের অর্থনৈতিক স্বার্থের বিরোধ নিশ্চয়ই আছে। সে বিরোধকে কিন্তু ভারতবর্ষের বুর্জোয়া জাতীয় বিপ্লব পর্য্যন্ত ঠেলে

নিয়ে যেতে পারে না। শ্রমিক-বিপ্লবের যুগ সুরু হয়ে গেছে সোভিয়েট রাষ্ট্রের পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে। এই যুগে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী বিপ্লব-পন্থী নয়, সে আপোষ-কামী। ইতিহাস তাকে মেরে রেখেছে। ভারতবর্ষের বুর্জোয়ার রাজনৈতিক দল কংগ্রেসও এই একই কারণে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ করতে বাধ্য। ভারতবর্ষের জাতীয় বিপ্লব সম্পন্ন করা তাই ভারতের মজুর-শ্রেণীর ঐতিহাসিক দায়িত্ব।

আমার রিপোর্টের পর অনেকে আমাকে অনেক প্রশ্ন করলেন নানা বিষয়ে। অবশেষে বুখারিন তাঁর মতামত ব্যক্ত করলেন। বুখারিন বল্‌লেন—এই কমরেড যা বললেন তাঁর রিপোর্টে তার থেকে মনে হচ্ছে যে ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক কাঠামোর বিরুদ্ধ প্রক্রিয়া (decolonisation process) সুরু হয়েছে। বুখারিনের এই মন্তব্যের পরে মানবেন্দ্রনাথ রায় আর লোহনী বুখারিণের এই প্রাসঙ্গিক উক্তির সুযোগ নিয়ে সাত তাড়াতাড়ি এক decolonisation theory রচনা করতে সুরু করে দিলেন কমিউনিষ্ট ইণ্টার-ন্যাশনালের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ইমপ্রিকরের' পাতায়। বুখারিন যে তখন বলশেভিক দলের পলিটব্যুরোর সদস্য, কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশানালের সর্বাধি-নায়ক। যে যখন ক্ষমতাশালী তাঁকে তোয়াজ করবার সুযোগ সুবিধাবাদীরা কি কখনো ছাড়তে পারে? এক বছর বাদে কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশানালের আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে এই একটি প্রাসঙ্গিক উক্তির জন্যে বুখারিনকে অনেক তীব্র সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছিল। সে কথা যথাসময়ে লিখব। কমিণ্টার্নে রিপোর্টের পালা শেষ হতে না হতেই ভারতবর্ষের ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলন সম্বন্ধে বলবার জন্যে লাল ট্রেডইউনিয়ন আন্তর্জাতিকের (এর রুশীয় সংজ্ঞা—প্রফিন্‌টার্ণ) কাছ থেকে জরুরী তলব এলো। লজভ্‌স্কি তখন প্রফিন্‌টার্ণের কর্তা। তাঁর সভাপতিত্বে লাল ট্রেড ইউনিয়ন আন্তর্জাতিকের এক অধিবেশনে ভারতবর্ষের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলুম আমি। রুশীয়দের যেমন রিপোর্টের নেশা এমনটি আমি দেখিনি আর কোথাও। কারখানা, স্কুল, ক্লাব, থিয়েটর, খবরের কাগজের অফিস, কমিণ্টার্ণের তো কথাই নেই সব জায়গায় 'দক্‌লাদ্‌' (রুশীয় শব্দ মানে রিপোর্ট) চলেছে দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর। এটা এদের জীবনের এমন অঙ্গ যে 'দক্‌লাদ' না হলে এদের জীবনটা যেন ভরাটই হয় না, তাতে ফাঁক থেকে যায় অনেকটা। 'দক্‌লাদে'র দায় থেকে উদ্ধার পেয়ে বাঁচলুম আমি। রুশীয় ভাষা শেখবার জন্যে

উঠে পড়ে লেগে গেলুম। দেশে থাকতে রুশীয় হরফের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিলো, কিছু রুশীয় কথাও সংগ্রহ করেছিলুম আমার বিদ্যের ঝুলিতে। তার বেশী আর এগোয় নি। এবারে খবরের কাগজ নিয়ে অভিধান নিয়ে ব্যাকরণ নিয়ে দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করলুম নিজেকে ঘিরে। সারাদিনের মধ্যে পাঁচ ছ'ঘণ্টা কাটতো আমার সেই ব্যূহের মধ্যে। রোজ পঞ্চাশটি নতুন কথা শিখবো এই পণ করে মরিয়া হয়ে লেগে গেলুম রুশীয় ভাষা শিখতে। ফলও পেলুম তার, অল্পদিনের মধ্যেই আমি রুশীয় কাগজ পড়তে সুরু করে দিলুম, রুশীয় ভাষায় কথা বলাও সুরু হোলো সঙ্গে। রুশীয় ভাষায় আমার দখল যে শুধু বন্ধু মহলের তারিফ পেয়েছে তা' নয়, একদিন আমার খাস মস্কো জবানের তারিফ করলেন স্বয়ং বুখারিন। থিয়েটর আর সিনেমায় যেতে লাগলুম রুশীয় বন্ধুদের সঙ্গে। মনটা খুসী হলো দেখে যে থিয়েটরে অভিনয়ের কথাবার্তার অনেকটাই বুঝতে পারছি। বল্‌শই থিয়েটরে 'ক্রাসনিয়িমাক' (লাল পপি) নামক ব্যালে দেখলুম। প্রধান ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন সুপ্রসিদ্ধা ব্যালেরিণা গেলৎসার। মেয়রহোল্ডের থিয়েটরে দেখলুম গোগলের 'রিভিজ্‌র', ত্রিচিকভের 'রিচিকিতাই' (চীনের ডাক), মালি থিয়েটরে দেখলুম 'লুভব ইয়ারোভায়া' নামক নাটিকা, ষ্টানিস্লাভস্কির থিয়েটরে দেখলুম 'হ্যামলেট' আর মেটারলিঙ্কের 'ব্লু বার্ড', ভাগ্‌তান্‌গভ থিয়েটরে দেখলুম 'প্রিন্সেস তুরেনদত্‌'। আরো কত অভিনয় দেখলুম কিন্তু এইগুলিই মনে আছে আর সব মুছে গেছে মন থেকে। এদের মধ্যে আবার বিশেষ করে মনে আছে 'রিচিকিতাই'য়ের অভিনয় মেয়ারহোল্ড থিয়েটরে, ষ্টানিস্লাভ্‌স্কির থিয়েটরে প্রসিদ্ধ অভিনেতা চেকভের অভিনয় হ্যামলেটের ভূমিকায়, ব্লু বার্ডের অভিনয়, আর প্রিন্সেস তুরেনদতের অভিনয় ভাগ্‌তান্‌গভ্‌ থিয়েটারে। রূপকথাকে যে কি ভাবে ফুটিয়ে তুলতে হয় দৃশ্যপটে আর অভিনয়ে তা বুঝতে পারলুম 'ব্লু বার্ড' আর 'প্রিন্সেস তুরেনদতে'র অভিনয় দেখে। একবার ছোট্ট একটি ইহুদী থিয়েটরে 'গেলম্‌' নামের একটি নাটিকার অভিনয় দেখেছিলুম। সে অপূর্ব জোরালো অভিনয়ের কথা আজও ভুলিনি।

মস্কো শহরটি বড় ভাল লেগেছিল। হোটেল থেকে বেরিয়ে কয়েক পা গেলেই বুলভার সুরু হোলো। পুস্কিনের বিরাট মূর্তি রয়েছে বুলভারে ঢোকবার মুখেই। সমস্ত শহটির মধ্যে দিয়ে ঘুরে গেছে বুলভার। বুলভারের ভিতরে পথের দু'পাশে বড় বড় গাছ তাদের তলায় সবুজ ঘাসের উপর শিশুদের

মেলা বসে সকাল সন্ধ্যে। সবুজ গাছগুলো সোনালী হয়ে যায় হেমন্তে। তারপরে পাতাঝরা নগ্ন গাছগুলো বরফের শুভ্র আবরণে নগ্নতার লজ্জা ঢাকে শীতকালে। পোষাকের একঘেয়েমি এখানে নেই, কেউ কলার দিয়েই গলাটাকে আড়ষ্ট করে বেঁধে চলেছে, কেউবা চলেছে রুশীয় রূবাস্কা ট্রাউজারের উপর দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়ে কোমরে কোমরবন্ধ বেঁধে। নানা রঙের রঙীন রুমাল দিয়ে পিঙ্গল কি সোনালী রঙের চুলগুলোকে বেঁধে পথ চলে মেয়েরা। এখানে পথে ঘাটে কথাবার্তায় রঙের প্রাচুর্য্য দেখে খুসী হয় মন। রাস্তাগুলো আঁকাবাঁকা, ছোট্ট সরু রাস্তা, তার দুপাশের বাড়ীগুলোর দিকে তাকালেই মনে হয় তাদের মধ্যে একটা আত্মীয়তা আছে। পরস্পরকে তারা চেনে, ভালবাসে। কত পুরোনো গির্জে ছড়িয়ে রয়েছে শহরময়। চমৎকার ফ্রেস্কো রয়েছে কতকগুলি গির্জের ভেতরকার দেয়ালে। আরবাতের কাছে একটি গির্জে দেখলুম, শুনলুম পুস্কিনের বিয়ে হয়েছিল এই গির্জেয়। রেড্ স্কোয়ারে ঢোকবার আগেই একটা ছোট্ট গির্জে। গির্জের চূড়োটি নীল রঙের, তার উপরে সোনালী তারা বসানো। এই ছোট্ট গির্জেটিতে সন্ধ্যেবেলায় লোক আর ধরে না। ক্রেমলিনের দেয়ালের গা ঘেঁসে নদীর দিকে নেমে চলে গেছে প্রকাণ্ড শানবাধানো রেড্ স্কোয়ার। লেনিনের মাওসেলিয়ম রয়েছে রেড্ স্কোয়ারের মাঝামাঝি জায়গায় ক্রেমলিনের দেয়ালের ধারে। মস্‌ক্‌ভা নদীটি মাঝারি গোছের চওড়া, ঢেউয়ের দেমাক করবার মত তার স্রোতের সম্পদ নেই তবুও দুধারের তীরের বৈচিত্রে, ছোটবড় অসংখ্য নৌকোর যাওয়া আসায় মস্‌ক্‌ভা গতিমুখরা চিরচঞ্চলা। শীতের সময় মস্‌ক্‌ভা শাদা জমাট বরফের মরুভূমি। নদীর উপর দিয়ে হেঁটে পারাপার হয় লোকে, নদীর বুকে বিদ্যুতের গতিতে স্কেটিং করে মেয়ে পুরুষে। শীতের শেষে বসন্তের প্রারম্ভে স্থুরু হয় বরফগলা। যেটা ছিল বরফের ঢালাই করা পাতের মত বেদাগ, সেটাতে দেখা দেয় চিড়ের রেখা শতসহস্র। উপরের বরফের আবরণ পাত্‌লা হয়ে আসে; শোনা যায় বরফের তলায় স্রোতের কলধ্বনি। তারপরে একদিন নদীর বুক ফেটে চৌচির হয়ে যেতে স্থুরু করে সূর্যের উত্তাপে; নদীর বুক থেকে বরফ ফাটার ধ্বনি ছড়িয়ে যায় আকাশে বাতাসে। বরফের বড় বড় টুক্‌রো ভেসে যেতে থাকে। সন্ধ্যেবেলা সেই ভেসে যাওয়া বরফের চাক্‌লার উপর প্রদীপ সাজিয়ে দেয় মেয়েরা। আলোগুলো জোনাকির মত জ্বলতে জ্বলতে নিবে যায়, মিলিয়ে যায় অন্ধকারে। এরা পথ চলে গান

গাইতে গাইতে। এমন দিন নেই যেদিন চোখে পড়ে না যে একদল মজুর কিম্বা কয়েকজন লাল সৈনিক চলেছে রাস্তা দিয়ে বিপ্লবের গান গেয়ে। বুল্‌ভারের মধ্যেও প্রায়ই দেখি পথিকেরা একজন সৈনিককে ঘিরে দাঁড়িয়ে গেছে, হাততালি দিয়ে তাল রাখছে আর সে নাচছে। নাচগান এদের কাছে আলো বাতাসের মতই প্রয়োজনীয় জীবনধারণের জন্যে। চলমান জীবনকে এরা বেঁধে নিয়েছে গান ও নৃত্যের ছন্দে। এখানে অফুরন্ত বৈচিত্র্য আছে কিন্তু বৈষম্যের পীড়াদায়ক ছবি চোখে পড়ে না। অভাব আছে কিন্তু সামাজিক বৈষম্যের দ্বারা অভাবকে এরা অপমানে পরিণত করেনি। লেনিন নেই কিন্তু তখনো ষ্টালিনের কালো ছায়া লেনিনের আলোকে নিঃশেষ করে দেয়নি।

হোটেলের ঘরে একদিন এক ভদ্রলোক দেখা করতে এলেন, নাম বল্‌লেন—ফ্রায়ার। চীন থেকে সদ্য ফিরেছেন, আমার হোটেলেই থাকেন। সন্ধ্যেবেলা ফ্রায়ারের ঘরে গেলুম, ফ্রায়ার আলাপ করিয়ে দিলেন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে। কয়েকদিনের মধ্যেই আলাপ জমে গেলো, সন্ধ্যেবেলা ফ্রায়ারের ঘরে সামেভার ফুট্‌তো টগ্‌বগ্‌ করে টেবিলের উপর, আমরা তিনটি প্রাণী টেবিলের ধারে বসে মজলিস জমাতুম। চীনের বিপ্লবের অনেক খবর পেলুম ফ্রায়ারের কাছ থেকে। ফ্রায়ার-দম্পতী এক বছর ছিলেন চীন দেশে। কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলুম যে পেছিয়ে-পড়া ভারতবর্ষের লোক বলে আমাকে এঁরা দেখেন করুণার নেকনজরে। যা কিছু রুশীয় তার উপর এঁদের দু'জনের প্রগাঢ় ভক্তি। যা কিছু রুশীয় সেটা যে অতুলনীয় এইটে আমাকে দিয়ে মানিয়ে নেবার জন্যে এঁদের চেষ্টার অন্ত ছিলো না। এঁদের নিয়ে রস উপভোগ করবার এমন সুযোগ যে আমি ছেড়ে দিইনি সেটা আশা করি বলতে হবে না! ফ্রায়ার-জায়া মুসা একদিন রুশীয় রান্নার প্রসঙ্গ তুললেন, জিজ্ঞেস করলেন রুশীয় রান্না আমার কি রকম লাগ্‌ছে। বল্‌লুম বেশ লাগ্‌ছে, দু'একটি রান্নার তারিফও করলুম। তিনি বললেন: সে কি কথা! এমন চমৎকার রান্না পৃথিবীতে নেই। বললুম, তা ঠিক মানতে পারছিনে। নানা দেশের নানা অপূর্ব রান্না খেয়েছি। এই সেদিন প্যারিসে ফরাসী রান্না খেয়ে এলুম, রান্না যদি বল্‌তে হয় তো তাকেই বলে রান্না। রুশীয় রান্না আনাড়ির হাতের কাজ, ফরাসী রান্না শিল্পীর সৃষ্টি। দু'জনে আক্রমণ করলেন আমাকে, দম নেবার জন্যে একজন থামেন তো আর একজন ধরেন। তাঁদের কথাগুলো ভীমরুলের মতো বোঁ বোঁ করে উড়তে লাগ্‌লো আমাকে ঘিরে। আমরা তিনজন ব্যালে দেখতে গেলুম

একদিন সন্ধ্যেবেলা। হোটেলে ফেরবার পথে ফ্রায়ার জিজ্ঞেস করলেন, ব্যালে লাগ্‌লো কেমন। আমার যে বিশেষ ভালো লাগেনি সেটা জানিয়ে দিলুম তাঁকে। পথের মধ্যেই স্থুরু হয়ে গেলো ব্যালের তারিফে বক্তৃতার নায়াগ্রা প্রপাত। রুশীয় ব্যালের তারিফের বন্যায় সেদিন পথের মধ্যেই আমি ডুবে মরবার দাখিল। একবার আলোচনা স্থুরু হোলো বিশ্ব-সাহিত্য নিয়ে। আমি রোম্যা রোলাঁ, রবীন্দ্রনাথ, টমাস্ মান্ প্রভৃতির কথা উল্লেখ করে বল্‌লুম এই জাতের লেখক সোভিয়েট রাশিয়ায় একটিও নেই। গর্কির ছোটো গল্পগুলি অপূর্ব, তাঁর নভেলগুলো এমন কি তাঁর বহু-প্রশংসিত 'মা' নভেলটিও কিন্তু সাহিত্যের দিক থেকে নীচু দরের। সেদিন উত্তেজনার যে বিস্ফোরণ হলো তার জন্যে প্রস্তুত ছিলেম না। রোম্যা রোলাঁ, রবীন্দ্রনাথ, টমাস্ মান্ যে ঘোর বুর্জোয়া আর বুর্জোয়ারা যে এযুগে ভালো সাহিত্য কিছুতেই স্থষ্টি করতে পারে না, সোভিয়েট রাষ্ট্রের সরকারী কবি ডিমিয়ান বিয়েদ্‌নির লেখার পাশে এঁদের লেখা যে হীরের পাশে কাঁচের মত নিষ্প্রভ—এসব এবং আরো কতো কিছু বলে চল্‌লেন ফ্রায়ার। অন্যদিন আমি এঁদের উস্‌কে দিই, মাঝে মাঝে টিপ্পনীর একটি দুটি খোঁচা মারি রস-উপভোগ করবার জন্যে। সেদিন এঁর কথায় আমার মেজাজটা ঈষৎ তেতে উঠে রস উপভোগে বাধা স্থষ্টি করলো। বল্লুম পোষ্টারের শ্লোগান-লিখনেওয়ালা ডিমিয়ান বিয়েদ্‌নিকে কবি বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা মাতালের টল্‌তে টল্‌তে চলাকে নাচ বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টার মতো হাস্যকর নিবুর্দ্ধিতার পরিচায়ক।

দুজনে অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। সোভিয়েট রাষ্ট্রের সরকারী মোহর-মারা কবির সম্বন্ধে এরকম উক্তি করতে যে কেউ সাহস করতে পারে এটা যেন তাঁরা বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। পেছিয়ে-পড়া ভারতের অবুঝ রাজনৈতিক আদমিটির উপর এদের এতদিন ছিলো করুণা, এবার সেই করুণার সঙ্গে মিশলো এসে রাগ। একটা জিনিস আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেলো। রুশীয় ন্যাশানালিজ্‌ম্ যে তার জাতীয় সওদা কাট্‌তি করছে দুনিয়ার বাজারে কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশানালিজমের লেবেল লাগিয়ে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ রইলো না। রাশিয়ার জাতীয় পণ্যকে বিশ্বের পণ্য হিসেবে চালিয়ে দেবার জন্যে প্রাণপাত করছে ইণ্টারন্যাশানালিজ্‌মের আলখাল্লা-পরা এ রকম রুশীয় ন্যাশানালিষ্ট-কমিউনিষ্ট যে কতো দেখেছি তার সংখ্যা নেই। ষ্টালিনের আওতায় এই রুশীয় ন্যাশানালিজ্‌ম্ বছরের

পর বছর বেড়ে চলেছে শেষে আগাছার মতো ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত রাশিয়ায়।

কমিণ্টার্নে প্রায় রোজই যাতায়াত করি। রায়ের সঙ্গে কয়েকবার আলোচনাও করেছি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে। মাঝে মাঝে রায়ের ওখানে খাবার নেমন্তন্ন আসে। জুটি আমরা এই ক'জন—টিভেল, লোহানী, টিভেলের স্ত্রী ইভা, আমি, রায়, লু আর রাথবোন। রাথবোন, ইংরেজ, ঢেঙা, রোগা লোক, কেঙ্গারু-ছন্দে একটু লাফিয়ে চলে। লম্বা গলাটার উপরে ছোট্ট মাথাটি, দেখে মনে হয় যেন জিরাফের মানব-সংস্করণ। রাথবোন ছিলো রায়ের মহাভক্ত। রায়ের দিকে তাকিয়ে থাকতো এমন করে যে মনে হতো তার ভাব লেগেছে। একবার রায়ের ঘরে এক সন্ধ্যের মজলিশে আলাপ হলো জার্মান কমিউনিষ্ট নেতা হান্স্ নয়মানের সঙ্গে। হান্স্ নয়মান তখন সবে রাশিয়ায় ফিরে এসেছেন ক্যান্টন্ থেকে। সেই মজলিশে আরো অনেক কমিউনিষ্ট নেতাদের সঙ্গে আলাপ হলো। নিজেকে তৈরি করবার জন্যে কি কড়া হাতেই না নিজেকে চালিয়েছি আমি এই সময়! কমিউনিজম সম্বন্ধে যতো বই পেয়েছি সব উজাড় করে চলেছি, রুশীয় ভাষা আয়ত্ত করবার জন্যে একঘেয়ে পরিশ্রম করেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা, রুশীয় সাহিত্য ও রুশীয় ইতিহাস জানবার জন্যে কতো লোকের শরণাপন্ন হয়েছি। রুশিয়ার অতীতকে আমার জানতে হবে তবেই আমি বুঝতে পারবো সোভিয়েট রুশিয়াকে, এই ধারণা নিয়ে চলেছি আমি সেদিন। সোভিয়েট রাশিয়া সম্বন্ধে নানা ধরণের তথ্য সংগ্রহ করবার জন্যে কি ঘোরাই না ঘুরেছি, কি পরিশ্রমই না করেছি তখন। সোভিয়েট রাশিয়ার নতুন শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্যে অন্তত পঞ্চাশটি শিশুদের শিক্ষা-নিকেতনে গিয়েছিলুম। তা' ছাড়া শিশুদের ক্লাব, তাদের থিয়েটর সব খুঁতিয়ে দেখেছিলুম। অন্য অন্য দেশের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপনের জন্যে 'ভক্স্' নামে এক প্রতিষ্ঠান ছিলো। এই প্রতিষ্ঠান চালনা করতেন মাদাম কামেনেভা। ইনি ছিলেন প্রসিদ্ধ বল্‌শেভিক্ নেতা কামেনেভের স্ত্রী, ট্রট্‌স্কীর বোন। মাদাম কামেনেভা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তাঁর বাড়ীতে যাবার জন্যে। মনে আছে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেছিলেন—অনেক সমজ্‌দার লোকের সঙ্গে আপনার আলাপ করার সুযোগ হবে আমার ওখানে। আপশোষ থেকে গেল তাঁর সহৃদয়তার সুযোগ আমি গ্রহণ করতে পারিনি। তখন বলশেভিক দলের মধ্যে

ষ্টালিন আর ট্রট্স্কি-কামেনেভ-জিনোভিয়েভের লড়াই চরম সীমায় গিয়ে পৌঁচেছে। এক ভয়ঙ্কর হিংস্র বিষাক্ত রাজনৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টি করে রেখেছিল ষ্টালিন সমস্ত রাশিয়া জুড়ে। তার কথা মানিয়ে নেবার জন্যে তার নেতৃত্বকে স্বীকার করিয়ে নেবার জন্যে লেনিনের বলশেভিক পার্টিকে তুলে দিয়েছিল ষ্টালিন তার গোয়েন্দা-পুলিশ-বিভাগ গেপেয়ুর হাতে। যতদূর মনে হচ্ছে আমার সাহসে কুলোয়নি সেই হিংস্র সময়ে মাদাম কামেনেভার ওখানে গিয়ে কামেনেভ ও ট্রট্স্কির সঙ্গে দেখা করার। ফাঁকিতে কিন্তু আমিই পড়েছি, ক্ষতিটা হয়েছে আমারই।

কিশোর বয়েস থেকে ভেরা ফিগ্‌নারের নাম শুনে এসেছি। স্বেচ্ছাচারী জারকে মারবার জন্যে রাশিয়ার সন্ত্রাসবাদীরা কি রকম ষড়যন্ত্র করেছিলেন তার কাহিনী তন্ময় হয়ে পড়তুম সেই অল্প বয়েসে। তাই লেনিনের নাম যখন একেবারেই শুনিনি তখন থেকে ভেরা ফিগ্‌নারের নাম আমার জানা ছিল। বন্ধু লিও ভিলেন্‌স্কিকে একবার কথায় কথায় ভেরা ফিগ্‌নারের কথা জিজ্ঞেস করলাম। তার কাছ থেকে শুনলাম যে ভেরা ফিগ্‌নার বেঁচে আছেন আর থাকেন মস্কোতেই।

লিওকে ধরে পড়লাম ভেরা ফিগ্‌নারের সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দিতে হবেই। দুদিন বাদে লিও এলেন হাতে একটী পোষ্টকার্ড। দেখলুম তার পরদিন বিকেলে আমাদের যেতে লিখেছেন ভেরা ফিগ্‌নার। পরদিন বিকেলে লিও আর আমি গেলুম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। যাঁরা জারের স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের বিরুদ্ধে জীবনপণ করে লড়েছিলেন আর তার জন্যে অকল্পনীয় দুঃখ লাঞ্ছনা ভোগ করেছিলেন; বিপ্লবের পরে। তাঁদের সম্পূর্ণ ভার নিয়েছিলো লেনিনের সোভিয়েট রাষ্ট্র। ষ্টালিনের আমলে মানবতার অন্য সব চিহ্নের লুপ্তির সঙ্গে এটিও লোপ পায়। বাড়ীতে ঢুকতে যাচ্ছি হঠাৎ জানলার দিকে নজর পড়ল। দেখি লাল শাল গায়ে এক বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে আছেন জানলার কাছে। আমরা বারান্দায় উঠ্‌তেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। কি সুন্দর চেহারা! কাশের মত নরম সাদা চুল কপালের উপর দিয়ে টেনে খোঁপা করে বাঁধা। বড় বড় চোখ, নিখুঁত নাক, মুখখানি অসামান্যতার লাবণ্যে উজ্জ্বল। তাঁর আত্মজীবনী 'রাশিয়ার উপর রাত্রির ছায়া' বইখানি আমি পড়েছিলুম। সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে ভেরা ফিগ্‌নারের যাতায়াত ছিল জারের প্রাসাদে। অপূর্ব সুন্দরী বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। জারকে মারবার

জন্যে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে তাঁর যাবজ্জীবন কারাবাসের হুকুম হয়। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর কারাবাসের পর নভেম্বর বিপ্লবই তাঁকে মুক্তি দেয়। যে লোহার খাঁচাটিতে তিনি এই দীর্ঘকাল কাটিয়েছিলেন সেটি রাখা আছে মস্কোর বিপ্লবের মিউজিয়ামে। আমি তাঁর আত্মজীবনীর কথা উল্লেখ করলুম, বল্‌লুম যে বইখানি পড়ে খুব আনন্দ পেয়েছি। তাঁর কাল আর সেকালের বিপ্লবীদের যে ছবি তিনি এঁকেছেন তা যে পড়বে সে কখনো ভুলবে না। তাঁর অল্প বয়েসের যে ছবিগুলি বইতে রয়েছে সেগুলির কথা তুলে বল্‌লুম—জারকে বিয়ে করবেন এই রকম কল্পনা করা আপনার পক্ষে মোটেই অন্যায় ছিল না, যে রকম আশ্চর্য সুন্দর ছিলেন আপনি। আমার দিকে তাকিয়ে কৌতুকভরা চোখে মিষ্টি হাসি হেসে বল্লেন—কেন, এখন কি রকম দেখছেন! সত্যি তাই, জীবনের পঁচিশ বছর জন্তুর মত লোহার খাঁচায় বন্ধ থেকে আটাত্তর বছর বয়েসেও মানুষ এত লাবণ্য পায় কোথা থেকে! ভারতবর্ষের কথা অনেক জিজ্ঞেস করলেন, বল্‌লেন—গান্ধীকে আমি বুঝি না। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে বৈকি, ওতে অন্যায় কি থাকতে পারে? রাশিয়ার অর্থনৈতিক দুর্গতির জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে বল্‌লেন—মানুষের দিকে না তাকিয়ে প্ল্যান করলে এই রকমই ঘটে। মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে হরণ করবার জন্যে ষ্টালিনের তীব্র সমালোচনা করলেন। আমি অবাক হয়ে গেলুম তাঁর নির্ভীকতায়।

তারপরে আরো বারদুয়েক তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলুম। তাঁর আত্মজীবনী আর তাঁর স্বাক্ষরযুক্ত তাঁর নিজের অনেক ছবি তিনি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। বইটী এখনো আমার কাছে আছে, ছবিগুলো একজন ভারতীয় ষ্টালিনপন্থী দেখবার নাম করে আত্মসাৎ করেছে।

গ্রীষ্মের দিনগুলি শেষ হয়ে এল। বুলভারের গাছগুলিতে সোনা ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিলো হেমন্ত বায়ু। ঘন নীল আকাশ হল ধূসর। হেমন্তের ঝড় ছড়িয়ে দিলো পাতার সোনা রাস্তায় বনে বুল্‌ভারে। আমাদের দেশে ঋতুর ডালিত রঙের বৈচিত্র নেই, আছে শুধু সবুজ আর সবুজেরই হেরফের। এখানে আছে রঙের খেলা সবুজে সোনালিতে শাদায়। এ দেশের ঋতুর মতো এ দেশের মানুষদের জীবনও বৈচিত্রে ভরা, নানা রঙে রঙীন। এই জীবন-বৈচিত্রের রঙীন সুরা পান করছিলুম আমি আমার প্রাণের উত্তপ্ত তৃষ্ণার তাড়নায়।

ক্রমশঃ

আধুনিক সাহিত্য

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোনো বিখ্যাত সাহিত্যিকের মৃত্যু আমাদের শোকসভাতেই উদ্বোধিত করে এবং সভার শোকের যা অনিবার্য পরিণতি আমাদের মন সেই বিস্মৃতিকে নিয়েই ঘরে ফিরে আসে। তারপর আর এক মুহূর্তের জন্যেও আমরা ভাবতে চাইনে আমাদের সাহিত্য-ভাণ্ডার সেই বিখ্যাতের রচনাবলী থেকে কতোটুকু নিতে পারল। যদি কিছুই তা তুলে নিতে রাজি না হয় তাহলে যে বিন্দুমাত্রও দুঃখ বা সন্তাপ এসে আমাদের মনে উঁকি দেবে কখনও এমন ঘটনা দেখা যায় না। রবীন্দ্রসাহিত্যের ধারাবাহিকতা আজ বাংলাসাহিত্যে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর কিন্তু তাতে আমাদের ভ্রূক্ষেপ নাই—মহাসমারোহে আজও ত আমরা রবীন্দ্রজন্ম- বা মৃত্যুবার্ষিকী করে যাচ্ছি! এমন কি সে-সব সভায় চেঁচিয়ে একথাও বল্‌ছি: তোমার আসন শূন্য হে বীর পূর্ণ কর। ভাবছি এই আমাদের কর্ত্তব্য। আসল কর্ত্তব্যে যখন ফাঁকি পড়ে তখন ফাঁকা আওয়াজেই গগন বিদীর্ণ করতে হয়। এ-কৌশল আমাদের জানা আছে।

তবু আমি ভাবি বাংলাসাহিত্যের দীনতায় কেউ-কেউ সত্যি ব্যথিত হচ্ছেন। কোনো বিখ্যাত সাহিত্যিকের মৃত্যুতে তাঁরা সন্তপ্তচিত্তে ভাবতে থাকেন, সাহিত্য কাঙাল হয়ে গেল! এ-ভাবনার যে কোনো ফলই হয় না আমি তা মানব না। কেউ-কেউ এ-দুঃখের কাঁটা বহন করেন বলেই সমাজমানসে একদিন ফুল ফুটে ওঠে। সাহিত্য তার হৃতগৌরব ফিরে পায়।

শরৎচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের পর আজ বিভূতিভূষণের মৃত্যুতেও, আমার মনে হয়, কেউ-কেউ নিশ্চয়ই মনে-মনে একটা দারিদ্রের ব্যথা লালন করে চলেছেন। তাই ‘পথের পাঁচালি’র মতো মিষ্টি বই হয়ত আরো লেখা হবে। কিন্তু আমি ভাবছি আরেকটি বিভূতিভূষণ বাংলাসাহিত্যে আসবে কি? দু’জন লেখকের অমিল অবধারিত বলেই এ কথা বলছিনে, বলছি সাহিত্যিকদের মতিগতি লক্ষ্য করে। বিভূতিভূষণের মৃত্যুতে বলা যায় যে বাংলাসাহিত্যে আর নির্ম্মল শিল্পীমন রইল না। অনেকেরই জীবনে শিল্পের জোয়ার যৌবনের মতো একটা বিশেষ কালব্যাপী—দেখতে পাই, তারপরই তাঁরা আটপৌরে মানুষ। শিল্পসৃষ্টির বিস্ময়কর ক্ষমতার বলে যাঁরা ধন-মান অর্জ্জন করেছেন, একদা তাঁরাও ঠিক তেম্নি বিস্ময়করভাবেই শিল্পীমন হারিয়ে বসে থাকেন। এই অভিশাপ থেকে বিভূতিভূষণ মুক্ত হতে পেরেছিলেন—আজীবন তিনি তাঁর মনকে নিয়েই খুসী ছিলেন, উল্লসিত ছিলেন মনের সম্পদকে নিয়ে।

শিল্পীমনের যাত্রা আলোর যাত্রারই মতো—একটি বিন্দু থেকে তার সুরু কিন্তু

ক্রমেই তা ছড়িয়ে পড়ে জড়িয়ে ধরে বিপুল আয়তন। একটি ছোট্ট গাঁয়ের গাছ, লতা, ফুলকে ভালোবেসে যে-মনের যাত্রা স্থরু হয়েছিল তার পরিণতি হল তাই বিশ্বপ্রকৃতিকে আলিঙ্গন করে। মন শুধু আশেপাশের মানুষের জীবনকে পেয়েই সব পাওয়ার তৃপ্তিতে ভরে গেলনা, পেতে চাইল জীবনের মহারহস্যকে। মনের এই প্রসার নিয়েই বিভূতিভূষণ। আজ তাঁর দিকে তাকাতে গেলে একটি প্রসারিত মনই মনে পড়ে।

এ মন সঙ্কীর্ণতায় সাধারণ নয়, খণ্ডতায় ভ্রষ্ট নয়। তাই বিভূতিভূষণকে দেখতে পেতাম শিল্পভোক্তার ও ভূমিকায়। শিল্পস্থষ্টির যে ধরন বা ভঙ্গী তিনি গ্রহণ করেন নি তার প্রতি উপেক্ষা তাঁর মনে কোনোদিন ঠাঁই পায়নি—যেভাবে, যেখানে শিল্পস্থষ্টি হয়েছে, তিনি তার রসাস্বাদ করেছেন। এমন বহু বিখ্যাত শিল্পীর কথা আমি জানি যাঁরা নিজেদের প্রিয় বিষয় বা ভঙ্গীর বাইরে কোনো রচনাকে শিল্পের মর্য্যাদা দিতে রাজি নন। এ-তুর্লক্ষণ এ-শতকে ক্রমেই স্পষ্ট আর ব্যাপক হয়ে উঠছে। ক্রুদ্ধ বিংশ শতক্ শিল্পীর মহৎ মনেও ক্রোধের কীট প্রবেশ করিয়ে দিতে সচেষ্ট! তাই প্রগতিবাদী সাহিত্যিক নাম নিয়ে কেউ কালাপাহাড়ী নৃত্য করছে দেখা যায়, কেউবা গণসাহিত্যের লাল ধ্বজা তুলে রবীন্দ্রনাথের বিরাট কীর্ত্তিকে পাণ্ডুর করে দিতে উদ্যত, কেউ কেউ সাহিত্যের শুচিবায়ুতে উত্যক্ত হয়ে যৌনতার মসিখেলায় মত্ত আর কেউ প্রগতিবাদের বিভীষিকায় ধর্ম্মের তুর্গ নির্ম্মাণে ব্যস্ত। ফলে, শিল্পী আর তাঁর নিজের মনের দিকেই পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিতে তাকাতে পারছেন না. অপরের মনকে গ্রহণ করা ত দূরের কথা! শিল্পী আজ আর মনোবাদী নন, মতবাদী!

সাহিত্যজীবনের এই তুঃসময়েই আমরা বাস্ করছি। যাঁরা একে তুঃসময় বলতে নারাজ তাঁদের আরামে বিঘ্ন ঘটাতে চাইনে কিন্তু আমরা ভাবতে থাকব যে তুঃসময়েই আমরা আছি আর শিল্পীমনের অস্তমিত মহিমা বারবার স্মরণ করে মনে মনে বল্‌ব: 'আমরা চিরদিন এমন ছিলাম না।'

মনোজিৎ চৌধুরী

চিত্রকলা

বিগত যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর কলকাতায় বছরে পাঁচসাতটা ছোট বড় শিল্পপ্রদর্শনী, বিশেষ করে চিত্রশিল্পের প্রদর্শনী দেখা যেতো ; চিত্র ও ছোটো ছোটো তক্ষণ-নিদর্শন বিক্রীও ভালো হ'তো। নানা আদর্শ ও আঙ্গিকের সংঘাতে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলছিল বিস্তর। একটা উজ্জীবনের লক্ষণ বেশ সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল। আজ বছর দুই দেখ্‌ছি প্রদর্শনীর সংখ্যা কমে আস্‌ছে, বিক্রীর অঙ্ক নেমে আস্‌ছে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা সীমাবদ্ধ হ'য়ে আস্‌ছে। ক'লকাতার শিল্পীকুলের মধ্যে যে উজ্জীবন লক্ষ্য করা গিয়েছিল তা' যেন কতকটা স্তিমিত হ'য়ে আস্‌ছে। এর সামাজিক ও শিল্পগত কারণ বিশ্লেষণ ও নির্ণয় খুব দুরূহ ব্যাপার হয়তো নয়।

কিন্তু, যা' সবচেয়ে মর্মান্তিক তা' হচ্ছে শিল্পীকুলের চরম অর্থদৈন্য। যিনি আঁকবেন, রূপ গড়বেন, তাঁকে তো আগে খেয়ে পরে বাঁচতে হবে, রং কিন্‌তে হবে, কাগজ, তুলি, মাটি, পাথর সবই অর্থবলে সংগ্রহ করতে হবে। ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে জানি, ক'লকাতায় একাধিক যথার্থ প্রতিভাবান লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পী এমন আছেন যাঁদের পক্ষে দু'বেলা পেটভরে খাওয়া, স্ত্রীপুত্রকে খাওয়ানো এবং মাসিক বাড়ীভাড়া জুটানোই অত্যন্ত কঠিন ; সারাদিন ও অর্ধেক রাত্রি তাঁদের কাটে নির্মম অর্থচিন্তায় এবং অর্থ কুড়ানোর চেষ্টায় !! আমি একটুও অত্যুক্তি করছিনা। এই অবস্থার মধ্যে সার্থক শিল্পসৃষ্টির এবং কঠিন পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা উত্থাপন করতেও মনে লজ্জা ও ধিক্কার আসে। এ কী সমাজের চেহারা !!

অথচ, রাষ্ট্র ও সমাজের নায়কদের কণ্ঠে ও লেখনীতে অবিরতই সঢক্কানিনাদে ঘোষিত হ'চ্ছে তাদের শিল্পী ও শিল্পীকুলের পৃষ্ঠপোষকতার কথা। এমন কথাও অনেকে বলে থাকেন, যাঁরা যথার্থ শিল্পী তাঁরা অর্থের দিকে তাকান না, সৃষ্টির তাগাদায়ই সৃষ্টি করে যেতে থাকেন। ভাবটা এই, পয়সাকড়ির দিকে তাকাবার প্রয়োজন তাদের নেই, শুধু সৃষ্টি করে যাও, অর্থ আপনি আসবে। কী অবস্থায় কাদের মুখে এ-সব বাণী শোনা যায়, তা আমার অজানা নয়, তবু সবিনয়ে তাদেরকে একথা স্মরণে রাখতে বলি, পেটে ভাত না পড়লে, সন্তানের মুখে দুধ জুটাতে এবং মাসিক ঘরভাড়া সংগ্রহ করতে না পারলে সৃষ্টির প্রেরণার উৎসও মরুক্ষেত্রে পরিণত হয়। এ-দৃশ্য আমি চোখে দেখেছি, অথচ যাঁদের কথা স্মরণে রেখে একথা বলছি, তাঁদের মত শিল্পী সারা ভারত ও পাকিস্তানে দশবিশটাও নেই।

শিল্পীকুলের এই নিষ্করুণ দারিদ্র্যের মধ্যে রাষ্ট্রের ও সমাজের যে-রূপ প্রত্যক্ষ তার দিকে তাকিয়ে মন বিদ্রোহী হয়। দু'দশজন চাকুরীজীবী বা পৈত্রিকধনপুষ্ট বা বিদেশী ট্যুরিষ্টপুষ্ট শিল্পীছাড়া অধিকাংশ সার্থক শিল্পী যে জীবনযাপন করেন তা' একান্ত নিম্ন

মধ্যবিত্তের গ্লানিকর জীবন। সে-জীবনের পঙ্ক থেকে শিল্পে পদ্ম ফুটানো যে কী মর্মান্তিক প্রয়াস, তার কিছু পরিচয় আমার জানা আছে বলেই অবান্তর হ'লেও একথাগুলো না বলে পারলাম না।

ফাইন আর্ট একাডেমির বার্ষিক যে প্রদর্শনী কিছুদিন আগে হ'য়ে গেলো, উদ্যোক্তাদের কাছে খবর পেলাম, এবার বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ খুব আশাপ্রদ, এবং অনেক শিল্পীর শিল্পনিদর্শন নানাজনে নানামূল্যে কিনেছেন। এতে শিক্ষিত জনসাধারণের কলাবোধ ও কলারসজ্ঞতার অভিজ্ঞান কতটা পাওয়া যায়, তা' নিশ্চয়ই আলোচ্য ; এ-ধরণের প্রদর্শনীর নানাদিক দিয়ে নানা প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা তো আছেই, কে তা' অস্বীকার করবে, তবে আপাতত এই ভেবে আশ্বস্ত হ'চ্ছি যে, অন্তত কিছু শিল্পী কিছুদিনের জন্য অর্থচিন্তার হাত থেকে মুক্তিলাভ করে শিল্পচিন্তায় মন দিতে পারবেন। তা' ছাড়া, এই অর্থাগমের পশ্চাতে প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাদের যে উদ্যোগ ও শুভেচ্ছা, শিল্পকর্ম ও শিল্পীদের প্রতি যে সমাজবুদ্ধি সক্রিয়, তাহাও একটা শুভ লক্ষণ, স্বীকার করতেই হয়।

তুলনায় এবারকার প্রদর্শনী অন্যান্য দিক দিয়েও সার্থকতর হ'য়েছে। প্রথমই বল্‌তে হয়, নির্বাচনের কথা। মোটামুটি, এবারকার নির্বাচন রুচি ও শৈলী, আঙ্গিক ও বৈচিত্র্য সব দিক থেকেই প্রশংসনীয়, যদিও মনে হয়, আরো ছাঁটাই করবার অবকাশ ছিল। অস্পষ্ট দৃষ্টি ও অপটু হাতের কাজ দেখিয়ে লাভ নেই, কারণ তা' প্রদর্শনীর ভাল ছবিগুলোর ক্ষতি করে, এবং অনভ্যস্ত চোখকে, অমার্জিত বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে।

অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলাল-যামিনীবাবু থেকে আরম্ভ করে রমেন্দ্র চক্রবর্তী-গোপাল ঘোষ-কনওয়াল কৃষ্ণ পর্যন্ত সাম্প্রতিক ভারতবর্ষের সমস্ত খ্যাতনামা শিল্পীদেরই একাধিক নিদর্শন এবারকার প্রদর্শনীতে দেখা গেল। সমগ্র দেশের চলমান শিল্পপ্রবাহের একটা সামগ্রিক রূপ এমনভাবে একসঙ্গে দেখবার সুযোগ বড় একটা পাওয়া যায় না। এজন্য প্রদর্শনীর উদ্যোক্তারা ধন্যবাদের পাত্র। বোম্বাই প্রান্তের রজা, চাবড়া, আরা, বাংলার প্রদোষ দাশগুপ্ত প্রভৃতির কাজ প্রদর্শনীতে দেখা গেল না ; এঁদের কাজও থাকৃলে আরো ভালো হ'তো। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, এবারকার প্রদর্শনীতে কিছু নোতুন শিল্পপ্রতিভার সন্ধান পাওয়া গেল ; এঁদের কাজ থেকে চিত্তে উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হয়, প্রাণে আশা জাগে। ধনরাজ ভকতের ভাস্কর্য নিদর্শন, চিঞ্চলকার, শানু মজুমদার, রামকিংকর বেইজ, হরেন দাশ, পালসিকর প্রভৃতির নানা দৃষ্টি ও আঙ্গিকের রচনা যে কোনো দেশের সাম্প্রতিক শিল্পকর্মের পাশাপাশি দাঁড়াতে পারে। এই নোতুন শিল্পীদের পরিচয়ের দিক থেকেই এবারকার প্রদর্শনীর সবচেয়ে বড় সার্থকতা।

নীহাররঞ্জন রায়

সঙ্গীত

ইদানীং দেখি গানে, স্বরবিচিত্রতার থেকে বিশেষ মাত্রায় বাক্য বিন্যাস বেশী। বাক্যকে আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু স্বরকে শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি। অন্যান্য দেশের তুলনায় বাঙলায় বাক্যমাধুর্য্য সহকার গানের মধ্যে অনেকখানি। সেখানে প্রতিক্ষেত্রেই বাক্য ও স্বর মিলে এমন এক পরম বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে, যে রসের সৃজন করে তা অনেক দূর পর্য্যন্ত গড়ায়। এ বৈচিত্র্য স্বয়ংই অভিজ্ঞতা, সমজদারের স্মৃতিকে আহ্বান করলেও একথা যে, কদাচ আপনকার সত্বা হারায় না, তথা শুধু গুণ গুণ হয়েই থাকে না, কথাটীও বলা চাই —তবেই পুরো মজা পাওয়া যায়।

এতদিন পর্য্যন্ত সমস্ত ধরণধারণ ছিল একপ্রকার; গায়ক প্রায় নিজেই গানটী বাঁধতেন; এবং তিনি সেই গানটীতে স্বর যোজনা করতেন। এক এক বাক্য বাছাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বর-সাহায্য লাভ করতো। স্বর সেই কথাটীর অর্থ বেশ পরিষ্কার ভাবে বর্ণনা করবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকে। হাজার হাজার কথা প্রত্যেকটীর নিজ মৃত্যু ঘাড়ে করে নিয়ে বেড়ায়, বাক্যগুলি ফাঁকা তারই মধ্যে সুবিবেচনায়ে প্রাণপ্রাচুর্য্য হঠাৎ আকাশ বাতাসের পাশ দিয়ে এসে বাক্যটী নিপট করে তোলে। স্বরের গুণ বাক্যটীকে রসিক ক'রে, বাক্যটীকে নিপট করে অন্যপক্ষে বাক্যটীর শব্দ-মূল্য স্বরকে আধার দেয়। এই ভাবে সমস্ত গানখানি গঠিত হয়; সঙ্গে সঙ্গে মার্জ্জিত এবং ধ্যানধারণ সবই; একই সঙ্গে একই ভাবে থাকে এবং ফলে রীতিমতো 'সুন্দর' সৃষ্টি হয়। কবে ঠিক তা বলা সত্যই মুস্কিল— কবি ও স্বরকার দুজনে আলাদা হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ গান বাঁধতেন কিন্তু প্রথমে যতদূর জানি স্বরে বাক্য যোজনা করতেন—এটা তাঁর প্রথম অবস্থা—ভাল ভাল রাগ-রাগিনীর গানগুলিতে হিন্দীর বদলে বাঙলা বাক্যস্রোত চালিয়ে দিয়েছেন, লোকত্তর প্রতিভাবান কীর্ত্তনীয়াদের গানের কলিতে নিজস্ব কবিতা আরোপ করেছেন। হলেও তাঁর একটা দিক ছিল, সেটা এই যে স্বরকে তিনি বিশেষ বিচক্ষণতা সহকারে উপলব্ধি করে নিয়েছিলেন, ফলে বাক্যগুলি অন্ততঃ স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়ে বার হতো ও স্বরে বেশ মিশ খেয়ে যেতো। এটা আমরা বিশেষ ভাবে দেখতে পাবো তাঁর প্রতিটী গানের মুখে তথা অস্থায়ীর কলিতে—সেখানে অদ্ভুত গাম্ভীর্য্য আছে, রস আছে, এবং যুক্তির অবিশ্বাস্য দৃঢ় রূপ আছেই। কাল সেখানে নাই, সমস্ত কিছু তথা যাহা কিছু আছে তা অমরতার মর্য্যাদায়। ভক্তিই থাকে, মন কোন অস্থিরতা লাভ করে না। কিন্তু পরে যখন তাঁর স্বকপোলকল্পিত স্বর লহরা তোলে তখন তাঁর গান আর রসসিঞ্চন করে না।

কথাটা আমার অন্যায় কোন ক্রমেই নয় যথা 'হে নূতন দেখা দিক' এখানে মুখটীর

মজাটা অলৌকিক। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই একটী বিচ্ছেদ আছে, সেটী সত্যই অবাক করে। আমি শুনেছি বহু গান প্রথমটুকু যেটী চিরকালের যা রবীন্দ্রনাথ সংগ্রহ করেছেন সেটুকুই সুন্দর এবং পরেরটুকু, যেটুকুতে তিনি নিজে—সেটুকু আমাদের ভাল লাগে না। রজনীবাবু, কৃষ্ণনন্দ প্রভৃতি এঁদের 'যমুনে এই কি তুমি' গানগুলিতে সুর বাক্য যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে; গানগুলি বেশ। কুমুদবাবুর গানও খুব সুন্দর। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় অতুলপ্রসাদের গান খুব সুন্দর।

আমাদের কথা ইদানীংকে নিয়ে, কাজী সাহেব বা পরবর্ত্তী আর আর গান লেখকদের নিয়ে। এদের প্রায় প্রত্যেকের গান প্রেমের গান। দু'চারখানি যে গান হিসাবে ওৎরাইনি তা নয়। তবে বেশীর ভাগ গানকেই সুর ছাপিয়ে গেছে—তাই সুরটী অদ্ভুত লাগে। কথার গায়ে সুর ঠিকভাবে বসে না। এমন গান একটী নয় শতাধিক। সুরে আগেভাগেই আছে; বাক্যের মালা তথা একটী সমগ্র ভাব—তার উপর আরোপ করতে অর্থাৎ ঠিক ভাবে বসাতে গেলে অনেক বাদ অনেক বাক্য বদলানোর একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ফলে কবিতার নিজস্ব ভাব যেখানে ভাষা দ্বারা রূপায়িত হতে চায়, সেখানে সুরের মর্য্যাদার দিক থেকে অদ্ভুত অদ্ভুত বদল স্বীকার করে নিতে হয়—অদ্ভুত অদ্ভুত বাক্যের সৃষ্টী করতে হয়। এমন কি যুক্ত অকার যেমন কোথাও চলে না সর্ব্বদাই তাকে ভেঙে নিতে হবে। দেখা যাবে সেটা কোন কবিতাই নয়—কোন ভাবই নয় শুধু তা সুরাত্মক বাক্য যথাযথ বৈ অন্য কিছু নয়। ভাবের দিক থেকে এই নৌকা দূরে চাঁদ—বনের ফুল খোপ্-খসা চাঁপা, প্রেম, পিরীত, পিয়া, পাপিয়া; গভীর প্রেম কোথাও নেই—যতবারই কেন চামেলী থাক। গান না টেলিগ্রাম বোঝবার যো নেই।

হেমন্তকুমারের অনেক গানের অর্থ পাওয়া ভার। যথা, 'গাঁয়ের বধূ' যেন 'স্বাধীনতা'র সম্পাদকীয়। যেমন তার সুর। তেমনই তার বাক্যচয়ন। তাছাড়া রেডিও মারফৎ জুয়েকটী গান গেয়েছিলেন তার ভাব ভাষা বিয়ের পদ্য। রেডিওতে বাঙলা দেশের কালচারের গর্ব্ব চলে রোজ—যদি আপনি দয়া করে গানগুলি শোনেন বুঝবেন—বাঙলা দেশে যে সাহিত্যরুচি আছে তা আপনার মনেই হবে না।

এখানে একদা 'মেঘৈর্মেদুরম্বরম্ বনভুবঃশ্যামস্তমালদ্রুমৈঃ' গান রচিত হয়েছিল, যে 'কেনা বাঁশী বায় বড়াই কালীনি কুলে'—এবং বহু বহু গান গীত হতো, ঐতিহ্য ছিল তা ভুলে যাই।

শুধু আশা সত্যিকারে গীত রচয়িতা কবে আসবে—যার গানের সঙ্গে চকিতেই আপামর জনসাধারণের সম্বন্ধ স্থাপন হবে যথা সনাতন, সনাতনাত্মক কীর্ত্তনের ঐতিহ্যের পর পাই রামপ্রসাদী।

কমল মজুমদার

রেডিও

সম্প্রতি কলকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' নাটকের বেতার রূপদানের বিষয়ে আলোচনা উঠেছে। অভিযোগকারীরা বলেছেন, ঐ নাটকের অনেক অংশে বেতার-রূপায়ক নিজে সংলাপ বসিয়েছেন। তাছাড়া অনেক জায়গায় 'তপতী' নাটক থেকে সংলাপ আমদানী করা হ'য়েছে। দুটি অভিযোগই গুরুতর। রবীন্দ্রনাথের রচনায় নতুন সংলাপ যোজনা করতে যাওয়া ধৃষ্টতা। আবার রবীন্দ্রনাথেরই অন্য নাটক থেকে সংলাপ ধার করা, সেও কম হাস্যকর নয়। বেতার-রূপায়ক বলতে পারেন, 'রাজা ও রাণী'র বর্তমান যে রূপ আছে সেটা মঞ্চের উপযোগী, বেতার পরিবেশনের জন্যে তাতে কিছুটা রদবদল প্রয়োজন। এ যুক্তি একেবারে খেলো নয়। এই বিশেষ নাটকটির ক্ষেত্রে এ রকম উপযোগিতা-অনুপযোগিতার তর্কে জড়িত না হ'য়েও যুক্তির খাতিরে আমরা মেনে নিতে বাধ্য যে নাটক প্রধানতই মঞ্চস্থ করার জন্যে রচিত হ'য়েছে, তার বেতার পরিবেশনে আঙ্গিক পরিবর্তন অপরিহার্য হ'তে পারে। কিন্তু কথা হ'চ্ছে মহৎ কবির যে সব রচনা প্রায় জাতীয় সম্পদের মতো সম্মান পেয়েছে তাদের স্পর্শ করা বিধেয় কিনা। এ সব ক্ষেত্রে পাঠক এবং শ্রোতৃবর্গ হয়তো এইটুকু মাত্র মেনে নিতে রাজী থাক্‌বেন যে মূল নাটকের কোনো কোনো অংশ পরিত্যক্ত হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে অন্যের রচিত সংলাপ এবং আলোচ্য নাটকের নাট্যকারেরই অন্য রচনার অংশ সংগ্রহণ—এ পর্যন্ত গলধঃকরণ করা শক্ত। এ ব্যাপারে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, কে সেই শক্তিমান পুরুষ যিনি রবীন্দ্রনাথের মতো রচয়িতার ভাব ও ভাষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পদ রচনা করবেন। আর দ্বিতীয়, সেই ব্যক্তির নাট্যশাস্ত্রের জ্ঞান, কাব্যবোধ এবং সর্বোপরি রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে উপলব্ধি এতটা উঁচুদরের কিনা যাতে রবীন্দ্রনাথের কোনো নাটককে বেতারস্থ করতে গিয়ে কোথাও কোনো অভাব চোখে পড়লে রবীন্দ্রনাথেরই বিরাট কাব্য-ও-নাট্যসাহিত্যের মধ্যে কোনো একটি বিশেষ রচনার দ্বারস্থ হ'য়ে তার সমাধান করতে পারেন!

আর একটা কথা। ওপরের আলোচনায় আমি অভিযোগের বিষয়েই লিপিবদ্ধ করেছি। এমন হ'তে পারে যে এ অভিযোগ সর্বাংশে সত্য নয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও এই প্রসঙ্গে যে মূল প্রশ্ন উঠেছে তার সত্যতা কিছু কম হ'য়ে যায় না। কথাটা জোর দিয়ে বলতে হ'চ্ছে এই কারণে যে, ভবিষ্যতেও বেতার প্রতিষ্ঠানকে রবীন্দ্রনাথের নাটক নিয়ে কাজ করতে হবে। এবং তখন যেন প্রযোজক এ কথা মনে রাখেন, রবীন্দ্রনাথ বিরাট প্রতিভা ছিলেন বলেই তাঁর সমস্ত নাটক-উপন্যাস-গল্পই যে বেতার-পরিবেশনের অনুকূল হতে হবে তার কোনো মানে নেই। এ ব্যাপারে যথেচ্ছাচারের দুর্নাম কুড়োনোর চেয়ে স্থির মস্তিষ্কে

নির্বাচন ক'রে কাজে নামা অনেক নিরাপদ। আর দ্বিতীয়, যদি কোনো শক্ত রচনার বেতার-রূপায়ণ করার দায়িত্ব কর্তৃপক্ষের ওপর বর্তায়, তবে তাঁরা যেন এরকম লোককে দিয়ে সে কাজ করিয়ে নেন যাঁর বিচারবোধ ও সাহিত্য-খ্যাতি এমন যাতে বেতার-রূপায়ণের ত্রুটি তিনি নিজেই বহন করতে পারেন, বেতার-প্রতিষ্ঠান জড়িত না হয়।

কিন্তু শুধু প্রাচীনের পুনরাবৃত্তিই বা কেন ? রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র বাংলা ভাষা-সাহিত্যের ঐশ্বর্য। সে সম্পদে নিজেদের অলংকৃত ক'রে তোলায় নিজেদেরই গৌরব। সেই জন্যে 'রাজা ও রাণী' কি 'চরিত্রহীন' যদি বেতারে অভিনীত হ'য়ে থাকে, আমরা শ্রদ্ধাসহকারেই শুনেছি। কিন্তু তারপর ? জীবন কি তারপর থেমে আছে ? বাঙালী লেখকের লেখনী কি তারপর স্তব্ধ ? তুলনায় ছোটবড়র প্রশ্ন এখানে নিরর্থক। বাংলা সাহিত্যের ঐ দুই দিক্‌পালের পর এদেশে আর কিছু উল্লেখযোগ্য রচনা হয় নি, এমন অভিযোগ আমরা কিছুতেই মানতে পারব না। অথচ সে সব রচনার দিকে বেতার প্রতিষ্ঠান মোটেই যেন সজাগ নয়। অবশ্য, একটা কথা উঠতে পারে : শুধু গল্প বা উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে তো বেতার শ্রোতাদের বেশীদিন খুশী রাখা সম্ভব নয়। নাটক কই ? সত্যিই সেদিকে আমাদের লেখকদের দৃষ্টি বড়ই স্বল্প। আর এদেশের নাটমঞ্চে যেসব নাট্যকারদের নাটক মঞ্চস্থ হয়, তাঁরা আর যাই হোন সাহিত্যিক নন। অবশ্য ব্যতিক্রম আছে, যেমন তারাশঙ্কর, মনোজ বসু কি শচীন সেনগুপ্ত। কিন্তু বাকী যাঁরা আছেন, তাঁরা পেশাদার লিখিয়ে মাত্র, লেখক কিনা সন্দেহ। সেই কারণেই বেতার প্রতিষ্ঠান যদি চান তাঁরা দেশের নাট্যজগৎ থেকে আনকোরা নাটক আমদানী করবেন বেতারে, তবে সে প্রচেষ্টার পথ রুদ্ধ। কিন্তু এরই মধ্যে নতুন পথের আভাসও চোখে পড়ছে বই কি ! আর সেটা পেশাদারদের আশপাশ দিয়ে নয়, সে পথের রেখা ফুটে উঠছে চলমান জীবনের আঙিনার ওপর দিয়ে। আমি 'নাট্যচক্র' এবং বিশেষভাবে 'বহুরূপী' নাট্যসম্প্রদায়ের কথা মনে রেখেই একথা বলছি। গত বছরের শেষে আর এবার নতুন বছরের সূত্রপাতে সত্যিই একটা নতুন শিল্প আস্বাদনের আনন্দ পাওয়া গেছে এই শেষোক্ত নাট্যগোষ্ঠীর অভিনয়ে। যাঁরা নাটক নেই রব তুলে পেশাদার নাটমঞ্চে ঐতিহাসিক (যা প্রায়ই স্বকপোলকল্পিত) নাটক মঞ্চস্থ ক'রে আসছিলেন, এবং যাঁদের 'অসহায়' দুর্দশা দেখে বেতার কর্তৃপক্ষ নিজেদের প্রযোজনা-কৃতিত্বে আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রে আসছিলেন—তাঁরা সকলেই এবার দেখতে পেয়েছেন, সংবুদ্ধিসম্পন্ন কর্মিষ্ঠ শিল্পীমনের পক্ষে দুরাধিগম্য ব'লে কোনো কিছু নেই। তার জন্যে নাট্যকার, পরিচালক বা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের যা সব থেকে প্রথমে দরকার সেটা হ'ল সমাজহিতৈষী শুভবুদ্ধি। অর্থাৎ, এই কথাটি সর্বসময়ে মনে রাখা যে শিল্পীর আশেপাশের সমাজের বাইরে কোনো শিল্পের উপাদান নেই—কোনো শিল্পকর্মের উপলব্ধিও নেই। সেইজন্যে শিল্পের রসবস্তু সংগ্রহ করিতে হবে নিজের কালের নিজের সমাজের মর্ম থেকে, শিল্পকর্মকে সার্থকতা লাভ করতে হবে—সেও নিজের কালের নিজের সমাজের মর্মের ভেতর। যাই হোক, আমাদের বেতার প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারদের কানে এসব কথা

এতই সহজ সরল লাগবে যে প্রায় বামপন্থী বুলির মতো ঠেকবে। তবে পন্থা ডাইনে কি বাঁয়ে সে সব চুলচেরা তর্কে না গিয়েও বেতার-নাটক প্রচারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিরা এইটুকু মেনে নিলেই আমরা খুশী হব যে, জীবনের পন্থা ছাড়া শিল্পের আর কোনো পথ নেই। প্রমাণ স্বরূপ, বেতার-প্রতিষ্ঠানের এতদিনকার অসার্থকতাই যথেষ্ট—নাটক প্রচারে জীবন-পরিপন্থী কিম্বা জীবনউদাসীন থেকেই যে ঐ অনুষ্ঠানগুলো এত প্রাণহীন, তার যথার্থ প্রমাণ পাওয়া যাবে যদি একবার সাহস ক'রে তাঁরা জীবনপন্থী নাটকের প্রাণচাঞ্চল্যকে বেতারে জায়গা দিয়ে তার প্রতিক্রিয়াটা লক্ষ্য করেন। এর জন্যে নাট্যকারকে খ্যাতিমান হবার দরকার করে না, যা প্রয়োজন তা শুধু দৃষ্টির সততা এবং অভিজ্ঞতা প্রকাশের সাহস। বাকী ত্রুটি যা থাকবে সেটা চলতে চলতেই শোধরাবে।

মণীন্দ্র রায়

সিনেমা

সোভিয়েট চলচ্চিত্র

অত্যন্ত রীতিবিরুদ্ধভাবে মার্কিণ ছবির জোয়ারকে ছাপিয়ে সোভিয়েট চলচ্চিত্র কয়েক সপ্তাহের জন্য কলকাতায় আলোড়ন তুলে গেল। বৈদেশিক যোগাযোগ অর্থে মার্কিণ অনুকরণের যে চিরাচরিত রীতি ছিল, সোভিয়েট চলচ্চিত্রের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তাকে অল্পবিস্তর বিচলিত করেছে। বিশেষতঃ সোভিয়েট-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক এবং অভিনেতার একত্র উপস্থিতি ভারতীয় চলচ্চিত্রের পক্ষে অভাবনীয় সৌভাগ্যের বিষয়। সাহিত্য বা সাধারণ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইউরোপের সাহচর্য এদেশে বহুকাল ধরে বর্তমান; সংস্কৃতির লেনদেন কিছু পরিমাণে সকল দেশের সঙ্গেই ঘটেছে। ভারতীয় চলচ্চিত্রই অজ্ঞতার একাকীত্বে আত্মসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে রয়েছে, আর্থিক দুর্দিন আরো ভয়াবহ করে তুলেছে তার সাংস্কৃতিক সংকটকে। এই অবস্থার মধ্যেই প্রগতিশীল, উন্নত শিল্পদৃষ্টির সঙ্গে তার পরিচয়ের বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

সোভিয়েট চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় এতদিন সীমাবদ্ধ ছিল মুষ্টিমেয় কয়েকটি ছবির মধ্যে—তার মধ্যে অনেকগুলিই প্রথম শ্রেণীর নয়, যেমন No Greater Love, Wait for Me, ইত্যাদি। উৎকৃষ্ট ছবির মধ্যে এদেশে দেখানো হয়েছিল Road to Life, Ivan the Terrible, Maxim Gorky'র প্রথম খণ্ড। Rainbowকেও এই প্রসঙ্গে মনে রাখা যেতে পারে। Russian Story নামে একটি সঙ্কলনে বিভিন্ন উৎকৃষ্ট ছবির অংশ একত্রিত ভাবে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল।

কিন্তু প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভাব সত্ত্বেও সোভিয়েট চলচ্চিত্র সম্বন্ধে শ্রদ্ধা আমাদের চলচ্চিত্র মহলে অনেক দিন থেকেই বিদ্যমান। 'মন্তাজ,' 'রাশিয়ান স্টাইল' ইত্যাদি কথা প্রায়ই শোনা যায়, যদিচ সমালোচকেরা জানেন যে ভারতীয় চলচ্চিত্রের ওপর সোভিয়েট চলচ্চিত্র-শিল্পের প্রভাব সামান্যই। বস্তুতঃ কল্পনা, সংস্কৃতি ও চলচ্চিত্র-বোধের যে স্তরে বাংলা ছবির বাস তার ওপর সোভিয়েট চলচ্চিত্রের শিল্পরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না বলেই মনে হয়। কেন না উন্নত শিল্পরূপের প্রভাব যার ওপর পড়বে তারও নিজস্ব রূপ, প্রকৃতি ও প্রগতিশীলতা থাকা দরকার। সোভিয়েটের প্রেরণায় উন্নত বিষয়বস্তুকে চলচ্চিত্রে পরিবেশন করতে অনেকেই উদ্যোগী হয়েছেন, সেটা আনন্দের বিষয় সন্দেহ নেই, কিন্তু তার ফলে সোভিয়েট শিল্পকে অনুধাবন করতে তাঁদের সাহায্য হয়েছে বলে মনে হয় না। সোভিয়েট চলচ্চিত্রের যে ক'টি উন্নত নমুনা কলকাতায় দেখানো হয়েছে তার সঙ্গেও আমাদের

খুব কম পরিচালকই পরিচিত। Ivan the Terrible যাঁরা দেখেছিলেন তাঁদের অনেকের মুখেই যে ভাব প্রকাশ পেয়েছিল সেটাকে ইংরাজীতে bewilderment বলা যেতে পারে। বস্তুতঃ সোভিয়েট চলচ্চিত্রের জ্ঞান বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল আইজেনস্টাইন এর 'দি ফিল্ম সেন্স' ও পুডোভকিন-এর 'ফিল্ম টেকনিক' ও 'ফিল্ম একটিং' বই-এরই মারফৎ। অথচ 'দি ফিল্ম সেন্স' দুরূহ গবেষণার বই, তার তত্ত্ব বাংলা ছবির নির্মাণ কৌশলে বিশেষ রেখাপাত করেছে বলে মনে হয় না।

সোভিয়েট চলচ্চিত্র-উৎসব ও পুডোভকিন এবং চেরকাসভের যুক্ত উপস্থিতিতে বাংলার দর্শকসাধারণ ও চলচ্চিত্রশিল্পীর পক্ষে সোভিয়েট চলচ্চিত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের প্রথম স্থযোগ মিলল। একদিকে সোভিয়েট-চলচ্চিত্রের প্রকৃত স্বরূপ দেখা গেল Alexander Nevsky, Story of Stalingrad, Fall of Berlin, Conspiracy of the Doomed, Mussorgsky ইত্যাদি ছবিতে, অপরদিকে পুডোভকিন ও চেরকাসভের সঙ্গে আলোচনায় জানা গেল সোভিয়েট চলচ্চিত্রশিল্পের পশ্চাৎপট ও সৃষ্টির ইতিহাস। যে জীবন-দৃষ্টির উপর সোভিয়েট চলচ্চিত্র-শিল্পের ভিত্তি, বঙ্গীয় চলচ্চিত্র কর্মীসংঘে প্রদত্ত অভিভাষণে পুডোভকিন তার সম্পূর্ণ পরিচয় উপস্থিত করেন। সোভিয়েট চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজমের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির কাহিনী বিবৃত করে পুডোভকিন বলেন যে জনসাধারণের জীবনকে শিল্পরূপ দেওয়াই সোভিয়েট চলচ্চিত্রের উদ্দেশ্য, এবং সেই উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে Battleship Potemkin থেকে শুরু করে বহুতর ছবিতে। কলিকাতা ফিল্ম সোসাইটির আসরে তিনি যে বক্তৃতা করেছিলেন তা আরেকদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। এখানে তিনি সমাজ ও শিল্পের সম্বন্ধ আলোচনা না করে পরিচালকের দৃষ্টি থেকে শিল্পসৃষ্টির বিশেষ প্রেরণা ও রীতিকে ব্যাখ্যা করেন। তিনি ও চেরকাসভ সভায় উপস্থিত হওয়ার পূর্বে পুডোভকিনের Storm over Asia নামক জগৎবিখ্যাত ছবিটি দেখানো হয়। উদ্দেশ্য ছিল পুডোভকিনের সংস্পর্শে আসার পূর্বে তাঁর শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হওয়া। সেই উদ্দেশ্য সার্থক হল যখন পুডোভকিন বিশেষভাবে Storm over Asia সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। ফিল্ম সোসাইটির এই বক্তৃতায় পুডোভকিনের মনের একটি স্থকুমার শিল্পীরূপ দেখতে পাওয়া যায়।

সোভিয়েট শিল্পে জনসাধারণের সঙ্গে যোগ ও শিল্প-রাজনীতির সম্বন্ধবোধ সম্বন্ধে আমাদের দেশে অনেক অবিচার ও অসম্পূর্ণ জ্ঞান সোভিয়েট শিল্পীদের সংস্পর্শে আসার ফলে কেটে যাওয়া উচিত। মৌলিক তত্ত্ব সম্পর্কিত অনেক ঘোষণা থেকে মনে হয় সোভিয়েট শিল্পী যেন রাষ্ট্রের ক্রীতদাস, অনবরত কেবল রাজনীতিকে, খবরের কাগজের সম্পাদকীয়কে প্রতিফলিত করে যাওয়াই তাঁর প্রধান কর্তব্য। অথচ এই ধরণের ঘোষণার সঙ্গে যখন সোভিয়েট চলচ্চিত্রকে মিলিয়ে দেখা যায় তখনই বিষয়বস্তুর প্রতি শিল্পীর স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক আবেগ ও তার ফলে সেই বিষয়কে চরিত্র ও ঘটনার সাহায্যে রূপায়ণের নৈপুণ্য ও সত্যতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নিয়ে যখন সোভিয়েট

শিল্পী বলেন তাকে রূপ দেওয়াই তার কর্তব্য, তখন এই ঘোষণার মানবিক আবেগপূর্ণ রূপটি আমাদের অনভ্যস্ত দৃষ্টিতে সহজে ধরা পড়ে না। সেই বিষয়বস্তুর রসোত্তীর্ণ রূপায়ণ দেখে আমরা বুঝতে পারি কী গভীরভাবে শিল্পীমন তাকে জারিত করে মানুষের চরিত্র, সামাজিক লেনদেন ও অগ্রগতিকে মানবিক ভাবে শিল্পে পরিণত করে, যার ফলে সেই শিল্পরূপের মধ্যে যান্ত্রিকতার কোনো পরিচয়ই থাকে না। এই সাফল্যের অন্যতম কারণ হচ্ছে সোশ্যালিষ্ট রিয়ালিজম সম্বন্ধে সোভিয়েট শিল্পীর বোধ, যাকে আমরা এখনো সম্পূর্ণ বুঝে উঠতে পারিনি। এখানে রিয়ালিজম অর্থে হুবহু প্রতিচ্ছবি মোটেই নয়, তার অন্তর্নিহিত রূপের পরিচয়। চেরকাসভের সঙ্গে stereo copy সম্বন্ধে আমার কিছু কথাবার্তা হয় যাতে এটা বিশেষ স্পষ্ট হয়েছিল। তিনি বিনা দ্বিধায় বলেছিলেন: "Naturalism is a reactionary tendency; socialist realism does not mean naturalism" (এরৎসিনা কৃত অনুবাদ)। যামিনী রায়ের ছবি দেখে দুই শিল্পীই অভিভূত হন, তাঁদের মতে এখানে জনসাধারণের জীবনের আশ্চর্য গভীর প্রকাশ হয়েছে। অথচ এই শিল্প মোটেই naturalistic বা বাস্তবের হুবহু নকল নয়, তার বিপরীত। এইখানেই মনে হয় আমাদের দেশের প্রগতিশীল শিল্প-আন্দোলন বানচাল হয়েছে। বস্তুতঃ জনসাধারণের শিল্প আদিম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত কোনোদিনই naturalistic ছিল না। তাই রেনেসাঁসের পরবর্তী ইয়োরোপীয় শিল্প portrait ধর্মী, প্রত্যক্ষ-বাস্তব ঘেঁষা। জনসাধারণের শিল্প চিরকালই illusion সৃষ্টি করতে চেয়েছে, যে illusion প্রত্যক্ষ বাস্তবের অন্তর্নিহিত সত্যকে, মানুষের স্বপ্ন ও কল্পনাকে প্রকাশ করে, অথচ বাস্তবজীবনে প্রগতিতে সাহায্যই করে শেষ পর্যন্ত। কাজেই দেখা যায় যে সমস্ত দেশে শিল্পে (যেমন চিত্রকলায়) naturalismকে চাপানো হচ্ছে, সেখানে সেটা জনসাধারণের সমাজতন্ত্রী শিল্প আদৌ নয়, সেটা হচ্ছে বুর্জোয়া শিল্পবোধকে জোর করে জনসাধারণের উপর চাপানো। প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করা যেতে পারে আমাদের থিয়েটারের প্রতি পুডোভকিন ও চেরকাসভের অপরিসীম শ্রদ্ধা। তাঁদের দেশে মঞ্চ আন্দোলন এমনকি আইজেনস্টাইন-এর শেষকালীন চলচ্চিত্রের stylised বা রীতিবদ্ধ রূপ, আমাদের মঞ্চের মতোই। কেবল ছবি আঁকার ব্যাপারেই দেখা যায় সোভিয়েট শিল্প এদিক থেকে অনগ্রসর এবং naturalism-এর নাগপাশে এখনো বাঁধা। আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু সমস্ত প্রগতি শিল্পান্দোলনেই এই ভ্রান্তি অটুট হয়ে রয়েছে। সোশ্যালিষ্ট রিয়ালিজম বলতে আমরা naturalismকেই অকাট্য বলে ধরে নিয়েছি। ফলে আমাদের দশ বৎসরব্যাপী প্রগতি আন্দোলন ক্রমেই আমাদের ঠেলে এনেছে সাংবাদিকতার প্রত্যক্ষতার দিকে, শিল্পের মায়া-বাস্তবতার দিকে আমরা অগ্রসর হতে পারিনি। আমাদেয় নিয়মমাফিক রচনা তাই কর্তব্য বোধের পীড়নকে প্রকাশ করে মাত্র, রসসৃষ্টি করে না, সাধারণের মনে চাঞ্চল্য আনে না।

চিদানন্দ দাসগুপ্ত

নাটক

অভিনেতার জীবনে একটী নতুন চরিত্র সৃষ্টি করা যে কী বেদনাদায়ক আনন্দ তার একটী উপাখ্যান স্ট্যানিস্‌ল্যাভ্‌স্কির রচনায় পাওয়া যায়। আমরা অনেকে, যারা অভিনয় করি এবং করতে ভালবাসি, তারা প্রত্যেকে বোধহয় তীব্র অনুভূতির সঙ্গে বোধের এই পর্যায়গুলো অতিক্রম ক'রে থাকি। কিন্তু সুসম্বদ্ধ চিন্তার অভাবে উপলব্ধিগুলোর crystallization (কেলাসন) হয় না। তাই আমরা সাহায্য খুঁজি গুরুস্থানীয়ের কাছে।

পরিচালক ছাত্রদের বললেন, 'আগামী পাঠের জন্য ছাত্রেরা যে যার ইচ্ছা অনুযায়ী এক একটা চরিত্র সেজে সেই চরিত্রানুযায়ী চলন-বলনে অভিনয় করে দেখাবে। তা সে যে চরিত্রই হোক। বণিক হোক, সৈনিক হোক, ইরাণী বা স্পেনীয়, অভিজাত বা মশা বা ব্যাঙ, যা কিছু তোমাদের মনে ভালো লাগে। থিয়েটারের পোষাক-পরিচ্ছদের মধ্যে বেছে খুঁজে যে যার দরকার মতো জিনিষ নিয়ে নাও।'

ঠিক সময়মতো পোষাক বিভাগে গিয়ে সকলেই চট্ ক'রে নিজের নিজের পছন্দমত জিনিষ বেছে নিয়ে বেরিয়ে গেল, বিপদ হোল শুধু দু'জনের। সোনিয়া ব'লে একটা মেয়ের; কারণ, সে একটু লম্বা ধরণের। এতো সুন্দর ও এতো বিভিন্ন রকমের সজ্জাবস্তু দেখে সে আর তার মনই স্থির করতে পারে না।

আর বিপদ হোল কস্‌তিয়া ব'লে একটী ছেলের। সম্পূর্ণ অন্য কারণে। কী চরিত্র সাজা যায় তা সে কিছুতেই ঠিক করতে পারছে না, এবং পোষাক দেখতে দেখতে কেবলই আশা করছে যে দৈবাৎ একটা বুদ্ধি যদি আসে!

তার নজর পড়লো একটা সাধারণ 'মর্ণিং' কোটের দিকে। কী একটা অদ্ভুত কাপড়ে তৈরী,—খানিকটা বালি রং আর সবুজে আর ধোঁয়াটে রঙের সংমিশ্রণ। তা আবার রঙ্‌টা চ'টে গেছে, ধূলো ও ছাই-তে দাগ ধরিয়ে রেখেছে। কাস্‌তিয়ার মনে হোল ঐ কোট প'ড়ে দাঁড়ালে তাকে প্রেতের মতো দেখাবে। এরই সঙ্গে মিলিয়ে যদি টুপি, দস্তানা, ধূলোপড়া জুতো পরা যায়, আর পরচুলা মেক্-আপও করা যায় ঐ ধরণের রঙে—ধোঁয়াটে, হলদেটে, আর সবুজে, সবই বিবর্ণ, সবই রঙচটা, তাহ'লে একটা খুব পরিচিত অথচ অমঙ্গলবহ ধারণা বোধহয় আনা যায়। অথচ ঠিক কী যে সেই রূপটা হবে তা' কিন্তু কস্‌তিয়া ভালো করে বুঝতে পারছে না।

পোষাক বিভাগের লোকেরা কোটটা তার জন্য আলাদা ক'রে রাখলো, এবং ঐধরণের টুপি, জুতো, দস্তানা পরচুলা, দাড়ী সবই জোগাড় ক'রে রাখবে বললো। কিন্তু তবু কস্‌তিয়ার মন ভরলো না। যতক্ষণ সময় বাকি ছিল তার মধ্যে সে কেবলই তন্ন তন্ন ক'রে পোষাকের

স্তূপের মধ্যে নতুন কিছু খুঁজতে লাগ্‌লো। সেখান থেকে আসতে আসতে কস্‌তিয়া কেবলই ভাবতে লাগলো যে, ঐ 'মার্ণিং' কোটটা প'রে সে কী চরিত্র ফোটাবে! ছদ্মবেশের আসর হবার কথা আরও তিনদিন পর, এবং এই সময় থেকে তিনদিন ধ'রে কস্‌তিয়ার মনের মধ্যে কী যেন হ'তে থাকলো : স্বাভাবিক ও সাধারণভাবে মানুষের যে নিজত্ব বোধ তা যেন সে হারিয়ে ফেলেছে, সে আর সে নেই। ঠিক ক'রে বলতে গেলে, সে আর একলা নেই। তার সঙ্গে কে যেন রয়েছে। যাকে সে নিজের মধ্যে হাতড়াচ্ছে। কিন্তু খুঁজে পাচ্ছে না।

কস্‌তিয়া রয়েছে, নিয়মানুযায়ী জীবনও যাপন করছে। কিন্তু কিসে যেন তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করছে, ভালো ক'রে মন দিতে দিচ্ছে না কিছুতে। সে যেন দু'ভাগ হয়ে গেছে। কোনও জিনিষ দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, সে তাকাচ্ছে সেই দিকে, কিন্তু ভাসা ভাসা ভাবে। ভাববার চেষ্টা করছে, কিন্তু জট ছাড়াচ্ছে না। শুনছে, তাও আধ কান দিয়ে। শক্তি ও উদ্যম যেন তার অর্দ্ধেক ক্ষয় হয়ে গেছে। তিনদিন ধ'রে এই রকম যন্ত্রণা তার চললো। এবং কী যে সাজবে সেই ছদ্মবেশের আসরে তাও ঠিক হোল না মনে।

শেষে একদিন রাত্রে হঠাৎ সে জেগে উঠলো। মনে হোল সব যেন স্পষ্ট হয়ে গেছে। তার সাধারণ জীবনের সমান্তরালে আর একটা জীবনে সে বাঁচছিল সেটা একটা গোপন মগ্নচেতনার জীবন। সেইখানেই সেই ছাতা-পড়া মানুষটার অন্বেষণ চলেছে যার কোটটা কস্‌তিয়া সেদিন হঠাৎ দেখেছে।

যাই হোক, সেই স্পষ্টতা বেশীক্ষণ রইল না। যেমন অকস্মাৎ মনে হয়েছিল যে সব বোঝা যেন গেছে, তেমনি অকস্মাৎই আবার সব যেন কেমন মিলিয়ে গেল। সব সময়েই বড়ো অস্বস্তি কস্‌তিয়ার। কেবলই মনে হয় কী যেন সে ভুল করছে অথচ সে-ভুল কোনও সময়েই ধরা পড়ে না।

একদিন আনমনে চলতে চলতে হঠাৎ খেয়াল হোল সে যেন কী রকম একটা বিশ্রী ধরণে হাঁটছে। তার নিজের হাঁটার মতো মোটেই নয়। আবার একদিন রাত্রে ঘরে পায়চারি করতে করতে সে হঠাৎ হাত কচলাচ্ছে। অবাক হয়ে ভাবলে—এ করকমভাবে হাত কচলায় কে? কোথায় দেখেছি তাকে?—কিছুতেই মনে পড়লো না। কিন্তু এটা মনে হ'তে লাগলো যে, এরকমভাবে যে হাত কচ্‌লায় তার হাতগুলো খুব সরু আর ঘামে ভিজে ঠাণ্ডা। আর হাতের চেটোগুলো বিশ্রীরকম লাল। এ রকম একটা হাত ছুঁতেই ঘেন্না করে।···কিন্তু কার হাত? কে সে?

ছদ্মবেশের তারিখ এসে গেল কিন্তু তখনও কস্‌তিয়া কিছু ঠিক করতে পারেনি। সাজঘরের হট্টগোল তাকে আরও উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তুললো। অথচ সে শেষ আশা ক'রে আছে যে পোষাকটা পরলে—নিজের ছায়ার দিকে একমনে তাকালে—হয়তো সেই লোকটা ধরা পড়বে।

অন্য সকলে চমৎকার সেজেছে। তাই নিয়ে হাসি ঠাট্টা আর প্রশংসাবাণীতে সাজঘর মুখরিত। কিন্তু কস্‌তিয়ার যেন কী একটা গোলমাল হয়েছে— মেক্‌-আপের লোক এসে

কস্তিয়ার মুখটা নিজের আইনমাফিক সাধারণ থিয়েটারী রং ক'রে চ'লে গেল। দাড়ি গোঁফ এঁটে কস্তিয়া হতাশভাবে ব'সে রইল।

অন্য সকলেই সাজার শেষে ছুটলো পরিচালককে দেখাতে। কিন্তু কস্তিয়া গেল না। তার মনে হ'তে লাগলো সে একেবারে অপারগ হয়েছে, কিছু হয়নি। মুখ থেকে রং তুলে ফেলবার জন্যে সামনেই একটা কৌটাতে সবজে মতো ক্রীম ছিল তাই নিয়ে মুখে ঘষতে লাগলো। এবং······ঘষতেই থাকলো! রঙগুলো সব মেশামেশি হয়ে পুরো মুখটা সবজে-ধোঁয়াটে-হলদেটে একটা চেহারা হলো। নাক চোখ মুখ সব লেপে গেছে, আলাদা ক'রে ধরা যায় না। সেই রঙ খানিকটা নিজের দাড়ি-গোঁফ আর পরচুলায় লাগিয়ে দিল। কতকগুলো চুলেও জট্ বেঁধে গেল।···কস্তিয়া আনন্দে প্রায় আচ্ছন্নের মতো মুখে যথেচ্ছ পাউডার লাগালো, হাতের চেটোগুলোয় লাল লাগিয়ে উল্টোদিকগুলোয় সব্জে করলো। তারপর দাঁড়িয়ে কোট টেনে বেশটা ঠিক ক'রে নিলে খুব নিপুণভাবে। কারণ এতোক্ষণে সে বুঝতে পেরেছে কার চরিত্র সে সাজছে, কে সে লোক।

টুপিটাকে দিল বাঁকিয়ে, প্যান্টালুনের ভাঁজের মধ্যে পাটাকে খাপ খাওয়াতে আঙুলগুলো ভিতরদিকে বাঁকিয়ে রাখলো। তাতে চলনটা বদলে গেল। হাতে একটা ছড়ি তুলে নিল। বাকি থাকলো একটা কলম। একটা ছোকরাকে পাঠালো একটা পালকের কলম জোগাড় করে আনতে। তারপর বারকয়েক পায়চারি ক'রে আয়নার সামনে গিয়ে সে নিজেকে আর চিনতে পারে না। এইটুকু সময়ের মধ্যে যেন একটা নতুন পরিবর্ত্তন ঘটেছে। তার নড়া-চড়া, তার ভাবভঙ্গী সমস্ত বদলে গিয়ে অন্য একটা রূপ নিচ্ছে। আয়নায় নিজের ছায়ার দিকে তাকিয়ে আনন্দে সে অধীর হয়ে উঠল—'হয়েছে, হয়েছে।' এখন সেই কলমটা এসে পড়লেই সে ছুটে চলে যায় মঞ্চে।

করিডোরে পায়ের শব্দ শুনে কস্তিয়া ভাবলো সেই ছেলেটী বোধ হয় কলম্ নিয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি দরজার কাছে আসতেই মুখোমুখি হয়ে গেল সহকারী পরিচালক রাখমানভের সঙ্গে। রাখমানভ্ চম্‌কে উঠে বললেন—'ও বাবা, এটা কী? এ কী সাজ হয়েছে? ডষ্টয়েভ্স্কির? না, এক সনাতন স্বামীর?—আরে, তুমি কে হে—কস্তিয়া নাকি? কী ব্যাপার, এটা কী সেজেছ?

কস্তিয়া খুব একটা বিশ্রী ধরা গলায় খ্যাঁক ক'রে উত্তর দিলো—'সমালোচক'!

তার তীক্ষ্ণ পলকহীন চাউনির ধরণে রাখমানভ্ যেন একটু ভড়কে গেলেন—'কীসের সমালোচক?'

কস্তিয়া খুব অপমানজনকভাবে উত্তর দিলে—'কিসের সমালোচক? কস্তিয়া নাজভানভ্-এর মধ্যের যে সমালোচকটা খালি খুঁৎ ধ'রে বেড়ায়। আমি তার মধ্যে আছি কেবল তার কাজ পণ্ড করে দিতে। তাইতেই আমার আনন্দ। তাইতো আছি।'

এভাবে রাখ্মানভের সঙ্গে বিশ্রীভাবে সে যে কথা বলতে পারে, বা এমন রূঢ় অভদ্র-ভাবে তাঁর দিকে তাকাতে পারে এই দেখে কস্তিয়া নিজেই অবাক। রাখ্মানভ্ও কী

বলা বা করা উচিত তা ঠিক ভেবে না পেয়ে কেমন একটু ইতস্তত ক'রে বললেন—'চলো যাওয়া যাক, অন্যেরা অনেকক্ষণ হলো সুরু ক'রে দিয়েছে।'

কস্‌তিয়া একটুও না নড়ে, তেমনি অভদ্র তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শিক্ষকের দিকে তাকিয়ে থেকে তাঁর কথাগুলোকে ব্যঙ্গ ক'রে বললো—'যাওয়াই যাক আর সকলে যদি অনেকক্ষণ হলো সুরু করেই থাকে।'

একটা অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা। ঠিক এই সময়ে সেই ছেলেটা দৌড়তে দৌড়তে পালকের কলম এনে দিলো। কস্‌তিয়া তার হাত থেকে কলমটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে সেটা দাঁতে কামড়ে রাখল।

রাখ্‌মানভ্‌ খুব আস্তে বল্‌লেন—'চলো।' কস্‌তিয়া এতক্ষণের মতই ব্যঙ্গ ক'রে উত্তর দিলো—'চলুন।' দুজনে চললো মঞ্চের দিকে।

মঞ্চে গিয়ে কস্‌তিয়া একটু আড়ালে ব'সে রইল যাতে কেবল মাঝে মাঝে তার টুপিটা বা তার মুখের একপাশটা নজরে পড়ে। পরিচালক তখন লিও আর পলের চরিত্রসৃষ্টি দেখছেন। হঠাৎ কস্‌তিয়া শুন্‌তে পেল পরিচালক বলছেন—'ওখানে কে? ঐ চুল্লীটার পিছনে কে যেন রয়েছে ব'লে মনে হচ্ছে। ওখানে কে হে? সকলকেই তো দেখা হোল। তাহলে? কস্‌তিয়া? না তো। কে হে তুমি?'

কস্‌তিয়া একটু এগিয়ে এসে পরিচয় দিল—'আমি সমালোচক।'

তার বাঁকা পায়ে একপাশে কাৎ হয়ে দাঁড়িয়ে ভদ্রতার অভদ্র বাড়াবাড়িতে টুপি খুলে খুব নত হয়ে মাথা নোয়ালো। তারপর আবার নিজের সাজের মতোই বিবর্ণ সেই আঁকা চুল্লীটার পাশে গিয়ে বসল।

পরিচালক অবাক হয়ে বললেন—'সমালোচক!'

কস্‌তিয়া কর্কশস্বরে বললো—'আজ্ঞে, এবং খুব নীচ। দেখছেন এই কলমটা? সব কামড়ানোর দাগ। রাগলেই কামড়াই। এমনি ভাবে…'

হঠাৎ নিজেকেই বিস্মিত ক'রে কস্‌তিয়া অদ্ভুতভাবে থ্যাঁক থ্যাঁক ক'রে হেসে উঠলো। বোঝা গেল, পরিচালকের ওপরেও তার ক্রিয়া হয়েছে। তিনি বললেন—'তুমি এদিকে এসো, পাদপ্রদীপের কাছে এসো।'

কস্‌তিয়া তার নবলব্ধ 'আঙুল-ভিতর-দিকে-আর-গোড়ালী-বের-করা' বাঁকা পায়ের ভঙ্গীতে এগিয়ে এলো।

পরিচালক যেন চিনতে পারছেন না তাকে এমনভাবে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—সমালোচক মানে? কীসের সমালোচক তুমি?

—যার সঙ্গে বাস করি তার।

—সে কে?

—কস্‌তিয়া।

পরিচালক বললেন, 'ও। তুমি কি তার ভিতরে থাকো? কী ক'রে ঢুকলে সেখানে?'

—কী করে আবার! বলেই আবার প্রচণ্ড একটা খ্যাক্‌খ্যাকে হাসি। অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে একহাঁটু ভেঙে ব'সে পরিচালকের মুখোমুখি হয়ে বলল, 'সে নিজে। অভিনেতারা সেই সব লোককে খুব পছন্দ করে যারা তাদের কেবল প্রশংসা করে। কিন্তু সমালোচক···আবার একটা হাসির দমকে তার কথা বন্ধ হয়ে গেল।

পরিচালক বললেন—'তুমি আবার কী সমালোচনা করবে? তুমি তো নিজে একটা আসল মুখ্যু।'

কস্‌তিয়া খ্যাঁক ক'রে উঠলো,—'মুখ্যুরাই তো সবচেয়ে বেশী সমালোচনা করে'।

পরিচালক আরো ক্ষেপাবার জন্য বললেন,—'তুমি নিজে না কিছু বোঝো, না কিছু নিজে হাতে করতে পারো—'

কস্‌তিয়া কুৎসিৎভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললে,—'ঠিক। যে লোক নিজে কিচ্ছু জানে না সেই তো আবার মাস্টার হয়।'

পরিচালক চেঁচিয়ে বললেন,—'তুমি সমালোচকই নয়। তুমি, যাকে বলে ছিদ্রান্বেষী —তাই। তুমি হ'লে—জোঁকের মতো, উকুনের মতো, তোমার কামড়ে বিষ নেই। কিন্তু জীবন অতিষ্ঠ করো তোমরা।'

কস্‌তিয়া ক্রূর কর্কশভাবে বললো,—'আপনাকে আমি নিপাত করবো···টিপে টিপে··· যদ্দিনে হয়···'

পরিচালক সত্যি ঘৃণায় বলে উঠলেন,—'নোংরা পোকার মতো।'

কস্‌তিয়া অশ্লীল আহ্লাদে বললো,—'ভালো, ভালো, খুব ভালো। কিন্তু অতো সহজ নয়—একটা জোঁক ঝেড়ে ফেলা।···জোঁক মানে নিশ্চয়ই কোথাও জল আছে···জল মানে আরো জোঁক···তাদের তাড়ানো অতো সহজ নয়···আমাকেও নয়···'

একমুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ ক'রে হঠাৎ পরিচালক পাদপ্রদীপের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে কস্‌তিয়াকে জড়িয়ে ধরলেন,—চমৎকার হয়েছে······

কস্‌তিয়া অত্যন্ত খুশী। কারণ, এইবার সে বুঝেছে যে কী ক'রে আর একটা চরিত্রের মধ্যে ডুবে তারই মধ্যে বাঁচা যায়। এই হলো একজন অভিনেতার সবচেয়ে বড়ো গুণ। অথচ সমালোচকের অভিনয় করার সময়ে কস্‌তিয়া নিজত্ব-বোধ যে হারিয়ে ফেলেনি একথা তার পরে মনে হয়েছে। তার কারণ, তার নিজের রূপান্তরটা সে নিজেই খুশী হয়ে লক্ষ্য করছিল। তার একটা অংশ যখন ঐ নীচ প্রকৃতির হয়েছে, তখন আর একটা অংশ সেটাকে লক্ষ্য করছে। অথচ মজা এই যে, এই দ্বিত্ব, এই বিভক্তি অভিনেতার কাজের ক্ষতি করে না বরং সাহায্যই করে।

শম্ভু মিত্র

সমালোচনা

অন্বিষ্ট—বিষ্ণু দে। ডি এম লইব্রেরী। আড়াই টাকা।

'আমাকে এ-যুগের কবি হতে হবে'—এ-ধরনের চিন্তা মনে অতি বেশি সজাগ থাকলে যে-রকম কবি হওয়া যায় শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে ঠিক তা-ই। অবশ্য কবিমাত্রেই হয়ত এ-কথা ভাবেন কিন্তু যাঁরা সত্যিকারের যুগের কবি হয়ে দাঁড়ান এ-ভাবনা তাদের অহর্নিশ উদ্বেজিত করেনা, অন্তত কবিতা-সৃষ্টির মুহূর্তে ত নয়ই। শিল্পবিশ্লেষণাত্মক ম্যানসিক ক্রিয়া-কলাপ শিল্পীজীবন সুরু হবার আগেই শেষ হয়ে যাওয়া উচিত। এর ব্যতিক্রম অবশ্য টি-এস্ এলিঅটের কবি-জীবনে দেখা যায় কিন্তু আমরা বলতে নিশ্চয়ই বাধ্য হব যে এ-ব্যতিক্রম-লাঞ্ছিত এলিয়টের কবিতা তাঁর অন্যান্য কবিতার চাইতে ম্লান। এলুমিনিয়মের মতো প্রথম আমদানীতে ওর জৌলুষ থাকতে পারে—মূল্যবান মনে হতে পারে কিন্তু কালক্রমে এখন তা আর নয়। কবি-সম্বিৎ যে তৈরী করা যায় তার বিপক্ষে কোনো ইঙ্গিত আমি করতে চাইনে, আমি তা মানি। কিন্তু মেনেও বলতে চাই যে কবি-সম্বিৎ তৈরী করতে-করতে যদি কেউ কাব্য-সৃষ্টিতে প্রয়াসী হন তাহলে সে-সৃষ্টিতে অপরিণতির ছাপ সুস্পষ্ট দেখা যাবে। এ-অপরিণতি দুর্বোধ্যতা, প্রাজ্ঞতা, যান্ত্রিকতা প্রভৃতি লক্ষণে আত্মপ্রকাশ করে থাকে এবং সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে কবির প্রাজ্ঞতাকেও বিজ্ঞের ভান বলে মনে হয়। শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দের কবিতা পাঠককে এম্নি একটি অপ্রীতিকর অবস্থায় এনে উপস্থিত করে। অনেকে হয়ত বলবেন শিল্পীর সম্বিৎ দ্বান্দ্বিকতার নিয়মে চলে—অবিরতই তার ভাঙা-গড়া চলছে। একথা অস্বীকার করা যায়না। পিকাসো তার উজ্জ্বল উদাহরণ। কিন্তু সে-ভাঙাগড়াটা কেমন? ভাঙার অধ্যায় নেপথ্যেই থেকে যায়, আমরা দেখতে পাই গড়ার দিকটাকেই। সৃষ্টির বিচিত্রতা দিয়েই তাই শিল্পীরা চিহ্নিত হন। তাঁরা নিজেদের মনের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করে দেখাতে উদ্যত হন না। বলেন না, ছাখো, আমার নীল অধ্যায়ের পর লাল অধ্যায় সুরু হ'ল। সম্বিৎই সে-সব অধ্যায়ের কারক এবং ভোক্তা হয়ে প্রকাশ্যে যা নিবেদন করল তা-ই শিল্প, নৈবেদ্যের বিচিত্রতায় আমরা শিল্পীর সমৃদ্ধ মনের পরিচয় পেলাম। ভোক্তা হিসেবে শিল্পীর সম্বিৎ যা উপভোগ করে তা-ই শিল্পীর অভিজ্ঞতা—নিজের উপভোগের পরীক্ষায় নিজের অভিজ্ঞতাকে উত্তীর্ণকরেই অপরের কাছে তিনি তা উপস্থিত করেন। কবির প্রথম সহৃদয় পাঠক কবি নিজে তার জন্যেই শিল্প সহৃদয়হৃদয়সংবাদী হবার সুযোগ লাভ করে। শিল্পীর মেধা-মনন, বিদ্যাবত্তা-প্রজ্ঞা এ-ক্ষেত্রে অনেক পেছনে পড়ে থাকে—সামনে এগিয়ে আসে ভোক্তা সম্বিৎ বা হৃদয়।

শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দের 'অন্বিষ্ট'-বইএর কবিতাগুলোতে হৃদয়ের অগ্রসরতা নেই এ-কথা

বলিনে—বরং বলব হৃদয়-ধর্ম্ম সম্পর্কে তিনি এখানে খুবই সচেতন। ফলত, বলতে হয়, হৃদয়ের চেহারা এখানে তেমন স্পষ্ট নয়। হৃদয়-ধর্ম্ম সম্পর্কে সচেতনতা মননের কর্ম্ম এবং সমালোচকেরই ধর্ম্ম। কবির মনোরাজ্যে মননের ভূমিকা অবশ্যই আছে—অভিজ্ঞতাকে মননই গ্রহণ করে,—কিন্তু তার শ্রীবৃদ্ধিসাধন ও পরিবেশন অন্যের হাতে। এমন কি মননের সাহায্যে কবিতাকে উপলব্ধি করতে চাওয়াও প্রচণ্ড ভুল। পাঠকরা এ-ভুলে অভ্যস্ত। অভ্যস্ত হয়ত এজন্যে যে মননাশ্রয়ী রচনা সম্প্রতি কবিতাখ্যাতি নিয়ে প্রকাশিত হয়। 'অন্বিষ্টে' বিষ্ণুবাবু মননশীলতা থেকে মুক্ত হতে পারেন নি—অনেক জায়গায় তিনি জ্ঞানই পরিবেশন করেছেন, অভিজ্ঞতা নয়, আর তার দরুণই কবি-হৃদয় কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

'অন্বিষ্টে'—বিশেষ করে 'অন্বিষ্ট'-কবিতায়—বিষ্ণুবাবু নিজের বহুমাত্রিক সত্তার ব্যাখ্যাতা হয়ে উঠেছেন। কবির পক্ষে এ-ভূমিকা গ্রহণ বিপজ্জনক, কবিতাকে বিপন্ন না করে এ ভূমিকায় সাফল্য অর্জ্জন দুঃসাধ্য। জীবন-ব্যাখ্যায় এলিঅটের 'দি ওয়েষ্ট ল্যাণ্ডে'র মতো মহাকাব্য হয়—কিন্তু ব্যক্তি-জীবনের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ব্যাস, পরিধি প্রভৃতি বোঝাতে গেলে ধ্বনিশিল্পে ব্যাঘাত আসবেই—সে ব্যাখ্যাকে ভাবপুঞ্জের সঙ্গীত বলে দাঁড় করানো শক্ত ব্যাপার। তারপর সে-জীবন যদি কবির নিজের জীবন হয়—তাহলে সে-জীবনকাহিনীতে নৈর্ব্যক্তিকতা কোত্থেকে আসবে? আর নৈর্ব্যক্তিকতা ছাড়া শিল্পের স্বভাব কোথায়? 'অন্বিষ্ট' কবিতায় প্রকৃতিতে, প্রেমে, মানুষের বিচিত্র স্তরে, ইতিহাসে যে তাঁর কবিসত্তা বিতত বিষ্ণুবাবু সে-কথাই বলেছেন, তারপর এই বিশেষের ভঙ্গী সাধারণে টেনে নিয়ে প্রচার করেছেন যে জীবনের দাবী, প্রাণের দাবী সত্তার বিকাশের দাবীই খাঁটি সত্য। আমরা তা থেকে স্রষ্টা শিল্পীর পোর্ট্রেট পেয়ে যাচ্ছি কিন্তু সত্যিকারের শিল্পকে ত তেমন পাচ্ছিনে!

"আমারও অন্বিষ্ট তাই
অণুর সংহতি
আসুক জীবনে রঙে মানবিক আমি চাই আমরা সবাই
সূর্য্যাস্তে ও সূর্য্যোদয়ে ইন্দ্রধনু ভেঙে দিই জীবনে ছড়াই…"

"আমার যাত্রার পথ দীর্ঘ ও ভঙ্গুর
সভ্যতার বহুদূর ঘিরে…"

"পিকাসো কি মহানদী প্রতিটি মুহূর্ত্ত তাঁর
বারবার সমুদ্রের নিত্য অভিযান
নৈর্ব্যক্তিক সত্তা অনির্বাণ?"

এ-ধরণের বহু পংক্তি শিল্পীর পোর্ট্রেট ছাড়া আর কি!

তবে যখন তিনি উপলব্ধি করছেন: "প্রেমেই জীবন গড়া—জীবনই ত প্রেমের ফাল্গুন"—তখন তাঁর ভাষায় সত্যিকারের হৃদয়ের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। প্রেমিকের মতো জীবনকে উপভোগ করতে চেয়েছে বলেই তাঁর সম্বিৎ যে ভাষার জন্ম দিয়েছে তা কবিতা:

"তোমার বাহু পেয়েছি বাহুডোরে
তোমারই চোখ নিজের চোখে জ্বালি
প্রতিটি দিন তোমাকে দিই ডালি
তোমারই ছবি বিভাস ঘুমঘোরে··· ।"

জীবন যেখানে নদী বলে উপমিত সেখানেও প্রেমানুভূতিই কবিতা সৃষ্টি করেছে ঃ

"তোমাতেই বাঁচি প্রিয়া
তোমারই ঘাটের গাছে
ফোটাই তোমারই ফুল ঘাটে ঘাটে বাগানে বাগানে।
জল দাও আমার শিকড়ে ॥"

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

Michael: The Finn—*by* Mika Waltari. Putnam & Co. Ltd., London 12/6*d*.

আলোচ্য বইখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস। নায়ক মাইকেল পেলৎস্কাস এর নাম ইতিহাসে লিখিত হয় নাই বটে, কিন্তু প্রোটেসট্যাণ্ট মতবাদের সংঘাত উত্তর ও মধ্য ইয়োরোপে যে রাজনৈতিক ও সামাজিক আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিলো মাইকেল তাহারই আবর্ত্তে হাবুডুবু খাইতে খাইতে সুদূর ফিনল্যাণ্ড হইতে রোমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইতিহাসের ঘটনার বিপুলতায় মাইকেলের মত আরও কত লোক নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। অপেক্ষাকৃত শান্ত অবস্থায় তথাকথিত ইতিহাসের নায়কেরাও হয়ত পিছনের ধ্বংসাবশেষের তৃপ্ত দৃষ্টিতে হয়ত চাহিতে পারেন না। সাধারণ মানুষের সুখ ও শান্তি কামনা করিয়া ঐতিহাসিক ঘটনাবলী কত অসংখ্য লোকের সুখ ও শান্তি চিরতরে লুপ্ত করিয়া দেয়। বহু আশা লইয়া সাধারণ লোক এই সব ঘটনার সহিত সক্রিয়ভাবে যোগ দেয়, কিন্তু আশা তাহাদের আদৌ সফল হয় কিনা তাহা পরবর্ত্তীকালের ইতিহাসই বিচার করিতে পারে। জনসাধারণ ইতিহাসের বলি। এই দিক হইতে দেখিলে প্রত্যেকটি যুগাবসানের ইতিহাস অত্যন্ত ট্র্যাজিক। তাহারা নিজেরাই ইতিহাসের স্রষ্টা এবং তাহাদের কাহিনীই প্রকৃত ইতিহাস।

লেখক এই যুগাবসানের একটি খণ্ডদৃশ্য অবতারণা করিয়াছেন। মধ্যযুগকে আমরা অন্ধকার যুগ বলিয়া থাকি। প্রত্যেক যুগেরই বিশিষ্ট সংস্কার থাকে। মধ্যযুগেও তাহা ছিল। সব কিছু লইয়া একটি বিশেষ যুগকে পুনরায় পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে পারিলেই তাহাকে সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে। আলোচ্য উপন্যাসখানিতে মধ্যযুগ অবসানকালের পূর্ণ রূপ পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু যেটুকু পাই তাহা ইতিহাস সম্মত। গ্রন্থকারের পূর্ণাঙ্গ একটি আলেখ্য হয়ত ইচ্ছাও ছিল না। মাইকেলের জীবন কাহিনীর

সহিত সঙ্গতি রাখিবার জন্য এই দিক হইতে লেখককে একটু সংযম রক্ষা করিতে হইয়াছে। কাহিনীটি মাইকেলের জীবনীতে বলা হইয়াছে। পিতৃপরিচয়হীন মাইকেলের যে অভিজ্ঞতা তখনকার দিনে সম্ভব তাহার অতিরিক্ত কিছু অবতারণা করিলে একটু শিল্পহানি হইত। অবশ্য প্রশ্ন করা যাইতে পারে মাইকেলের জীবনীতে কাহিনীটি না বলিলে কি চলিত না ?

নানা উপাদান হইতে বহু ঘটনার সূত্র লইয়া ফিনল্যাণ্ডের এ্যাবো সহরে ডেনদের আক্রমণ হইতে সুরু করিয়া রোম ধ্বংস পর্য্যন্ত কয়েক বৎসরের একটি ধারাবাহিক কাহিনী সৃষ্টি করিতে ক্ষমতার প্রয়োজন। উপন্যাসখানির বহু স্থানে প্রমাণ আছে লেখক সে ক্ষমতার অধিকারী।

বর্ত্তমান যুগের সহিত এই উপন্যাসখানির একটি বহির্গত সাদৃশ্য আছে। বর্ত্তমান যুগে কম্যুনিজমকে আশ্রয় করিয়া ইয়োরোপে যে আলোড়ন চলিতেছে, প্রোটেষ্ট্যাণ্ট মতবাদের আবির্ভাব তাহার সহিত তুলনীয়। তখনকার দিনের ধর্ম্মমত সাধারণ লোকের মনে যুগপৎ সন্দেহ এবং উদ্দীপনা সৃষ্টি করিয়াছিল, বর্ত্তমান কালেও তাহার অভাব নাই। কিন্তু প্রোটেষ্ট্যাণ্ট মত সাধারণ লোকের ঈপ্সিত বস্তু কতখানি দিতে পারিয়াছিল, কম্যুনিজমই কতটা পারিবে ?

করালীকান্ত বিশ্বাস

স্বর্ণমারীচ—রমাপদ চৌধুরী। পূর্বাচল প্রকাশক। দাম—দেড় টাকা

রমাপদ চৌধুরীর দৃষ্টি বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ নয়। এই সমতল প্রদেশের বাইরে যে-বৃহৎ বাঙালী পরিবারবর্গ ইতস্তত বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে রয়েছে প্রধানত তাদের জীবন-পরিবেশ নিয়েই রমাপদবাবুর কারবার। তাছাড়া, ভাষা সম্বন্ধে তাঁর সুচারু সাবধানতা পাঠককে আকৃষ্ট করে। কথা দিয়ে তিনি আশ্চর্য ছবি আঁকতে পারেন ; সৃষ্টি করতে পারেন ঈপ্সিত আবহাওয়া।

'স্বর্ণমারীচ' সাতটি ছোটো গল্পের সমষ্টি। এর মধ্যে পাঁচটি গল্পের উপজীব্য মূলত এক হওয়ায়, সংকলনে বৈচিত্র্যের অভাব ঘটেছে। সমাজের উচ্চচূড়ায় যাদের বাসা, যারা ধনী এবং পদস্থ, তাদের হিংস্র মনোবিকার এবং অধীনস্থ নরনারীর ভগ্নজানু অসহায়তা—এই নিয়েই সবকটি গল্পের বুনিয়াদ রচনা করা হয়েছে।

রমাপদবাবুর লেখা পড়ে মনে হয় রতিবিকৃতি যেন বিত্তশালীদের একচেটে এবং অনিবার্য রোগ। বাবুলডিহির চীফ মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়র বিকলাঙ্গ কর্ণেল জনসন, সৌদামিনী আয়রন ওয়ার্কসের প্রায়বৃদ্ধ মালিক স্যর মোহনলাল, ছত্তিশগড়ের মদ্যপ কুমার বাহাদুর—এরা সবাই ধনী বলেই পরস্ত্রীকাতর এবং নারীমাংসাশী। বিশ্বনাথ ঘটকের জটিল সন্দেহপ্রবণতা আর মূলচাঁদ মাড়োয়ারীর অমানুষিক নৃশংসতার মূলেও কি তাদের ঐশ্বর্যের

অভিশাপ ? রমাপদবাবু সায় দিলেও বলব যৌনবিকৃতি কখনই অর্থনীতির অনুগামী নয়, জৈবিক কারণ থেকেই রোগটার উৎপত্তি।

তাছাড়া, মানুষকে একান্তভাবে অর্থনীতির ক্রীড়নক বলে মনে করাও সমীচীন নয়। কেননা, এমন কতকগুলি চিরন্তন মানবিক মূল্য রয়েছে, টাকা-আনা-পাই যে-গুলিকে বশ করতে পারে না। এগুলি আছে বলেই মনুষ্যত্বের কথা ওঠে। কিন্তু রমাপদবাবুর ধারণা দারিদ্র্য মনুষ্যত্বকে সমূলে বিনাশ করে। তাই দেখি বেতনবৃদ্ধির জন্য দীপ্তেন তার তরুণী স্ত্রীকে বীভৎসদর্শন মালিকের অঙ্কশায়িনী করল; বৃদ্ধ মোহনলাল লক্ষপতি বলেই কাঞ্চিণী বিনা প্রতিবাদে তার রিরংসার খোরাক জোগাল নিজের দেহদান ক'রে; শাড়ী আর অলঙ্কারের লোভে বাসনা তার স্বাধীন ইচ্ছাকে জলাঞ্জলি দিয়ে শেষ পর্যন্ত নিবীর্য স্বামীকেই আঁকড়ে ধরে থাকল। আর অমলেন্দুই বা কেন মার খেয়ে চুপ ক'রে রইল ? আশ্চর্য, এরা কেউই প্রতিবাদ করল না, বিদ্রোহী হয়ে উঠল না। দীপ্তেন না পারুক, তার স্ত্রীও তো আপত্তি জানাতে পারত ? যে নিষ্ঠুর ভবিতব্যতা এদের ক্লীবলিঙ্গ ক'রে রাখল, আমার মনে হয়, তার জন্য লেখকই দায়ী, যিনি জানেন না কিংবা মানেন না যে দারিদ্র্য একটা সামাজিক ব্যাধি, মানসিক কুষ্ঠরোগ নয়।

ধনীর অনিবার্য চরিত্রহীনতা আর দরিদ্রের অনিবার্য আত্মসমর্পণ—রমাপদবাবুর কাছে স্বতঃসিদ্ধ সত্য। রসবিচারের দিক থেকে 'রত্নকূট' আর 'কুশীদাশ্রিত' গল্পদুটি ছাড়া, 'স্বর্ণমারীচে'র সবকটি রচনাই সুলিখিত এবং সুখপাঠ্য। 'রূপোর কাঠি' গল্পটি তো চমৎকার।

অরুণকুমার সরকার

তোমরাই ভরসা—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স। পাঁচ টাকা।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ছোটো গল্পের আমি অনুরাগী পাঠক। 'রাণুর প্রথম ভাগে'র সজল হাসির শিশির, অথবা গণেশ-সম্প্রদায়ের চমৎকার কাহিনীগুলি বাংলা ছোটো গল্পের ভিড়ে সহজে হারিয়ে যাবার নয়। কিন্তু বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন মনোস্বভাব; ছোটোগল্পে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যে-দৃঢ় ধৃতি, তা আলোচ্য উপন্যাসখানিতে খুঁজে পেলাম না, এর আগে তাঁর 'নীলাঙ্গুরীয়' প্রভৃতি অন্যান্য উপন্যাসপ্রয়াসেও পাইনি।

যতদূর ধারণা করতে পারলাম, কাহিনীর ভিতর দিয়ে লেখক যে-প্রতীতি ব্যক্ত করতে চেয়েছেন তা এই যে, পৃথিবীর ঘোর-লাগা রাস্তায় ধ্রুব আলো দেখিয়ে চালনা করবার দায়িত্ব নারীর। বিপথগামী পুরুষকে ফিরিয়ে আনতে মেয়েরাই ভরসা; অভিমান, অতএব, মেয়েদের সাজেনা। শিক্ষয়িত্রী অণিমা ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে না নিয়ে চরিত্রহীন এ্যালবার্ট কিরণময় রায়কেই বরণ ক'রে নিলো ব'লেই একদিন পঙ্ক থেকে পঙ্কজের আবির্ভাব হলো, কিরণময় আদর্শ সচ্চরিত্র স্বামীতে রূপান্তরিত হলো। পক্ষান্তরে, আশৈশব পুরুষ সম্বন্ধে

একটি ঘৃণা ও আতঙ্কযুক্ত মন্যতার মধ্যে লালিত হয়ে উঠেছে ব'লে জাহ্নবী উপযাচক ব্রজলালকে উপেক্ষা করলো, আর সেইজন্যেই ভগ্নমনা হয়ে ব্রজলাল পাপের পথে আরো ভেসে গেলো এবং শেষে চরম সর্বনাশে পৌছুলো। ত্রাণকর্ত্রী নারীর পক্ষে ঔদাসীন্য অথবা বিমুখতা শোভা পায় না।

এই বক্তব্যকেই হয়তো কলাকুশলতার সাহায্যে মহৎ ক'রে প্রকাশ করা যেতো, কিন্তু কল্পনা ও নির্মিতির মধ্যে ছায়া পড়েছে। কাহিনীটি কোনোখানেই দানা বেঁধে ওঠেনি; তাছাড়া, এই গ্রন্থে বিভূতিবাবুর ভাষাও তেমন স্রোতসচ্ছল নয়। অম্বিকাচরণের সঙ্গে অন্নদাঠাকরুণের এবং নারায়ণী ও জাহ্নবীর, মিলিত হবার যে-গৌরচন্দ্রিকা, তা দুর্বল; এধরণের ঊনবিংশশতকীয় ঠমক আজকাল অচল ঠেকে। তারো পরে, যে-জাহ্নবী এগারো-বারো বছর বয়স পর্য্যন্ত বলতে গেলে সভ্যতার ছায়াই মাড়ায়নি, সে মাত্র তিনচার বছর মিশনারী স্কুলে প'ড়ে হঠাৎ কী ক'রে এতটা ইংরেজিনবিশ হয়ে গেলো যে যুগপৎ সুদক্ষ স্টেনো-টাইপিস্টের কাজ করতে এবং শেলি-কীটসের গহনতায় ডুবে যেতে শিখলো, তা ভেবে অবাক লাগে।

এটা তর্কাতীত যে দুর্বল উপন্যাসের চেয়ে ভালো ছোটোগল্প অধিকতর প্রিয়পাঠ্য।

অশোক মিত্র

ইদানীং—পরিমল রায়। এম, সি, সরকার এ্যাণ্ড সন্স লিঃ। দাম দু' টাকা।

কিছুকাল পূর্বেও বাংলা সাহিত্যে ব্যক্তিগত প্রবন্ধের অভাব ছিলো: হাল্কা চালে, লঘু ছন্দে, জীবনের বহু গভীর ও জটিল বিষয়কে এ ধরণের প্রবন্ধে বেশ রসাল করে প্রকাশ করা চলে। তার জন্য লেখাকে অসংখ্য উদ্ধৃতি দ্বারা কণ্টকিত করার প্রয়োজন নেই। অথচ সমস্যাগুলি সম্পর্কে লেখকের প্রাঞ্জল মতামত পাওয়া অনায়াসসাধ্য। তবে হাল্কা চালেই শুধু লেখা নয়। ব্যক্তিগত প্রবন্ধের এমন কতকগুলি চরিত্র লক্ষণ আছে যার জন্য তা স্বীয় সত্তায় অস্তিত্ববান। আলোচ্য গ্রন্থটি এধরণের ব্যক্তিগত প্রবন্ধের একটি সংকলন।

এইচ, জি, ওয়েলস তাঁর সাহিত্যে অস্বাভাবিক ঘটনার সমাবেশ কেন করেন তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, গ্রহান্তরে অথবা পৃথিবীর সীমানা পার হয়ে যাবার প্রয়োজন ঘটে শুধু যথার্থভাবে পৃথিবীকে দেখবার জন্যই। কারণ পৃথিবী এত বিরাট যে নিকটে থেকে তা যথাযথ প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। কিন্তু পরিমল রায়ের 'ইদানীং' এই বক্তব্যের অসারতাই যেন প্রমাণিত করে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। এমনকি গ্রহান্তরে গেলেও নয়। এ-চেষ্টা শুধু প্রচেষ্টাই এ-কথা বোধকরি পরিমল রায় বুঝেছেন, তাই এ-পৃথিবীর, তাই বা কেন, ঢাকা, দিল্লী ও কলকাতার পথেঘাটে সজাগ ভ্রূকুঞ্চিত দৃষ্টির পাহারা বসিয়ে তিনি আনাগোনা করেছেন। আর মানুষকে জেনেছেন। পৃথিবীকে

দেখেছেন। তথাপি সকলের মধ্যে থেকেও যেন তিনি সেখানে অনুপস্থিত। সে-কারণেই তাঁর রচনায় এমন নির্লিপ্ততা। মনের ক্যামেরায় ফটো ধরাই যেন তাঁর কাজ। কিন্তু এ নির্লিপ্ততা অনীহা নয়, মানুষ বিচারের অন্যতম পন্থা মাত্র। মনস্তত্ত্বে এর স্বীকৃতি মেলে। এমন কি নিজেকেও এই পন্থায় বিচার করা সম্ভব।

গ্রন্থ-অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি প্রবন্ধেই লেখক হাসি পরিহাসের এক উজ্জ্বল আবহাওয়ায় জীবনের বিভিন্ন বিচিত্র দিক উদ্ঘাটন করেছেন। ভাষায় রসাল হাসির প্রলেপ, কিন্তু তারই আবরণে বিদ্রূপ প্রচ্ছন্ন। প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'আত্মীয়,' 'জনসাধারণ,' 'স্বাস্থ্য-শিকার,' 'শিউপূজন,' এবং 'দিল্লীতে' অনবদ্য!

নৃপেন্দ্র সান্যাল

Printed and Published by Atawar Rahman at Sri Gouranga Press, 5, Chintamani Das Lane, Calcutta.

চতুরঙ্গ
দ্বাদশ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা মাঘ-চৈত্র ১৩৫৭

বাংলার রিপোর্ট

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

দেশসম্পর্কে প্রত্যাগত প্রবাসীর মন্তব্য করার পূর্ণ অধিকার নেই। আংশিক অধিকারের দাবী খানিকটা বিযুক্ততা ও বাকীটা বৃত্তিসুলভ নিস্পৃহ দৃষ্টিভঙ্গী। তদ্‌ভিন্ন অনুরাগ ও পূর্ব্বতন সম্পর্ককে যদি পাঠকবর্গ স্বীকার করেন তাহলেই যথেষ্ট।

তিন বৎসর পরে দেশে ফিরতে না ফিরতেই, অর্থাৎ হাওড়া স্টেশনেই, মনে হল দেশ মানে সমস্যা, এবং শরণার্থীর সমস্যা। ট্রাউজার্স পরা ছিল, বোধ হয় তাই মালবাহক বললে, 'বাঙালীবাবু সব ভাগকে আয়া, বিহারসে আউর পুরীসে।' যাঁরা স্টেশনের বড় চাতালে ঘরকন্না করছেন তাঁদের ঠিক বাবু বলা যায় না, এবং চাষীমজুরও বলা যায় না। পুরুষেরা শুয়ে আছেন, মেয়েরা রাঁধছেন, এবং অসংখ্য শিশু, বালকবালিকা খেলা করছে। উত্তর প্রদেশেও অনেক শরণার্থী এসেছিলেন, এবং তখন আমরা কেউই অভিজ্ঞ ছিলাম না। তবু এমন অ-বন্দোবস্ত চোখে পড়েনি, এবং স্টেশনে পুরুষদের ঘুমুতেও দেখিনি। পরে শুনলাম অনেক কথা। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের মতে এই দল অপদার্থ ও নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে অক্ষম। অবশ্য প্রাদেশিক সরকারকে নিজেদের দোষ ঢাকতে অনেক কিছুই বলতে হয়, এবং অর্থাভাবে অনেক সময় যা করতে চান তা তাঁরা পারেন না। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেও বাঙালীর প্রতি আন্তরিক দরদ প্রত্যাশা করা যায় না; তাঁদের ভাণ্ডারও কুবেরের নয়। তবু যেন মনে হয় বাঙালী শরণার্থীদের আবদার একটু বেশী এবং আত্মসম্মান একটু

কম পঞ্জাবী শরণার্থীদের চেয়ে। শেষোক্তরা অন্যের সাহায্য চাইতে লজ্জা পান। কত শীঘ্র তাঁরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন না দেখলে বিশ্বাস হয় না! অনেকে ভাবছেন এ পার্থক্য চরিত্রগত। চরিত্র বস্তুটিকে বিশ্লেষণ করলে শ্রেণীগত অভ্যাস ও ঐতিহ্যে পৌঁছতে হয়। খোঁজ নিয়ে জানলাম যে হাওড়া স্টেশনে যাঁরা আছেন তাঁরা মোটেই চাষীমজুর নন, হাটবাজারের দোকানদার, আড়তের অল্পমাইনের চাকুরের দল। এঁদের উড়িষ্যার জঙ্গলে কিংবা বিহারের পাহাড়ে জায়গায় পাঠাবার মানে হয় না। একটা কেন কুড়িটা ফুলিয়া-নীলোখেরী স্থাপিত হলেও এঁদের সমস্যার নিরাকরণ হবেনা। পাকিস্তানে কী হচ্ছে বা না হচ্ছে সেটা চলে আসবার কারণ—তা নিয়ে বড় জোর ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের সরকারের মধ্যে রাজনৈতিক হামলাবাজি চলতে পারে; কিন্তু পুনর্স্থাপনার পদ্ধতি সম্পর্কে তা অবান্তর। রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গী এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়; এমন কি রিলীফ্ ও সহরস্থাপনাও নয়। দেশের ও সরকারের প্রচেষ্টায় শ্রেণীবিভাগের অস্তিত্ব কতটা স্বীকৃত হয়েছে, কতটা শ্রেণীপ্রত্যয় ওতঃপ্রোত রয়েছে সেইটাই প্রধান কথা। এও শুনলাম যে সরকার বাহাদুর ইকনমিক ও সোশ্যাল সর্‌ভে করেছন। কিন্তু এই ধরণের সর্‌ভে প্রায় সর্ব্বত্রই অর্থহীন, এক থিসীসের প্রয়োজন ছাড়া। কার্য্যকরী সর্‌ভের মূল প্রত্যয়ের বিচারের স্থান অন্যত্র। মাত্র এইটুকু বললেই চলবে যে সোশ্যাল ও ইকনমিক প্রোসেস্ থেকে বিচ্ছিন্ন প্রত্যয়ের কোনো মূল্য নেই; এবং সব পরীক্ষামূলক সর্‌ভেতেই প্রথমে একটা অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ হাইপথেসীস্ খাড়া করতে হয় যার অসত্যতা, পূর্ণতা-অপূর্ণতা বিচারিত হয় বিজ্ঞানসম্মত সত্যনিষ্ঠ সর্‌ভের দ্বারা। আমার মতে ইকনমিক ও সোশ্যাল প্রোসেসের অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ হাইপথেসীস হল নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণীর নিপাত। এই শ্রেণীর ঊর্ধ্বে উঠবার ক্ষমতা ও সুযোগ নেই; ক্ষেত-চাষী ও কলের মজুর হবার ইচ্ছা ও সুযোগ নেই। তাই এই শ্রেণীর শরণার্থী সর্ব্বহারা। ওপরকার শ্রেণীতে টেনে তোলবার ক্ষমতা কোনো ক্যাপিটালিষ্ট এমন কি ওয়েলফেয়ার ষ্টেটেরও থাকতে পারেনা। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে আমেরিকায় যা হয়েছিল ও সেদিন পর্য্যন্ত হয়ে আসছিল তাতে রাষ্ট্রের সাহায্য ছিল না। বর্তমানে রাষ্ট্রের সাহায্য একমাত্র আসতে পারে কল-কারখানা, বড় বড় যৌথ ক্ষেত তৈরী করবার মারফৎ; অর্থাৎ নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীকে নতুন প্রোডাক্‌টিভ্ শ্রেণীতে পরিণত করবার পদ্ধতিতে। এই প্রকার সমস্যাবিচারের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। আমাদের রাষ্ট্র যথার্থ ডেমক্রাটিক

নয়; আমাদের উৎপাদন পদ্ধতি ডেমক্রাটিক রাষ্ট্রের দ্বারা চালিত নয়, নিয়ন্ত্রিতও নয়।

সহরে দু' সপ্তাহ বাসের মধ্যেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যর্থার্থ রূপ প্রকট হল। বাড়ীভাড়া ছেড়ে দিলে আমার পরিচিত কয়েকটি পরিবারের ভদ্রোচিত মাসিক ব্যয় ৫০০৲ টাকা থেকে ৬০০৲ টাকা, ও আয় ৩০০৲ থেকে ৪০০৲ টাকা। (এই সব সংসারে মাত্র তিনজন জোয়ান ব্যক্তি।) অর্থাৎ এঁদের প্রতি মাসে ১০০৲ থেকে ২০০৲ টাকা হয় ধার করে, না হয় গহনা বেচে খরচ যোগাতে হয়। শিক্ষিত সম্প্রদায় টিউশনী করেন ও মাসিক-দৈনিকে লেখেন। বাইরের ঠাট এঁরা বজায় রাখেন বটে, কিন্তু "বাইরে কোঁচার পত্তন ঘরে ছুঁচোর কীর্ত্তন"। বলা বাহুল্য এঁদের বুর্জ্জোয়া বলা মোটেই চলেনা; অথচ বহু স্তরভেদ থাকা সত্বেও এঁরা অন্য শ্রেণী থেকে সামাজিক ও আর্থিক বৈষম্য বজায় রাখতে তৎপর; আয় ও সম্পত্তিতে আঘাত কিংবা কোনোপ্রকার সমীকরণ পদ্ধতি, যার ফলে উচ্চহারের বৃত্তির একচেটিয়া অধিকারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আসে, তার বিপক্ষে এঁরা একদল ও একদিল হতে সদাব্যগ্র। এঁরা যখন সরকারকে আনডেমোক্র্যাটিক বলেন তখন ডিমক্রাসীর সঙ্গে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থের যোগই বোঝেন। এই শ্রেণীর সব স্তরের সঙ্গে কৃষ্টির যোগ সব সময়, সব ক্ষেত্রে থাকে না। যে-স্তরের সঙ্গে যোগ থাকে তার সংখ্যা নিতান্ত কম বরাবরই। এবার আরো কম দেখলাম। বিদগ্ধ জনের সামাজিক প্রতিপত্তি আজ নেই। অন্যত্র বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর প্রতিবেশে ভদ্রশ্রেণী উঠেছে, এবং ভদ্রশ্রেণীর ভেতরে নিম্নবিত্ত শ্রমিকশিল্পী প্রবেশ করছে; বাঙলায় তার চিহ্ন নিতান্ত অস্পষ্ট। বোধ হয় বাঙলায় মধ্যশ্রেণীর অ-বিদগ্ধ স্তরের সঙ্গে কৃষ্টির কিছু যোগ ছিল। সে-যোগের ধাতুপরিবর্ত্তন হয়েছে। যাঁরা আধুনিক অর্থনীতিতে অভিজ্ঞ তাঁরা জানেন প্রত্যাশা (এক্স্পেক্টেশন) কতখানি বাজার-দর লাগৎ (কষ্ট্) ও মুনাফা (প্রফিট)-কে নিয়ন্ত্রিত করে। প্রত্যাশার অন্তরে যত কিছুই থাক কৃষ্টির প্রতি দরদের স্থান নেই। সংখ্যাই তার দেবতা; অতএব যে-বইয়ের প্রচলন বেশী সে-বইই ভালো স্বীকৃত হচ্ছে। এমন কি প্রতিক্রিয়ার চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। সঙ্গীত সম্বন্ধেও তাই। গায়ক-গায়িকার সংখ্যা যত বাড়ছে ততই গান-গাওয়ার অবনতি হচ্ছে। ব্যাপারটা অথচ সংখ্যা ও গুণের দ্বন্দ্ব নয়; ব্যাপারটা হলো ভদ্রশ্রেণীর যে স্তরের সঙ্গে কৃষ্টি-পরিমাণের যোগ ছিল তার অবলোপ। অথচ নতুন কোনো মানদণ্ডের উত্থান দেখলাম না। তার কারণ মধ্যশ্রেণীর মধ্যে কেবল স্তরভঙ্গই চলছে, অথচ তাঁরা নতুন শ্রেণীর সঙ্গে মিশে যাচ্ছেন না।

ধাতুপরিবর্ত্তনের একটি লক্ষণের পরিচয় পূর্ব্বেই শুনেছিলাম। ইন্টারভিউতে ছাত্রদের সাহিত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয় প্রায়ই। বাঙালী ছাত্ররা উৎসাহের সঙ্গে উত্তর দেয়। কিন্তু মাইকেল, বঙ্কিম সম্বন্ধে তাদের ধারণা নিতান্ত অস্পষ্ট, তারা কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, ভারতচন্দ্রের নামই শুনেছে, রামায়ণ মহাভারতের গল্প পর্য্যন্ত জানে না, অথচ জীবিত সাহিত্যিকদের আধুনিক রচনার সঙ্গে বেশই পরিচিত। মাদ্রাজ অঞ্চলের, বিশেষত তামিল ও মালাবারের ছাত্রদের জ্ঞান ও রুচি ঠিক বিপরীত। তারা ক্ল্যাসিক্‌স্ ভালো করেই পড়েছে, এবং নব্যসাহিত্য সম্বন্ধে হয় উদাসীন না হয় অজ্ঞ। এর থেকে হয়ত প্রমাণ হবে যে বাঙলা সাহিত্য জীবন্ত ও অন্য সাহিত্য মৃত। সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এই সিদ্ধান্তেও আসতে হবে যে নানা কারণে ক্ল্যাসিক সাহিত্যের সঙ্গে বাল্যাবধি পরিচয়ে, পড়েই হোক আর মা-ঠাকুমার মুখে শুনেই হোক, যে মূল্যজ্ঞান হোত সেটি আর হচ্ছে না, এবং তার ফলে চিন্তা, ভাব ও বোধের ধারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে, মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে। রামকৃষ্ণ ইন্‌স্টিটিউট অফ্ কালচারে আজ দেড় বৎসর ধরে প্রতি সপ্তাহে একদিন মহাভারতের ওপর বক্তৃতা চলছে; পাঁচ ছশ' ব্যক্তির সমাগম হয়; কিন্তু যুবক-যুবতীর সংখ্যা নিতান্ত কম; এবং মনে হল যেন অধিকাংশই উচ্চ কিংবা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। সে যাই হোক, মধ্যশ্রেণীর সঙ্গে ক্ল্যাসিক্‌সের সম্বন্ধ নিতান্তই ক্ষীণ হয়ে পড়ছে। রামকৃষ্ণ মিশনের কাজটি নিতান্ত সাধু এবং সুচারুরূপেই সম্পন্ন হচ্ছে। শোনবার সময় মনে হচ্ছিল যদি গ্রামে গ্রামে মহাভারতের গল্প রামকৃষ্ণ মিশন প্রচার করেন তবে দেশের মহা উপকার হয়। কিন্তু তার পরই সন্দেহ উঠল হয়তো এ-কাজ সম্ভব নয়, যদিও মহাভারত প্রগতি-সাহিত্যের অপেক্ষা অনেকাংশে আধুনিক।

বাঙলা সাহিত্যে প্রগতিবাদের আজ দুরবস্থা। ত্রিশ ও চল্লিশ শতকের অর্দ্ধাংশের উৎসাহ প্রত্যাশা করিনি। তখনও প্রগতি-সাহিত্য সাহিত্য হয়ে উঠেনি এবং তার কারণও ছিল যথেষ্ট। কিন্তু প্রগতি-সাহিত্যের একটা সামাজিক মূল্যজ্ঞান ছিল। আজ প্রগতি-সাহিত্য অর্থে শান্তি সম্পর্কে কবিতা ও বিদেশী প্রবন্ধ ও গল্পের অনুবাদ। দুইই অ-বাস্তব, ভুয়ো। এর কারণ বোধ হয় এই: আমাদের মধ্যশ্রেণীর সকল স্তরের লোকই জানেন যে যুদ্ধ বাধলে দাম অবশ্য বাড়বে কিন্তু চাকরী মিলবে, ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়েও বেশী লাভ হবে। যুদ্ধের অর্থ বাঙালীর কাছে ততটা প্রকট নয় যতটা মধ্য-য়ুরোপীয়ানের কাছে। তাদের সাহিত্যে অস্তিত্ববাদের ঢেউ এসেছে; ইংরেজী সাহিত্যেও দৃষ্টি অন্তর্মুখী

হচ্ছে। অস্তিত্ববাদ সম্পর্কে কিছু বাঙলা রচনা পড়লাম—সবই অনুবাদ, হয় স্বপক্ষে, না হয় বিপক্ষে, আলোচনা নেই। অন্য ধারে পলিটিক্যাল সাহিত্যেরও উন্নতি দেখলাম না। প্রগতি-সাহিত্য যদি পার্টিবাজি ছেড়ে দিয়ে কম্যুনিজমের মানবিক সত্যগুলি গ্রহণ করত তবে তার সামাজিক মূল্যবোধের এমন দুরবস্থা হত না বোধ হয়। পলিটিক্যাল প্রপ্রাগাণ্ডা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার নানা উপায় আছে; সেটা ত্যাগ করেও ভূয়োদর্শন সম্ভব, এবং সে ভূয়োদর্শনের যথেষ্ট স্থান ও প্রয়োজন আছে বাঙলা সাহিত্যে।

বর্ত্তমান বাঙলা সাহিত্য সম্পর্কে আমার মোটামুটি ধারণা এই হল; পুরান গত, আগেকার মীথ্ কার্য্যকরী নয়; নতুন মীথ্—যেমন জনগণ, প্রগতি, স্বাধীন ভারত, বিশ্ববোধ, জমল না, প্রত্যয়ই রয়ে গেল, ব্যক্তিকেন্দ্রিক গণ্ডীতেই আবদ্ধ রইল। কেবল রবীন্দ্রনাথের মীথ্ই চলছে যা কিছু, তাও টায়টায়ে, রবীন্দ্রনাথের ঐক্যবোধ এখন ছিন্নভিন্ন। অন্যদিকে বাঙালীর সম্বল, যেমন মাতৃকা, নদী, কুণ্ডলিনীশক্তি, বাঙালী সাহিত্যিকেরই হাতে আগে থেকেই বিনষ্ট হয়েছে। এমন অবস্থায় তিনটে জিনিষ প্রত্যাশা করা যেত। প্রথমতঃ ইমেজের প্রাধান্য, দ্বিতীয়তঃ বিশুদ্ধ যুক্তিপূর্ণ বিচারসর্ব্বস্ব প্রবন্ধ, এবং তৃতীয়তঃ ছড়া। তিনচার বৎসর পূর্ব্বেও বাঙলা কবিতায় ইমেজের প্রাচুর্য্য ছিল। এখন দেখলাম পুনরাবৃত্তি, তাই তাদের রঙ ও গড়ন একেবারে পাৎলা। অবশ্য ঘনতার অভাব বরাবরই ছিল, তবু দুএকজন রবীন্দ্রোত্তর কবি ঘন করবার চেষ্টা করছিলেন। (অবশ্য ইমেজসৃষ্টি খানিকটা ব্যক্তিগত প্রকৃতিসাপেক্ষ)। যুক্তিপূর্ণ গদ্য নেই বললেই চলে। অন্ততঃ তিনচারজনের প্রবন্ধ সত্যই ভালো, কিন্তু ছাঁচ সেই ল্যাস্কির শিষ্যদের হাতের। দুএকটি ত্রৈমাসিক ও একটি মাসিক—'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'—যুক্তিপূর্ণ রচনা ছাপায়, কিন্তু অন্যদেশে এই ধরণের পণ্ডিতী লেখাও জনসাধারণ পাঠক-পাঠিকার কাছে সাহিত্যপদবাচ্য হয়ে ওঠে। প্রজ্ঞায় একান্ত বিশ্বাসী না হলে বোধ হয় তর্ক, বিচার, বুদ্ধিপ্রধান লেখা সাহিত্য বলে গণিত হয় না। বাকী রইল ছড়া ও যথার্থ লোকসাহিত্য। নতুন যুগের ছড়া ও লোকসাহিত্য রচনার জন্য আঙ্গিককে খুবই বেশী আয়ত্ত করতে হয়; কিছু কম হলেই আয়াস ধরা পড়বে ও রচনা হবে ন্যাকামী। শিশু ও কিশোর সাহিত্য যা পড়লাম তাতে সহজভাব নেই মোটেই, সব ন্যাকামীতে ভরা। অথচ এই সহজ লোকসাহিত্য ও ছড়ার ভাব যামিনী রায়ের আধুনিক ছবিতে ওতঃপ্রোত। অতএব বাঙলা সাহিত্যের উদ্ধারের এক উপায় যামিনী রায়ের ছবির উপায়,

অন্যটি প্রজ্ঞাপ্রধান প্রবন্ধ। শেষেরটাই সোজা। যে দুর্মর সত্যসন্ধান বহু অবান্তর আপাতমনোহর আকর্ষণকে পরিত্যাগ করতে সমর্থ সেটি মোটেই সহজসাধ্য নয়।

বর্ত্তমান বাঙলাদেশের সঙ্গীত সম্বন্ধে লিখতে গেলে ভদ্রতা রক্ষা করা শক্ত। সকলেই রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছে। স্ত্রীপুরুষের কণ্ঠে কোনো পার্থক্য নেই। অথচ নপুংসকের কণ্ঠ নয়, castratoও নয়। আধো আধো ভাষা, ন্যাকামী মাখান, অশুদ্ধ উচ্চারণ, ঠোঁট চাপা, আড়ষ্ট, সামনে বইখানি খোলা। তালের সামান্য উন্নতি হয়েছে। নির্ব্বাচনে কাঁককাঁকুড় জ্ঞান নেই। ওস্তাদী গান পড়ে গেছে। নতুন গায়ক-গায়িকা সব বড় গোলাম আলির অনুকরণ করছে। তিন বছর আগে যাঁদের গান শুনে মুগ্ধ হতাম তাঁরা এখন হয় বেসুরো না হয় ভুল গাইছেন। প্রথম তিন চার মিনিট খাশা লাগে, তারপর তানের বেলা স্বর ও সুর দুইই যায় উড়ে। যন্ত্রসঙ্গীত মন্দ নয়, তবে ভারতবর্ষে যন্ত্রসঙ্গীতই আছে। বাঙলা সঙ্গীতে না আছে শিক্ষা-দীক্ষা না আছে অনুভব, অথচ আগ্রহ প্রচুর। 'আধুনিক' সঙ্গীতে ন্যাকামী ও বোকামীর অদ্ভুত মিশ্রণ ঘটেছে। এ সঙ্গীত feebleminded-এর সঙ্গীত। আমাদের সঙ্গীতে গলা কাঁপান অচল—স্বর হবে তৈলধারাবৎ। বাঙলা দেশের সঙ্গীতে মেরুদণ্ড নেই, কাদাচিঙড়ীর মতনই তার গড়ন।

এক চিত্রকলা ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রেই বাঙলা চারুকলার এই অবস্থা। আশার কথা ঐ চিত্রকলা। তিন চার জন চিত্রকরের স্টুডিও ও প্রদর্শনী দেখলাম। ক্যালকাটা আর্টিষ্টগোষ্ঠীর কাজ দেখতে পেলাম না। শুনলাম সেটাও নাকি ভাঙছে। যামিনী রায় বিস্তর ল্যাণ্ডস্কেপ এঁকেছেন। প্রতিটির ডিজাইন, ড্রাফ্‌ট্‌ম্যানশিপ সরল—কোনো ওস্তাদী নেই। রঙ উগ্রভাবে স্বাধীন নয়, অথচ উজ্জ্বল, সাহসী। কোথাও তিলমাত্র ভাবালুতা নেই। হলদে, সবুজ, বেগুনির অদ্ভুত সমাবেশ হয়েছে সামান্য দু'একটি স্পষ্ট রেখার আশ্রয়ে। তাছাড়া, কাঁথার কল্পনায় কয়েকটি ছবি ; আর পুতুলের মতন ঘোড়া, হাতি, যারা স্বজাতিত্ব রক্ষা করেও বিশেষ। এরা রূপকথার ঘোড়া হাতি, কথা কয়, হাসে, ছুটতে ছুটতে থামে, ড্যাবড্যাব করে চেয়ে থাকে, সেজেগুজে ঠাটঠমকে চলতে চায়, নিজেরা ছাখে, লোককে বলে ছাখ আমাদের, কোনটা আদুরে, কোনোটা দম্ভে ভরা, প্রতিটি পৃথক নিজের সত্তায়। কোনার্কে'র ঘোড়া রাজার, যামিনী রায়ের ঘোড়া শিশুর। হাতির ওজন, গতি, দুষ্টুমি, স্মৃতিশক্তিটি পর্যন্ত ফুটে উঠেছে, অথচ

একটি হাতি এক দেশের, অন্যটি সাগরপারের। যামিনী রায়ের ছবিতে শান্তি আছে। শুনলাম চীনে ও রাশিয়ান অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা সব ছবিতে সাধারণ মানুষ, জনগণের আর্ট লক্ষ্য করেছেন তিনি। তাঁরা বেশী জানেন, অতএব নিশ্চয়ই তাই। আমি কিন্তু অনুভব করলাম মাটির ছোঁয়াচ। শীতল মাটি, শক্ত, ঠিক দুর্বাদল মণ্ডিত নয়। সহরের মেয়েরা জুতো খুলে হাজারীবাগ অঞ্চলের শালবনে ঢোকে, ঘোরা-ঘুরি ক'রে হাঁপিয়ে পড়ে, পাহাড়ে নদীর ঠাণ্ডা জল খায়, গাছের তলায় শুয়ে পড়ে, বাড়ী ফিরতে মন আর তাদের চায় না। এই ধরণের খানিকটা মনোভাব অন্ততঃ একজনের প্রায়ই হত যামিনী রায়ের স্টুডিওতে ঢুকে। আজ পৃথিবী দৈত্যের কবলে, দৈত্যদলের মিলন কি যামিনী রায়ের ছবিতে? মাটির পরশ ত্যাগ করলেই মৃত্যু—এ-কথা পুরাণেও আছে মার্কসবাদেও আছে। আমার নিতান্ত দুঃখ যে অবনীবাবু, নন্দলালবাবুর নতুন কাজ দেখতে পেলাম না। (কিন্তু অবনীবাবুর বহু রচনা পড়লাম। 'ক্ষীরের পুতুল', 'ভূতপত্রীর দেশ', 'রাজকাহিনী' ছড়া নয়, গল্প। আমার হঠাৎ মনে হল রবীন্দ্রনাথের পরই অবনীবাবু আমাদের শ্রেষ্ঠ গদ্য লেখক। তাঁর লিখিত ভাষায় বহু ছবি ফুটে ওঠে; এমন কি ছড়ার রেশও শোনা যায়। সাহিত্য, চিত্র ও সঙ্গীতের এমন সমাবেশ আমাদের সাহিত্যে নেই বললেই চলে। কিন্তু আমি সমাবেশের কথা ভাবছি না; ভূমি ও উৎসের কথাই ভাবছি, যার প্রকাশ ছড়া, মাত্র ছড়ার রেশ নয়।) সে যাই হোক, বাঙলার কৃষ্টি বাঁচিয়ে রেখেছেন চিত্রকরেরা।

বাঙালী নতুন অধ্যাপক, রিসার্চ স্কলারদের সঙ্গে আলাপ হল। সকলের মুখেই এক কথা—বাতাবরণ প্রতিকূল, কোনো দল নেই, আলোচনার সুযোগ নেই, বৃদ্ধেরা নিরাগ্রহ, তাঁদের কাছে থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যায় না, প্রায় সকলেই পলিটিক্যাল জীব। দুখানি ডক্টরেটের জন্য লেখা থিসীস ও একটি বইয়ের পাণ্ডুলিপি পড়লাম। বেশ লাগল। বাঙালীর স্কলারশীপ সম্বন্ধে হতাশ হইনি। এখনও একজন বৃদ্ধ পণ্ডিত একলা মহাভারতের অনুবাদ করছেন, নীহাররঞ্জন বাঙালীর ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ড লিখতে ব্যস্ত, বিশ্বভারতীতে গবেষণা চলছে। বিজ্ঞানে, অর্থশাস্ত্রে নাকি বিশেষ কিছু হচ্ছে না। জানি না কতটা সত্য। তবে আজকালকার বৈজ্ঞানিক গবেষণা অনেক টাকার কারবার; ল্যাবরেটারী সাজাবার যন্ত্র নেই, টাকা নেই, ঘর নেই। নবীন অধ্যাপকেরা খেতে পাচ্ছেনা ত' পত্রিকা কিনবে কোত্থেকে? অর্থশাস্ত্রে বিশ্লেষণমূলক রচনা প্রত্যাশা করেছিলাম, খবর পেলাম না। সাহিত্য-গবেষণা যান্ত্রিক মনে হল।

সকলেই সাহিত্যকে ফর্ম্মুলার ভেতরে আনতে চাইছেন। সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে যোগ হল না এবার। তথ্যসংগ্রহ কিছু তবু হচ্ছে সেখানে, কিন্তু সাহিত্যবিচার ও সমালোচনা নেই বললেই হয়। বঙ্কিমসাহিত্য বিচারে কিন্তু নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দেখলাম।

অন্য দুটি কথা উল্লেখ করে আমার রিপোর্ট শেষ করছি। রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিটিউটের উল্লেখ করেছি। এটি একটি বলিষ্ঠ কৃষ্টিকেন্দ্র হয়ে উঠছে। বন্দোবস্ত স্থন্দর, গোঁড়ামির নাম গন্ধ নেই, ভদ্রতায় ভরপুর, নিষ্ঠা প্রচুর, অনুষ্ঠান, কার্যাবলী ও বক্তৃতার পিছনে মন রয়েছে। স্বামীজীর উপযুক্ত। দ্বিতীয় আশা মেয়েরা। এদের আশ্চর্য্য পরিবর্তন ঘটেছে। আমাদের পাড়ায় দুশ' গজের মধ্যে বারোটি জুয়েলারীর ও অগুনতি শাড়ির দোকান। দোকানের মধ্যে গৃহিণীরা গহনা দেখছেন, শাড়ি ও জর্দা কিনছেন আঁচলে চাবির গোছা বেঁধে। অসময়ে কুপথ্য খেয়ে, দুপুরে ফিল্মের ও আধুনিক গান শুনে, ঘণ্টা দু'এক নির্দমে ঘুমিয়ে, পাঁচটার শো'তে সিনেমা দেখে ফেরার পথে এঁরা দোকানে ঢোকেন ; আর অল্পবয়সী মেয়েরা গাছ কোমর বেঁধে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কিসে অনার্স, এম. এ. নেবে কথা কয়, রিসার্চ প্রোজেক্‌টের আলোচনা করে। মেয়েরা হাঁটতে শিখেছে, যা তাদের মা ঠাকুরমারা জানতেন না। তবে এখনও কোল কুঁজো। সোজা হবার জন্য ঘি দুধ চাই। তা তারা পাচ্ছে না, যা বাড়িতে আসে তা ছোট ভাইবোনেরাই খায়। একবার খেতে পেলে এরাই বাঙলা দেশকে বাঁচাবে। বাঙলার বিপ্লব আর কারুর দ্বারা সম্ভব নয়। এ কাজ পার্টিবাজির বাইরে ; একাজ মানুষের, এবং মেয়ে মানুষের, এবং নতুন মেয়েদের, যাদের কোনো আধুনিক বাঙালী সাহিত্যিক কল্পনায় ধরতে পারেনি। এরাই শক্তি। অন্ততঃ তাই মনে হল। তবে কিনা অনেক ঠকেছি—সব বুদ্ধিমান ছাত্রই ভদ্রলোক হয়ে গিয়েছে, সব বুদ্ধিমতী ছাত্রীই গৃহিণী হয়ে উঠেছে, সেইজন্য ভবিষ্যৎবাণী করতে ভয় পাই।

কবিতা

পূর্ণিমা

চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়

আবেগ আমার ছিন্ন মেঘের ভেলা
মদির ঝুলন পূর্ণিমা এই রাতে
ছড়ায় শুধুই দিগ্‌দিগন্তে খেলা
জানিনা কখন নিয়েছি তোমায় হাতে।

বাতাসে গ্রন্থি অন্ধ ফুলের বাস
বন্ধ দুয়ার কেঁপেছে শহর বুকে
ভরা পূর্ণিমা হানবে সর্বনাশ ?
আলোর বৃষ্টি তোমার আমার মুখে।

ডুবুক আলোয় শহর, শহরতলী
সিঞ্চিত হোক বাঞ্ছিত প্রিয়জন
আলোর বন্যা আনবে চাঁদের পলি
প্রেয়সী তোমার শরীরে সারাক্ষণ।

প্রেম-অপ্রেমের কবিতা

আবুল হোসেন

কাল সারা রাত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে মেয়েটি।
কে যেন বললো, প্রেমের ব্যাপার।
সে কথা বিশ্বাস হয়নি আমার।
আমি জানি এ পাড়ার ছেলেগুলো আর
দৌরাত্ম্যি করে না ওর 'পরে, উপরন্তু যুদ্ধের বাজারে
হু হু করে চড়েছে সাড়ীর দাম, তা ছাড়া বহুদিন
ফুরিয়েছে গ্রামোফোনের পীন, শিগ্‌গির
চাও নাকি মিলবে না আর, তারপর এদিকে আজ
সরকার নিয়েছে হাতে কনট্রোল।

২

মাফ ক'রবেন মিস—
আপনার জন্যেই এই উপদেশ, 'পিস্'
এখনো রয়েছে। তাড়াতাড়ি দিন
যা কিছু পারেন দিতে, ব্যাগটা হারটা সেফ্‌টিপীন,
এদিকে ওদিকে চাইবেন পরে
সাড়ীটা খুলুন শীগ্‌গির, ওরা এসে
নেবার আগেই আমাকেই দেন।
মাফ করবেন বলছি আপনার ভালোর জন্যেই,
কিছু না থাকলে হয়তো বা বেঁচেই যাবেন!

যাত্রী

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

হেমন্তের সোনালি দিন শীতের ছোঁয়ায় ধূসর হয়ে এলো। পাতায় পাতায় সোনার এতো ছড়াছড়ি, এতো প্রগল্‌ভতা বুঝি সহ্য করতে পারলো না প্রকৃতি। এলো ঝরা পাতার দিন। ঝরা পাতার আল্পনা দিতে সুরু করলো শীতের হাওয়া পথে ও বুল্‌ভারে। ঘূর্ণির বিনি সুতোয় ঝরা পাতাগুলোকে গেঁথে নিয়ে তুলে নেয় শীতের হাওয়া শূন্যে, সেখানে ঘুরপাক খাইয়ে কৌতুকভরে ছড়িয়ে দেয় তাদের চার দিকে। রিক্ত ডালগুলো আকাশের দিকে মেলে দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে নগ্ন গাছগুলো। যেন তাদের নগ্নতা দূর করবার জন্যে তারা প্রার্থনা জানাচ্ছে আকাশকে। অক্টোবর শেষ হয়ে গেলো, শীত বাড়ছে, বরফের দেখা কিন্তু তখনও নেই। ঘনিয়ে এলো নভেম্বর-বিপ্লবের দশম-বার্ষিকী উৎসবের দিন। সাতই নভেম্বর। সেদিন সকাল থেকে মস্কোর রাস্তায় রাস্তায় সে কি আগুনের স্রোত! মস্কো যেন আপনাকে ঢেলে দিয়েছে উজাড় করে সহরতলীর রাস্তাগুলোতে। সমস্ত রাস্তা দিয়ে মানুষের রঙীন ও উত্তপ্ত স্রোত অবিরাম বয়ে চলেছে রেড স্কোয়ারের দিকে। লেনিনের মাওসেলিয়ামের সামনে দিয়ে চলেছে হাজার হাজার লাল পল্টন আর ছাত্রের দল, চলেছে লক্ষ লক্ষ মজুর আর নাগরিক। কাভ্‌কাসের ঘোড়সোয়ারের দল কালো কাভ্‌কাসি পোষাক পরে ঘোড়ার সঙ্গে মিশে গিয়ে বিদ্যুৎবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে গেলো। মনে হচ্ছিল যেন এক ঝাঁক ফিঙে মাটির উপর দিয়ে উড়ে চলেছে। সারা সকাল ধরে রেড স্কোয়ারে আর রাস্তাগুলোয় উৎসব চল্‌লো। গান গাইছে হাজার হাজার লোক, মনে হচ্ছে সমস্ত সহর যেন গান গাইছে। দলে দলে লোক নাচছে বুল্‌ভারে ও রাস্তায়। সে এক আশ্চর্য ছবি আগুনের রঙে রাঙা। রেখাগুলি তার হাল্‌কা ও চিকণ নয়, রেখাগুলি প্রবল ও গভীর। কলকারখানা সব বন্ধ, সিনেমা, থিয়েটর সব খোলা। লেনিনের বিরাট ছবি চোখে পড়ে প্রত্যেকটি রাস্তায়। তখনো ষ্টালিনের গোয়েন্দা-বিভাগ 'গেপেয়ু'র হুকুমে প্রত্যেক বাড়ী থেকে ষ্টালিনের ছবি জবরদস্তি টাঙ্গানোর দিন সুরু হয় নি। ষ্টালিনকে 'আমার সূর্য, আমার তারা, আমার চাঁদ' বলে সম্বোধন করবার মতো রুচির যে জঘন্য বিকৃতি

আজ 'গেপেয়ু'র তাড়নায় দেখা দিয়েছে সোভিয়েট সমাজে, উনিশশো সাতাশ সালে তখনো সেটা ঘটে নি। ষ্টালিনের অসংস্কৃত জীবনের কালো ছায়া সোভিয়েট রাশিয়ার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে তখনো আবৃত করতে পারে নি তার কালো কলুষের নির্মম আবরণে।

সকালের সেই জন-স্রোতের মধ্যে হাজির হলেন ট্রট্স্কি। যেখানে কতবার কত উৎসবের দিন লেনিন আর ট্রট্স্কি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে জনতার প্রাণের উছল অভিবাদন নিয়েছেন এবারে সেই রেড স্কোয়ারে ট্রট্স্কির স্থান ছিলো না ষ্টালিনের আদেশে। এবারে তাই রাস্তার জনতার মধ্যে মোটরে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা স্থরু করলেন ট্রট্স্কি। লোকে উদ্‌গ্রীব হয়ে শুন্‌তে লাগলো, কিন্তু ষ্টালিনের পুলিশ এসে হাঁকিয়ে দিলো তাদের। তখন রাস্তার ধারের এক হোটেলের দোতলার গাড়ি বারান্দায় গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বক্তৃতা স্থরু করলেন ট্রট্স্কি। থাম বেয়ে গাড়ি বারান্দায় উঠে ষ্টালিনের গোয়েন্দারা ঘিরে দাঁড়ালো ট্রট্স্কিকে। এই হলো ট্রট্স্কির শেষ আবির্ভাব মস্কোর জনতার সামনে। তার কিছু দিন পরেই তাঁকে মস্কো থেকে নির্বাসিত করলো ষ্টালিন। আমি মাত্র তুবার ট্রট্স্কির বক্তৃতা শুনেছি। একবার জোফের মৃত্যুর পর মস্কোর বাইরে গোরস্থানে আর একবার ক্রেমলিনে বল্‌শেভিক পার্টির বাৎসরিক কন্‌ফারেন্সে। ষ্টালিনের নীতির বিরুদ্ধতা করেছিলেন জোফে। এই অপরাধে তাঁকে দলের সব কাজ থেকে সরিয়ে দেয় ষ্টালিন। জোফে আত্মহত্যা করেন। মৃত্যুর ঠিক আগে তিনি তুটি চিঠি রেখে যান—একটি বল্‌শেভিক দলের সেন্ট্রাল কমিটিকে আর একটি ট্রট্স্কিকে। সেন্ট্রাল কমিটিকে তিনি জানান যে দলের জীবনের বাইরে তাঁর জীবনের অস্তিত্ব নেই। ষ্টালিন যখন তাঁকে দল থেকে সরিয়েই রেখেছে তখন সত্যি করে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাই শুধু দেহ নিয়ে বেঁচে থাকতে চান না তিনি। ট্রট্স্কিকে লিখেছিলেন—আপনার নীতি ঠিক। ক্ষমা করবেন আমাকে, আমি সাহায্য করতে পারলুম না আপনাকে।

মৃত্যুর পরেও ষ্টালিনের নীচ হিংস্রতা রেহাই দেয় নি জোফেকে। মৃত্যুর পর বল্‌শেভিক নেতাদের কবর দেওয়ার রেওয়াজ ছিলো রেড স্কোয়ারে। ব্যতিক্রম ঘটলো কিন্তু জোফের বেলায়। জোফের মৃতদেহ কবর দিতে দিলো না ষ্টালিন রেড স্কোয়ারে। সহরের বাইরে গোরস্থানে নিয়ে যাওয়া হোলো জোফের মৃতদেহ। সেন্ট্রাল কমিটির দিক থেকে সেখানে হাজির ছিলেন শুধু বুখারিন। ট্রট্স্কির কথাগুলো এখনো কানে বাজছে—কমরেড জোফে, বিপ্লবের

জন্যে তুমি যা করছো তা আমরা ভুলবো না কখনো। যে নীচতা মৃত্যুর পরেও তোমাকে অনুসরণ করছে তার ক্রূরতা নিয়ে তাকে আমরা কখনো ক্ষমা করবো না। কমরেড জোফে, আমরা শপথ করছি যে তোমাকে আমরা ফিরিয়ে নিয়ে যাবো রেড স্কোয়ারে লেনিনের পাশে তোমার যোগ্য বিশ্রাম-স্থানে। ট্রট্স্কির সেই প্রতিশ্রুতি পালন করবার ভার আজ বিশ্বের জনসাধারণের। আর সেখানে লেনিনের পাশে ট্রট্স্কিরও চির-বিশ্রামভূমি রচনা করবার ভার তাদেরই।

ক্রেমলিনে বল্‌শেভিক দলের পঞ্চদশ-বার্ষিক কন্‌ফারেন্স। সে অভিজ্ঞতাও ভোলবার নয়। ক্রেমলিনের প্রকাণ্ড হলে লোক ধরে না। ঘরের হাওয়া তেতে উঠেছে উত্তেজনায়। সভা-মঞ্চে ষ্টালিন, বুখারিন, ভরসিলভ্ প্রভৃতি দলের নেতারা। কূটচালের খলিফা ষ্টালিন তখন বুখারিনকে দিয়ে ট্রট্স্কিকে আঘাত হানছে। তার নিজের যুক্তি দিয়ে ট্রট্স্কির যুক্তি খণ্ডন করবে এমন মগজের দাবী ষ্টালিন নিজেও করে নি তখন। যদি করতো তো সে দিন সমস্ত রাশিয়া জুড়ে কৌতুক-হাস্যের তুফান যেতো বয়ে। আজ অবিশ্যি অন্য কথা! ট্রট্স্কি, জিনোভিয়েভ্, কামেনেভ্ ও রাডেক এলেন সেই কন্‌ফারেন্স-সভায়। সভামঞ্চের উপরে না বসে বসলেন তাঁরা সভা-মঞ্চের সিঁড়িতে। বক্তৃতা দিতে উঠলেন ভরসিলভ্। 'রিবিয়াতা' বলে সকলকে সম্বোধন করলেন তিনি। 'রিবিয়াতা' শব্দটির মানে হচ্ছে 'ছেলের দল' আর ব্যবহার করা হয় সৈন্যদের সম্বোধন করতে। ট্রট্স্কি গর্জে উঠলেন—রিবিয়াতা নয়, তোয়ারিশ। (তোয়ারিশ রুশীয় শব্দ, মানে কমরেড।) এটা পল্টনের ব্যারাক নয়। ভরসিলভ্ ক্ষেপে উঠে বললেন—তোয়ারিশ নয়, রিবিয়াতা। এই নিয়েই কথা কাটাকাটি চল্‌লো কিছুক্ষণ। ভরসিলভের বক্তৃতা শেষ হলো। এবারে ট্রট্স্কি বল্‌তে চাইলেন, বল্‌লেন তাঁর দু ঘণ্টা সময় চাই। মঞ্চের উপর থেকে উত্তর এলো তাঁকে পনেরো মিনিট সময় দেওয়া হবে। কাগজপত্তর গুটিয়ে ট্রট্স্কি উঠে পড়লেন সভা থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে। সভা থেকে চীৎকার উঠ্‌লো—ট্রট্স্কিকে বল্‌তে দেওয়া হোক্, তাঁকে সময় দেওয়া হোক। ষ্টালিন মুখে পাইপ, ঘুরছে মঞ্চে, একবার বুখারিন, একবার ভরসিলভ্, একবার মলতভ্, এদের কাছে গিয়ে মন্ত্রণা চালাচ্ছে চাপা গলায়। শেষে ঠিক হোলো এক ঘণ্টা সময় দেওয়া হবে ট্রট্স্কিকে। সভা-মঞ্চে উঠে বক্তৃতা দেবার জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন ট্রট্স্কি। কমিন্টার্নে খাজাঞ্চিগিরি করতো এক জার্মান ষ্টালিনপন্থী, হঠাৎ এগিয়ে এসে ট্রট্স্কিকে ধাক্কা দিয়ে সে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো।

তীব্র অবজ্ঞার সঙ্গে তার দিকে একবার তাকিয়ে ট্রট্স্কি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। ভরসিলভ্ একটি কাঁচের গেলাস ছুঁড়ে মারলেন ট্রট্স্কির পায়ের কাছে। কাঁচ ছড়িয়ে গেলো চারদিকে, ট্রট্স্কি ফিরেও তাকালেন না। সে কি বক্তৃতা! এমন বলাও সম্ভব হতে পারে মানুষের পক্ষে! ইতিহাস এলো ঘটনার মর্ম বোঝাতে, ঘটনা সাজানো হোলো ইতিহাসের গতি বোঝাবার জন্যে। নীতি এলো ঘটনা-বিশ্লেষণের সাহায্যে, ঘটনাগুলো প্রমাণ করলো নীতির যথার্থতা। সে এক আশ্চর্য বুনুনি ভাবের চিন্তার ও ভাষার। যেমন কণ্ঠস্বর, তেমনি জোরালো ভঙ্গি, তেম্নি ভাষার ইন্দ্রজাল রচনা। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো কথাগুলো বিরামহীন ভাবে আছড়ে পড়তে লাগলো শ্রোতাদের বুকে। তার নিজের লোক দিয়ে সভা ভরে রেখেছিলো ষ্টালিন, তবু সেই বক্র ও বিষাক্ত উপদলীয় বিরুদ্ধতা নির্বাক হয়ে শুনছিলো ট্রট্স্কির বক্তৃতা। 'একদেশে সোশালিজম্ সম্ভব' ষ্টালিনের এই আষাঢ়ে মতবাদকে ধূলোয় মিশিয়ে দিলেন ট্রট্স্কি। চীনের বিপ্লবে ষ্টালিনের হঠাৎ বাঁয়ে হঠাৎ ডাইনে যাওয়ার সুবিধেবাদী নীতিকে, দলের মধ্যে আলোচনার সমস্ত সুযোগ ও অধিকার নষ্ট করবার ষ্টালিনের ফ্যাসিষ্ট চক্রান্তকে, কমিন্টার্নকে বল্শেভিক পার্টির ও সোভিয়েট রাষ্ট্রের খেল্না বানানোর বদ মতলবকে আঘাতের পর আঘাত হানলেন ট্রট্স্কি। ষ্টালিন ও ষ্টালিনবাদকে তীব্র কশাঘাত হেনে ট্রট্স্কি বললেন—ষ্টালিন ও ষ্টালিনবাদ বিপ্লবের অরুণ আলোকে নিবিয়ে দিয়েছে। তার জায়গায় এনেছে বিপ্লবের গোধূলি। কিন্তু ওস্তাদ চক্রীর নিজের হাতে সাজানো সভায় যুক্তির স্থান কোথায়? সেই কন্ফারেন্সেই ট্রট্স্কিকে বের করে দেওয়া হোলো বল্শেভিক পার্টি থেকে।

সন্ধ্যে ঘনিয়ে এলো। ক্রেমলিনের গম্বুজের চূড়োয় যে বিরাট লাল নিশান উড়ছিলো সারাদিন, সন্ধ্যের বিজলী আলোর রশ্মিতে মনে হচ্ছিলো যে সেই লাল নিশান যেন এই পৃথিবীর রাঙা বিদ্রোহ বনেদী আকাশের নীল আভিজাত্যকে আঘাত করবার জন্যে হাত বাড়িয়েছে। ক্রেমলিনের ঘড়িতে বাজছিলো ইন্টারন্যাশনাল্ গানের সুর ঘণ্টায় ঘণ্টায়। সকালের উৎসবের পর উৎসব-ক্লান্ত জনতা ঘরে ফিরে গিয়েছিলো। রাস্তাগুলো খালি হয়ে গিয়েছিলো দুপুর থেকে। বিকেলের পর থেকে রাস্তাগুলো আবার ভরে উঠলো কানায় কানায়। রাত্তিরে আমাদের আমন্ত্রণ ছিলো ক্রেমলিনের উৎসবে। মাদাম লোহানী, লোহানী, নলিনী গুপ্ত আর আমি চল্লুম ক্রেমলিনের উৎসবে। সবে মাত্র পথে বের হয়েছি হঠাৎ সুরু হোলো বরফ পড়া। বুদ্বুদের মতো হাল্কা

শাদা বরফের টুক্‌রোগুলো নেমে এলো আকাশ থেকে। মনে হচ্ছিলো যেন পাগলা হাওয়ার ঝাঁকানিতে আকাশের উপবন থেকে লক্ষ লক্ষ শাদা ফুল ঝরে পড়ছে পৃথিবীতে। বরফে-ধোওয়া বাতাসেও যেন দূর আকাশের গন্ধ। আমার ইচ্ছে হচ্ছিলো এই বরফের ফুল-ঝরা রাতে ঘুরে বেড়াই পথে পথে বুল্‌ভারে বুল্‌ভারে। রেড স্কোয়ারের ধারের প্রকাণ্ড ফটক দিয়ে ঢুকলুম আমরা ক্রেমলিনে। প্রাসাদের যে অংশে রাশিয়ার শেষ রাজা নিকোলাসের তিন মেয়ে বাস করতো সেখানে উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিলো। আঁকা-বাঁকা সরু সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলুম। এটা ক্রেমলিনের পুরনো মহল, তৈরী করা হয়েছিলো অনেক শতাব্দী আগে। এখানে এশিয়ার হাতের ছাপ সুস্পষ্ট—নীচু ছাদের ঘর, নীচু দরজা, দেয়ালে ফুল-লতা-পাতার বিচিত্র নক্‌সা। এই মহলের অগুন্‌তি ঘরের কোনো ঘরে চলেছে গান, কোথাও চলেছে কভ্‌কাসের নাচ, কোথাও বা জর্জিয়ার নাচ। দু' তিনটি ঘরে অঢেল খাবার সাজানো রয়েছে লম্বা টেবিলগুলোতে—ক্যাভিয়ার, নানা রকমের মাছ ও মাংস আর নানা রকমের ফল। তা'ছাড়া মদের আয়োজন ছিলো বাদশাহী ধরণের—আঙুর আর আপেল-চোঁয়ানো কভ্‌কাসের মদ, ক্রাইমিয়ার মদ, ভদ্‌কা, তা'ছাড়া আরো হরেক রকমের মদ। লোহানীর তর সইছিলো না। ছিপি খোলাবার সময়টুকুও সে নষ্ট করতে রাজী নয়। ভদ্‌কার বোতল নিয়ে টেবিলের কোণে ঠুকে বোতলের মাথাটি উড়িয়ে দিয়ে ঢেলে দিলো বেশ কিছুটা ভদ্‌কা গলার গহ্বরে। রুশীয়দেরও তাক লাগিয়ে দিলো লোহানী তার ভদ্‌কা খাবার কেরামতিতে। কত লোক যে ছিলো সে দিন রাত্তিরে ক্রেমলিনের এই উৎসবে! বারবুস্‌কে দেখলুম একটি কোণে বসে আছেন। শকলৎওয়ালা ঘোরাফেরা করছিলেন। দুটি মেয়ে এসে টেনে নিয়ে গেলো তাঁকে তাঁদের দলের মধ্যে, তাঁর হাত ধরে নাচতে সুরু করে দিলো। বুড়ো শকলৎওয়ালার নাচ দেখে ঘর শুদ্ধু লোকের কি হাসি! কিছুক্ষণ এ ঘর ও ঘর করে আমিও বসলুম গিয়ে একটি কোণে। মনটা আমার পার হোয়ে গেলো বর্তমানের সীমানা, ঘোরাফেরা করতে লাগলো ক্রেমলিনের অতীত ইতিহাসে। আইভান আর ক্যাথারিনের কথা না হয় বাদই দিলুম, মাত্র দশ বছর আগে রাজপ্রাসাদের এই সব ঘরেই তো ধনীদের বিলাস-লীলা ছিলো। রাসপুটিনের পঙ্কিল শয়তানির সাক্ষী তো এই সব ঘরগুলিই। শতাব্দীর পর শতাব্দী এই ক্রেমলিনের ভিতর দিয়ে বয়ে গেছে রাশিয়ার ইতিহাসের ধারা। আমার মনে হচ্ছিলো যে সে অতীত যেন কৌতুক ভরে তাকিয়ে আছে আমাদের

দিকে। আমাদের অসহিষ্ণুতা ও অধীরতা দেখে সে অতীত যেন মুখ টিপে দুষ্টু হাসি হাসছে। সে যে অনেক দেখেছে। অজানাদের ভিড়ে নিজের স্বপ্ন নিয়ে একলা থাকা চলে, জানাদের ভিড়ে সে সুযোগ কোথায়? স্বপ্ন ভাঙতে এই ধরণের চেনা অচেনাদের জুড়ি নেই। আমার কোণটি আর নিরালা রইলো না এদের ভিড়ে। তা'ছাড়া ভদ্‌কার তরল উত্তাপে লোহানীর লোহার প্রাণ বিগলিত হয়ে যে রকম উছল হোলো আমার উপর যে সেটা প্রায় দুঃসাধ্য হোলো সহ্য করা। মাদাম লোহানী ছিলেন বড়ো লক্ষ্মী মেয়ে। লোহানীর অত্যাচার থেকে আমাকে বাঁচাবার জন্যে তাঁর সলজ্জ প্রয়াসের অন্ত ছিলো না। যে বায়ুমণ্ডল আমার চারদিকে রচনা করে বসেছিলুম সেই কোণটিতে, লোহানী ছাড়াও আরো অনেকে নিরর্থক পোষাকী কথার ঢিল মেরে বিক্ষিপ্ত করে দিলো সেই বায়ু-মণ্ডলকে।

রাত তখন ভোরের দিকে ঢলে পড়েছে যখন ক্রেমলিন থেকে বের হোয়ে এলুম রেড স্কোয়ারে। দেখলুম সহরের চেহারা যেন একেবারে বদলে গেছে। ক্রেমলিনে যাবার জন্যে সন্ধ্যেবেলা যখন পথে বের হয়েছিলুম তখন আকাশের রঙ ছিলো রক্তিম ধূসর, পথগুলো ছিলো পাথুরে রঙের, গাছগুলোর ছিলো পাতাহীন শুক্‌নো কালো মূর্তি। কয়েক ঘণ্টায় একি ঐন্দ্রজালিক পরিবর্তন! পথ, গাছ, বাড়ীর ছাদ, কার্ণিশ মোমের মতো শাদা বরফের পুরু আবরণে ঢাকা। যেন এক যাদুকর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এক মোমের সহর তৈরী করেছে। আকাশের ঝোড়ো চেহারাও দেখি একেবারে বদল হয়ে গেছে। আকাশ পরেছে তারার সল্‌মা চুম্‌কি-বসানো ঘন নীল উত্তরীয়। সঙ্গীরা চলে গেলেন যে যার ঘরে। বুল্‌ভার দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে আমি চলে গেলুম নদীর ধারে। সেই শীতের রাতের শেষ প্রহরে জনহীন নদীর ধারে আমিই ছিলুম একমাত্র পথিক। সমস্ত শহর তখন বরফের শুভ্র আচ্ছাদনের তলায় ঘুমিয়ে ছিলো। শুধু পথের ধারের কাঠের ঘর থেকে প্রহরীরা মাঝে মাঝে মাথা বের করে দেখছিলো কে এক পাগল ঘুরে বেড়াচ্ছে পথে পথে এই শীতের রাতে।

পরদিন বিকেলে এশিয়ার ও এফ্রিকার জনসাধারণের প্রতিনিধিদের এক সভা ডাকা হয়েছিলো। সেই সভায় সভানেত্রী ছিলেন মাদাম সুনিয়াৎ সেন। ভারতবর্ষের তরফ থেকে মানবেন্দ্রনাথ রায় আর আমি বক্তৃতা দিই সেই সভায়। বক্তৃতা দিতে উঠে হঠাৎ নজরে পড়লো ঘরের এক কোণে বসে আছেন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু আর জওহরলাল নেহরু। তাঁরা যে মস্কোয় আসছেন সে খবর

আমার জানা ছিলো। কমিন্টার্নের দপ্তরে বুখারিন এঁদের আসবার খবর আমাকে জানিয়েছিলেন। তিনি আমাকে অনুরোধও করেছিলেন যে এঁদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে আমি যেন ষ্টেশনে যাই। আমার মনে তীব্র বিরূপতা ছিলো পণ্ডিত মতিলাল সম্বন্ধে। তালুকদারদের দোস্ত পণ্ডিত মতিলাল সংযুক্ত প্রদেশের কিষাণ-আন্দোলনকে যে কি ভাবে খতম্ করে দেন তা' আমার জানা ছিলো। এ্যাসেম্ব্লীতে বন্ধ্যা বক্তৃতা দেওয়া আর কলওয়ালা-জমিদারদের সুবিধের জন্যে আইনের কিছু হেরফের করা ছাড়া অন্য কিছু করার তাগদ এই ধরণের নেতাদের আদবেই ছিলো না! পণ্ডিত মতিলালকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে ষ্টেশনে যেতে আমি সোজাসুজি অস্বীকার করলুম। বুখারিন আমার কথা শুনে হাসলেন, রেহাই কিন্তু দিলেন তিনি আমাকে এই ব্যাপারে। সেই সভায় আমার বক্তৃতায় কংগ্রেসের নেতাদের আর বিশেষ করে পণ্ডিত মতিলালের তীব্র সমালোচনা করলুম। বক্তৃতার শেষে যখন হাত তালির পালা এলো তখন দেখলুম পণ্ডিত মতিলালও হাততালি দিচ্ছেন। সভার শেষে মাদাম সুনিয়াৎ সেনের সঙ্গে আলাপ করছি, হঠাৎ মনে হলো পিছন থেকে কে যেন হাত দিলো আমার কাঁধে। ফিরে দেখি পণ্ডিত মতিলাল। হাত বাড়িয়ে আমার হাত ধরে বললেন—নিজেকে বাঁচিয়ে চলো। আমার সঙ্গে দেখা কোরো। দু'চারটি কথার পর তিনি চলে গেলেন। দু'দিন পরে মানবেন্দ্রনাথ রায়কে আর আমাকে নিয়ে বুখারিন পণ্ডিত মতিলালের সঙ্গে দেখা করতে যান। আমি বাধা দিয়েছিলুম কিন্তু শুনলেন না বুখারিন। আমাকে আর মানবেন্দ্রনাথ রায়কে নিয়ে চললেন পণ্ডিত মতিলালের হোটেলে। পণ্ডিত মতিলাল সেই দিনই মস্কো ছাড়বেন। ঘরে গিয়ে তাঁকে খবর দিলুম যে বুখারিন দেখা করতে এসেছেন। পণ্ডিত মতিলাল বললেন—বুখারিন কে? অবাক হয়ে গেলুম। এই কুঁয়োর ব্যাঙরা চালাবেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার লড়াই? বুখারিনের নাম পর্যন্ত শোনেন নি! বুখারিনের পরিচয় জানিয়ে বললুম—তিনি পোলিটব্যুরোর সদস্য, কমিনটার্নের অধিনায়ক। পণ্ডিত মতিলাল বললেন—খুব অল্প সময়ের জন্যে দেখা করতে পারি কেন না আমাকে ট্রেন ধর্‌তে হবে। ভিতরটা আমার রাগে জ্বলে যাচ্ছিলো। বললুম—বুখারিনও বেশী সময় দিতে পারবেন না। তাঁর অনেক কাজ। আপনি চলে যাচ্ছেন বলে তিনি দেখা করতে এসেছেন। বুখারিন অপেক্ষা করছিলেন বাইরে। তাঁকে ডেকে আনলুম ঘরে। পণ্ডিত মতিলালের দাম্ভিকতার কথা শুনেছিলুম, এবারে তার পরিচয় পেলুম। মতিলাল

যে তাঁর নামও শোনেন নি আর তাঁর সঙ্গে দেখা করতেই রাজী ছিলেন না সে কথা পরে একদিন বলেছিলুম বুখারিনকে। তিনি খুব হেসেছিলেন।

সে দিনই সন্ধ্যেবেলা ট্রেড ইউনিয়ন হলে বিরাট সভার আয়োজন ছিলো। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে নামজাদা সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, চিত্রকর, রাজনীতিজ্ঞ মস্কোতে এসেছিলেন নভেম্বর-বিপ্লবের এই দশম-বার্ষিকী উৎসবে যোগদান করবার জন্যে। এতো দিনে মানুষের সমাজ বোধ হয় মোড় ঘুরে একটা বিরাট সম্ভাবনার সূচনা করলো এই আশা অরণির মতো সে দিন আলো জ্বালিয়েছিল প্রত্যেক দেশের মানুষের মনে। লোভ-লুণ্ঠন-হিংসার যে ঘূর্ণাবর্তে পড়ে মানুষ এগোতে পারছিলো না এতো দিন, সেই ঘূর্ণাবর্ত থেকে মানুষকে বের করেছিলো নভেম্বর-বিপ্লব। ভবিষ্যতের সেই সম্ভাবনাকে প্রাণের অকুণ্ঠিত ভালোবাসা জানাবার জন্যে প্রত্যেক দেশ থেকে মানুষেরা এসেছিলেন মস্কোতে। কি আশা, কি আলোকেই না নিবিয়ে দিলো ষ্টালিনের সর্বনাশী অমানিশা! আমরা চেয়েছিলুম যে সেই উৎসবে ভারতবর্ষের তরফ থেকে জওহরলাল অভিনন্দন জানান নভেম্বর-বিপ্লবকে। জওহরলাল প্রথমে রাজিও হয়েছিলেন কিন্তু বাধা দিলেন মোতিলাল। তিনি কিছুতেই জওহরলালকে বলতে দিলেন না সেই সভায়। ভারতবর্ষের হয়ে বল্‌লেন শকলৎওয়ালা আর হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। অপূর্ব বলেছিলেন শকলৎওয়ালা। হরীন্দ্রনাথ বলেই চল্‌লেন, লোকে অস্থির তাঁর বক্তৃতায়। বারবার ঘন্টা বাজলো তাঁর অসংলগ্ন ভাবুকতা থামাবার জন্যে। তিনি ভ্রূক্ষেপই করলেন না, বেপরোয়া বলে চল্‌লেন। শেষে অনেক কষ্টে থামানো হলো তাঁকে। সেই মিটিংয়ে বললেন বারবুস্‌, বল্‌লেন আরো অনেক সাহিত্যিক। থিওডোর ড্রাইজার আর লুনাচারস্কি এঁরাও বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেই সন্ধ্যের উৎসব-সভায়। সেই অগুন্‌তি বক্তৃতার সমতল ভূমির উপর পাহাড়ের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলো বারবুসের বক্তৃতা। যা বল্‌তে চায় বক্তা সে সম্বন্ধে গভীর আন্তরিকতা, অসংশয় বিশ্বাস, স্বচ্ছ ধারণা ও প্রবল আবেগ—প্রাণের এই অলখ চার সুতোর বুনুনি হচ্ছে প্রত্যেকটি সফল বক্তৃতা। বক্তার বক্তৃতায় এরাই যোগায় রঙ, মাধুর্য ও গভীরতা। প্রচণ্ড মনন ও দহন-ক্রিয়ার ফল যে কথা শুধু সেই সার্থক কথাই মানুষের মনের দখল নিতে পারে। কথার ছাই-ওড়ানো ডজন খানেক নিরর্থক বক্তৃতার পর প্রাণের আগুনের ফুল্‌কি-ছড়ানো বারবুসের বক্তৃতা যে কি ভালো লেগেছিলো তা' বলবার নয়। বেশীর ভাগ বক্তৃতা আমাদের বন্দী করে সাজানো কথার কারাগারে।

আমার জীবনে খুব কমই এমন বক্তৃতা শুনেছি যা বর্তমানের বন্ধন থেকে আমাকে মুক্তি দিয়েছে, যে বক্তৃতা শুনে মনে হয়েছে যে দিগন্তের শেষে যেখানে ভবিষ্যতের তরঙ্গ দুলে দুলে উঠ্ছে, বর্তমানের এই ছোটো নদী থেকে ভবিষ্যতের সেই উদ্বেল জ্যোতির্ময় তরঙ্গ-স্রোতে পৌঁছে দিয়েছে প্রাণ-সত্বা বাণী আমার মানস-তরীকে। আমাকে সেই অনুভূতির মুক্তি দিয়েছিলেন বারবুস্, তাই তাঁর সেই বক্তৃতা থেকে গেছে মনের মধ্যে।

আরো দু'তিন দিন ধরে উৎসবের জের চল্‌লো। তারপরে সুরু হোলো আবার সেই বাঁধা-গৎএর জীবন। এই উৎসবের আসরে যে কতো লোকের সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ পেয়েছিলুম তা বলা যায় না। প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ প্রফেসর স্কট নিয়ারিং, প্রফেসর হ্যারি ডেনা, ক্লারা জেট্‌কিন, আর্থার হোলিচার, ইন্‌টারন্যাশানল সঙ্গীতের রচয়িতা প্রভৃতি অনেকের সঙ্গে আলাপ হোলো। স্কট নিয়ারিং, হ্যারি ডেনা আর আমি এক হোটেলেই থাকতুম, তাই প্রায় রোজই আমাদের দেখা হোতো। কবি লংগ্‌ফেলোর নাতি ডেনা ছিলেন গল্পের রাজা, সত্যিকারের মজলিশি লোক। প্রায় রাত্তিরে আমাদের আড্ডা জমতো, নয় তাঁর ঘরে, নয় আমার ঘরে। এমন দিন কিন্তু ছিলো না যে দিন মজলিশে তর্কের ঝড় না উঠ্‌তো আমাদের দুজনের মধ্যে। যা কিছু দেখছিলেন আর যা কিছু শুনছিলেন তার কাছে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করেছিলেন বৃদ্ধ হ্যারি ডেনা। সোভিয়েট রাশিয়াকে তিনি দেখছিলেন শিল্পীর দৃষ্টি দিয়ে আর সেই রসের দৃষ্টিতে ভালো-মন্দর সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক বিচারের স্থানই ছিলো না। আমার সংশয় ও সমালোচনা ক্ষেপিয়ে তুল্‌লো ডেনাকে। আমার সমালোচনাকে তিনি 'বুদ্ধির ঢঙ' বলে উপহাস করতেন। জবাবে আমি বলতুম—নির্বুদ্ধিতা যে বুদ্ধির ঢঙের চেয়ে কোনো অংশে সেরা তার প্রমাণ কেউ কি কখনো পেয়েছে? স্কট নিয়ারিং প্রায়ই থাকতেন আমাদের মজলিশে। সোভিয়েট শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে তাঁর লেখা বই যথেষ্ট সমাদর পেয়েছিলো সেই সময়। নিয়ারিং ছিলেন ডেনার ঠিক উল্টো। ডেনার উচ্ছ্বাস ছিলো, গভীরতা ছিলো না। তাঁর মনটা ছিলো শিল্পীর মন তাই কথায় যা সমর্থন করতেন কাজে তার সমর্থনের প্রয়োজন বোধ করতেন না। প্রফেসর নিয়ারিংয়ের চরিত্র ছিলো যেমন গভীর তেমন সত্যনিষ্ঠ। কঠোর পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করতেন তিনি। উচ্ছ্বাসের কাদার চিহ্ন আদবেই ছিলো না তাঁর মুখে, ছিলো সংযমের কঠোরতার চিহ্ন আর নিষ্ঠার অপ্রগল্‌ভ আলো। তিনি স্বল্পভাষী ছিলেন কিন্তু তাঁর প্রত্যেকটি কথায় ছিলো জাগ্রত মনের পরিচয়।

মস্কোতে পৌঁছবার অল্প দিন পরেই টিভেলের ঘরে আমার দেখা হয় হেলেনা ষ্টাস্‌সোভার সঙ্গে। হেলেনা ষ্টাস্‌সোভা ছিলেন প্রথম যুগের বল্‌শেভিকদের একজন। বিপ্লবের পরে ক্ষুদ কুড়োবার জন্যে যে সব পঙ্গপাল জড়ো হয়েছিলো বল্‌শেভিক পার্টিতে, তিনি সেই মত্‌লবী দলের লোক ছিলেন না। তিনি যে শুধু বল্‌শেভিক দলের সেণ্ট্রাল কমিটির সভ্যা ছিলেন তা নয়, বহু দিন তিনি সেণ্ট্রাল কমিটির সেক্রেটারীও ছিলেন। ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে বল্‌শেভিক পার্টির সেণ্ট্রাল কমিটি দলের কর্মী-সম্মেলন ডাকে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কন্‌ফারেন্সে সেণ্ট্রাল কমিটির প্রতিনিধি হিসেবে যে পাঁচ জন যোগদান করেছিলেন তার মধ্যে ছিলেন হেলেনা ষ্টাস্‌সোভা। আমি যখন তাঁর দেখা পাই তখন তিনি বৃদ্ধা, মাথায় শাদা চুল পুরুষালি ঢঙে ছোটো করে কাটা আর আঁচড়ানো, চোখে তাঁর পাঁশনে। বুদ্ধি আর কর্ম-শক্তি তাঁর মুখের প্রতিটি রেখায় আঁকা। 'মোপর্' বলে যে প্রতিষ্ঠানটি গড়া হয়েছিলো পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের দুস্থ বিপ্লবীদের সাহায্য করবার জন্যে ষ্টাস্‌সোভা ছিলেন সেই প্রতিষ্ঠানের কাণ্ডারী। মোপরের আন্তর্জাতিক কন্‌ফারেন্সে ব্রিটিশ শাসনে ভারতবর্ষের কারা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে ও রাজনৈতিক কর্মীদের উপর অত্যাচার সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার জন্যে আমাকে অনুরোধ করলেন ষ্টাস্‌সোভা। ষ্টাস্‌সোভার সঙ্গে দেখা হবার কয়েকদিন পরে নলিনী গুপ্ত মস্কোতে এসে হাজির। নলিনী ছিলেন প্রথম কমিউনিষ্ট ষড়যন্ত্র মামলার রাজবন্দীদের একজন। তিনি যখন মস্কোয় হাজির তখন এই আন্তর্জাতিক কন্‌ফারেন্সে তাঁরই বলা উচিত এই মনে করে এই কন্‌ফারেন্সের বক্তা হিসেবে আমি প্রস্তাব করলুম নলিনীর নাম। ষ্টাস্‌সোভা তখুনি রাজী হলেন। হোটেলে ফিরে এসে নলিনীকে যখন জানালুম যে মোপরের কন্‌ফারেন্সে তাকে বক্তৃতা দিতে হবে তখন আমার প্রাণ বাঁচানো দায় হোলো। জীবনে কখনো বক্তৃতা দেয় নি নলিনী, তা' ছাড়া তার স্নায়ুগুলি তার বশে ছিলোনা আদবেই। একটু উত্তেজিত হলেই তার চোখদুটি জোনাকির মতো দপ্‌দপ্ করে খুল্‌তো আর বুজতো আর সঙ্গে সঙ্গে নাসিকা থেকে যে ধ্বনি নির্গত হতো তাকে ঠিক শ্রুতিমধুর বলা যায় না। আমার কথা শুনে বিছানায় শুয়ে পড়ে চোখের আর নাকের যে আশ্চর্য ম্যাজিক দেখাতে সুরু করলো নলিনী তাতে বুঝলুম যে তার অবস্থা সত্যিই ঘায়েল। তাকে জব্দ করবার জন্যে যে আমি ষ্টাস্‌সোভার সঙ্গে এই বন্দোবস্ত করে আসি নি এইটে বুঝতে আমারই স্নায়ুর বিকার সুরু হবার দাখিল। নলিনীকে অনেক করে বুঝিয়ে শান্ত করলুম। শেষ

পর্যন্ত রফা হোলো এই যে কন্‌ফারেন্সে সে বল্‌বে বাঙলায় আর তার দোভাষী হিসেবে আমি শুধু তর্জমা করবো না, আসল বক্তৃতাটাই দেবো। কন্‌ফারেন্সের দিন সন্ধ্যাবেলা নলিনী আর আমি যথাসময়ে হাজির হলুম কন্‌ফারেন্সের হলে। জার্মান, ইংরেজ ফরাসী, চীনে, জাপানী, কোরীয়—কতো দেশের বিপ্লব-আন্দোলনের কতো প্রতিনিধি সেখানে হাজির। আঠারোশো একাত্তর খৃষ্টাব্দের প্যারিস কম্যুনের এক কম্যুনার্ডও এসেছিলেন এই সভায়। শ্রমিক-বিপ্লবের সেই প্রথম সূচনা প্যারিস কম্যুনের সময় থেকে কতো আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে শ্রমিক-বিপ্লবকে চলে আস্‌তে হয়েছে! উনিশ শো সাতাশ সালের এই কন্‌ফারেন্সে সেই ছাপ্পান্ন বছরের এগোনো-পেছনোর হার-জিতের ইতিহাস যেন জীবন্ত হয়ে উঠ্‌লো। ছু'চারটি বক্তার পর ভারতবর্ষের প্রতিনিধি নলিনী গুপ্তের ডাক পড়লো। নলিনীর দোভাষী হিসেবে আমিও গিয়ে হাজির হলুম বক্তৃতা-মঞ্চে। নলিনী বক্তৃতা সুরু করলো বাঙলায়। বক্তৃতার ছু'চারটি কথা শুনে আমার মনে হতে লাগলো যে হাসিতে আমি ফেটে পড়বো বোমার মতো। নলিনী যা বললে তার মর্ম হচ্ছে এই—এই যে শয়তান আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, আমাকে জব্দ করবার জন্যে সে আমার নাম দিয়েছে বক্তা হিসেবে। তোমরাও সব যেমন বোকা, এই শয়তানের ফাঁদে পড়েছো। বুঝ্‌ছো কিছু আমি কি বল্‌ছি? ছাই বুঝ্‌ছো, বোকার মতো তো ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে আছো আমার দিকে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই রকম বক্তৃতা নলিনী দিয়ে চল্‌লো মিনিট দশেক। তার পাশে দাঁড়িয়ে সেই সন্ধ্যেবেলা আমার আত্ম-সংযমের অগ্নি-পরীক্ষা হয়ে গেলো। তার বক্তৃতা থামলে আমি প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে ব্রিটিশ শাসনে ভারতবর্ষে জেলগুলির অবস্থা আর রাজনৈতিক কর্মীদের উপর যে কি অত্যাচার করে ব্রিটিশ শাসন সে সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলুম। পরদিন সকালে আমার বক্তৃতা নলিনীর বক্তৃতা হিসেবে 'প্রাভ্‌দা'তে ছাপা হোলো! যারা জানে না তারাই শুধু বলে যে রাজনৈতিক আন্দোলন শুষ্ক, নীরস। হাস্যরসের যে কি অফুরন্ত উপাদান রাজনৈতিক আন্দোলন নিয়ত যোগায় তার কোনো খবর যদি তারা রাখতো! অবিশ্যি শুধু উপাদানই যথেষ্ট নয়, যে দেখে সে কোন চোখ দিয়ে দেখে—অতি-গম্ভীর পেচক-দৃষ্টি দিয়ে না রস-দৃষ্টি দিয়ে—তার উপরেই সবটা নির্ভর করে। ষ্টাস্‌সোভার অনুরোধে "ভারতে ব্রিটিশ ত্রাস-ব্যবস্থা" নামক একটি পুস্তিকা আমি লিখেছিলুম এই সময়ে। পুস্তিকাটি প্রথমে রুশীয় ভাষায় ছাপা হয়, পরে ইউরোপে আরো ছু'চারটি ভাষায় অনূদিত হয়ে বের হয়। সোভিয়েট রাশিয়ায় যতো

দিন ছিলুম ততো দিন আমার যোগাযোগ ছিলো হেলেনা ষ্টাস্‌সোভার সঙ্গে। ভারতবর্ষের দুস্থ বিপ্লবীদের সাহায্য করবার জন্যে সব রকম সাহায্যের বন্দোবস্ত আমি করেছিলুম তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে। সে সব বন্দোবস্ত মানবেন্দ্রনাথ রায়ের কূট কারসাজির কল্যাণে ব্যর্থ হয়।

মস্কো থেকে আমাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করে দেবার জন্যে মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রথম থেকেই উঠে পড়ে লেগে গিয়েছিলেন। অবিশ্যি যুক্তি দেখাচ্ছিলেন যে কাজের জন্যে আমার তখনি দেশে ফিরে যাওয়া দরকার। আমি মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিলুম যে নিজেকে ভালো করে তৈরী না করে দেশে ফিরবো না। আমার মনে দৃঢ় প্রত্যয় ছিলো যে তৈরী হয়ে গেলেই কাজ হবে, নইলে ষ্টালিনের চেলাদের মতো হুকুমনামার জোরে কাজ করতে গেলে বৈপ্লবিক আন্দোলনের সর্বনাশই করা হবে। আমার মনের কথা আমি সোজাসুজি জানিয়ে দিয়েছিলুম রায়কে। রায় চুপ করে শুনলেন বটে আমার কথা কিন্তু চুপ করে রইলেন না। আমাকে মস্কো থেকে সরাবার জন্যে তাঁর চেষ্টা চল্‌তে থাকলো আগের মতই। টিভেল্‌, ফ্রায়ার, রাথবোন, লোহানী এরা প্রত্যেকে বিষম উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লো ভারতবর্ষের বিপ্লবের জন্যে। বিপ্লবের জন্যে আমার তখুনি দেশে ফিরে যাওয়া যে কতো দরকারী সেটা এরা আমাকে বোঝাতে সুরু করলে সবাই মিলে। চুপ করে শুনে, কোনো জবাব না দিয়ে আমি এই মতলব্‌বাজদের বাজিমাৎ করলুম। যে চুপ করে থাকে অথচ নিজের সংকল্পের অটল ভূমি থেকে সরে যায় না তাকে আটকাবার চেষ্টা হাওয়ায় গেরো দেবার চেষ্টার মতোই একেবারে নিষ্ফল। বুখারিনের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সব কথা জানিয়েছিলুম। তিনি আমার কথায় পূরো সায় দিলেন। চারদিকের বিষাক্ত বিরুদ্ধতার মধ্যে তাঁর সমর্থন ও উৎসাহ-দান আমাকে বাঁচিয়েছিলো সে দিন। কমিউনিষ্ট মতবাদ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হবার জন্যে বুখারিনের সাহায্যে আমি 'লেনিন কোর্স' নামক প্রতিষ্ঠানে যোগদান করি। মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্যে নানা দেশের কমিউনিষ্টরা এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করতেন। আমি বছরখানেক ধরে ইতিহাস, অর্থনীতি, মার্কসবাদ, লেনিনবাদ ও অনেকান্তভূতবাদ (ডায়লেকটিকাল মেটিরিয়ালিজম্) অধ্যয়ন করেছিলুম এই শিক্ষা-নিকেতনে। এই শিক্ষা-নিকেতন পরিচালনা করতো কমিনটার্ন তাই বুখারিনই ছিলেন এর প্রধান পরিচালক। মাঝে মাঝে বুখারিন, ইয়ারোস্লার্ভ্‌স্কি, মোলোতভ্‌

প্রভৃতি বল্‌শেভিক নেতারা বক্তৃতা দিতেন এখানে। ইংরেজ, মার্কিন, জার্মান, ফরাসী, পোল, ফিন, বুলগার, চীনে, জাপানী আরো নানা দেশের কমিউনিষ্টরা এখানে বিপ্লবের বিজ্ঞান অধ্যয়ন করতেন। আমরা সবাই থাকতুম একসঙ্গে একটি বিরাট বাড়ীতে। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত চল্‌তো আমাদের অধ্যয়ন, অধ্যাপকদের বক্তৃতা আর আমাদের আলোচনা। সন্ধ্যেবেলা আমরা বের হয়ে পড়তুম পথে, যেতুম বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে কিম্বা সিনেমায়। কখনো কখনো কারো একজনের ঘরে কয়েকজন মিলে মজলিশ জমাতুম। সহপাঠিনী মেয়েরা নাচ্‌তো, আমরা গান গাইতুম হাততালি দিয়ে। মারুসার কথা মনে পড়ে। সে এসেছিলো পোলাণ্ড থেকে। সেখানে জেলে থাকবার সময় তার উপর অকথ্য অত্যাচার করেছিলো পিল্‌সুড্‌স্কির পুলিশ। মনের দিক থেকে বেচারী তার পরে আর সুস্থ হতে পারে নি। মারুসা প্রায়ই নাচ্‌তো আমাদের আসরে। মাথায় রঙীন রুমাল বেঁধে সেকেলে লোক-সঙ্গীত কিম্বা জিপ্‌সি গানের সঙ্গে সে নাচ্‌তো। নাচ্‌তে নাচ্‌তে বদল হোয়ে যেতো তার মুখের ভাব, হঠাৎ নাচ বন্ধ করে মারুসা চলে যেতো। সে দখল হারিয়ে ফেলেছিলো নিজের মনের উপর। দ্বিতীয়বার যখন মস্কো যাই তখন মারুসার খবর নিতে গিয়ে শুনলুম যে সে আত্মহত্যা করেছে বছরখানেক আগে।

'লেনিন শিক্ষা-নিকেতনে' ঢোকবার কয়েক দিনের মধ্যেই আমি এক আঁধির সৃষ্টি করে বসলুম। শনির দৃষ্টি আমার উপর নিশ্চয়ই আছে কিন্তু আমার জন্ম যে আঁধি-লগ্নে সে বিষয়েও আমার কোনো সন্দেহ নেই। এতোটা জীবন ধরে দেখছি যখনই কিছু বল্‌ছি বা করছি অম্‌নি ঝড় ফুঁসে উঠ্‌ছে চারদিকে। সেবারও ক্রুদ্ধ ঝড় গর্জে উঠ্‌লো আমাকে ঘিরে। যে ঘটনা আঁধির সৃষ্টি করলো সেটি হোলো এই। ট্রট্‌স্কির কার্য-কলাপ সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্যে একদিন সভা ডাকা হোলো আমাদের শিক্ষা-নিকেতনে। তখনো ষ্টালিন বল্‌শেভিক পার্টি থেকে ট্রট্‌স্কিকে সরিয়ে দেয়নি। ট্রট্‌স্কির বিরুদ্ধে এক তরফা মিথ্যে প্রচার ষ্টালিন তখন পূরো দমে চালিয়ে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে যেখানে যতো ট্রট্‌স্কির মতের সমর্থক ছিলো তাদের ছত্রভঙ্গ করে দূরে দূরে পাঠিয়ে দিচ্ছিলো ষ্টালিন। ষ্টালিনের ন্যাশানাল-সোশালিজমের বিরুদ্ধে লেনিনগ্রাডে বল্‌শেভিক দলের বেশীর ভাগ সভ্য ভোট দিয়েছিলো ট্রট্‌স্কির মতের সমর্থনে। হেরে যাবার পর থেকেই লেনিনগ্রাডের পার্টি কমিটির সেক্রেটারী থেকে সুরু করে যে যে তার বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করেছিলো

ষ্টালিন তাদের কাউকে সাইবেরিয়ায়, কাউকে উরালে, কাউকে সুদূর ভ্লাডিভষ্টকে পাঠাতে সুরু করলো। তিন মাস বাদে আবার পার্টি কন্‌ফারেন্স ডাকা হোলো লেনিনগ্রাডে, এবারে জয় হোলো ষ্টালিনের। পার্টির যন্ত্র সম্পূর্ণ হাতে থাকায় এমনি করেই নির্মম ত্রাস সৃষ্টি করে তার বিরুদ্ধে দলে যে বহুমত ছিলো তাকে ষ্টালিন তার স্বপক্ষের বহুমতে পরিবর্তিত করেছে। এই হোলো সোভিয়েট জনসাধণের ষ্টালিনের স্বপক্ষে থাকার ইতিহাস! পৃথিবীর ইতিহাসে এ রকম জঘন্য পাশবিক ত্রাসের উদাহরণ আর একটিও নেই। ক্ষমতা-লুব্ধ ষ্টালিন যে শুধু নভেম্বর-বিপ্লবের পুরোযায়ী লেনিনের সহকর্মীদের সম্পূর্ণ মিথ্যে দোষারোপ করে হত্যা করলো তা নয়, হাজার হাজার বিপ্লবীদের হত্যা করলো, অসংখ্য বিপ্লবীদের কারাগারে আর নির্বাসনে পাঠালো শুধু এই অপরাধে যে তারা ষ্টালিনের ন্যাশানাল-সোশালিজম্‌কে মেনে নিতে পারে নি, তারা লেনিনের শেখানো বিশ্ব-বিপ্লবের পথ ধরে চলতে চেয়েছিলো।

ভারতবর্ষে যখন ফিরে এলুম দেখলুম যে ড্রইংরুমের ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালদের মধ্যে ষ্টালিনের খাতির গ্রেটা গার্বোর চেয়ে কম নয়। একটু তলিয়ে দেখতেই তার কারণটা বুঝলুম। এই ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালেরা ন্যাশানাল-সোশালিজমের সমর্থন করতে পারে, কমিউনিজমের সমর্থন কখনই করতে পারে না। তাই লেনিন আর ট্রট্‌স্কির নাম শুনলেই যারা ভয়ে বিদ্বেষে আত্মহারা হোতো তারাই রাতারাতি ষ্টালিনের মহা-ভক্ত হয়ে উঠেছিলো। এরা বুঝেছিলো যে ত্রাসের যে বন্যা ষ্টালিন বইয়েছে সোভিয়েট রাশিয়ায় সেটা সেখানকার জনসাধারণের বিরুদ্ধেই বইছে। এরা সহজেই ধরতে পেরেছিলো যে ষ্টালিন জনগণের শত্রু। ভারতবর্ষের এই মধ্যবিত্ত শিক্ষিতেরা মনে প্রাণে জনসাধারণের বিদ্বেষী হওয়ায় ষ্টালিনের উপর তাদের ভক্তি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। যে নক্‌শা মাফিক সোভিয়েট রাষ্ট্রকে সাজাচ্ছিলো ষ্টালিন সে নক্‌সায় তাদের পূর্ণ সমর্থন ছিলো। তারা ঠিকই বুঝেছিলো যে এই নক্‌সা মতো যদি কাজ হয় ভারতবর্ষে তা হোলে তারা যে শুধু বেঁচে যাবে তা নয় রাষ্ট্র-পরিচালনার যন্ত্রের দখল করে তারা নিংড়ে শুষে নিতে পারবে জনসাধারণকে। তাই ষ্টালিনের উপর এতো অনুরাগ ভারতবর্ষের ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালদের। অবিশ্যি ঐতিহাসিক কিম্বা সামাজিক কারণ ছাড়াও আরো একটি কারণ ছিলো। গত মহাযুদ্ধের সময় ষ্টালিনবাদী হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসক গোষ্ঠীর নেক নজরে তোফা আরামে থাকা যেতো। তখন পুলিশ অফিসর, সি-আই-ডি, গভর্মেণ্টের কর্মচারীরা সবাই ষ্টালিনবাদী। এই

কারণেই ড্রইংরুমের এই বুদ্ধিজীবিরা ষ্টালিনের পূজোরী হয়েছিলো ঝাঁকে ঝাঁকে। কোনো কিছুর দিকে ঝুঁকে পড়বার আগে ড্রইংরুমের এই বাসিন্দেরা ভালো করে দেখে নেয় যে সেটা নিরাপদ কিনা। ফ্যাশানটা নিরাপদ না হলে কি চলে!

আবার সেই মিটিংয়ের কথায় ফিরে যাই। সভায় সভাপতিত্ব করছিলেন একজন অষ্ট্রেলীয় কমিউনিষ্ট। ট্রট্স্কির কার্যকলাপ যে কতো খারাপ, বল্শেভিক দলের সেন্ট্রাল কমিটি যে ট্রট্স্কির আচরণের তীব্র নিন্দে করেছে সে কথা তিনি শুনিয়ে দিলেন আমাদের। এক কথায় তিনি মূল গায়েন হয়ে কীর্তনের সুরটা ধরে দিলেন আর আমাদের ইঙ্গিত করে জানিয়ে দিলেন যে মূল সুরের দিকে লক্ষ্য রেখে আখর দিতে হবে। তাঁর ইঙ্গিত ব্যর্থ হোলো না। একজনের পর একজন বক্তা সুরু করলো ট্রট্স্কির শ্রাদ্ধ। সুর চড়েই চল্লো। একজন যদি বলে ট্রট্স্কি ভুল করেছেন, আর একজন বলে ট্রট্স্কি ঘোর অন্যায় করেছেন। একজন বলে ট্রট্স্কি সোভিয়েটের শত্রুতা করেছেন, অম্নি আর একজন বলে ট্রট্স্কি জনগণের শত্রু। বুঝলুম এসব হচ্ছে চাকুরেদের বক্তৃতা। বক্তৃতাগুলো মনিবের কানে পৌঁছে চাকরী যাতে বহাল থেকে সেই উদ্দেশ্যে এদের বক্তৃতা দেওয়া। এদের বক্তৃতা আমাকে যেমন লজ্জা দিলো তেমনি রাগিয়েও দিলো। এই হোলো কমিউনিষ্টের নমুনা! যারা নিজেদের সুবিধে করে নেওয়ার জন্যে এই ধরণের স্তাবকতা করতে পারে তারা আনবে বিপ্লব মানুষকে মুক্তি দেবার জন্যে, তারা রচনা করবে নয়া দুনিয়া! এদের আচরণ আমাকে এতোটা ক্ষুব্ধ না করলে সেই সভায় আমি যা বলেছিলুম খুব সম্ভব আমি বলতুম না সে সব কথা। তখন মাত্র কয়েক মাস হোলো আমি সোভিয়েট রাশিয়ায় গেছি। ষ্টালিনের চতুর অপপ্রচারের হদিশ আমি তখনো পাই নি ঠিক করে। ষ্টালিনের অপপ্রচারের ফলে আমারও মনে তখন এই ধারণা হয়েছিলো যে ট্রট্স্কি দলের শৃঙ্খলা নষ্ট করেছেন, তিনি দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন। এই ঘটনার অনেক পরে ষ্টালিনের আসল চেহারাটা ধরতে পেরেছিলুম। দলের মধ্যে স্বমত প্রকাশের যে অবাধ স্বাধীনতা ছিলো লেনিনের আমলে, সেই অধিকার কেমন করে হরণ করেছে ষ্টালিন, কি অবর্ণনীয় ত্রাস সৃষ্টি করে এক-রঙা মত ও তাঁবেদারী আনুগত্য সৃষ্টি করেছে ষ্টালিন বলশেভিক দলে আর সোভিয়েট নাগরিকদের মধ্যে, সে সব সম্বন্ধে আমার চোখ ফুটেছিলো এই ঘটনার অনেক পরে। তাই সেদিনের মিটিংয়ের ঘটনার জন্যে দায়ী ছিলুম না আমি, দায়ী

ছিলো যো-হুকুম তাঁবেদারেরাই ! আমার বক্তৃতায় আমি বলি যে ট্রট্‌স্কি সোভিয়েট-বিরোধী, জনগণের শত্রু, এই সব কথা যারা বলছে তারা নিজেদের বল্‌শেভিকদের চেয়েও ভালো বল্‌শেভিক এইটে দেখাবার জন্যে বল্‌ছে। যে লোক তাঁর সারাটা জীবন সোশালিষ্ট বিপ্লবের জন্যে কাজ করেছেন, লাল সেনা-বাহিনীর সৃষ্টি করে বিপ্লবকে সফল করেছেন ও বিপ্লবকে বাঁচিয়েছেন ঘরের ও বাইরের শত্রুদের আক্রমণ থেকে, সে লোক জনগণের শত্রু, সোভিয়েট-বিরোধী এ কথা নিঃসংশয় প্রমাণ না পেয়ে কারো বলা উচিত নয়। ট্রট্‌স্কি ভুল করতে পারেন কিন্তু জনগণের ও সোশালিষ্ট বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা তিনি কখনো করতে পারেন না। আমার বক্তৃতার পর সভার সভাপতি আমাকে শুনিয়ে দিলেন যে এ ধরণের মত কমিউনিষ্টদের মধ্যে কিছুতেই থাকতে পারে না সেটা যেন আমি ভালো করে বুঝে নিই। তাঁর তাঁবেদারী মন এটা কল্পনাই করতে পারে নি যে হুকুম দেবার পরেও সুরে সুর মিলতে কেউ অস্বীকার করতে পারে। তিনি কিন্তু মারাত্মক ভুল করলেন। তাঁর ধমকানির ফল হোলো এই যে আরো জোরের সঙ্গে আমি আমার মত আবার ব্যক্ত করলুম। সভার আবহাওয়া থম্‌থমে হয়ে গেলো। কেউ স্বপ্নেও ভাবে নি যে এ রকম অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। উপর থেকে হুকুম আসবে আর সেই হুকুম মতো বাঁধা গৎএর বক্তৃতা হবে, কর্তাদের ঠিক-করে দেওয়া প্রস্তাবগুলো পাশ করা হবে এই তো সবাই জানে ষ্টালিনের আমলে যে কোনো সভার বাঁধা-ধরা তাঁবেদারী চেহারা। এই নিশ্চিন্ত ব্যবস্থার নিশ্চল জলে সমালোচনার ঢিল মেরে কম্পন জাগালো কোন মূর্খ! ব্যাপারটা এখানেই শেষ হোলো না। আমার বেয়াদবির সব খবর জানানো হোলো কমিনটার্নে, আমাকে তলব করা হোলো জবাবদিহি করতে। নলিনী এলো, মুখে তার উৎকণ্ঠার ছাপ। আমার একগুঁয়েমির জন্যে আমাকে ভর্ৎসনা করলো, বল্‌লে রায় বলেছে যে আমি গুরুতর অপরাধ করেছি। আমি যা বলেছি এরকম কথা সোভিয়েট রাশিয়ায় বলা চলে না। বল্‌লেম—যদি না চলে তো চল্‌বে না। আমি নিরুপায়। কারো মন যুগিয়ে কথা বলবার অভ্যেস আমার নেই। সোভিয়েট রাশিয়ায় এসেছি কমিউনিজমের উপর পূর্ণ আস্থা নিয়ে, কারো মন যুগিয়ে কথা বলবার জন্যে নয়। যুক্তির জায়গায় না মানি ভক্তির ভণিতা না মানি হুকুমের হুম্‌কি। আর এই যুক্তিহীন জবরদস্তির নাম আর যাই হোক কমিউনিজম নিশ্চয়ই নয়। নলিনী মাথা নেড়ে বল্‌লে—তবুও, যখন সোভিয়েট রাশিয়ায়

রয়েছি তখন ভেবে চিন্তে কথা বলাই ঠিক। রিয়ালিষ্ট বন্ধুর এই সুবুদ্ধির পরামর্শ আমি মেনে নিতে পারলুম না। কমিনটার্নের কণ্ট্রোল কমিশনে যথাসময়ে জবাবদিহি দিলুম! পার্টির মত যে সব সময়ে নির্ভুল আর সেটা যে বিনা ওজরে মেনে নেওয়া উচিত এই উপদেশ পেলুম কর্তাদের কাছ থেকে! ব্যাপারটা এবারে এইখানেই শেষ হয়ে গেলো। আবার বিপদে পড়লুম, কিন্তু এবারে ব্যাপারটা সরকারী মহলে পৌঁছলো না, ঘরোয়াই থেকে গেলো। ফ্রায়ার-দম্পতীর সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে একদিন লেনিনের মাওসেলিয়ামের কথা উঠলো। আমি বল্লেম—মৃতদেহকে মমি করে রেখে লোক জমানোর খেলা হচ্ছে ম্যাজিক আর এই ধরণের ম্যাজিকের বিরুদ্ধে লড়াই কমিউনিজমের বহুমুখী লড়াইয়ের একটা জরুরী দিক। লেনিনের মৃতদেহটিকে দাহ করে ফেলা উচিত। এরকম মমি বানিয়ে রেখে আমরা লেনিনকে আর কমিউনিজমকে অপমান করছি। ফ্রায়ার উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌লেন, বল্‌লেন—ওসব আমরা জানি, কিন্তু বিপ্লবের অগ্রগতির জন্যেই এটা দরকার। আর বিপ্লবের কাজের জন্যে যা কিছু দরকার সব আমরা করবো, তা' ম্যাজিকই হোক আর যাই হোক। বল্লেম—লেনিনের মৃতদেহকে মমি বানিয়ে রাখার ফলে বিপ্লবের কাজ এগোচ্ছে এ কথা আমি আদবেই মানতে রাজী নই। বিপ্লবের সব চেয়ে বড়ো কাজ হচ্ছে মানুষের মনকে মুক্তি দেওয়া অন্ধতা থেকে, কুসংস্কার থেকে। কুসংস্কারকে আঘাত করা দূরে থাকুক আমরা তাকে জিইয়ে রাখছি এই উপায়ে। মানুষের মনের যে অন্ধতার সুযোগ নেবার জন্যে আমরা লেনিনের মৃতদেহকে মমি বানিয়েছি সে অন্ধতাকে দূর করতে না পারলে কমিউনিষ্ট সমাজ প্রতিষ্ঠা করা কখনো সম্ভব হবে না। আমাকে বিদ্রূপ করে ফ্রায়ার বলনেন—অতো গভীর জ্ঞানের কথা আমাদের মাথায় ঢোকে না। আমরা মনে করি লেনিনের মৃতদেহ রক্ষা করে আমরা জনসাধারণকে ধরে রাখতে পারবো বিপ্লবের পথে। অতএব যে যাই বলুক আমরা যা দরকার মনে করি তা'ই করে চল্‌বো। তা' ছাড়া ধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আমরা যে প্রচণ্ড অভিযান চালাচ্ছি সেটা কি আপনার চোখে পড়ে না? বল্‌লুম—পড়ে বৈকি, পোষ্টার্স কার্টুন সবই চোখে পড়ে। তবে সেগুলো তো একতরফা চল্‌ছে। এই মমি-পূজো নিয়ে কার্টুন করবার অধিকার আপনারা অন্যদের দেবেন কি? আপনারা যদি মনে করে থাকেন যে একটা পুকুরের পচা জল নালা কেটে অন্য এক পুকুরে নিয়ে ফেল্‌লে জলটা শুদ্ধ হয়ে যায় তা' হোলে ভয়ানক ভুল করছেন। এতে শুধু আধারটাই বদলানো নয়, বস্তুটি

আগে যা ছিলো তাই থেকে যায়। আপনারা ঠিক তাই করছেন। সর্বনেশে ভুল করছেন যদি ভেবে থাকেন যে কুসংস্কারকে আঘাত করছেন শুধু আধার বদল করে। তর্ক ক্রমশই তেতে উঠ্‌ছিলো। চায়ের গেলাস, রাইয়ের রুটি, মাখন, ক্যাভিয়ার সামনে ধরে দিয়ে ফ্রায়ার-জায়া উত্তাপটাকে চালিত করলেন রসনার দিকে। মেয়েরা কলহের আগুন জ্বালতে যেমন নিপুণা, কলা-কৌশলে নিবতেও তেমনি দক্ষ। স্বভাব-গুণে তাঁরা কিন্তু প্রথম কাজটাই বেশী করে থাকেন।

নানা মিটিং আর কনফারেন্সে যোগদান করার ফলে আর একটা জিনিসও আমার কাছে পরিস্কার হোয়ে গেলো। প্রত্যেকটি মিটিংয়ে দেখলুম নিজের মত হিসেবে কেউ কোনো কিছুই বল্‌ছে না। কিছু একটা বলার পরেই প্রত্যেক বক্তা নিজের মতের সাফাইয়ে 'লেনিন বলেছেন' বলে লেনিনের লেখা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করছে। একটি মতের সমর্থনে যিনি বলছেন তিনি যেমন লেনিনের দোহাই দিচ্ছেন, বিরুদ্ধে যিনি বলছেন তিনিও ঠিক তেমনি দোহাই দিচ্ছেন লেনিনের। বুঝলুম লেনিনের মতামতকে এরা শাস্ত্র করে তুলেছে আর অন্য সব শাস্ত্রের মতো এই শাস্ত্রের বাঁধ তুলে বিচারের জ্বলন্ত স্রোতকে রুদ্ধ করবার জন্যে তারা উঠে পড়ে লেগেছে। প্রত্যেকটি সভায় দেখলুম যে লেনিনকে এরা খাড়া করছে লেনিনের বিরুদ্ধে। বুঝলুম ষ্টালিনের ত্রাস-ব্যবস্থার ফলে নিজের মত ব্যক্ত করবার সাহস এরা হারিয়ে ফেলেছে। তাই লেনিনকে ব্যবহার করছে এরা বর্মের মতো ষ্টালিনের আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্যে। সমস্ত বিচার-শক্তি নিঙরে নিয়ে মানুষকে যন্ত্র বানাবার জন্যে ষ্টালিনের এই বীভৎস চেষ্টা সোভিয়েট রাশিয়ার বাসিন্দাদের পক্ষে যে কি মারাত্মক হয়েছে তা' এদের জীবন কাছ থেকে যে না দেখেছে সে বুঝবে না। কখন যে ষ্টালিনের গোয়েন্দা পুলিশ 'গেপেয়ু' এসে কাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবে তা কেউ জানে না। তাই এরা নির্বাক হয়ে গেছে ভয়ে। এদের সঙ্গে কথা বল্লেই বোঝা যায় যে এরা যেন প্রাণ খুলে কথা বলছে না, এড়িয়ে যাচ্ছে অনেক কিছু। গভর্মেণ্টের সামান্য সমালোচনা করবার আগে এরা চারদিকে তাকিয়ে দেখে নেয় কেউ শুনছে কি না। এক সন্ধ্যেবেলার কথা আমার এখনো মনে আছে। এক সাহিত্যিক বন্ধুর বাড়ী গিয়েছিলুম। বন্ধু-পত্নী গাঁয়ের মেয়ে, অতি শাদা-সিধে, ঘরকন্না নিয়ে থাকেন, রাজনীতির ধার ধারেন না। সাহিত্যিক বন্ধুটি কমিউনিষ্ট নন কিন্তু জানতেন যে আমি কমিউনিষ্ট। আলাপের কিছুদিন

পরে আমিই সেটা জানিয়ে দিয়েছিলুম তাঁদের। কথায় কথায় আমি বন্ধু-জায়াকে জিজ্ঞেস করলেম—কেমন, মনের খুসিতে আছেন তো? তিনি সরল মানুষ, সোজাসুজি বলে বসলেন—ষ্টালিনের অত্যেচারে কেউ আরামে থাকতে পারে? উত্তর শুনে আমি হেসে তাকালুম আমার বন্ধুর দিকে! দেখলুম তাঁর মুখ থেকে শেষ রক্ত-বিন্দু যেন চুঁয়ে পড়ে গেছে, মুখ একেবারে শাদা। বুঝলুম তাঁর স্ত্রীর ভাগ্যে কি আছে এই ভেবে তিনি ভয় পেয়েছেন। নিশ্চয়ই ভেবে নিয়েছেন যে কমিউনিষ্টের সামনে এ কথা বলে ফেলেছে আর রক্ষে নেই। তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বল্‌লুম যে আমি যে কমিউনিষ্ট সে কথা তো আমিই বলেছি তাঁদের, কিন্তু আমাকে ষ্টালিনের 'গেপেয়ু' ভাবলে তাঁরা আমার উপর অবিচার করবেন। বন্ধু-পত্নীকে পরিহাস ছলে বল্‌লুম—দেখলেন তো আপনার স্বামীর অবস্থাটা আপনার কথা শুনে? অন্য লোকের সামনে এ ধরণের কথা কখনো বলবেন না। সোভিয়েট রাশিয়ায় থাকার সময় এ ধরণের অভিজ্ঞতা আমার বারবার হয়েছে। নিদারুণ ত্রাসের অবাধ ব্যবহার করে ষ্টালিন যে কেমন করে গুঁড়িয়ে দিয়েছে মানুষের মনুষ্যত্বকে তার মর্মান্তিক নমুনা চাষী, মজুর, ছাত্র, রাজনৈতিক কর্মী, লেখক, এক কথায় সোভিয়েট সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের মধ্যে প্রায় দুবছর ধরে দেখেছি। তখন বুঝেছি লেনিনের ও আরো শত শত সত্যনিষ্ঠ বিপ্লবী কর্মীদের নতুন মানব-সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জীবনপণ কঠোরতম সাধনাকে কেমন করে ব্যর্থ করে দিয়েছে ষ্টালিনের মানবতা-বিরোধী অন্ধ অনুদার ক্ষমতা-লোলুপ হিংস্রতা।

রুশীয় ভাষাটা কয়েক মাসেই চলনসই রকমের আয়ত্ত করে নিয়েছিলুম। এবারে আমি রুশীয় সাহিত্য পড়তে সুরু করলুম। শুধু সোভিয়েট আমলের লেখকদের লেখা পড়ে অপূর্ব রুশীয় সাহিত্যকে অপমান করবার চেষ্টা আমি করি নি। তিনজন কাল্পনিক বীরের জীবন নিয়ে বহু শতাব্দী আগে অনেক ছড়া রচিত হয়েছিলো। রুশীয় সাহিত্যে এই ছড়াগুলো 'বিলীনা' নামে পরিচিত। সেই বিলীনাগুলো পড়লুম, দু'একটি অনুবাদও করেছিলুম। আমার সমস্ত বই খাতাপত্তর যখন নাৎসিরা নষ্ট করে দেয় বার্লিনে তখন অনুবাদগুলি নষ্ট হয় তারি সঙ্গে। আমাদের 'পঞ্চতন্ত্র' আর ইয়োরোপের 'ঈসপস্ ফেবল্‌স'এর মতো রুশীয় সাহিত্যেও এই ধরণের আখ্যানগুলির একটি সংকলন আছে। এই আখ্যানগুলিকে 'বাস্‌নি' বলে। ক্রিলভের লেখা এই বাস্‌নিগুলি জানে না এমন কোনো লোক রাশিয়ায় আছে কিনা সন্দেহ। 'বাসনি' ছাড়াও গ্রাম্য

ছড়া, গ্রাম্য গীতি, নানা পালাপার্বণের কবিতা ও গান, রূপকথা সংগ্রহ করে পড়ে নিলুম। তার পরে সুরু করলুম রাশিয়ার বিখ্যাত কবিদের কাব্য-পাঠ। এতো চমৎকার দরদ-ভরা সব কবিতা পড়লুম যে এগুলো অজানা থেকে যাবে আমাদের দেশে এটা অসহ্য বোধ হলো। মরিয়া হয়ে লেগে গেলুম অনুবাদের কাজে। সুরার সাহায্য না পেলে আমার পক্ষে অনুবাদ করা কখনো সম্ভব হতো না। মস্কোতে পৌঁছবার মাসখানেক পরে একজন ভারতীয় বন্ধু একটি রুশীয় মহিলাকে নিয়ে আসেন একদিন সন্ধ্যেবেলা আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন বলে। মেয়েটির পরিচয় দিয়ে বললেন—এঁর নাম সুরা। একজন বাঙালী কমিউনিষ্ট উনিশ শো পঁচিশ সালে মস্কোয় ছিলেন, তাঁর স্ত্রী ইনি। স্বামীর খবর জানবার জন্যে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। এই বাঙালী কমিউনিষ্টকে আমি খুব ভালো করেই জানতুম। বাঙলা দেশের একটি টেরারিষ্ট দল তাঁকে মস্কোয় পাঠিয়েছিলো। মস্কোয় মাস দশেক থেকে তিনি দেশে ফিরে যান। দেশে ফিরে আসবার কিছু কাল পরে আমার আলাপ হয় তাঁর সঙ্গে। আমিই তাঁকে টেনে নিই 'বঙ্গীয় শ্রমিক-কৃষক' দলে। দেশ ছাড়বার দু এক দিন আগেও তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। সুরার কথা কিন্তু তিনি আমাকে একবারও বলেন নি। যতোটা খবর জানতুম সব জানালুম সুরাকে। তাঁর বাড়ীতে যাবার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়ে তিনি চলে গেলেন।

সহরের এক প্রান্তে একটি নিরালা রাস্তায় কাঠের তৈরী একতলা বাড়ীর একটি ঘরে সুরা থাকতেন তাঁর বৃদ্ধা মা আর দুবছরের মেয়ে নিয়ে। সুরার মা ছিলেন খুব অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে। জারের আমলের বহু বিপ্লবী তাঁর পিতার কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছেন, তাঁদের বাড়ীতে আশ্রয়ও পেয়েছেন। এখন অতি কষ্টে এঁদের দিন কাটে। শিশুদের একটি কিন্ডার গারটেনে শিক্ষা দিয়ে সুরা যেটুকু পেতেন তারি স্বল্প উপার্জনে তাঁদের সংসার চলতো। থাকবার ঘরটি যেমন স্যাত্স্যাতে তেমনি অন্ধকার। এতো দারিদ্রের মধ্যে থাকতেন তবু এক দিনের জন্যেও বৃদ্ধার মুখে বিরক্তির লেশমাত্র চিহ্ন দেখিনি। তাঁর অন্তরের আভিজাত্য হার মানেনি বাইরের আঘাতের কাছে। দু'বছরের জয়চ্কাকে নিয়ে সুরা এগিয়ে এলেন। জয়চ্কার কালো চোখ, কালো চুল, শামলা রঙ; দেখে বুঝলুম এখানে বাঙলা হার মানিয়েছে রাশিয়াকে। মস্কোতে যতো দিন ছিলুম সুরাকে বন্ধু রূপে পেয়ে আমি ধন্য হয়েছিলুম। এমন মেয়ে যে কোনো

দেশে বিরল। যেমন গভীর তেম্‌নি আলোয় ভরা ছিল তার মনখানি। অর্দ্ধাহারে অনাহারে শরীর কৃশ কিন্তু তার ক্লান্ত মুখে এক দিনের জন্যেও করুণা ভিক্ষার দাবী দেখিনি। কতো ঝড়ের কতো ঝাপ্‌টা জীবনের উপর দিয়ে বয়ে গেছে, শিশুকে নিয়ে, বৃদ্ধা মাকে নিয়ে একলা বহন করতে হয়েছে সংসারের সব দাবী কিন্তু কখনো আত্ম-করুণার সর্বনাশী মোহে মজে নি এই মেয়েটি। সুরা প্রায়ই আসতেন আমার কাছে। দুজনে বসে রুশীয় কবিতা পড়তুম। তিনি নানা কবির কবিতা ও গ্রাম্য ছড়া আমাকে পড়ে শোনাতেন, শুনতেন আমার মুখ থেকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা। কতো দিন বরফ-ঢাকা বুল্‌ভার দিয়ে দুজনে বেড়াতে গেছি বিকেল বেলা।

আমার মনের মধ্যে তখন দ্বন্দ্ব চলেছে। অনেক কিছু দেখছিলুম, শুনছিলুম যা আমার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিলো না। আঘাত পাচ্ছিলুম অথচ কারো কাছে নিজের মনের সংশয় মেলে ধরবার উপায় ছিলো না। রাজনৈতিক ত্রাসের এমনি গুমোট সৃষ্টি করে রেখেছিলো ষ্টালিন। সেই কুটিল বিষাক্ত আবহাওয়ায় দুটি মাত্র লোক ছিলো—সুরা আর লিও—যাদের কাছে মন উজাড় করে সব কথা আমি বলতে পারতুম। এই দু'জনের বন্ধুত্ব আমাকে বাঁচিয়েছিলো সে দিন। আমার সমালোচনায় যে তারা সব সময়েই সায় দিতো তা' নয়, কিন্তু আমাকে তারা ভুল বোঝে নি কখনো। কমিউনিজম্‌কে যে আমি আমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছি সে বিষয়ে এদের মনে কোনো দিন সংশয় জাগে নি। কতো দিন আমার মনের ঝড় আমাকে ঠেলে নিয়ে গিয়ে হাজির করেছে লিও কিম্বা সুরার কাছে। ঘরের মধ্যে কখনো পায়চারি করছি, কখনো বসছি, পাগলের মতো বলে গেছি নিজের মনের দ্বন্দ্বের কথা। আমার সব দৌরাত্ম ওরা দুজনেই পরম প্রীতির সঙ্গে সহ্য করেছে। মনে পড়ছে লিওর কথা। তার ছোট্ট ঘরটিকে বই-ঘর বল্‌লেই চলে। চৌকির উপর, বিছানার উপর, মেঝেতে, টেবিলে চার দিকে বই ছড়ানো। সেই ঘরে আমি গিয়ে হাজির হতুম ঝোড়ো অশান্তির মতো। তাড়াতাড়ি চৌকি থেকে বইগুলোকে ধুপ্‌ধাপ্‌ মাটিতে ফেলে লিও বসতে দিতো আমাকে। পুরু লেন্‌সের চশমার মধ্যে দিয়ে আমার দিকে সে এমন করে তাকাতো যেন আমার মনের ঘুর্ণির জন্যে সেই অপরাধী। আমার একরোখা মনের সমালোচনার স্রোত পাছে কূল ছাপিয়ে যায় এই জন্যে তার উৎকণ্ঠার অন্ত ছিলো না। সহরের বাইরে বনে আমরা কতো দিন বেড়াতে গেছি দু'জনে। আলো-ছায়ার আল্‌পনা-আঁকা ঘাসের

উপর বসে চলতো আমাদের আলাপ। সে আলাপ কখনো বাঁধানো সড়কের পথ ধরতো না। পায়ে-চলা পথের মতো মনের যে আঁকা-বাঁকা পথ সেই পথ ধরে যেতো আমাদের খেয়ালী আলাপ। উনিশশো ত্রিশ সালে দ্বিতীয়বার যখন মস্কো যাই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তখন আবার দেখা হোলো লিওর সঙ্গে। দু'বছরের মধ্যে তার আশ্চর্য বদল দেখলুম। মুখে তার গভীর ক্লান্তি আর অবসাদ। ষ্টালিনের ক্ষমতা-লোলুপতা তৃষার্ত মরুভূমির মতো বিপ্লবের স্রোতকে প্রায় শুষে নিয়েছে তখন। জোয়ারের জল নেমে গেলে শ্যাওলা-পড়া ভাঙ্গা ঘাটের যে রকম শ্রীহীন চেহারা বের হয়ে পড়ে, রাশিয়ার চেহারা সেই রকম দেখলুম উনিশশো ত্রিশ সালে। ক্ষমতা-লোলুপ মানুষ যে কি ভয়ঙ্কর হিংস্র হোতে পারে, কি রকম নিপুণ নির্মমতার সঙ্গে যে দলের আর রাষ্ট্রের যন্ত্রধর তার বিরুদ্ধ-মতবাদীদের দলের ও রাষ্ট্রের বিরোধী বলে চালিয়ে দিতে পারে ও সেই অপবাদ দিয়ে নির্বাসনে পাঠাতে পারে, হত্যা করতে পারে সে সম্বন্ধে কারো কোনো ধারণাই হোতে পারে না যে ষ্টালিনের রাহুগ্রস্থ সোভিয়েট রাশিয়ায় কিছু দিন কাটিয়ে না এসেছে। অবিশ্যি পিঠে হাত-বুলুনির সোহাগে মনের চোখ যদি একেবারে বন্ধ হয়ে যায় তাঁদের মনের মতো যাঁরা ষ্টালিনের সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠান 'ভক্সের' আমন্ত্রণে এই সে দিন সোভিয়েট রাশিয়ায় গেছেন, তা হোলে নিরুপায়। সোভিয়েট রাশিয়ায় পৌঁছনোর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই সাহিত্যিক ও সাংবাদিকেরা যে ধরণের নির্বোধ ও নির্লজ্জ প্রচার সুরু করেছেন তার থেকে এইটেই বোঝা যাচ্ছে যে খুঁতিয়ে দেখবার মতো ধৈর্য আর সত্য কথা বলবার মতো সাহস এঁদের নেই। অবিশ্যি তার জন্যে এঁদের দোষ দেওয়া যায় না কেন না ধৈর্যের কিম্বা সাহসের পরিচয় দেশে থাকতেও কখনো দেননি এঁরা আর তার জন্যে এঁরা যানও নি সোভিয়েট রাশিয়ায়। সোভিয়েট রাশিয়ায় যে দিনগুলো কাটিয়েছি সে ভোলবার নয়। যখনই সেই দিনগুলোর কথা ভেবেছি তখনই লিওর সেই আলো-নিবে-যাওয়া মরা মুখ ভেসে উঠেছে আমার মনে। লিওর মুখেই আমি দেখেছি আত্ম-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ ষ্টালিনের হিংস্র বর্বরতার আঘাতে রক্তাক্ত, ত্রাসের পাশবিক আঘাতে পিছু-হটে-যাওয়া রুশীয় বিপ্লবের মর্মান্তিক ট্র্যাজেডির ছবি।

ক্রমশঃ

পদ্মা

হুমায়ুন কবির

ধুলদীর হাট থেকে ফেরবার পথে নজুমিয়া সঙ্গের লোকজনদের সাবধান করে দিয়ে বলল,—খবরদার, হাটে কি হয়েছে সে-সব কথা যেন আম্মাজানের কানে না পৌঁছয়।

রমজান বলল,—কিন্তু আম্মাজান যদি জিজ্ঞেস করে?

নজুমিয়া জবাব দিল,—তোমরা যদি ফুসফাস না কর, তবে জিজ্ঞেস করবার কথা উঠবে কেমন করে?

রমজান মাথা নেড়ে বলল,—আপনি চিন্তা করবেন না, পঞ্চায়েত। রমজানের মুখ থেকে একটা কথাও বেরোবে না।

কথা রমজানের মুখ থেকে বেরোল না সত্যি, কিন্তু তার কথা না বলার চেষ্টা এত স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে আয়েসার চেয়ে ঢের কম হুঁসিয়ার লোকের চোখেও তা ধরা পড়ত। ইদ্রিস এমনি কথা বলে কম, কিন্তু তারও হাঁড়িমুখ যেন আরো ভারী হয়ে উঠলো। আয়েসা সহজেই বুঝল, একটু কিছু ঘটেছে।

নজুমিয়াকে জিজ্ঞেস করে বিশেষ কোন সুবিধা হলনা। সব কথার জবাবই সে দেয় কিন্তু আয়েসা যা জানতে চায়, তার হদিস মেলেনা। ইদ্রিসকেও দুএকবার জিজ্ঞেস করল, কিন্তু হুঁ হাঁ'র বেশী সে কোনদিনই বলে না। দুএকটা কথার জবাব দিয়েই তার হঠাৎ মনে পড়ে যায়, জাল বিছিয়ে এসেছে, শীগ্‌গির না তুললে জড়িয়ে যেতে পারে, ছিঁড়ে লোকসান হতে পারে।

আয়েসা মনে মনে বলল,—আমাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা, আচ্ছা দেখা যাবে।

সেদিন সারা সকালবেলা বৃষ্টি হয়ে দুপুরবেলা রোদ উঠেছে। ভাদ্রশেষের তালপাকানো রোদ্দুর। ভাপসা গরমে চারদিক যেন থমথম করছে। গরম হলে কি হবে, ভরা বর্ষার শেষে একটু রোদ পেয়ে আয়েসা আচার কাসুন্দী সব তাড়াতাড়ি বের করল। উঠোনে রোদে পোলোধামা দিয়ে সব ঢেকে আয়েসা একটু নিশ্চিন্ত হয়ে দাওয়ায় বসল। জাঁতি দিয়ে সুপুরী কাটতে কাটতে তার

মনে পড়ল, ধুলদীর হাটে কি হয়েছিল সে কথা জানা হয়নি। কুলসুমকে বলল,—রমজানকে ডাক।

বলির পাঁঠার মতন কাঁপতে কাঁপতে রমজান এল, জিজ্ঞেস করল,—আমাকে ডেকেছ কেন আম্মাজান ?

আয়েসা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার তার দিকে চেয়ে আপন মনে সুপুরী কেটে চলল।

রমজানের অস্বস্তি বাড়তে লাগল। কোনো রকমে একবার পালাতে পারলে হয়। একটু ভয়ে ভয়ে আবার বলল,—আম্মাজান ?

আয়েসা বলল,—কি হয়েছে বলতো।

রমজান বলল,—কি বলছ আম্মাজান, আমি বুঝতে পারছিনা।

আয়েসা বলল,—ঢের হয়েছে, আর বুঝতে হবে না। ধুলদীর হাটে কি হয়েছিল, খুলে বলতো।

রমজানের মুখ শুকিয়ে গেল। কোন কথা না বলে সে আয়েসার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকল।

আয়েসা বলল,—কি বোবা হয়ে গেলি নাকি ? বলতে পারিস না ?

রমজান বলল,—ধুলদীর হাটে কি হবে আবার ?

আয়েসা বলল,—দেখ্, বেশী চালাকি করিস না। তোদের মুখ দেখে আমি সব কথা বুঝতে পারি। হাটে নিশ্চয় একটা কাণ্ড করে এসেছিস তা নইলে নজুই বা পালিয়ে বেড়াবে কেন, আর তোর মতন ফোঁপরদালালের মুখ হঠাৎ বন্ধ হবে কেন ?

রমজান বলল,—কি আবার হবে হাটে ? হাট বাজার শেষ করে জন-মজুর ঠিক করে বাড়ী ফিরে এলাম, বিশ্বেস না হয় তো পঞ্চায়েতকে জিজ্ঞেস করো।

আয়েসা বলল,—চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা! বলি বুদ্ধির ঢেঁকি, যদি হাটে কিছু নাই হবে তবে এমন গোমরা মুখ কেন ? কে তোর পাকা ধানে মই দিয়েছেরে ?

রমজানের মুখে এক কথা,—বিশ্বেস না হয় পঞ্চায়েতকে জিজ্ঞেস করো।

আয়েসার এবার রাগ হল, বলল,—বেশ বেশ হাটে কিছু হয়নি। তোরা সব হাটবাজার ঠিকমত করে এলি। কিন্তু আমার বাতের ওষুদটা আনার কথা মনে ছিল না ?

রমজান বলল,—ওষুদ আনেনি পঞ্চায়েত ? হাকিমের কাছে তো গিয়েছিল, অনেকক্ষণ বসে বসে কি সব কথাও বলেছে, ওষুদ আনেনি কেন ?

আয়েসা বলল,—হাকিমের কাছে গিয়েছিল অথচ ওষুদ আনেনি ? আর জিজ্ঞেস করলে বলে হাকিম না জোচ্চোর। হাকিমের সঙ্গে ঝগড়াফ্যাসাদ তো করেনি ?

রমজান বলে উঠল,—না না, হাকিমের সঙ্গে তো নয়।

আয়েসা বলল,—বেশ হাকিমের সঙ্গে নয়তো কার সঙ্গে ?

রমজান আমতা আমতা করে বলল,—না, কারো সঙ্গে নয়।

আয়েসা তাকে ধমক দিয়ে বলল,—দেখ্, বেশী চালাকী করিস না। শীগ্‌গির বল্, নইলে ভাল হবে না।

রমজান তবু চুপ করে রয়েছে দেখে আয়েসার রাগ আরো বেড়ে গেল, বলল,—আল্লা তোকে খালি ধড়ই দিয়েছেন, বুদ্ধি দেননি। ভালো চাস তো শীগ্‌গির বল্ কার সঙ্গে কি নিয়ে নজু ঝগড়া করেছে।

রমজান কাতর স্বরে বলল,—পঞ্চায়েতের কথা না শুনলে আমাকে মেরে ফেলবে আম্মাজান।

আয়েসা বলল,—আর আমার কথা না শুনলে আমি তোকে রসগোল্লা খাওয়াব ? শীগ্‌গির সবকথা খুলে বল্, তা নইলে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে গ্রাম থেকে বের করে দেব।

একটু থেমে বলল,—তোর ভয় নাই, নজু তোর কিছু করবে না। আমি তাকে বলে দেব।

রমজান উপায় না দেখে ধীরে ধীরে সব কথা বলল। শুনে আয়েসা খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল। তারপরে বলল,—নজু আর আসগরের ঝগড়া কি কোনদিন মিটবে না ?

একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল,—সত্যিই কি ফকির কামেল দরবেশ ?

এতক্ষণে রমজানের মুখ খুলল। ফকিরের কেরামতির কথা বলবার জন্য তার প্রাণ হাঁস-পাঁস করছিল, কেবল পঞ্চায়েতের ভয়ে পারেনি। এবার আয়েসার আস্কারা পেয়ে সে বিনিয়ে বিনিয়ে সব কথা বলতে সুরু করল। এমনি তো ভক্তিতে তার প্রাণ গদগদ, এখন আয়েসাকে ভাল করে বোঝাতে গিয়ে সে ভক্তি আরো ফেঁপে উঠল।

সব কথা শুনে আয়েসা নজুমিয়াকে ডেকে পাঠাল। বলল,—বুড়ো হতে

বসেছো, এখনো তোমার আক্কেল হল না? আসগরের সঙ্গে কাজিয়া তো লেগেই আছে, তাতে তুষ্ট না হয়ে এবার ফকির দরবেশের সঙ্গে লেগেছ?

নজুমিয়া বলল,—কে তোমাকে এসব আজগুবী কথা বলেছে? রমজানটা বুঝি? ওকে মানা করেছি যে বাজে কথা যেন না বলে, পিটিয়ে ওকে টিট করে দেবো।

আয়েসা বলল,—রমজানের উপর রাগ ফলিয়ে কি হবে? আমি বলে দিচ্ছি, তার গায়ে হাত দিতে পারবে না। আর তোমার কীর্ত্তিকলাপ কি ঢাকা থাকে? কে বলেছে তা দিয়ে তোমার দরকার কি, ঘটনা সত্যি কিনা, তাই তোমার কাছে শুনতে চাই।

নজুমিয়া বলল,—একটু সামান্য কথা কাটাকাটি হয়েছিল, তা নিয়ে তোমাকে পেরেসান করবার দরকার কি? কোথাকার এক ভণ্ড উজবুগ এসে হাটে আড্ডা গেড়েছে, আর দেশ শুদ্ধ লোক ফকির ফকির করে পাগল।

—তোমার সঙ্গে আর পারি না, বাবা। রাগারাগি করে আজ এই দশা, তবু রাগ সামলাতে শিখলে না? আসল হোক আর মেকী হোক, ফকিরের সঙ্গে ঝগড়া করতে গেলে কেন?

নজুমিয়া মাথা নীচু করে বলল,—ঝগড়া করা অন্যায় হয়েছে মানি। কিন্তু ফকির যখন আসগরকে ঘরে ডেকে নিল, তখন আমার মাথায় খুন চেপে গেল, নিজেকে আর আমি সামলাতে পারলাম না।

—সে কথাই তো বলছি, বাবা। জানো তোমার মেজাজ চড়া, একটু চেষ্টা করে সবুর শিখতে হয়। ফকির মানুষ, তাদের বরদোওয়ায় লোকসান করে।

নজুমিয়া আপত্তি করছিল, কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে আয়েসা বলল,—খোদা জানে কার মধ্যে কি আছে, কিন্তু ফকির যখন তোমাকে নদীতে ঝড়ের কথা বলেছে, তখন ফকিরকে খুসী না করা পর্য্যন্ত তোমার আর পদ্মা পাড়ি দিতে হবে না। এমনিতেই রাক্ষুসী পদ্মা কত জনের সর্ব্বনাশ করেছে, আর তাতে ফকিরের বরদোওয়া।

নজুমিয়া মিনতি করে বলল,—আর যা বলো করতে রাজী আছি আম্মা, কিন্তু নদী পাড়ি দিতে বারণ করোনা। ওপারে বাঁকের কাছে নতুন চর উঠেছে, সোনার জমি, এখন না গেলে বেহাত হয়ে যাবে, আমি তো ভাবছিলাম, কালই যাব।

আয়েসা কঠিন স্বরে বলল,—জান্ বড় না নতুন জমি বড়? তুমি ভাদ্র মাসের ভরা পদ্মা পাড়ি দিতে পারবে না।

নজুমিয়া বলল,—এত বড় চর ছেড়ে দেব? মানুষে বলবেইবা কি? একবার যদি জানাজানি হয়, নজুমিয়ার আর আগের মতন ক্ষ্যামতা নেই, নতুন জমি দখলের মুরোদ নেই, তখন যে তারা আমার পুরোনো জমির উপর হামলা করবে। তুমি কি চাও, তোমার মালেক পথে দাঁড়াক?

আয়েসা বলল,—কথা বলতে তো খুব শিখেছ। নতুন জমি দখল না করলে পুরোনো জমি বেদখল হবে কেন? নতুন জমির যদি এত শখ, তবে না হয় রমজান আর ইদ্রিসকে পাঠিয়ে দাও। তারা গিয়ে চর দখল করুক।

নজুমিয়া বলল,—রমজান আর ইদ্রিসকে পাঠাব নতুন জমি দখল করতে?

আয়েসা বলল,—কেন, তাতে তাজ্জব হবার কি আছে? তারা পুরোনো লোক, বিশ্বাসী।

নজুমিয়া বলল,—তারা বিশ্বাসী জানি, কিন্তু রমজান, সে তো একটা গোঁয়াড়, ভাবে, গায়ের জোরে কাজ উদ্ধার করবে। আর ইদ্রিস, তাকে তো বোবা বললেই চলে। এদের দুজনকে পাঠালে জমি পাব কিনা জানিনা, কিন্তু দু-চারটা মাথা যে ফাটবে, আর খেসারত দিতে দিতে শেষ হতে হবে, তাতে সন্দেহ নেই।

আয়েসা বলল,—কিন্তু ভরা পদ্মায় তোমাকে আমি যেতে দেব না।

নজুমিয়া বলল,—এত আক্কেলমন্দ্ হয়ে আম্মা তুমি এমন কথা বললে? আল্লার হুকুম রদ করবে কে? ডুবে মরাই যদি আমার নসীবে থাকে, তবে হাঁটুপানির মধ্যেও ডুবতে পারি। আর যদি আল্লার হুকুম না থাকে, তবে হাজার ঝড়তুফানেও আমার মাথার একটা চুলও খসবেনা। আল্লার উপর তওক্কল করে আমাকে যাওয়ার হুকুম দাও।

রমজান হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে বলল,—তুমি তো গেলেনা পঞ্চায়েত, আসগরমিয়া তার দলবল নিয়ে নতুন চর দখলের জন্য রওয়ানা হয়ে গেল।

নজুমিয়ার শরীর শক্ত হয়ে উঠল। আয়েসার দিকে তাকিয়ে বলল,—এখনো তুমি আপত্তি করছ আম্মা? তুমি কি চাও, তোমার মালেক আসগরের ছেলেপুলের কাছে মাথা নীচু করে থাকবে?

আয়েসা তবু একবার শেষ চেষ্টা করল, বলল,—মালেকের কথা ভেবে

ভেবে তো তুমি হদ্দ হয়ে গেলে। বারবার বলছি যে ছেলে বড় হচ্ছে, বিয়ে-সাদী দাও, নতুন বউ নিয়ে একটু সাধআহ্লাদ করি, কিন্তু সেদিকে ত খেয়াল নেই।

এত ভাবনার মধ্যেও নজুমিয়া হেসে ফেলল, বলল,—মালেকের বিয়ে? এখনো তো দশ বছর পূরো হয়নি, এখনি বিয়ের কথা কেন?

—দশ বছর হয়নি তো কি হয়েছে? তোমাদের ঘরে আমি যেদিন আসি, তখন তোমার বাবার বয়স কত ছিল? না, ও সব ওজর আমি শুনতে চাইনা, মালেকের এবার বিয়ে দিতে হবে।

—বিয়ে দিতে তো বলছ, কিন্তু বিয়েতো মুখের কথায় হয় না। দশজনকে বলতে হবে, জেয়াফত দিতে হবে, সে কি কম টাকার মামলা? তাইতো বলছি, এই নতুন জমিগুলি পেলে আসছে বছর ফাল্গুনে মালেকের বিয়ে দেব।

—আসছে বছর ফাল্গুন, সে তো এখনো দেড় বছরের ধাক্কা। যদি এ ফালগুনে না হয়, তবে আসছে শ্রাবণ পর্য্যন্ত কোন রকমে সবুর করতে পারি, তার বেশী দেরী আমি করতে পারব না। তুমি কি চাও যে তোমার বুড়ী মা খতম হয়ে যাক, তার পরে তোমরা মালেকের বিয়ে দেবে?

—তুমি যেমন হুকুম করবে, তাই হবে আম্মা, কিন্তু এবার আমাকে যেতে দাও।

মালেকের বিয়ের আলোচনায় আয়েসা ফকিরের কথা ভুলে গিয়েছিল। সে কথা মনে হতেই বলল,—বেশ যাবে তো যাও, কিন্তু প্রথমে ধুলদীর হাটে গিয়ে ফকিরকে খুসী করো, তারপরে পদ্মা পাড়ি দিতে হয় দিও।

নজুমিয়া বলল,—ফকীরের হুকুমের আশায় বসে থাকলে তো আর অন্য সকলে বসে থাকবে না, চর ততদিনে বেদখল হয়ে যাবে। ঈষৎ রাগত স্বরে বলল,—একটা ভণ্ডবুজরুকের জন্য তোমার এত ভাবনা কেন?

আয়েসা বলল,—জিভে লাগাম নেই বলেই তো ভুগেছ, তবু শিক্ষা হলনা? মানলাম ফকির ভণ্ড, কিন্তু আমার যদি তার উপর ভক্তি থাকে, তবে অন্তত আমার খাতিরে তাকে সম্মান করা উচিৎ।

নজুমিয়া বলল,—মাফ কর আম্মা, আমার ঘাট হয়েছে। ফকীরের কাছে আমি মাফ চাইব, কিন্তু এখন নয়। চর দখল করে ফিরে আসি, তারপরে একদিন ফকির সাহেবকে দাওয়াত করে না হয় মৌলুদের বন্দোবস্ত করা যাবে।

মৌলুদের নামে আয়েসা খুসী হয়ে উঠল, বলল,—আচ্ছা তবে তাই করো; কিন্তু সাবধান, পদ্মা পাড়ি দিতে কোন গোঁয়ার্তুমি করো না।

নজুমিয়া হেসে বলল,—ভাদ্র শেষ হয়ে এল, নদীর ধার কমে গেছে, নতুন চর জাগ দিয়েছে, হাওয়াতেও এখন ঠাণ্ডার আমেজ, তুফানের দিন শেষ হয়ে এল। তুমি ভাবনা করোনা।

আয়েসা বলল,—রাক্ষুসী পদ্মাকে বিশ্বাস নেই।

ছয়

চরের জমি নিয়ে কোন ঝগড়াবিবাদ হয়নি। নজুমিয়া পৌঁছে দেখল নতুন যে ডাঙ্গা উঠেছে, তা তার আশার অতীত। যতদূর দেখা যায় কেবল কাশের বন, সবুজ গালিচায় সাদা ফুলের বাহার। আসগর এবং তার দলের লোক পশ্চিমের চর দখল করেছিল। নজুমিয়াকে তারা খবর পাঠাল, একখানি বড় চর পেলেই তারা খুশী। নজুমিয়া পূবের চর দখল করল, একবার ভাবল, পশ্চিমের চরে দাবী জানায়, কিন্তু তার মাঝি বসির বলল, পঞ্চায়েত, আমি বুড়ো মানুষ, প্রায় চার কুড়ি বয়স হতে চলল, রাক্ষুসী পদ্মার অনেক খেলা দেখেছি। পশ্চিমের চর টেকে না, বছর দুবছরে নদীর ধারে কেটে যায়, আর পূবের চর বিশবছরেও ভাঙে না।

নজুমিয়া দেখল কথাটা ঠিক, মিছিমিছি আসগরের সঙ্গে ঝগড়া করে কি লাভ? আসগরের সঙ্গে দুএকবার দেখাও হল। নজুমিয়া তাকে বলল,—তুমি পশ্চিমের চর নিয়েছ, নাও। পূবের চর আমার। খুঁটাগাড়ি করে সীমানা বেঁধে দিলাম, এদিকে নজর দিও না।

আসগর জবাব দিল,—পরের জিনিষে নজর দেওয়া আমার স্বভাব নয়, সে কথা তুমি জান।

হয়তো কথায় কথা বেড়ে যেত, কিন্তু বুড়ো বসির মাঝখানে পড়ে নজুমিয়াকে বলল,—পঞ্চায়েত, পশ্চিমের হদ তো টেনেছো, কিন্তু পূবদিকের হদ টানা হয়নি। সেদিকে নজর না দিলে শেষে হয়তো গোল বাধবে।

নজুমিয়াকে কথা বলবার অবসর না দিয়ে লোক ডাকাডাকি করে বসির তাকে চরের পূবদিকে নিয়ে গেল। আসগর এবং নজুমিয়ার চোখাচোখি হতে একবার আগুন ঝলকে উঠল, কিন্তু কিছু না বলে যে যার আপন জমিতে সরে গেল।

জমির বিলি বন্দোবস্ত করতে প্রায় সাতদিন কেটে গেল। রমজান এসে রোজ নজুমিয়াকে মনে করিয়ে দেয়,—আম্মাকে বলে এসেছ, যে দুরাতের বেশী থাকবেনা, দেরী হচ্ছে দেখে বুড়াবিবি যে বেচৈন হয়ে পড়বে।

নজুমিয়া বলল,—কি করি ? হাতের কাজ শেষ না করে তো যাওয়া যাবে না। তবে আম্মাকে খবর দেওয়া হয়েছে আমরা সবাই ভাল আছি, চিন্তার কোন কারণ নেই।

ফিরতেই আয়েসা নজুমিয়াকে চেপে ধরল,—আর দেরী করে দরকার নেই, এবার ফকীরকে ডেকে মৌলুদের বন্দোবস্ত করতে হবে।

নজুমিয়া বলল,—একটু সবুর কর আম্মা। আশ্বিন পড়েছে, এখন ঘরে ফসল তোলা দরকার। দশ দিন সময় দাও, ক্ষেতের কাজ শেষ হোক, ধুলদীতে গিয়ে ফকীরকে দাওয়াত করে আসব।

রোজ আয়েসা মনে করিয়ে দেয়, সঙ্গে যোগ দেয় রমজান আর ইদ্রিস। অবশেষে একদিন নজুমিয়া বলল,—এবার ক্ষেতের কাজ মোটামুটি শেষ হয়েছে, কাল হাটবার, ধুলদী যাব।

হাটে পৌঁছে নজুমিয়া ফকীরের তল্লাসে বুড়ো বটের দিকে রওয়ানা হল। কাছে গিয়ে দেখে, বটগাছের চেহারা একেবারে ফিরে গেছে। গতবার যখন এসেছিল তখন দেখেছে সামান্য একটু ঝোপড়া, এখন বটগাছ ঘেরাও করে মস্ত বড় চালাঘর, নতুন বাঁশের বেড়া চকচক করছে। ঘরের উপরে মস্ত বড় সবুজ নিশান।

দুএক মুহূর্ত্ত ইতস্তত করে নজুমিয়া ঘরে ঢুকে পড়ল। দেখল সারা মেঝে মাদুরে ঢাকা। দশবারোটী ছেলে—তালেবেলমই হবে তারা—মাদুরে বসে দুলে দুলে কি পড়ছে। এক কোণায় একটা পেতলের আতসদানে ধূপলোবান জ্বলছে, মিষ্টি ধোঁয়ার গন্ধে ঘর ভর্ত্তি।

নজুমিয়াকে দেখে তারা আরো বেশী উৎসাহে পড়তে সুরু করল। একটু অপেক্ষা করে নজুমিয়া জিজ্ঞেস করল,—ফকীর সাহের বাড়ী আছেন ? এখন তাঁর সঙ্গে দেখা হবে ?

তালেবেলমেরা পড়েই চলেছে—নজুমিয়ার কথা যে তারা শুনেছে তার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। নজুমিয়া এবার আরো জোরে বলল,—ফকীর সাহেবের সঙ্গে কি এখন দেখা হবে ?

ছাত্রেরা তবু উত্তর দিল না, কিন্তু ঘরের এক কোণায় দরজা খুলে এক যুবক বেরিয়ে এল, জিজ্ঞেস করল,—কি চাই ?

নজুমিয়া বলল,—ফকীর সাহেবের জিয়ারত করতে এসেছি, মেহেরবানী করে খবর দিন, রহিমপুরের নজুমিয়া এসেছে।

যুবকটী বলল,—ফকীর সাহেব এখন চেল্লায় বসেছেন, এখন তো তাঁর কাছে কেউ যেতে পারবে না। যদি ঘণ্টাখানেক পরে আসেন তবে ফকীর সাহেবের সঙ্গে দেখা হবে।

ফকিরের সঙ্গে দেখা করতেই এতটা পথ নজুমিয়ার আসা। বার বার এতদূর থেকে কে আসবে? ভাবল, কোথায় আর যাবে, এখানেই অপেক্ষা করা ভাল। ঘরের এক কোণে বসে তালেবেলমরা কি পড়ছে, তাই শুনতে লাগল। খানিকটা শোনবার পরে বুঝতে পারল, ছাত্রেরা যা পড়ছে, তার মধ্যে বেশ মাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়। আরো একটু মনোযোগ দিয়ে শুনে বুঝল, তারা কোন সুরা বার বার পড়ছে।

পাশের ছেলেটীকে জিজ্ঞেস করল,—কি পড়ছ ভাই?

ছেলেটি আশ্চর্য হয়ে বলল,—কোরাণ পড়ছি, তাও বোঝেন না?

নজুমিয়া বলল,—মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, আমরা কোরাণ শরীফের কি জানি? কি পড়ছ বলনা ভাই?

ছেলেটী আরো আশ্চর্য্য হয়ে জবাব দিল,—কেন এই তো বললাম, কোরাণ পড়ছি, আবার জিজ্ঞেস করছেন কেন?

নজুমিয়া বলল,—হাঁ ভাই, কোরাণ যে পড়ছ তা তো বুঝলাম, কিন্তু আমি জাহেল পাড়াগেঁয়ে মানুষ, আমি তো কোরাণের অর্থ বুঝতে পারি না। যে সুরা পড়ছ, তার মানে বুঝিয়ে দাও না ভাই।

ছেলেটী বলল,—মানে, কোরাণ শরীফের মানে? খোদার কালাম পড়ছি, হেফজ করে করে মুখস্ত করছি, তার আবার মানের কথা ভাবে কে?

নজুমিয়া কি বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় দরজা খুলে যুবকটী আবার বেরিয়ে এল। নজুমিয়াকে বলল,—ফকীর সাহেবের চেল্লা ভেঙে গেছে, আপনাকে তলব করেছেন। আপনার নসীব ভাল, কোন কোন দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেল্লা ভাঙে না।

কথা না বলে নজুমিয়া যুবকটীর সঙ্গে চলল। গাছের কোটর পরিস্কার করে তার মধ্যে একটী কুঠুরীতে ফকীর সাহেবের আস্তানা। দহলিজ বিছানো, চারদিকে তাকিয়া। তারই একটীতে হেলান দিয়ে বসে আছে ফকীর।

নজুমিয়াকে একটী তাকিয়া দিয়ে ফকীর জিজ্ঞেস করল,—নজুমিয়া যে, কি মনে করে ?

নজুমিয়া বলল,—হুজুরের জিয়ারত করতে এসেছি।

ফকীর বলল,—আমার কাছে এসেছ মাতব্বর ? এ তো ভারী আশ্চর্য্য কথা। তুমি না বলছিলে, ভণ্ডবুজরুগের সঙ্গে তোমার কোন কারবার নেই ?

নজুমিয়া বলল,—গোস্তাকি মাফ কর ফকীর সাহেব। আমি নাদান বেওকুফ, কি বলতে কি বলে ফেলেছি। তোমরা অলিআল্লা, তোমরা দোষখতা মাফ না করলে আমরা বাঁচি কি করে ?

ফকীর বলল,—না না নজুমিয়া, আমি রাগ করিনি। খোদা জানেন কে সাচ্চা আর কে মেকী। আমরা নিজেরাই অনেক সময়ে নিজেকে বুঝি না, অকারণে ধোঁকা দি, ধোঁকা খাই।

নজুমিয়া আরো অপ্রস্তুত হয়ে বলল,—আল্লার ওয়াস্তে মাফ কর ফকীর সাহেব। আর লজ্জা দিও না।

ফকির বলল,—সত্যি বলছি, তোমার উপর আমার কোন রাগ নেই।

নজুমিয়া বলল,—তবে মেহেরবানী করে গরীবের দাওয়াত কবুল কর। আমরা গাঁয়েতে থাকি, চাষাভূষো মানুষ, আমাদের ছদিন নসিহত করলে আল্লা খুসী হবেন। বল ফকীর সাহেব, আমার দোষ মাফ করেছ, আমাদের গাঁয়ে এসে মিলাদ শোনাবে ?

—আমার তো খুবই যাওয়ার ইচ্ছে, কিন্তু এখানকার বাসিন্দারা রাজী হলে হয়। দুদশ ঘর মুরিদ আছে, সাকরেদ তালেবেলম আছে, তাদের ফেলে যাই কি করে ?

নজুমিয়া বলল,—সে কথা আমরা শুনব না, ফকির সাহেব। মুরিদ সাকরেদরা তো তোমাকে সব সময় পায়। আমরা থাকি গাঁয়ে জঙ্গলে, আমাদের উপর একটু রহম না করলে চলবে কেন ? আমাদের এ তল্লাটে দরবেশ ফকির এমনিতেই বড় একটা আসে না—তুমি যখন মেহেরবানী করেছ, তখন কষ্ট করে আরো একটু দূরে যেতে হবে।

ফকির বলল,—তুমি যদি জোর কর, তবে আমাকে যেতেই হবে। কিন্তু এ মাসে তো পারব না, আসছে মাসে একটা দিন ঠিক করা যাবে।

নজুমিয়া বলল,—আর দেরী করে লাভ কি ? আজই দিনতারিখ বলে দাও।

শেষে ঠিক হল, আসছে মাসে পূর্ণিমা রাতে ফকির রহিমপুর যাবে। নজুমিয়া বলল,—ভাল দিনই ঠিক করেছ ফকির সাহেব, কার্ত্তিকের পূর্ণিমা, রাত পর্য্যন্ত দিনের মত উজালা।

নজুমিয়ার বাড়ীতে সাজসাজ রব পড়ে গেল। কাকে দাওয়াত করা হবে, কাকে কি কাজের ভার দেওয়া হবে—সে সব ব্যবস্থা আগে থেকে না করলে শেষে বড় গোলমাল হয়। সব ব্যাপারেই নজুমিয়া আয়েসার পরামর্শ নেয়, তাকে জিজ্ঞেস করতেই আয়েসা বলল,—দাওয়াত গাঁয়ের সবাইকে দিতে হবে। কাউকে বাদ দিতে পারবেনা। হোক সে হিন্দু, হোক সে মুসলমান।

নজুমিয়া বলল,—আসগরকে দাওয়াত দিতে বল ?

আয়েসা বলল,—সে বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে ? বাড়ীতে একটা ব্যাপার হচ্ছে, আল্লার নাম হবে, ওয়াজ হবে। দশজনকে ডাকছ, সেখানে গাঁয়ের একজন বড় মাতব্বরকে বাদ দিলে চলবে কেন ? আসবে না আসবে সে তার ইচ্ছে—দাওয়াত সবাইকে করতে হবে।

নজুমিয়াকে মানতে হল, কথাটা ঠিক। কাজও সেই রকম হল। কাউকে দাওয়াত করা হল চিঠি দিয়ে, কাউকে লোক পাঠিয়ে, কারুর বাড়ীতে নজুমিয়াকে নিজে যেত হল। আসগরের বাড়ী যেদিন গেল, সেদিন আসগর বাড়ী ছিল না। তার বাড়ীর লোকজন নজুমিয়াকে দেখে অবাক হয়ে গেল। নজুমিয়া বলল,—ধুলদীর ফকীর সাহেব মিলাদ মহফেলে আসবেন, তোমাদের মাতব্বরকে বলো, আমি দাওয়াত দিতে এসেছিলাম।

অবশেষে কার্ত্তিকের পূর্ণিমা এসে পড়ল। ভোর থেকে আয়েসা লোকজনের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে লাগল। চার পাঁচ শো লোক খাবে, সে এক এলাহি কাণ্ড। গাদা গাদা কলাপাতা কাটা হল, তা নইলে এত লোকের জন্য বাসন মিলবে কোথায় ?

মালেক কাণ্ড কারখানা দেখে থ। আয়েসাকে জিজ্ঞেস করল—দাদী, এ জেয়াফত কি জন্যে ?

আয়েসা গম্ভীর মুখে উত্তর দিল,—তোমার বিয়ে হবে, লোকজন খাবে না ?

মেয়ের দল হেসে উঠল—মালেক লজ্জা পেয়ে পালিয়ে গেল।

দুপুর আন্দাজ ফকির এসে পৌছল। মস্ত বড় ঘাসি নৌকো, মাস্তুলে চাঁদ

তারা মার্কা সবুজ নিশান, এসে ঘাটে ভিড়ল। নজুমিয়া ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ফকিরকে নামাতে এল, বলল,—হুজুর মেহেরবানী করে রহিমপুর এসেছেন, সেজন্য আমরা সবাই কৃতার্থ। গরীবের ঘরে হুজুরের ঠিক খাতিরদারী হবে না, দোষ ত্রুটীর জন্য আগে ভাগেই মাফ চাই।

ফকির নৌকো থেকে নামল। আজ গেরুয়া আলখাল্লার বদলে তার পরনে সাদা ধবধবে পায়জামা আর পিরহান। পিরহানের উপরে কালো সিদরিয়া, তাতে লাল সুতোর চুমকী কাজ। মাথায় মস্ত বড় সবুজ পাগড়ী।

ফকির বলল,—আল্লাতালা তোমাদের সকলের মঙ্গল করুন, খোদা হাফেজ।

নজুমিয়ার বাড়ীর দিকে সবাই চলেছে, এমন সময় গাঁয়ের পথে আসগরের সঙ্গে দেখা হল।

আসগর বলল,—আসসালামো আলায়কুম।

ফকির জবাব দিল,—ওয়ালায়কুম আসসালাম ইয়া রহমতুল্লা ইয়া বরকতাহু।

আসগর বলল,—তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম ফকির সাহেব। জরুরী কাজে আমাকে বাইরে যেতে হচ্ছে, মিলাদে শরীক হতে পারব না। গোস্তাকি মাফ করো।

নজুমিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল,—তুমিও মাফ করো।

আসসালামো আলায়কুম বলে কারু জবাবের অপেক্ষা না করে আসগর যে পথে এসেছিল, সে পথেই ফিরে গেল। ফকির কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু নজুমিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে চেপে গেল।

মিলাদের মজলিশে ফকিরকে আদর করে বসান হল। টানা ফরাস, তার এক কোণায় ফকির সাহেবের জন্য তাকিয়া পাতা, দুপাশে আতর দান, গোলাবদান, সামনে আগরবাতি আর ধূপলোবান।

ফকির সাহেব কোরাণ থেকে আয়েত পড়তে সুরু করল। গম্ভীর গলায় আরবী ছন্দের মন্থরগতি যেন আরো নিবিড় হয়ে উঠলো। ফকীর এক একটি আয়েত পড়ে, আর তার জের ধরে তার সাকরেদের দল সরু গলায় চেঁচিয়ে ওঠে। কি পড়ছে তার মানে কেউ বোঝে না, কিন্তু সবাই জানে খোদার কালাম, ভক্তিতে শ্রদ্ধায় তাদের মন পরিপ্লুত।

কোরাণ তেলাওয়াতের পরে ওয়াজ সুরু হল। দুনিয়ার সৃষ্টি থেকে সুরু

করে হজরত মোহাম্মদের জন্ম পর্য্যন্ত ঘটনা গুছিয়ে গুছিয়ে ফকির বলতে লাগল। আরবী ফারসী শব্দের সঙ্গে বাংলা জবান মিলিয়ে ফকিরের বর্ণনা, মাঝে মাঝে কবিতা আওড়ায়, তার ভাষা বোঝে কার সাধ্য? খোদার কুদরত এবং সৃষ্টির প্রথম দিনরাত্রির বর্ণনা শেষ করে ফকির ইবলিসের কাহিনী বলতে স্বুরু করল। ইবলিস ছিল ফেরেস্তাদের সেরা, কিন্তু অহঙ্কারের জন্য তার পতন হয়। মাটি দিয়ে আদমকে তৈরি করে তার মধ্যে রুহ সঞ্চার করে আল্লা ইবলিসকে বললেন, আদমকে সালাম কর। মূঢ় ইবলিস বলল, আমি আগুনের তৈরী আর আদম মাটির ঢেলা, ওকে কেন আমি সালাম করব? সেই অবাধ্যতার জন্য বেহস্ত থেকে বিতাড়িত ইবলিস পৃথিবীতে এসে আদমকে ভোলাবার ষড়যন্ত্র স্বুর করল।

আদম আর হাওয়া শয়তানের প্ররোচনায় বেহেস্ত থেকে বিতাড়িত হল, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আদমজাতকে খোরাকের সংস্থান করতে হবে, অসহ্য যন্ত্রণায় বুকের রক্ত জল করে হাওয়ার মেয়েরা পৃথিবীতে নতুন জীবনের সূত্রপাত করবে, এই হল আদম হাওয়ার শাস্তি!

ইব্রাহিমের খোদা ভক্তির তুলনা নাই! নিজের সন্তান ইসমাইলকে কোরবানী করতেও সে দ্বিধা করেনি। শতাব্দীর পরে শতাব্দী কেটে গেছে, খোদাভক্ত সাধু মহাপুরুষ পয়গম্বর নবী খোদার হুকুম তামিল করতে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করেছে। নূহ্, মুসা, ইসা, এবং আরো কত পয়গম্বর কত দেশে নিত্য নতুন ভাবে খোদার পয়গাম পৃথিবীতে পৌঁছিয়েছেন। আচার বদলেছে, ব্যবহার বদলেছে, দেশ বিদেশের ইতিহাস বদলেছে, কিন্তু আল্লার হুকুম বদলায়নি। সমস্ত বিপর্য্যয়, সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে বারবার খোদার বাণী ধ্বনিত হয়েছে, এবং সেই আদিম শাশ্বত বাণী নিয়েই আরবের মরুভূমিতে হজরত মোহাম্মদের আবির্ভাব। নতুন কোন পয়গাম হজরত আনেন নি, সেই চিরপুরাতন সত্যই নতুন ভাবে তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। তফাৎ শুধু এই যে হজরতের পরে আর সে বাণী বদলায় নি—তেরশ বৎসরেও কোরাণের একটি কথার অদল বদল হয়নি।

হজরতের গুণগান করে দরুদ পড়তে পড়তে ফকির দাঁড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মজলিশের সবাই দাঁড়িয়ে উঠল। সবাই এক সঙ্গে দরুদ পড়তে লাগল, কারু আওয়াজ মিঠে, কারু কর্কশ, কারু দরাজ, কারু ঢিমে, কিন্তু সকলেরই মনে এক আশা, আল্লার কালাম আবার প্রকাশিত হয়েছে, এবার আর পৃথিবীর কোন শক্তি তার বিকৃতি ঘটাতে পারবে না।

দরুদের শেষে ফকির বসে রোজ কেয়ামতের কাহিনী স্বুরু করল। সপ্তসূর্য

সেদিন আকাশে দীপ্ত হয়ে উঠবে, কাঁসার থালার মতন আকাশ জ্বলবে, পৃথিবী আগুনের হলকায় ঝলসে যাবে, সবুজের চিহ্ন কোথাও মিলবে না। আরশে বসে খোদা বিচার করবেন, যুগযুগান্তরের মানুষ বিচারাসনের সামনে জোড়হাতে এসে দাঁড়াবে। গোনাহগার ভয়ে কাঁপবে, মুসুল্লী মোতাক্কেদও ভরসা পাবে না। ধনীর সোনা রূপা সেদিন বিচ্ছুর মতন এসে তাকে কাটবে, কেবল দানখয়রাত যেটুকু যে করেছে, তাই এসে সেই রুদ্রদাহের মধ্যে তাদের মাথায় একটু ছায়া এনে দেবে। সব নবী সব পয়গম্বর নিজের নিজের উম্মতের জন্য খোদার দরগায় মোনাজাত করবেন, শেষ নবী আল্লার হবীব সেদিন সারা দুনিয়ার জন্য নাজাত ভিক্ষা চাইবেন।

সবাই আবার উঠে দাঁড়িয়ে দরুদ পড়তে সুরু করল। খোদার হবীব মানুষের বন্ধু হজরত মোহাম্মদ—তাঁর শান্তির বাণী সমস্ত পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ুক সকলের মনে শান্তি আসুক।

ফকির মোনাজাত সুরু করল। খোদার রহম সকলের উপর বর্ষিত হোক, দুনিয়ায় সুখস্বাচ্ছন্দ্য আর আরাম এবং আখেরাতে নাজাত হোক সকলের।

সাত

মিলাদ পড়া শেষ হয়ে গেল কিন্তু তবু খানিকক্ষণ মজলিসের কারু মুখে কোন কথা নেই। শেষে এক বুড়ো উঠে ফকিরের কাছে এসে বলল,—বাবা আমি গুনাহ্‌গার, আমাকে দোয়া করো, আমার দোষগুণাহ যেন মাফ হয়।

ফকির তার মাথায় হাত রেখে বলল,—আল্লাহ্‌ মেহেরবান, তিনি সব গুণাহ মাফ করে দেবেন, তোমার কষ্ট কিসের ?

বুড়ো বলল,—চোখের জ্যোতি কমে গেছে, আগের মত দেখতে পাইনা।

ফকির হেসে বলল,—খোদা তোমাকে দীর্ঘ জীবন দিয়েছেন, জোয়ান বয়সের চোখের দৃষ্টি আজ কেমন করে থাকবে ?

আর একজন এসে ফকিরকে বলল,—তার মেয়ের উপর কি জানি কি ভর করেছে ; তার জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছে। যখন দশা আসে, তখন তার দিকে তাকান যায় না। ভীষণ চীৎকার করে মাটিতে গড়াগড়ি দেয়, হাত পা ছুঁড়তে থাকে। শেষে যখন চীৎকার বন্ধ হয়, তখন মুখ ফেনায় ভরে যায়, দাঁতে দাঁতে লেগে যায়, সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে যায়। কখনো কখনো সারা দিনরাত অজ্ঞান হয়ে থাকে।

ফকির জিজ্ঞেস করল,—আর কোন বিশেষ লক্ষণ আছে ?

বুড়ো বলল,—না, বাবা, এমনিতে তো বাড়ন্ত মেয়ে, কোন ব্যারাম নেই, তবু দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে।

ফকির বলল,—না দেখে ঠিক বলতে পারি না, কিন্তু মনে হয় তোমার মেয়ের উপর জিন ভর করেছে।

নজুমিয়া বলল,—তুমি তোমার মেয়েকে এখানে নিয়ে এস। ততক্ষণে আম্মাজান এবং অন্যান্য মেয়েরা ফকির সাহেবের কদমবুসি করতে পারবেন।

নজুমিয়া ফকিরকে অন্দর মহলে নিয়ে গেল। আয়েসা লম্বা ঘোমটা দিয়ে এসে ফকিরকে সালাম করল। ফকির হেসে বলল,—আমাকে লজ্জা কেন মা ? আমাকে তোমার ছেলে মনে করো।

আয়েসা মালেককে এনে ফকিরের সামনে বসাল। বলল,—ফকির সাহেবকে সালাম করো। ফকিরকে বলল,—বাবা দোয়া করো, এই আমার নাতি, আমার বুড়ো বয়সের শেষ ভরসা।

ফকির মালেকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল,—মা নেই ? আয়েসার মুখ অন্ধকার হয়ে এল, মুখ নামিয়ে বলল,—না।

ফকির মালেককে টেনে কোলে বসিয়ে বলল,—খোদার রসুলও তোমার মত এতিম ছিলেন। আল্লাহ্ তোমার ভালো করবেন। বলে তার মাথায়, পিঠে হাত বুলোতে লাগল।

আয়েসার মনের ভার কেটে গেল একগাল হেসে বলল,—মরবার আগে আমার এক সাধ, মালেকের বউ দেখে যাব। কিন্তু আমার ছেলে কথা শোনে না, খালি খালি দেরী করছে।

ফকির হেসে বলল,—হবে মা, হবে, এত তাড়া কিসের ? এই দুধের বাচ্চা বিয়ের কি বোঝে ?

আয়েসা বলল,—মালেকের দশ বছর পুরো হতে চলল। এ বয়সে তো অনেকেরই বিয়ে হয়।

ফকির বলল,—সে জমানা চলে গেছে। আর বয়স না হলে বিয়ে না দেওয়াই ভালো। জানো মা, ইসলামের আদি যুগে নাবালক ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেওয়া মানা ছিল।

আয়েসা মাথা নেড়ে বলল,—সে সব আমরা জানিনে। চিরকাল দেখেছি যে নয় দশ বছরের ছেলেমেয়েদের বিয়ে হয়। ঘরে কচি বউ এলে দাদা-

দাদীদের ভালো লাগে। আমাদের গেরস্ত ঘরে কচি বয়সে না এলে মেয়েরা বাড়ীর হালচালই বা শিখবে কি করে ? না, ফকীর সাহেব, ধাড়ি বউ দিয়ে আমাদের চলবে না।

ততক্ষণে ইব্রাহিম তার মেয়েকে নিয়ে পৌঁছে গেছে। মেয়েটীর বয়স বছর পনেরো, ভয়ে ভরা বড়ো বড়ো চোখ, রোগা শরীর, কিন্তু বুকের উপর স্তনদুটি যেন ভারে ফেটে পড়ছে। মুখ শুকনো, গায়ের চামড়া বিবর্ণ, কিন্তু চোখ দুটি জ্বলছে। ভয়-পাওয়া জানোয়ারের মত চোখ। তার বাপের পিছনে পিছনে এলো যেন কাঠের পুতুল। ফকিরকে সালাম করে মাটিতে বসে পড়ল, ইব্রাহিম বলল,—এই হতভাগী আমার মেয়ে।

ফকীর মেয়েটির কপালে হাত রেখে ধীরে ধীরে বলল,—ভয় কিসের মা ? তোমার কষ্ট কি বলো তো ?

ফকিরের স্পর্শে মেয়েটি শিউরে উঠল। একটু চুপ করে থেকে একটানা স্বরে বলল,—আমাকে ভূতে পেয়েছে। একদিন সন্ধ্যেবেলা নদী থেকে কলসি ভরে ফিরছিলাম, হঠাৎ অন্ধকারে বাঁশবনে দেখলাম কালো উলঙ্গ মূর্ত্তি। চোখগুলো ভাঁটার মত জ্বলছে, যেন আমাকে আগুনে ঝলসে দেবে। কেমন করে যে বাড়ী পৌঁছোলাম, মনে নাই। মার কাছে শুনেছি, উঠোনে পা দিয়েই চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়ি। সেই থেকে অন্ধকার হলেই সে এসে আমার সামনে দাঁড়ায়। একলা থাকতে ভয় পাই।

মেয়েটি একটানা সুরে কথা সুরু করেছিল, কিন্তু বলতে বলতে তার আওয়াজ চড়তে লাগল। হাতপা কঠিন হয়ে মুখে ফেনা উঠতে লাগল, চীৎকার করে বলতে লাগল,—ওই যে ওখানে দাঁড়িয়ে, আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ওর লজ্জা সরম নেই, তোমরা এত লোক এখানে, তবু উলঙ্গ হয়ে নাচছে, এখুনি আমাকে গ্রাস করবে। ওর হাত থেকে আমাকে বাঁচাও। খানিকক্ষণ জবাই করা মুর্গীর মত লুটোপুটি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

ফকির তার নাড়ী টিপে দেখল। চোখের পাতা তুলে চোখ পরীক্ষা করল, দেখল চোখের তারা বিস্ফারিত, নাড়ী দ্রুত, অনিয়মিত।

ফকির বলল,—এক গামলা পানি আর খানিকটা হলুদ নিয়ে এস। ঠাণ্ডা জল দিয়ে মাথা ধুয়ে চোখে বারে বারে জলের ছিটে দিল। আগুন জ্বালিয়ে পোড়া হলুদ মেয়েটির নাকের কাছে ধরল। মূর্চ্ছার মধ্যেও সে সরে যেতে চেষ্টা করল কিন্তু ফকির তাকে ছাড়ল না। এক টুকরো ছোট

রশি নিয়ে মেয়েটিকে মারতে আরম্ভ করল। খানিক পরে তার জ্ঞান ফিরে এলে চীৎকার করে কেঁদে উঠল,—থামো, থামো আর মেরো না।

যারা উপস্থিত ছিল তাদের দিকে তাকিয়ে ফকির বলল,—মেয়েটি নিজে কথা বলছে না, তার মুখ দিয়ে কথা বলছে জিন। যতক্ষণ ওকে ছেড়ে যেতে রাজী না হবে, আমিও জিনকে রেহাই দেব না।

পোড়া হলুদের গন্ধ আর মার সহ্য করতে না পেরে মেয়েটি আবার বলল,—আমাকে আর কষ্ট দিও না বাবা।

ফকির বলল,—এবার বাছাধনকে কাবুতে এনেছি। আর একজনের হাতে রশি দিয়ে মেয়েটিকে মারতে বলল, আর নিজে গামলাভরা জল নিয়ে তার ওপর কি মন্ত্র পড়তে স্রুরু করল। সাতবার পড়ে জলে ফুঁ দিল, কিছুটা মেয়েটির মাথায় ছিটিয়ে দিল, মুখের মধ্যেও দিল কয়েক ফোঁটা।

মেয়েটীর মাথায় হাত রেখে ফকির চীৎকার করে জিজ্ঞেস করল,—এবার মেয়েটিকে চিরজীবনের মত ছেড়ে যাবি?

অস্বাভাবিক নাকীসুরে মেয়েটি বলল,—তুমি যা বল্‌বে তাই করব!

ফকির সঙ্গের লোকটিকে বলল,—আরও জোরে মারো। নিজে চীৎকার করে মেয়েটিকে বলল,—তোমাকে এত সহজে রেহাই দিচ্ছি না। মেয়েটিকে যে ছেড়ে যাচ্ছ তার প্রমাণ দিতে হবে। এই কলসিভরা জল দাঁত দিয়ে তুলে নিয়ে সাতপা যেতে হবে।

মেয়েটি কাঠের পুতুলের মত উঠে দাঁড়াল, দাঁত দিয়ে কলসি তুলে সাতপা হেঁটে গেল। তারপরে বেহুঁস হয়ে মাটিতে পড়ে গেল, কলসি ভেঙে জলে সমস্ত দেহ ভিজে গেল, সেই জলের মধ্যেই সে পড়ে রইল।

ফকির বলল,—শোকর আল্লা, এবার জিন ওকে ছেড়ে গেছে, আর কোনদিন ওকে কষ্ট দেবেনা।

ইব্রাহিমকে একপাশে টেনে নিয়ে বলল,—তোমার মেয়ের শীগ্‌গির শীগ্‌গির বিয়ে দাও, সোমত্ত হয়েছে, এখন ওর সোয়ামীর শাসন, সোয়ামীর আদর দরকার, আর দেরী করো না।

সকলে অবাক হয়ে ফকিরের দিকে তাকিয়ে রইল, তাদের ভক্তি আরো বেড়ে গেল। আয়েসাকে ফকির বলল,—কোন ভয় নেই মা, আল্লাহ্‌ মেহেরবান, তোমার ঘর সোনার ধানে ভরে দেবেন।

দুপুর রাত পর্য্যন্ত খাওয়াদাওয়ার হাঙ্গামা চলল, সমস্ত গ্রাম নজুমিয়ার

তারিফ করতে লাগল। কারু জন্মকালের মধ্যে এত বড়ো জেয়াফত গ্রামে হয়নি।

আট

শীত বসন্ত গিয়ে এখন গ্রীষ্মের প্রচণ্ড প্রতাপ। বৈশাখ শেষ হয়ে এল, কিন্তু তবু আকাশে মেঘের লেশ নেই। সূর্য্যের আলো গলা তামার মত পৃথিবীতে ঢেলে পড়ছে। মাটি শুকনো, জলের জন্য কাঁদ্‌ছে, ঘাস ঝল্‌সে গেছে। গাছের পাতাগুলো শুক্‌নো, কোথাও এক নিশ্বাস বাতাস নেই। চারদিক প্রচণ্ড গ্রীষ্মে ভারাতুর।

চোখ-ধাঁধানো আলোর মধ্যে বিশীর্ণ পদ্মার ওপার দেখা যায় না। কে বলবে, ভাদ্রের ভরা পদ্মার আজ এ দশা! ভাদ্রের নদীর ভরা যৌবন। আজ যৌবনের শেষে পাঁজড়ার হাড়ের মত এখানে ওখানে চর জেগে উঠেছে। পালিশকরা ইস্পাতের মত আকাশ, পালিশকরা ইস্পাতের মত নদীর জল। নদী থেকে আকাশে, আকাশ থেকে নদীতে চারিদিকে আলো আর গরম ঠিকরে পড়ছে।

তখনো ন'টা বাজেনি কিন্তু দুরন্ত গ্রীষ্মের আলোতে বাইরে বেরুবার উপায় নেই। পশুপক্ষী যেখানে একটু ছায়া, সেখানেই মাথা গুঁজে ধুঁকছে। এত গরম যে গাছের পাতাও নড়ছেনা। চারদিক নিস্তব্ধ—যেন আগুনের পর্দ্দায় আকাশ-পৃথিবী সব ছেয়ে গেছে।

নজুমিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বলল,—এ যে ভাদ্রের তাল-পাকানো রোদ। এত সকালে এত গরম হবে কে ভেবেছে? এতো আকাশ নয়, জ্বলন্ত হাঁপর।

রমজান বলল,—তোমাকে তো আগেই বলেছিলেম পঞ্চায়েত, কিন্তু তুমি বিশ্বাস করতে চাওনা। দুকুড়ি পেরিয়ে গেল, কিন্তু জন্ম কালে এমন গ্রীষ্ম দেখিনি।

নজুমিয়া বলল,—ওটা তোমার একটা খেয়াল। প্রত্যেক বছরই মনে হয়, গরম এমন আর কোনদিন পড়েনি।

ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে ইদ্রিস নজুমিয়ার কথা শুনে বলল,—না পঞ্চায়েত, রমজান ঠিকই বলেছে। এ বছর সবই আলাদা, একেতো অসহ্য গরম, তার ওপর এক পলক বাতাস নেই, মোটেই সুবিধে মনে হচ্ছে না।

নজুমিয়া বলল,—কেন অন্যায়টা কি হল? এ বছর তেমন ঝড়বৃষ্টি হয়নি, সে তো ভালো কথা। গত বছর কালবৈশাখীর ঠেলায় সব কাজকর্ম্ম বন্ধ ছিল। ভাগ্যে এ বছর এখনও ঝড়বৃষ্টি সুরু হয়নি।

ইদ্রিস গম্ভীরস্বরে উত্তর দিল,—ঝড়ঝাপটার মৌসুমে যদি ঝড় না হয়, সে তো ভালো কথা নয়। একবার বৈশাখী ঝড় শেষ হয়ে গেলে নিশ্চিন্ত মনে কাজে নামা যায়। এ বছর ঝড়েরও চিহ্ন নেই, আকাশে মেঘেরও কোন চিহ্ন নেই।

নজুমিয়া হেসে কথাটা ওড়াতে চেষ্টা করে বলল,—তুমি খালি খালি ভয় পাচ্ছ। এই তো সবে বৈশাখের শেষ, এখনও সারা জ্যৈষ্ঠ পড়ে রয়েছে। আষাঢ় আসুক বর্ষাও নামবে। দেখনি, পদ্মার জল বাড়তে সুরু করেছে।

ইদ্রিস বলল,—খোদা মালেক, কিন্তু তবু আমার ভয় করছে। বাপের কাছে শুনেছি যে বছর কুড়ি আগে একবার সারা বৈশাখে একদিনও ঝড় হয়নি, আকাশে একটু মেঘ দেখা যায়নি। শেষে যখন মেঘ নামল, তখন এমন তুফান উঠল যে সারা দেশ ভেসে গেল।

নজুমিয়া বলল,—যা হবার তা হবে, তা নিয়ে খালি খালি ভাবনা করে কি লাভ? রমজানের দিকে তাকিয়ে বলল,—নৌকো তৈরী আছে তো?

ইদ্রিস জিজ্ঞেস করল,—নৌকো করে কোথায় যাবে?

নজুমিয়া রাগতস্বরে বলল,—তোমাদের কি ভীমরতিতে ধরেছে? খেয়াল নেই যে আজকে চাঁদের দশ'ই। জমিদারের দেওয়ান পূর্ণিমার দিন ধুলদীর হাটে আসবে। সেদিন সালতামামি করতে হবে না? এখন গিয়ে টাকা আদায় না করলে জমিদারের খাজনা দেব কেমন করে? আর যদি কোন রকমে তামাদি হয়ে যায়, তবে জমিদার জমি বাজেয়াপ্ত করবে না?

—আজকে পদ্মা পাড়ি নাইবা দিলে? পুঁজির টাকা থেকে জমিদারের খাজনা শোধ দিয়ে দাও; বর্ষা নামুক, তারপরে পদ্মা পাড়ি দিলেই চলবে।

নজুমিয়া বলল,—আজকে পাড়ি দিতে আপত্তি কিসের?

—জানো তো সর্দ্দার, লোকে কি বলে? বৈশাখের পদ্মা রাক্ষুসী। তাকে লোভ দেখিয়ে লাভ কি?

নজুমিয়া ধমক দিয়ে উঠল,—মেয়ে মানুষের মত কথা বলো না। বৈশাখ মাসে পদ্মা রাক্ষুসী, আষাঢ় মাসে পদ্মা দুরন্ত আর ভাদ্রের পদ্মা বিশ্বাসঘাতক, এসব কেচ্ছা শুনলে কাজ চলেনা। যাদের মুরোদ আছে তারা কি

কোনদিন পদ্মার ভয়ে ঘরে বসে থাকে ? আকাশ এখন পরিস্কার, বেলাও বেশী হয়নি। যদি ঝড় ওঠেও, তবু বৈশাখী ঝড় বিকেলের দিকেই উঠবে। স্রোতে নৌকো ভাসিয়ে যদি দাঁড় বেয়ে যাই, তবে দু ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টায় নদী পার হয়ে যাব। দুপুরের আগেই পৌঁছব ওপারে।

আয়েসা বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল,—ঝগড়া হচ্ছে কি নিয়ে তোমাদের ?

নজুমিয়া ইদ্রিসের দিকে রাগত ভাবে তাকাল। পরে আয়েসার দিকে ফিরে বলল,—ওপারে যে নতুন চর বিলি করেছি, তার খাজনা আদায় করতে যেতে হবে। তাই ইদ্রিসকে নৌকো তৈরী করতে বল্‌ছি।

—এই ঝড়বাদলের দিনে পদ্মা পাড়ি দিতে চাও ?

নজুমিয়া বলল,—ঝড়তুফানের কথা কি বলছ আম্মা ? আকাশে এক টুকরো মেঘ নেই, বাতাসও একেবারে বন্ধ, ঝড়তুফানের তো আজ নাম গন্ধও নেই।

আয়েসা বলল,—এ সব চালাকি রাখো। বৈশাখ মাসের পদ্মাকে বিশ্বেস নেই। সকালে চারদিক পরিষ্কার, কিন্তু দুপুর না হতে হতে তুফানে চারদিক তোলপাড় করে তোলে।

নজুমিয়া বলল,—রোজই কি আর ঝড় হয় আম্মা ? আর বৈশাখের ঝড় এলেও বিকেলের আগে আসে না। আমরা সকাল থাকতে থাকতেই নদী পার হয়ে যাব। তাই তো এক্ষুনি রওয়ানা হতে চাই।

আয়েসার রাগ অনুনয় মানা কিছুতেই ফল হল না। নজুমিয়া তাকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করল, শেষে বলল,—সব সময়ে ভয় করলে কি আমাদের চলে ? আমরা পদ্মাপাড়ের লোক। ঝড়তুফানের সঙ্গে লড়াই করেই আমাদের জীবন। পদ্মার মেজাজ আমাদের ভালোই জানা আছে।

আয়েসা তবু গজরাতে লাগল,—পদ্মার মেজাজ আমিও জানি, ওর ছলাকলার অন্ত নাই। আজ মনে হচ্ছে যে রাক্ষুসী শিকার ধরবার জন্যে ওঁৎ পেতে বসে আছে, তাই আজ সে এতো চুপ।

ছুটতে ছুটতে মালেক এসে পৌঁছল। বলল,—বাবা আমিও যাব।

আয়েসা তাকে এক ঝটকায় বুকে টেনে নিয়ে বলল,—এখনো তুই বড় হসনি। এখনো তোকে আমার কথা মেনে চলতে হবে।

নজুমিয়া হেসে বলল,—তুমি কি বলতে চাও, আমি তোমার কথা অমান্য করি ? তা মালেককে রাখতে চাও, থাক ও তোমার কাছে।

মালেককে বুকে চেপে আয়েসা বলল,—আজকের দিনটা দেখে কাল গেলে হয়না বাবা ?

নজুমিয়া মিনতি করে বলল,—তোমার কথা কি কখনো সাধ করে ঠেলি ? আজ যে আমাদের না গেলেই নয়। পূর্ণিমায় খাজনা শোধ করতে হবে, নতুন চরের প্রজাদের কাছে টাকা না পেলে জমিদারের পাওনা শোধ করব কেমন করে ?

আয়েসা বলল,—এক বছরের খাজনা সব সময়ে হাতে রাখা ঠিক ! ধর যদি ঝড় বৃষ্টি হয়ে পারাপার বন্ধ থাকত, তবে খাজনা দিতে কেমন করে ?

নজুমিয়া বলল,—ঠিক কথা বলেছ আম্মা। এবার থেকে এক বছরের খাজনা সব সময় মজুদ রাখব।

আয়েসা বলল,—এ বছরের খাজনা না হয় আমার জেওয়রগয়না বিক্রী করে দাও।

নজুমিয়া হেসে উঠে বলল,—তোমার জেওয়রগয়না মালেকের বউয়ের জন্য রেখে দাও আম্মা। আর সত্যি সত্যি তো ঝড়তুফান ওঠেনি। আকাশ পরিস্কার, স্রোতে নৌকো ভাসিয়ে আমরা বেলাবেলি নদী পার হয়ে যাব। সন্ধ্যার মধ্যেই যদি খাজনা উশুল হয়ে যায়, তবে ভোর রাত্রে নৌকো ছেড়ে খোদা চান তো কাল দুপুরবেলা বাড়ীতেই ভাত খাব।

আয়েসা বলল,—যদি নেহাত যাবেই তবে বসিরকে সঙ্গে নিয়ে যাও। কম করেও সে হাজার বার পদ্মা পাড়ি দিয়েছে, তার মতন মাঝি এ তল্লাটে নেই।

নৌকো পদ্মা পাড়ি দিল। আকাশে সূর্য্যের অসহ্য দাহ। বালি তেতে উঠে যেন চারদিকে আগুন ঠিকরে পড়ছে। পদ্মার জলের উপর পাতলা কুয়াসা। প্রচণ্ড আলোয় চোখ ধেঁধে যায়।

রমজান জিজ্ঞাসা করল,—বাদাম তুলে দেব ?

বুড়ো বসির হাল ধরে বসেছিল, বলল,—পাল খাটাতে চাও খাটাও, কিন্তু হাওয়া কই ? তার চেয়ে বরং সবাই মিলে বৈঠে ধরো, একবার কোন রকমে বড় নদী পার হতে পারলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

নজুমিয়া বলল,—শেষে কি তোমারও ভয় করছে বসির ?

বসির বলল,—ভয়ের কথা নয় পঞ্চায়েত, কিন্তু নদীর রকমসকম আজ আমার ভালো লাগছে না, বড্ড বেশী ঠাণ্ডা আর চুপ। বড় গাঙ কোন রকমে পার হতে পারলে বাঁচি!

ততক্ষণে ইদ্রিস আর রমজান পাল তুলে দিয়েছে কিন্তু বাতাস কই? কপালের ঘাম মুছতে মুছতে রমজান বললো,—এক ফোঁটা বাতাস নেই।

বসির বলল,—সে কথা তো আগেই তোমায় বলেছি। তা এখন থেকেই কপাল মুছতে স্রুরু করলে কেন? ষাঁড়ের মত জোয়ান, বৈঠে মারতে ভয় পাও? প্রাণপণে বৈঠে মারো, কোন রকমে নদী পার হয়ে যাই!

ইদ্রিস বলল,—আগে এক ছিলুম তামাক খেয়ে নিই, তার পরে নৌকো উড়িয়ে নিয়ে যাব।

নজুমিয়ার দিকে ফিরে বলল,—তোমার জন্য তামাক সাজবো পঞ্চায়েত?

নজুমিয়া হাসল, কিছু বলল না। ইদ্রিস যত্ন করে তামাক সাজতে স্রুরু করল, হুঁকোর পুরোনো জল ফেলে দিয়ে, নদীর তাজা জল হুঁকোয় ভরে বিরক্তির স্বরে বলল,—নদীর জলও কি রকম গরম হয়ে উঠেছে। এরকম হলে কি কাজ করা যায়?

রমজান ততক্ষণে বৈঠে মারতে স্রুরু করে দিয়েছে। গামছা বেঁধেছে মাথায় পাগড়ীর মত করে, বুক পিঠ খালি। প্রখর সূর্য্যালোকে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম শিশিরের মত ঝলকে উঠছে।

নৌকো মাঝদরিয়ার কাছাকাছি এসে পড়ল। এতক্ষণ বাঁকের আড়ালে ছিল বলে স্রোতের পুরো বেগ পায়নি, এখন পদ্মার প্রচণ্ড স্রোতে নৌকো কেঁপে উঠল। বসির চেঁচিয়ে উঠল,—তোমার হুঁকো রেখে দাও ইদ্রিস। এবার বৈঠে ছেড়ে দুজনেই দাঁড় ধরো, নতুন পানি নেমেছে, ক্ষুরের মত ধার স্রোতে।

ইদ্রিসের তখনও তামাক খাওয়া শেষ হয়নি, কিন্তু কি করে? হুঁকো রেখে দিয়ে দাঁড় ধরল। মাঝদরিয়ার তীব্র স্রোতে নৌকোর মুখ ঘুরে গেল। জলের মৃদু কল্লোলের বদলে এখন স্রোতের হিংস্র তীক্ষ্ণ ডাক। সবাই একসঙ্গে বদর বদর বলে চেঁচিয়ে উঠল।

বসির বলল,—স্রোতের বিরুদ্ধে যাওয়ার চেষ্টা করো না। যদি খানিকটা ভাটিতে নিয়ে যায়, পারের কাছে গিয়ে ফিরে আসা যাবে। মাস্তুল নামিয়ে দাও, বাদাম গুটিয়ে ফেলো। নৌকো হালকা করে দাও, বাকি খোদার ভরসা।

কয়েক মিনিট কোন কথাবার্ত্তা নেই। কেবল স্রোতের ডাক আর দাঁড়ের শব্দ। রমজান আর ইদ্রিস দুজনেই ঘামে একেবারে নেয়ে উঠল, বসিরও বাদ গেল না। খালি হাল ধরে বসে না থেকে সে হাল দিয়ে নৌকো চালাতেও লাগল।

খানিকক্ষণ পরে কপালের ঘাম মুছে বসির বলল,—আর ঘণ্টাখানেক যদি ভালয় ভালয় যায়, তবে আর ভয় থাকবে না।

রমজান বলল,—তা হলে আর একবার তামাক সাজব ?

বসির হেসে উঠে বলল,—এখন মরবার সময় নেই, আর নবাবসাহেব তামাকের হিসাব করছেন !

ইদ্রিস ফোড়ন দিল,—তুমি মাঝিকে চেনোনা রমজান, তা নইলে এ রকম বাজে কথা জিজ্ঞেস করতে না !

হঠাৎ দমকা বাতাসে নৌকো টলে উঠল।

রমজান বলল, - তবু এতক্ষণে একটু হাওয়া দিয়েছে। বাঁচা গেল যা গরম !

ইদ্রিস কপাল মুছে বলল,—এতো বাতাস নয়, যেন আগুনের হলকা।

বসিরের মুখ আরও গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল,—খোদা করেন বাতাস যেন না বাড়ে। বৈশাখ মাসে একবার হাওয়া উঠলে কখন যে তুফান সুরু হয়ে যায়, তার ঠিকানা পাওয়া মুস্কিল। এ মাঝদরিয়ায় তুফান উঠলে নৌকো সামলান কঠিন হবে।

নজুমিয়া গলুই-এর ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল,—ঝড় তুফানের কথা কি শুনছি ?

ইদ্রিস কপাল মুছতে মুছতে বলল,—হাওয়ার জোর নেই। কপালের ঘামও এতে শুকোয় না।

কিন্তু ইদ্রিসের কথা টিকল না। অল্পক্ষণের মধ্যেই জোর বাতাস উঠল। উত্তর পশ্চিম থেকে এক একটা ঝাপটা এসে নদীর জল তোলপাড় করে তুলল। ঢেউয়ের জোর বাড়তে লাগল এবং সঙ্গে সঙ্গে নৌকো আছাড় খেতে সুরু করল। সবাই ব্যাকুল হয়ে আকাশের দিকে বারবার তাকাতে লাগল। পশ্চিমে ছোট এক টুক্‌রো কালো মেঘ, দেখতে ছোট, কিন্তু কি ঘন কালো তার রঙ, আকাশে যেন কে কালি ছিটিয়ে দিয়েছে।

এতক্ষণ কোথাও কোন সাড়া শব্দ ছিল না। হঠাৎ গাঙচিলের ডাকে

আকাশ ভরে গেল। বাতাস তীব্র হয়ে উঠল, তার সোঁ-সোঁ শব্দে বাকি সমস্ত আওয়াজ ডুবে গেল। বড় বড় ঢেউ এসে নৌকার উপর ভেঙে পড়তে লাগল। আকাশে যে মেঘের টুকরো দেখা দিয়েছিল, দেখতে দেখতে তা বেড়ে চারদিক ছেয়ে ফেলল। তামাটে মেঘের আড়ালে সূর্য্য ঢাকা পড়ে যাওয়াতে সমস্ত অন্ধকার হয়ে এল। স্তিমিত আলোয় পদ্মার জল যেন আরও ভয়ানক মনে হতে লাগল। বাতাসের ডাক আর নদীর গর্জ্জন মিলে সে এক তুমুল কাণ্ড বেধে গেল।

বিরাট নদী, অসীম আকাশ আর প্রচণ্ড বাতাস—তারই মধ্যে ছোট নৌকোয় কয়েকটি প্রাণী। প্রাণপণে তারা ঝড়ের সঙ্গে লড়তে লাগল, কিন্তু তাদের মুখের বদর বদর ডাক নদীর গর্জ্জনে চাপা পড়ে গেল।

ইদ্রিস চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল,—ফিরে যেতে চেষ্টা করব ?

বসির নজুমিয়ার দিকে তাকাল, নজুমিয়া বলল,—এখন ফেরার চেষ্টা বৃথা। মাঝদরিয়া পার হয়ে গেছি, এখন ওপাড়ে যাওয়াই হয় তো সহজ হবে।

বসির মাথা নেড়ে সায় দিল,—সামনে এগোতে পারলে তবু বাঁচার আশা আছে। তুফান যেদিকে চায় নিয়ে যাক, একবার কূলে পৌঁছতে পারলে হয়।

মাঝিমাল্লা পঞ্চায়েত সবাই ঝড়ের সঙ্গে লড়ছে। মেঘের আবছা অন্ধকারে তাদের মানুষ বলে মনে হয় না। থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল কিন্তু বিদ্যুৎ ঝলকেও জমাট অন্ধকার যেন কমছে না। মেঘের ডাকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পদ্মার গভীর গর্জ্জন। ঢেউএর আঘাতে নৌকো এক একবার কেঁপে উঠছে আর ফেনায় পাটাতন ভরে যাচ্ছে। দীর্ঘ ঢেউএর রেখার উপরে জমানো ফেনা যেন হিংস্র অজগরের জিভের মত লক্‌লক্ করছে।

হঠাৎ বাতাস ঘুরে গেল। নজুমিয়া চেঁচিয়ে উঠল,—এবার পূবে বাতাস দিচ্ছে।

বসির চেঁচিয়ে জবাব দিল,—তা হলে নদী পার হওয়ার আশাও ঘুচে গেল।

রমজান চেঁচিয়ে উঠল,—ঝড়ের মুখে নৌকো ছেড়ে দিয়ে দেখি না কেন ? বাদাম তুলে দি, তুফান যেখানে খুসী নিয়ে যাক।

বসির বলল,—এখন বাদাম তুললে আর বাঁচন নেই।

নজুমিয়া বলল,—নৌকোর মুখ ঝড়ের দিকে রাখাই ভালো। পাশে ঝাপটা লাগলেই নৌকো উল্টোবার ভয় বেশি।

প্রাণপণে তারা ঝড়ের বিরুদ্ধে লড়তে থাকল কিন্তু হঠাৎ দমকা হাওয়ায় নৌকোর মুখ গেল ঘুরে। বসির নৌকো ফেরাবার চেষ্টা করল প্রাণপণে, কিন্তু প্রচণ্ড বাতাসে হাল ছিঁড়ে গিয়ে বসির ছিট্‌কে পড়ল নৌকো থেকে।

রমজান ডুক্‌রে কেঁদে উঠল,—এবার আর রক্ষে নেই।

নজুমিয়া গর্জ্জন করে উঠল,—কান্না থামাও। যদি মরতেই হয়, ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে মরদের মত মরব।

হাল-বিহীন নৌকো আর বাগ মানে না। কিন্তু তবু নজুমিয়া, ইদ্রিস আর রমজান, তিনজনে বৈঠে হাতে নৌকো বাঁচাবার শেষ চেষ্টা করতে লাগল। নদীর প্রচণ্ড ঢেউএ জল উঠতে সুরু করল নৌকোর ছুপাশ থেকে। নজুমিয়া বলল,—বৈঠে ছেড়ো না। যদি নৌকো ডোবেও, বৈঠে ধরে হয়তো কোন চরে গিয়ে উঠতে পারব।

তাকে ব্যঙ্গ করেই যেন বাতাসের গর্জ্জন আরও তীব্র হয়ে উঠল। বিরাট এক ঢেউয়ের মাথায় নৌকো ফুলে উঠল যেন আকাশের দিকে, পর মুহূর্ত্তেই নৌকো আবার নেমে গেল পাতালে। যখন ঢেউ ভাঙল তখন নৌকোর আর কোন চিহ্ন নেই।

বৈশাখী ঝড় যেমনি হঠাৎ সুরু হয়েছিল, তেমনি হঠাৎ থেমে গেল। হয় তো ঘণ্টাখানেক তুফান ছিল, হয় তো তার চেয়েও কম। বাতাস শান্ত হয়ে এল, বিরাট পদ্মার বুকে ছুলতে লাগল লম্বা ঢেউয়ের রেখা দিগন্ত থেকে দিগন্তে।

পশ্চিম আকাশে তখনো ছুএক খণ্ড ছেঁড়া মেঘ। মেঘের শিখায় শিখায় আগুন জ্বালিয়ে সূর্য্য ডুবে গেল।

জেনারেল ক্লড মার্টিনের উইল

নবেন্দু বসু

কলিকাতা আর লক্ষ্ণৌ-এ লা মার্টিনিয়র নামক ইংরাজী বিদ্যালয়গুলির প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল ক্লড মার্টিনের নাম সকলেই জানেন। ফ্রান্সের লিয়ন্স নগরে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৬৩ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে সামরিক শিক্ষানবীশীতে যোগ দিয়ে ১৭৯৩ সালে মেজর জেনারেলের পদে ওঠেন। ইতিমধ্যে ১৭৬৬ সাল থেকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুমতিতে অযোধ্যার নবাবের অধীনে সেনাপতির কাজে বাহাল থাকেন, আর লক্ষ্ণৌতে বাস করতে থাকেন। ১৮০১ সালে, ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে, লক্ষ্ণৌতেই এঁর মৃত্যু হয়।

মৃত্যুকালে জেনারেল মার্টিন কোম্পানীর কাগজ আর অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি ছাড়া কলিকাতায় আর আশে পাশে, ফরাসী অধিকারভুক্ত চন্দননগরে, লক্ষ্ণৌ-এ, ফ্রান্সে, অনেক ভূসম্পত্তি রেখে যান। এই সকল সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা করে ১৮০১ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে মার্টিন তাঁর উইল স্বাক্ষর করেন।

জেনারেল মার্টিনের উইলের আলোচনা চিত্তাকর্ষক। উইলখানির সর্ত্তগুলি থেকে এই ইতিহাস-বিশ্রুত ব্যক্তিটির চরিত্রের কোন কোন দিকের একটা ছবি পাওয়া যায়, আর উইল নিয়ে আদালতে যে মামলা হয়েছিল, তার তর্ক বিচার অনুসরণ করলে উনিশ শতকের প্রথম দিকে বাঙলায় ঈষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী আর অযোধ্যায় নবাবদের মধ্যে সম্পর্ক এবং তদানীন্তন ভারতবর্ষে কোন কোন ইংরাজী আইনের প্রয়োগ সম্বন্ধে দু'একটা কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য আর মতামত চোখে পড়ে।

প্রথমে মার্টিনের ব্যক্তিগত দিকটা দেখা যাক। উইল থেকে জানা যায়, এঁর ক্রীতদাস, ক্রীতদাসী, খোজা, রক্ষিতা স্ত্রীলোক প্রভৃতি অনেক রকমের অনুচর ছিল। তাদের তিনি মৃত্যু-সময়ে মুক্তি দেন আর প্রচুর অর্থদানের ব্যবস্থা করে যান। Boulone বা Lise আর Sally নাম্নী দুজন রক্ষিতা নারীর জন্যে বাড়ী করতে তিনি টাকা দিয়ে যান। লক্ষ্ণৌ-এ কিছু ভূসম্পত্তিও এদের দেন। ফ্রান্সের আত্মীয়বর্গকেও সম্পত্তির অংশ দেন। লক্ষ্ণৌ, কলিকাতা আর চন্দননগরে দরিদ্র সেবার জন্যে তিনি টাকা দিয়ে যান। ব্যবস্থা হয়, লক্ষ্ণৌ-এ

খৃষ্টীয়, হিন্দু বা মুসলমান, যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী গরীবকেই সাহায্য দেওয়া হবে এবং সেটা যথাক্রমে রোমান ক্যাথলিক বা প্রটেস্টান্ট পাদরী, হিন্দু পুরোহিত বা মুসলমান মোল্লার মারফত বিতরিত হবে। অর্থের পরিবর্তে শস্য, আটা বা তৈরী রুটিও প্রত্যহ দিনের বেলায় একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁর সমাধিস্থলের কাছাকাছি কোন জায়গায় বিতরণ করা চলতে পারে এমন আদেশ ছিল। আর আদেশ ছিল সে-খানে মর্ম্মরপাথরের ফলকে বা অন্য কোন স্থায়ী উপায়ে ঐ দান আর দাতার পরিচয় পারস্য বা হিন্দী ভাষায় উৎকীর্ণ থাকবে। কলিকাতা আর চন্দননগরের জন্যেও ঐরকম ব্যবস্থা ছিল, তবে মনে হয় সেখানে খাদ্যের বদলে অর্থের দানটাই বেশী মনোমত ছিল। কলিকাতায় বণ্টনকর্তা ছিলেন ইংরাজী গির্জ্জার curate, চন্দননগরে ফরাসী গির্জ্জার ফরাসী পাদরী। দু' জায়গাতেই দানের স্থান গির্জ্জার কাছাকাছি হবার কথা ছিল, আর লক্ষ্ণৌ-এর মতন ফলকলিপির ব্যবস্থা ছিল। কলিকাতার ফলক ইংরাজীতে আর চন্দননগরের ফলক ফরাসীভাষায় লেখার নির্দ্দেশ ছিল। মার্টিন তাঁর উইলে বিশেষ করে উল্লেখ করিয়েছেন যে, ফলকগুলি উৎকীর্ণ করবার উদ্দেশ্য হল যাতে সদাব্রতের কথা কেউ ভুলে না যায়; অর্থাৎ দান বিতরিত না হলে প্রার্থীরা ইচ্ছা করলে ম্যাজিস্ট্রেট বা অন্য কর্ত্তৃপক্ষের কাছে সে সম্বন্ধে অভিযোগ জানাতে পারে।

বোধ হয়, দান সব সময়ে সঠিক বিলি হবে কিনা, সে সম্বন্ধে মার্টিনের মনে সন্দেহ হয়েছিল, কেননা তিনি উইলে দানের ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট, রাজা বা নবাবকে বিশেষ করে অনুরোধ করেছেন যেন দানের অপব্যবহার না হয়, বা সেটা অবিতরিত না থেকে যায়। এ-সাবধানতাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি কষ্ট স্বীকারের জন্যে বিতরণকারীদের পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করে যান, এবং শেষ পর্য্যন্ত স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট, রাজা বা শাসনকর্তাকে ক্ষমতা দিয়ে যান, নিয়মিত বরাদ্দ বিলি না হলে তাঁরা বিতরণকারীদের সরিয়ে দিতে পারবেন। লক্ষ্ণৌ-এ মার্টিনের সমাধি ছিল বলেই বোধ হয় তাঁর আত্মার তৃপ্তিকল্পে সেখানে বিশেষ করে সদ্য ভোজ্য বিতরণের ব্যবস্থা করেছিলেন, কারণ টাকাটা হাতে না পেলে, অথবা পেলেও, যথার্থ অন্নটা অনেক সময়ে দরিদ্রের পেটে নাও যেতে পারে।

কলিকাতা, ফ্রান্সের লিয়ন্স সহরে আর লক্ষ্ণৌ-এ লা মার্টিনিয়র নাম দিয়ে শিক্ষায়তন স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। আরও ব্যবস্থা হয় যে, লক্ষ্ণৌ-এর বিদ্যালয়টি

তাঁর বাসভবন Constantia House-এ হবে; তাঁর দেহও সেইখানেই সমাধিস্থ করা হবে; ছাত্রদের ইচ্ছানুযায়ী তাদের ইংরাজী ভাষা আর খৃষ্টীয় ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হবে। বিদ্যালয় ছাড়া, লিয়ন্স আর লক্ষ্ণৌ সহরে ঋণের অপরাধে বন্দী কয়েদীদের মুক্তির জন্যেও টাকা রাখা হয়। কলিকাতায় বালক এবং বালিকাদের একটা বিশেষ বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হবে; তারপর তাদের কোন কাজে শিক্ষানবীশ করে দেওয়া হবে; বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তাদের বিবাহের ব্যবস্থাও করা হবে। ভাল ছাত্রদের জন্যে পারিতোষিক বিতরণ, বা বিবাহ, বৎসরের মধ্যে মার্টিনের মৃত্যু তারিখেই হবে; অনুষ্ঠানের পর পাদ্রী উপাসনা করবেন, তার পর পান-ভোজন হবে।

মার্টিন চেয়েছিলেন, দাতার নাম যেন অমর থাকে এবং অপরেও যেন দানকার্য্যে উদ্বুদ্ধ হয়। মার্টিন আরও বলেছেন যে, সৎকার্য্য করে একটা ব্যক্তিগত আত্মতৃপ্তি অনুভব করা ছাড়া আশা, আকাঙ্ক্ষা, অহঙ্কার প্রভৃতির বোধ যেন তাঁর মনে স্থান না পায় তার চেষ্টা তিনি করেছেন। পরের উপকারই তাঁর একমাত্র আকর্ষণ।

জেনারেল ক্লড মার্টিনের উইলের উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি থেকে এই ঐতিহাসিক ব্যক্তিটির চরিত্র, বিশ্বাস, মনোভাব, মতামত, জীবনযাপন প্রণালীর নিশ্চয় একটা খসড়া ছবি পাওয়া যায়।

এইবার উইল সম্পর্কে আদালতে মামলার বিবরণ থেকে যে সকল প্রসঙ্গের আভাস পাওয়া যায় তাই দেখব।

উইলে লক্ষ্ণৌ-এ পালনীয় বিধিগুলি সম্বন্ধে সেখান থেকে রেসিডেণ্ট বাহাদুর ফোর্ট উইলিয়ম গবর্ণমেণ্টের Political Secretaryকে জানান যে, "His Majesty" লক্ষ্ণৌ-এর নবাব বাহাদুর লক্ষ্ণৌ সহরে বন্দীমুক্তি, দরিদ্র সেবা, আর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা অনুমোদন করেন না, কারণ এ সকল কার্য সাধারণত দেশের রাজা বা গবর্ণমেণ্টেরই করণীয়। অতএব অযোধ্যারাজ্যের মধ্যে কোন সাধারণ মানুষ এসব ব্যবস্থা করলে নবাবের গৌরব, ক্ষমতা আর প্রজারঞ্জন-খ্যাতিকে ক্ষুণ্ণ করা হয়। বিশেষত বন্দীদের মধ্যে অধিকাংশ চৌর্য আর নরহত্যার অপরাধে অপরাধী, সুতরাং তাদের মুক্তি দেওয়া সমীচীনও নয়। লেখালেখির পর Constantia House-এ কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে নবাব আপত্তি তুলে নেন। শেষে ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনে সুপ্রীম কোর্ট আদেশ দেন যে, প্রয়োজন হলে উইলকে কার্যকরী করতে লক্ষ্ণৌ-এ অবস্থিত

ব্রিটিশ রাজকর্ম্মচারীদের সাহায্য পাওয়া যেতে পারবে। দ্বিতীয়তঃ যেহেতু নবাবের রাজ্য লক্ষ্ণৌ সুপ্রীম কোর্টের এলাকার বাইরে, সুপ্রীম কোর্ট সেখানকার কোন বিলিব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করতে পারেন না, এবং মাত্র গবর্ণর-জেনারেলের হাতেই উইলের লক্ষ্ণৌ সম্বন্ধীয় নির্দ্দেশগুলিকে কার্য্যে পরিণত করবার ক্ষমতা আছে, তাই ভারত গবর্ণমেণ্টের ওপরই এ-ভার দেওয়া হল। শাসনগত আর রাজনৈতিক কারণ দেখিয়ে সুপ্রীম কোর্ট উইলে লক্ষ্ণৌরাজ্যে বন্দী মুক্তির ব্যবস্থা রহিত করলেন।

কলিকাতার সম্পত্তি সম্বন্ধে সুপ্রীম কোর্ট বলেন যে, যেহেতু উইলকর্ত্তা ফ্রান্সের প্রজারূপে জন্মেছিলেন, আর মৃত্যুকালে ইংরাজ-অধিকৃত ভারতবর্ষে বিদেশী পর্য্যায়ভুক্ত (alien) ছিলেন, তাই ইংলণ্ডের law of alienage অনুযায়ী কলিকাতার বাড়ী আর অন্যান্য ভূসম্পত্তি উইল মারফত বন্দোবস্ত করবার তাঁর কোন অধিকার ছিল না, এবং তাঁর মৃত্যুতে সে-সম্পত্তি ইংরাজ Crown-এ বর্ত্তাল।

ওদিকে ফ্রান্সের লিয়ন্স মিউনিসিপ্যালিটি আর ফরাসী দেশে মার্টিনের উত্তরাধিকারী আত্মীয়বর্গ নিজেদের মধ্যে লিয়ন্সের সম্পত্তি বখরার এক চুক্তি করে, কলিকাতার আর লক্ষ্ণৌ-এর সম্পত্তিতে নিজেদের দাবী জানিয়ে সুপ্রীম কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে বিলাতের প্রিভীকাউন্সিলে আপীল করলেন। তাঁরা বললেন যে, লক্ষ্ণৌ-এর বিষয় বিলি করার ভার ভারতগবর্ণমেণ্ট আইনসঙ্গতভাবে গ্রহণ করতে পারেন না।

লক্ষ্ণৌ সম্বন্ধে সুপ্রীম কোর্টের রায়ের ওপর প্রিভীকাউন্সিল মন্তব্য করেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট যদিও স্থির করেছেন যে, লক্ষ্ণৌ-এ ভারত গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদের মাধ্যমে উইলকে কার্যে পরিণত করা হবে, কিন্তু কি কি উপায় অবলম্বনে সে কাজ সাধিত হবে, গবর্ণর-জেনারেল মহোদয় সে-প্রশ্ন সম্বন্ধে কিছু বলছেন না—The answer of the Governor-General avoids the question as to his having the means। এ ছাড়া প্রিভী কাউন্সিল আরও বলেন যে, লক্ষ্ণৌ-এর বিষয় উইল-কর্তার বা কোর্টের নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা পক্ষকে না দিয়ে গবর্ণমেণ্টের নিজের হাতে রাখা প্রকৃতপক্ষে সম্পত্তিটিকে একেবারে বে-হাত করে দেওয়া এবং সম্ভবত সুপ্রীম কোর্ট যদি লক্ষ্ণৌ-এর সম্পত্তির বিলি সম্বন্ধে কোন সুবন্দোব্যস্ত হওয়া সম্ভবপর মনে করতেন, তাহলে তাঁরাই কোন ট্রাষ্টী প্রভৃতিকে সে-বিষয়ের ব্যবস্থার ভার দিতেন। লক্ষ্ণৌ সম্বন্ধে তাই প্রিভী

কাউন্সিল সুপ্রীম কোর্টের রায় পরিবর্তন করে ট্রাষ্টী অনুসন্ধান করতে আদেশ দিলেন। প্রিভী কাউন্সিলের কথাগুলি এই—Giving it to the Goverment is letting go all hold over it, and at once departing with its jurisdiction to those who can never, in any way, be interfered with or called to account. It appears clear that if the Court had been satisfied of the means existfng for effecting the testator's purposes at Lucknow, there should have been appointed a trustee or trustees for applying the fund under the superintendence of the Court। প্রিভীকাউন্সিলের মন্তব্যে যেন ঈষৎ ব্যঙ্গের স্বর পাওয়া যায় এবং মনে হয় যেন গবর্ণমেণ্ট বা Executive বিভাগ, বিচার বিভাগ বা Judiciary-র সংযোগে এমন একটা ব্যবস্থায় উপস্থিত হচ্ছিলেন, যা থেকে গবর্ণমেন্টের নিজের সমূহ লাভের সম্ভাবনা ছিল।

কলিকাতা সম্বন্ধে প্রিভী কাউন্সিল যে বিচার্য প্রশ্নগুলি নির্ধারণ করলেন তা এই :

বিলাতী আইনের যে ধারায় বৈদেশিক প্রজার স্থাবর সম্পত্তি উইল দ্বারা বা উত্তরাধিকার সূত্রে অন্যব্যক্তিতে অর্শাতে পারে না সে আইনের সে-ধারা ইংরাজ-অধিকৃত কলিকাতা সহরে প্রযোজ্য কিনা ; অর্থাৎ, অন্য কথায়, কোন জাতির নিজের দেশীয় আইন, যুদ্ধ বা চুক্তি মারফত পাওয়া কোন দেশে স্বতঃই কার্যকরী হয়ে ওঠে, না লিখিত আদেশ দ্বারা বিশেষ করে সে-আইন সে দেশে কার্য্যকরী করতে হয়।

এ-প্রসঙ্গে তর্ক ওঠে, কলিকাতা কি ভাবে ইংরাজের হস্তগত হয়েছিল। এ সম্বন্ধে বিদিত ঐতিহাসিক সকল তথ্যই আলোচিত হল, তবে প্রিভী কাউন্সিলের বিচারপতি Lord Brougham কোথাও কোথাও এমন সকল উক্তি করেন যার মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান মেলে। সতেরো শতকের শেষে বাঙলার নবাবের হাত থেকে ইংরাজের কলিকাতা ক্রয় করা সম্পর্কে বিচারপতি বলছেন যে—The Company had been struggling for nearly one hundred years to obtain a footing in Bengal। ১৬৯৬ সালে ইংরাজ তাঁদের হুগলীর কুঠী ঘিরে দুর্গ তৈরী করেন, "acting upon a kind of half consent given in an equivocal answer of

the Nabob"—তবু সে ভিত্তি আইনে ও ইতিহাসে বেশ কিছুদিনে দৃঢ় হল! এর পর, দুর্গের আশ্রয় পেয়ে ইংরাজ আর দেশীয় লোকে যখন সেখানে ঘরবাড়ি নির্মাণ করে বসবাস আরম্ভ করলে, তখন দেশীয়দের নিজেদের মধ্যেকার মামলা মোকর্দমা নিষ্পত্তির জন্যে নবাব সেখানে কাজী মোতায়েন করতে চাইলেন, কিন্তু "the Company's servants bribed him to abstain from the proceeding"—ঘুষের সাহায্যে কাজীকে বিদায় করে স্থানীয় শাসন আর বিচারভার কোম্পানী নিজের হাতেই রাখলেন।

ইংরাজ আমলের ভারতবর্ষের ইতিহাসে অন্যান্য দোমনা অনুমতি পত্র, অর্ধ-সম্মতি এবং উৎকোচের যা কিছু প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়ে থাকে, তার মধ্যে উপরোক্ত নিদর্শনগুলিও সন্নিবিষ্ট হতে পারে।

প্রিভী কাউন্সিল স্থির করেন যে, ইংরাজরা কলিকাতার বসতি বাঙলার রাজশক্তির কাছ থেকে অনুমতিক্রমে আর বন্দোবস্ত করেই পেয়েছিলেন, এবং নবাবের প্রজারূপেই তাঁরা সেখানে বসবাসও আরম্ভ করেন, কিন্তু "at what precise time and by what stages they exchanged the character of subjects for that of sovereign, or rather, acquired by themselves, or with the help of the Crown, and for the Crown, the rights of sovereignty, cannot be ascertained।" উত্তর—সূচ হয়ে প্রবেশ করে ফাল হয়ে নির্গমন। মূলে যেখানে দো-মনা অনুমতিপত্র, অর্ধ-সম্মতি, উৎকোচ প্রভৃতি থাকে, সে সকল ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক অনুসন্ধান করে কিছু আবিস্কার করতে পারেন না।

বিচারপতি ছাড়া কৌঁসুলীবর্গের দুটি একটি আলোচনাও সরস। সরকার পক্ষের Attorney-General এক স্থলে বলেন যে, বৈদেশিকেরা ইংরাজ-অধিকৃত ভারতবর্ষে জমির স্বত্তাধিকারী হতে পারতেন না বা তার বিলি করতে পারতেন না, যেহেতু ইংলণ্ডের আইন অনুযায়ী তাঁরা "inheritable blood"—এর অধিকারী হবেন না। তখন প্রতিপক্ষের কৌঁসুলী এই মন্তব্য করেন—"That is no ground of objection ; a bastard in this country (অর্থাৎ ইংলণ্ডে) has no inheritable blood, yet no one doubts but that if seized in fee, he can transmit his estate by will. In what respect does the condition of General Martin, an alien by birth but admitted and declared by the decree of

the Court to be entitled to hold lands in India and devising the same by will, differ?"

সুখের বিষয়, সুপ্রীম কোর্টের বিচারের বিরুদ্ধে প্রিভী কাউন্সিল রায় দেন যে, ইংলণ্ডের law of alienage কলিকাতার উপনিবেশে প্রযোজ্য নয়, এবং মার্টিনের কলিকাতার সম্পত্তি উইল দ্বারা ন্যায্যভাবেই বিতরিত হয়েছিল।

আধুনিক সাহিত্য

আলবার্তো মোরাভিয়া

আয়ান গ্রীনলীজ-এর নিকট লিখিত পত্রে উপন্যাস সম্বন্ধে মোরাভিয়ার ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে তিনি বলেছেন উপন্যাসের চরিত্র হবে লেখকের নিজের মতো নয়, সম্পূর্ণ অপরের মতো; তার মধ্যে প্রবাদ-প্রসিদ্ধ চরিত্রের মতো দেশকালের পরিচয় থাকবে। এক একটি চরিত্র যেন হবে এক এক জাতের মানুষের প্রতিনিধিস্বরূপ। তা নইলে যদি অধিকাংশ আধুনিক রচনার মতো কেবলি লেখকের নিজের প্রতিচ্ছবিই সৃষ্টি হতে থাকে, তাহলে পরবর্তীকালের কাছে একটি বিশেষ ব্যক্তির আত্মকাহিনী হিসাবে ছাড়া সে চরিত্র বোধগম্যহবে না। স্বাধীন ও দেশকালপাত্রের প্রতিভূস্বরূপ চরিত্র ছাড়া উপন্যাসের গতি নেই।

আত্মবহির্ভূত চরিত্রের প্রতি মোরাভিয়ার এই প্রীতির সঙ্গে মিশেছে তাঁর স্টাইলের পূর্ণ প্রকাশপ্রিয়তা। লোকশিল্পে বা প্রাচীন সাহিত্যে রেখায় ও রচনায় যে সরলীকৃত, দৃঢ় ও স্পষ্ট রীতি দেখা যায়, তিনি তার দ্বারা আধুনিক উপন্যাসের গাঁথুনিকে মজবুত করতে চেয়েছেন। তাঁর রচনায় তাই বিশ্লেষণ-গভীর, সংবেদনশীল পর্যবেক্ষণ আছে, কিন্তু ভাবালুতা নেই, আধুনিক উপন্যাসের মনস্তাত্ত্বিক কুয়াশা ও বলা-না-বলার ধোঁয়াটে অস্পষ্টতা নেই। সবি দিবালোকের মতো প্রকাশ্য; প্রতি ঘটনা ও চরিত্র যেন সেই দিবালোকের মাঝখানে স্বাধীন ও সম্পূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সত্য ঘটনার যথাযথ বর্ণনার মতো তাঁর উপন্যাস—ভাবালু নয়, অথচ কাব্যময়। আগস্টিনোর সুকুমার কিশোর মনের প্রথম আঘাতের বিশ্লেষণে, 'ডিসোবীডিয়েন্স'-এ ল্যুকার পরিণত কৈশোরের বিদ্রোহের রূপায়নে, 'ফ্যান্সি ড্রেস পার্টি'র একনায়ক রাষ্ট্রনেতা ও খামখেয়ালী ক্ষয়িষ্ণু ডাচেস্-এর প্রেম-প্রহসনে, 'উমান্ অভ রোম'-এর পতিতার আত্মকাহিনীতে, 'কন্‌জুগ্‌ল লাভ'-এর ব্যভিচার চিত্রণে—সর্বত্রই এই আদর্শ পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে। উপন্যাসে যে সকল গুণ আজ একান্ত বিরল হয়ে উঠেছে মোরাভিয়া সেইগুলিকেই ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেছেন। চরিত্রসৃষ্টিই তাঁর প্রধান লক্ষ্য, ঘটনার চমৎকারিতা থাকলেও চরিত্রবর্ণনার দিকেই তাঁর ঝোঁক দেখা দেখা যায়। অথচ সৃষ্ট চরিত্রের প্রতি তাঁর কোনো আসক্তি নেই, কেননা তারা লেখকের প্রতিচ্ছবি নয়। এই আশ্চর্য নৈর্ব্যক্তিকতার বলে মোরাভিয়ার লেখায় যৌনব্যাপারে পরিচ্ছন্ন স্পষ্টতা আছে, অশ্লীলতা নেই। এটাও প্রাচীন সাহিত্যের আদর্শ অনুসরণের ফল। আমি যেটা লিখি সেটা যে আমার নয়, লোকের, এ বোধ যেখানে সাহিত্যজগতে লোপ পেতে বসেছে সেখানে মোরাভিয়ার এই গুণ একাধারে ঐতিহ্যবাদী অথচ নতুন বলে মনে হয়।

মোরাভিয়ার সঙ্গে ইংরিজীনবীশ সাহিত্যজগতের পরিচয় বেশিদিনের নয়। যুদ্ধের পরেই তাঁর লেখার অনুবাদ ভালোভাবে শুরু হয় ও নানাজনের নজরে পড়ে। ১৯৩৯ সালে তাঁর প্রাথমিক যুগের একটি বই 'দি হুইল অভ ফর্চুন' নামে অনূদিত হয়েছিল, কিন্তু ইংরিজী সাহিত্যজগতে তার তেমন সমাদর হয়েছে বলে জানা যায় না। সে বইয়েরও হদিস পাওয়া শক্ত। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'আগস্টিনো' (১৯৪৭ সালে অনূদিত ও প্রকাশিত) থেকে অধুনাতম 'কন্জুগল্ লাভ' (১৯৫১) পর্যন্ত মোরাভিয়ার যে সাহিত্যিক বিকাশ তাকেই বর্তমান এই আলোচনার পরিধি বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

'আগস্টিনো'তে একটি ছোট ছেলে ও তার মা-র সম্পর্ক নিয়ে গল্পের বনিয়াদ। তরুণী সুন্দরী মায়ের প্রতি আগস্টিনোর ভালোবাসা ও বিশ্বাস ধাক্কা খায় একটি যুবকের সঙ্গে মা-র প্রেমের নানা দৃশ্য দেখে। আহত মন নিয়ে আগস্টিনো সমুদ্রতীরে জেলেপাড়ায় দুর্দান্ত ছেলেদের সঙ্গে মিশতে শুরু করে। যৌনব্যাপার সম্বন্ধে তার ধারণা স্পষ্ট হয়, বিশ্বাসঘাতিনী মা-র প্রতি তার আকর্ষণকে ব্যাহত করবার জন্যে নিজের অপরিণত যৌনবোধকে জাগিয়ে সে অন্যদিকে প্রবৃত্ত করার চেষ্টা করে। পতিতালয়ের দরজা থেকে তাকে 'শিশু' বলে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তখন জানালার ধারে দাঁড়িয়ে কিশোর আগস্টিনো হঠাৎ তার কৈশোরত্বকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করে। হাল ছেড়ে দিয়ে সে বাড়ী ফিরে যায়। 'You always treat me like a child' বলে অনুযোগ করলে তার মা সস্নেহে উত্তর দেয়: 'all right, I will treat you like a man'। এই আশ্বাস পেয়ে আগস্টিনের বিদ্রোহ শান্ত হয়ে আসে। প্রথম কৈশোর থেকে পূর্ণ যৌবনে পৌঁছবার যে দীর্ঘ অপেক্ষা, তাকে স্বীকার করে নেয় আগস্টিনো।

নৈর্ব্যক্তিকতা সত্ত্বেও মোরাভিয়ার রচনা মোটেই প্রাণহীন নয়, বরঞ্চ আত্মরতি থেকে মুক্ত বলে তাতে অপরের চরিত্রকে অনুধাবন করার ক্ষমতা এসেছে। আগস্টিনোর তরুণ মনের ওপর দিয়ে বয়ঃসন্ধির যে ঝড় বয়ে যায় তাকে মোরাভিয়া মনোরম অথচ স্পষ্ট সত্যতার সাহায্যে পরিচিত করেছেন। উপন্যাসের চেয়ে একে ছোট গল্প বলাই ভালো, কেননা ছোটগল্পের সঙ্গে কবিতার যে আত্মীয়তা আছে তা এতে ধরা দিয়েছে। আগস্টিনের ক্ষুদ্র জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে লেখকের স্থির, অচঞ্চল দৃষ্টি কাহিনীকে আশ্চর্যভাবে ধরে রাখে। পরিষ্কার করে ঘটনা বর্ণনার মধ্যেই সুর এসে যায়, চরিত্র একটি নিরবচ্ছিন্ন রেখার মতো ফুটে ওঠে। মোরাভিয়ার এই প্রাথমিক রচনায়ও তাঁর লেখনীর সরল, কাব্যময় অথচ দৃঢ় রূপ স্পষ্ট হয়েছে।

'ফ্যান্সি ড্রেস্ পার্টি'তে মোরাভিয়া নতুন ধরণের বিষয়বস্তু নিয়ে পরীক্ষা করতে চেয়েছেন। ডিক্টেটরশিপ্ নিয়ে রাজনৈতিক প্রহসন লিখতে গিয়ে তাঁর প্রধান গুণগুলি তেমন প্রকাশ হয়নি। এক গুপ্তচরের চরিত্র ছাড়া অন্যেরা তেমন জোরালো নয়। ক্ষয়িষ্ণু জমিদার শ্রেণী ও একনায়ক রাষ্ট্রনেতার যৌনজীবন নিয়ে কাহিনী। আবহাওয়া ও ঘটনার বর্ণনায় মোরাভিয়ার দক্ষতার যথেষ্ট পরিচয় এখানেও পাওয়া যায়, তাঁর শান্ত ব্যঙ্গরসের-ও।

শেষের অধ্যায়ে ডিক্টেটরের প্রেমিকার মৃত্যু ও বিবাহের বদলে শ্রাদ্ধবাসরের ব্যবস্থার মধ্যে একটা নাটকীয় গাম্ভীর্য ঘটনার হাস্যকরতাকে যেন আরো রস জোগায়। কিন্তু সব মিলিয়ে এ বই-এর পরিধি যেমন ছোট তেম্নি গুরুত্বও কম।

'উমান্ অভ রোম' মোরাভিয়ার একমাত্র বড়ো উপন্যাস। পতিতার আত্মকাহিনী অনেকেই লিখেছেন, কিন্তু প্রকৃত চরিত্রসৃষ্টি করতে পেরেছেন কম লেখকই। পরিধি অনেক বড় হলেও এখানেও মোরাভিয়া বিষয়বস্তুকে মোটেই ছড়িয়ে পড়তে দেননি। আড্রিয়ানার চরিত্রকে কেন্দ্র করে উপন্যাসকে গেঁথে তোলার জন্য তিনি আত্মচরিত রচনারীতির সাহায্য নিয়েছেন। এর ফলে অশিক্ষিত পতিতা আড্রিয়ানার মুখ দিয়ে যে ভাষা ও ভাব বলানো হয়েছে তা আপাতদৃষ্টিতে বাস্তবধর্মী না হলেও গভীরতর বাস্তবতাকে সাহায্য করেছে। এই সম্পর্কে জবাবদিহি করতে গিয়ে মোরাভিয়া নিজেই বলেছেন যে সাহিত্যের ভাষা সাধারণ কথ্যভাষার চেয়ে অনেক প্রকাশশীল; আড্রিয়ানার শ্রেণীর মেয়েরা নিশ্চয়ই সাহিত্যের ভাষায় কথা বলে না, কিন্তু ভাষা ও ভাব প্রকাশের ক্ষমতা যদি আড্রিয়ানার থাকতো তবে সে নিজের কাহিনী যেভাবে বলতো সেইভাবেই তিনি তার কাহিনী লিখেছেন। "All I have tried to do is to represent Adriana's moral world, by doing her the same service the public letter-writers perform when they interpret and commit to paper on the street corners the unformulated sentiments of illiterate servant maids." নিজেকে এইভাবে রাস্তার মোড়ের মুহুরীর সঙ্গে তুলনা করার মধ্যেও মোরাভিয়ার অহঙ্কারহীন চরিত্র-অনুধাবনের চেষ্টার পরিচয় মেলে। আড্রিয়ানার ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গীর মধ্যে চরিত্রের অন্তরে পরিপূর্ণ ভাবে প্রবেশ করার ইচ্ছা দেখতে পাওয়া যায়। অনুবাদেও এই ভাষার অকুণ্ঠ, প্রত্যক্ষ সরলতা অনেকখানি ধরা পড়েছে। সাহিত্যের ভাষা হলেও আড্রিয়ানার বর্ণনার সহজাত, অনাড়ম্বর স্বচ্ছতা সাধারণ জীবনের সন্নিকট।

আড্রিয়ানার মা'র চরিত্র দিয়ে কাহিনীর গোড়াপত্তন। অদ্ভুত এই চরিত্র। আড্রিয়ানার মা সংসারকে হাড়ে হাড়ে চিনেছে, সারবস্তু যে টাকা আর প্রতিপত্তি সে বিষয়ে তার মুহূর্তের জন্যও সংশয় নেই। নিজে কখনো পতিতাবৃত্তি করেনি, মেয়ের জন্যও তা কামনা করে না। বরং পতিতাবৃত্তি যে অধঃপাতে যাবার পথ সে বিষয়ে সে যথেষ্ট সচেতন। কিন্তু সাংসারিক উন্নতির জন্য আড্রিয়ানার একমাত্র সহায় যে তার রূপ তাও তার অজানা নয়। রূপের সদ্ব্যবহারের ফলে আড্রিয়ানা একদিন সমাজের শিখরে উঠবে, মায়ের সমস্ত অপূর্ণ কামনাকে সার্থক করবে, এই তার আশা। এই আশাকে নির্মূল করে দিয়ে সরলহৃদয়া আড্রিয়ানা একদিন এক মোটর ড্রাইভারের প্রেমে পড়ল। সেই থেকে তার পতনের শুরু। পুলিশের এক বড় কর্তার নেকনজর পড়ল আড্রিয়ানার প্রতি। কয়েকজন বন্ধুর চক্রান্তে তার কবলগত হল আড্রিয়ানা। তবুও না দমে সে বিয়ের প্রস্তুতি পূর্ণোদ্যমে চালিয়ে যায়, আর মোটর ড্রাইভার জিনো ক্রমেই পেছিয়ে দেয় বিবাহের তারিখ। অবশেষে

যেদিন বন্ধুদের পরিহাস ও মা-র সমস্ত লাঞ্ছনা গঞ্জনা অগ্রাহ্য করে আড্রিয়ানা বিয়ের সাজপোষাক তৈরী শেষ করল সেদিন জানা গেল জিনো বিবাহিত, তার স্ত্রী ও পুত্রকন্যা জীবিত। সেদিন থেকেই আড্রিয়ানার পতিতাবৃত্তির শুরু। বহু বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে তার অবসান হল এক রাজনৈতিক বিদ্রোহী, তরুণ, দ্বিধাগ্রস্ত, প্রেম-বিমুখ ছাত্রের সংস্পর্শে এসে। নিজের বুর্জোয়া সংস্কার ও নতুন রাজনীতির মধ্যে বিভক্ত, বিষায়িত ছাত্রবিপ্লবী মীনো একদিন পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি করে বস্‌ল। তার কিছুদিন পরে, নিজের রক্তের বিষ কিছুতেই যাবার নয় বুঝে মীনো আত্মহত্যা করল। মৃত্যুর পূর্বে ব্যবস্থা করে গেল আড্রিয়ানা ও তার সন্তানের ভদ্রভাবে ভরণপোষণের। মীনোর কিন্তু জানা ছিল না যে সেই সন্তান তার ঔরসজাত নয়, এক হিংস্র, মাতাল, পুলিশ-পালানো খুনীর সন্তান। "I thought how he would be the child of a murderer and a prostitute; but any man in the world might happen to kill someone, and any woman might sell herself for money, and what mattered most was that he should have an easy birth, and grow up strong and healthy".

আপাতদৃষ্টিতে কুৎসিৎ এই কাহিনীকে মোরাভিয়া তাঁর অনুসন্ধিৎসার আলোয় জীবন্ত করেছেন। আড্রিয়ানার চরিত্র তার দেহের ও দেহের প্রবৃত্তির মতোই সরল ও বলিষ্ঠ; সমস্ত পঙ্কিলতার মধ্যেও সেই চরিত্র যেন কিছুতেই দীপ্তি হারায় না। তেম্নি দৃঢ়, সুস্পষ্ট রেখায় আঁকা আড্রিয়ানার কঠিন, স্নেহশীলা মা। জীনোর দুর্বল, গোলামী ও শঠতাপূর্ণ চরিত্র; নরহন্তা সোয়েজোগ্নো; আত্মরত, বুর্জোয়া বিদ্রোহী মীনো—সকলেই অতুলনীয় চরিত্রসৃষ্টি। তেম্নি পুলিশের বড়কর্তা আস্টারিটা, যে অনেক সময়ে 'ফ্যান্সী ড্রেস্ পার্টি'র টেরিসো-র কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু তবু 'উমান অভ রোম'-এর বিচিত্র ঘটনাসমৃদ্ধ কাহিনীর মধ্যে কোথায় যেন একটা মামুলি ভাব আছে। 'আগষ্টিনো' বা ('উমান্ অভ রোম'-এর পরবর্তী) 'ডিসোবিডীয়েন্স'-এর সুডৌল, রেখায়িত রূপটি এখানে তেমনভাবে পাওয়া যায় না। অপরপক্ষে পরিধির ব্যাপকতার জন্য এই উপন্যাসে মোরাভিয়ার আদর্শ অনুযায়ী দেশকালগত চরিত্র ও সত্য ঘটনার মতো সরল ও সুস্পষ্ট, বাস্তব কাহিনীর পরিচয় এ বইয়ে বেশি। 'আগস্টিনো' বা 'ডিসোবিডীয়েন্স'-এ যে গুণের পরিচয় তাকে বলা যেতে পারে ছোট গল্পের মতো কাব্যধর্মী। সেখানে সুরের সঙ্গে বাস্তব মিশে একটি অদৃষ্টপূর্ব রূপ সৃষ্টি করেছে। 'ফ্যান্সি ড্রেস্ পার্টি'র সংক্ষিপ্ত পরিসরে যে নাটিকার ভাব এসেছে তা-ও অভিনব। কিন্তু 'উমান্ অভ রোমে' আশ্চর্য চরিত্রসৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও বৃহৎ পরিধির মধ্যে এসে কাব্যে-বাস্তবে মেশা সেই সূক্ষ্ম সুরটি ঠিক লাগেনি, যে সকল ভাবের ব্যঞ্জনা হয়েছে সেগুলি তত অভিনব নয়, মনে হয় যেন সাহিত্যের ইতিহাসে তার অনেক পূর্বরূপ দেখা গেছে।

এর পরবর্তী উপন্যাস 'ডিসাবিডীয়েন্স' মোরাভিয়ার প্রথম যুগের অপূর্ব রচনা 'আস্টিনো'র কথা মনে করিয়ে দেয়। গুটি থেকে প্রজাপতির জন্মের মতন কৈশোরের

বন্ধন থেকে যৌবনে মুক্তির বেদনা মোরাভিয়াকে বারবার আকর্ষণ করেছে। 'আগস্টিনো'র শেষ অধ্যায়ে এই ভবিষ্যৎ পরিণতির আভাস দেখা দিয়েছে মাত্র; "Like a man, he could not help thinking, before he fell asleep. But he wasn't a man. What a long, unhappy time would have to pass before he could become one." এই অপেক্ষার পরিচয় 'ডিসোবিডীয়েন্স'-এ। 'ডিসোবিডীয়েন্স'-এর ল্যুকা পরিণত কিশোর; চারিদিকের জীবনের বিরুদ্ধে তার প্রবল বিদ্রোহ ও অবশেষে যৌবনে শান্তিলাভ 'আগাস্টিনো'র পরবর্তী সন্ধিস্থলের পরিচয় দেয়।

যে বাড়ীতে ল্যুকার জন্ম ও বৃদ্ধি সে বাড়ীতে মনের দীনতা ও টাকার প্রাচুর্য মিলে বুর্জোয়া সমাজের একেবারে অন্তরঙ্গ রূপটি প্রকাশিত। ল্যুকা একদিন জানতে পারে যে রোজ সে যেখানে মেরীমাতার ছবির বন্দনা করে, সেখানে সেই ছবির আড়ালে লুকানো থাকে তাদের পরিবারের টাকা আর কোম্পানীর কাগজের চাবি আঁটা সিন্দুক। একদিন মা'র সঙ্গে রাত্রে কথা বলতে গিয়ে পায়জামা পরা ভুঁড়িওয়ালা বাবা ও পাৎলা নাইটগাউন পরা মা'কে ষড়যন্ত্রীর মতো চুপিচুপি মেরীমাতার ছবি সরিয়ে সিন্দুক খুলতে দেখে ল্যুকার ঘৃণা বিষায়িত, বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। প্রবল বিতৃষ্ণায় ল্যুকা সমস্ত পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে, কর্তব্য ও ভালোমন্দ বোধের সঙ্গে গোপনে যুদ্ধ ঘোষণা করে। নিজের অন্তরঙ্গ জীবনের মাঝখানে শুরু হয় এই লড়াই। নিজের বিশেষ প্রিয় স্ট্যাম্প্ অ্যালবাম্ সে দান করে দেয়, ফুটবল খেলায় প্রবল আসক্তি থাকা সত্ত্বেও প্রথম স্কুল টীমে খেলার সুযোগ পেয়ে প্রত্যাখ্যান করে; সমস্ত বইপত্র বিক্রি করে টাকা পয়সা মাটিতে পুঁতে রেখে আসে এক মাঠের মাঝখানে (যেখানে তার বিশ্বাস এক আত্মঘাতী যুবককে গোর দেওয়া হয়েছিল); স্কুলে শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করে। আশ্চর্য গুরুত্বময়, কাব্যময়, তীক্ষ্ণদৃষ্টি দিয়ে মোরাভিয়া এই সাধারণ ঘটনাগুলিকে গভীর করে তুলেছেন। এক বুভুক্ষু গভর্ণেসের সংস্পর্শে এসে ল্যুকা হঠাৎ আবিষ্কার করে যে শত বিদ্রোহ সত্ত্বেও এই আসক্তিটুকু যাবার নয়; নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও সমস্ত সংস্কার, শিক্ষা, প্রবৃত্তি তাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে কোনো এক অমোঘ নিয়মে। কিন্তু এই প্রেম সার্থক হবার আগেই গভর্ণেস্-টি মারা যায়। ল্যুকার বিদ্রোহের ঠিক চূড়াতে এসে এই আঘাত লাগে; তার সুকুমার শরীর মন শোক, কামনা ও গোপন বিদ্রোহের উত্তেজনার এই একত্রিত বেগ সহ্য করতে পারল না। ল্যুকার মনে হল যেন সে মরে গেল। প্রায় সংজ্ঞাহীন অসুস্থতার মধ্য থেকে যখন সে আবার চোখ মেলল তখন তার মনে এক আশ্চর্য শান্তি; যেন ঝড়ের পরেকার শান্তির মতো। এই অবস্থায় তার নার্সের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে একদিন ল্যুকা প্রথম পরিপূর্ণ যৌন সার্থকতার স্বাদ পেল। আর যেন সে কিশোর নয়, তার জীবনের সন্ধিক্ষণ পেরিয়ে গেল, নতুন ভাবে সে জন্ম নিল জগতের মধ্যে পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে।

ট্রেণে করে পাহাড়ের দিকে স্বাস্থ্য সারাতে যেতে যেতে ল্যুকা তার পৌরুষের

দীক্ষার সম্পূর্ণ অর্থ উপলব্ধি করল। "Yes, he concluded, that is what life should be : not sky and earth and sea, not human beings and their organisations, but rather a dark, moist cavern of loving, maternal flesh into which he could enter confidently, sure that he would be protected there as he had been protected by his mother all the time she was carrying him in her womb. Life meant the sinking of oneself in this flesh and feeling its darkness, its engulfing power, its convulsion, to be a beneficent, vital thing. Suddenly he understood the significance of the sense of relief that had refreshed him while the nurse was crushing him in her embrace." ট্রেণ তখন অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছে। ল্যুকার মনে হল সেই অন্ধকারে প্রতিধ্বনিত ট্রেণের চাকার শব্দ পর্যন্ত তাকে অভয় দিচ্ছে, সেও তার সমগ্র ভবিষ্য জীবনের অর্থের সঙ্গে জড়িত। "Then the train, with another whistle, came out into the light of day."

এই কাহিনী থেকে মনে হতে পারে মোরাভিয়ার জীবনদর্শন লরেন্স-এর মতোই দেহধর্মী, সহজাত সংস্কারের অনুবর্তী। কিন্তু এত নৈর্বক্তিক রচনার মধ্যে দর্শন খুঁজতে যাওয়ার বিপদ আছে। ল্যুকার বিপন্ন কৈশোরে যৌবনের মুক্তির আস্বাদ এনে দিল এক মাতৃবৎ প্রেমিকার সংস্পর্শ। তার জীবনের সন্ধিক্ষণে ল্যুকা এই ভেলাকেই আঁকড়ে ধরল, মনে করল এই বুঝি জীবনের চূড়ান্ত উপলব্ধি। কৈশোরের ধর্মই অতিশয়োক্তি, মুহূর্তের উপর অনন্তের আরোপ। তরুণ বয়সে প্রেম বা যৌনভাব মাতৃভাব থেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত হয় না, একথাই মোরাভিয়া ল্যুকার ক্ষেত্রে বলতে চেয়েছেন 'আগস্টিনো'-তেও দেখা যায় যৌনবোধের বিকাশের সঙ্গে মাতৃভাবের জটিল আপাত-বিরোধী সম্বন্ধ। কিন্তু প্রেমের এই মাতৃভাবাচ্ছন্ন রূপ পূর্ণবয়স্কদের চরিত্রে মোটেই দেখা যায় না, 'উম্যান অভ রোম' বা 'ফ্যান্সি ড্রেস্ পার্টি' বা 'কন্‌জুগ্‌ল লাভ'-এ তার কোনো স্বাক্ষর নেই।

কিন্তু চরিত্রের পরিচায়ক হিসাবে যৌন সম্বন্ধের বিষয়ে মোরাভিয়ার একটি বিশেষ দৃষ্টি আছে। মানুষ ধরিত্রীর সন্তান, তার আসল পরিচয় অনেকখানি তার দেহ ব্যাপারের মধ্যেই—এই বিশ্বাস তাঁর রচনাকে প্রভাবিত করেছে বলে মনে হয়। তাই 'কন্‌জুগ্‌ল লাভ'-এর নায়ক লেখক ও তার স্ত্রীকে নিয়ে যে কাহিনী তৈরী হয়েছে, তার শেষ দৃশ্যে গভীর রাত্রিতে ধানের গোলার ধারে স্ত্রীর ব্যভিচারের দৃশ্য প্রায় ফ্রেজারের 'গোল্ডেন বাও'-এর আদিম জাতিদের রহস্যময় ক্রিয়াকলাপের কথা মনে করিয়ে দেয়।

'কন্‌জুগ্‌ল লাভ'-এর 'লেখক' একদিকে গল্পের নায়ক, আবার নিজে সে গল্পের লেখকও। নায়কের মতো সে ঘটনার আঘাত অনুভব করে, আবার লেখকের মতো তাকে

নৈর্ব্যক্তিক ভাবে পর্যবেক্ষণ করে। অবস্থাপন্ন, কিঞ্চিৎ নিরীহ এই সৌখিন লেখকের চরিত্রের সঙ্গে তার স্ত্রীর দুর্দমনীয় প্রবলতার প্রভেদকে এখানে নাটকীয় করে তোলা হয়েছে। কাহিনী অনেকটা লরেন্স-এর লেডী চ্যাটার্লির প্রেমের মতো। কিন্তু অভিব্যক্তিতে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। লরেন্স-এর লেডী চ্যাটার্লি চরিত্র নয়, কেবল লেখকের তত্ত্বপ্রচারের যন্ত্র। তাছাড়া তার চরিত্রের সম্বন্ধে লরেন্সের যেটুকু উপলব্ধি আছে, তার স্বামীর সম্বন্ধে তা-ও নেই। নৈর্ব্যক্তিকতার বালাই লরেন্সে কখনো বর্তায়নি, তাই তাঁর উপন্যাস কেবল উচ্ছ্বাসময় স্বগতোক্তির মতো। মোরাভিয়ার দৃষ্টি স্থির, অবিচলিত, তীক্ষ্ণ; 'লেখক'-এর চরিত্রকে তিনি সম্পূর্ণভাবে সৃষ্টি করেছেন, সূক্ষ্মভাবে ভেদ ও বিশ্লেষণ করেছেন। 'উম্যান অভ রোম'-এর মতো এখানেও গল্পকারের চরিত্র ভাষার বিশিষ্ট ভঙ্গীকে সৃষ্টি করেছে। একদিকে লেখকের নিজের কাহিনী, আর একদিকে তার রচনা, দুয়ের লেনদেন এই বইকে সমৃদ্ধ করেছে।

মোরাভিয়া বস্তু ও ঘটনাকে দেখে ও বর্ণনা করেই ক্ষান্ত। তাঁর মতে বোধ হয় জীবনের প্রতি ও সমাজের প্রতি লেখকের সম্পর্ক এতেই যথেষ্ট নিবিড় হয়। চরিত্র ও ঘটনার সত্যতা বা রিয়ালিটি—তীব্রভাবে তার অস্তিত্বকে বোধ করা, তার প্রত্যক্ষ বিন্যাসকে পর্যবেক্ষণ করে চিত্রিত করা—এর ওপরই তাঁর শিল্প অবস্থিত। বৃহত্তর সমাজকল্যাণের সচেতন চেষ্টা তাঁর রচনায় নেই, যদিচ তিনি ফ্যাসি-বিরোধী ছিলেন এবং ফ্যাসিষ্ট ইতালী তাঁকে বহুবার নানাভাবে লাঞ্ছনা করেছে। মোরাভিয়ার রচনায় বুর্জোয়া সমাজের দৈন্য তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু তার থেকে মুক্তি পাবার রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধে তিনি সাহিত্যিক হিসাবে চেষ্টা করেন নি। আর্টের যে প্রাথমিক সত্যতা—দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা ও প্রকাশের নৈপুণ্যের মধ্য দিয়ে জীবনের যে কোনো একটি দিককে সম্পূর্ণ করে দেখানো—এটাই মোরাভিয়া নিজের সাহিত্যিক দায়িত্ব বলে মনে করেছেন। প্রাচীন কবি ও সাহিত্যিকদের মতো তিনি সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ, বহির্মুখীন ও পূর্ণপ্রকাশী গদ্যের সাহায্যে পাঠকের সাম্নে উপস্থিত হয়েছেন। আত্মরতি থেকে তাঁর রচনা সম্পূর্ণ মুক্ত, নিজেকে তিনি সকলের চেয়ে বড়ো বলে দেখেননি, তাই তাঁর লেখায় নৈর্ব্যক্তিকতাই সর্বপ্রধান গুণ। নৈর্ব্যক্তিকতার সঙ্গে হিতোপদেশ মোটেই সঙ্গত নয়, তাই পথ নির্দেশের কোনো প্রয়াস তাঁর রচনায় নেই। রক্তমাংসে গড়া একটি বা দু'টি মানুষের অস্তিত্বের পরিচয় পাঠকের কাছে উপস্থিত করাই এখানে যথেষ্ট। এতে হালের গোঁড়া প্রগতিবাদীদের ধৈর্যচ্যুতি হতে পারে, কিন্তু সাধারণ পাঠকের হয়ত মোরাভিয়ার রচনা এই কারণেই ভালো লাগবে। প্রগতিবাদী রচনা যেখানে যথার্থ তত্ত্বকে আশ্রয় করেও তাকে কেবল প্রাণহীন বুলিতে পরিণত করেছে, সেখানে সচেতন-তত্ত্ব-নিরপেক্ষ সহজ রচনা অভিনব বোধ হওয়া বিচিত্র নয়।

মোরাভিয়ার লেখার সীমানা এখনো পরিমিত, স্বল্প পরিধিতে সূক্ষ্ম সূত্রের বিশ্লেষণে তাঁর ক্ষমতা 'আগস্টিনো' ও 'ডিসোবিডীয়েন্স' এবং কিছু পরিমাণে 'কন্‌জুগ্‌ল লাভ'-এ প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু জীবনের রাজপথে, উন্মুক্ত প্রান্তরে অবাধ বিচরণ এখনো তাঁর

সীমানার মধ্যে নয়। 'উমান অভ রোম'-এর অপেক্ষাকৃত বৃহৎ পটভূমিতে তিনি তাঁর ছোটো উপন্যাসের নিরবচ্ছিন্ন স্বরটি ধরে রাখতে পারেন নি। তাঁকে বলা যেতে পারে নিপুণ মিনিয়েচার আঁকিয়ে। অথচ তাঁর সেই মিনিয়েচারে শক্তি আছে, নৈপুণ্য আছে, জীবনের স্পষ্ট পরিচয় আছে। যদি কোনোদিন তাঁর পর্দায় ব্যাপকতর জীবনবোধ ধরা দেয় তবে তিনি অতি মহৎ সাহিত্যিক হয়ে উঠবেন সন্দেহ নেই। শেক্সপীয়রের নাটকেও নৈর্বক্তিকতা আছে, তা সত্ত্বেও তাতে এক জীবনবেদ প্রতিভাত। মোরাভিয়া আর্টের প্রথম প্রয়োজনস্বরূপ নৈপুণ্য ও নৈর্ব্যক্তিকতা অর্জন করেছেন, জীবনবোধের বিশালতা এলে সেই শিল্প বৃহৎভাবে সার্থক হবে।

চিদানন্দ দাশগুপ্ত

Agostino: translated *by* Beryl de Zoete. Secker & Warburg. 7*s*. 6*d*.
Fancy Dress Party: translated *by* Angus Davidson. Secker & Warburg. 4*s*. 6*d*.
Woman of Rome: translated *by* Lidya Holland. Secker & Warburg. 12*s*. 6*d*.
Disobedience: translated *by* Angus Davidson. Secker & Warburg. 7*s*. 6*d*.
Conjugal Love: translated *by* Angus Davidson. Secker & Warburg. 7*s*. 6*d*,

সঙ্গীত

আপনাদের যাঁদের বাড়ীতে রেডিও আছে, তাঁরা একথা আমি আশা করি যে, আমার সঙ্গে একমত হবেন। কথাটী তথাকথিত। রেডিওর সংগীত ; বহুতর গলা শুনবেন সেখানে গান অতি অল্প ; এছাড়া একে রেডিও আর সেখানে শোনানো হয় ষ্টুডিওতে গৃহীত রের্কড ; সেই সেই গলা আরবার, যে যে গলা আপনার মেজাজে ভুঝোঁক মরিচ ছড়িয়ে দিয়েছে। এখন এই সকল গান যারা গায়, তারা গান জানে কিনা সে বিষয় ভাববার ও সেই আলোচনা আমাদের। হাটে মাঠে, ও আসরে যখন যখনই আমরা গান শুনেছি, তখনই দেখেছি গায়কের গলার স্বর অতিব দিব্য ; নিমিষেই শ্রোতা সমজদারের সঙ্গে ঝটিতি সম্বন্ধ যোজনা করে, শ্রোতারা অভিভূত। এর কিছু পরক্ষণে আপনার অভিজ্ঞাতা, যা ভোরের সূর্য্য থেকে অন্ধকারে—যে কাল নিত্য, এরই ক্ষণে ক্ষণে অতি সুক্ষ্ম আরো সুক্ষ্ম সাময়িক লীলা সংগঠন হয় এখন, এবং তাকেই আপনার মধ্যে ডেকে নিয়ে আসে। এই স্বরভঙ্গিমা এক অভিনব মাধুর্য্য বহন করি আনে, যা সমবেতকে—তাহার আপনকার সাক্ষাৎ পরিচয় দেয়। কিন্তু কথা এই, সেই এমত গলাস্বর ব্যতীত আপনার এরূপ অভিজ্ঞতা কোনক্রমেই রেখাপাত করা সক্ষম হয় না। অধুনা আবিষ্কৃত মাইকের স্বকীয়তা আমরা শুনেছি, এ দিব্যস্বর সেখানে যে আপনার হবেই, এমন কোন লেখা নাই। দৈব-দৈব। ফলে মায়িকগন্ধী গলা না হলে বড় প্যাঁচ। হয়ত সিদ্ধ গায়ক গান করেন, গান হয়, হঠাৎ একটা ছোট তান যেনবা বক্রোক্ত। তখন যারা যারা নিবিষ্টভাবে শোনে, তারা চোখে চোখে মেলায় আবার অন্ধকারের দিকে চায়। —সকলে বলাবলি করে, ওস্তাদী গান ভাল লাগে না। কিন্তু সেই সকলের, আশ্চর্য্যের, এই কথা সূত্রে যে, রবাব স্বরোদ সেতার বীণ, এমনও যে কর্ণাটী ঢঙে—যেহেতু তা সর্ব্বৈব অপরিচিত, তা প্রিয় হয়।—এক প্রকার গলা আছে যা মাইকে মজে, তারা ক্রমাগত দরদ ঢেলে দেয়। অতএব মাইক অনেক স্বর অভিজ্ঞতাকে ক্ষুণ্ণ করেই ; এ কারণে এই যে, যে দূরত্বকে সিদ্ধ করে গান হয়, যে অভ্যন্তর আমার আপনার সত্তাকে সঠিক অস্তিত্বের মধ্যে আনে, ছোট একটা ছুটী, বহু দিবস পর এবার একবার আবার আকাশের দিকে চাও, কোমল মুক্তির বিশ্বাস বৈ এ আর অন্য নয়। এ সেই দূরত্ব—যা গানের আত্মা অন্য ধারে যে এ হয় সে কলেবর। দূরত্বই সংগীত। এবং যে সেই দূরত্বই খণ্ডন হয়, এখানে এখন কথা জুয়াবে যে—"মহাশয়—দূরে সরে গিয়ে গানটী মজা পেতে পারেন।" একথার উত্তর যে যে 'দূরত্ব' আমি বলছি তা ঠিক সে দূরত্ব নয়। কণ্ঠে স্বর অভিজ্ঞতায় যে দূরত্ব গান হয়ে এসেছে—আর তা ক্রমে ক্রমে বিভাষিত হয় এই। এবং মাইকে তার সর্ব্বনাশ সংঘটিত হয় এমত বিশ্বাস। বহু বহু আকাশের মধ্য দিয়ে গান আসে ভেসে আসে, বঙ্গরজনীর

আকাশে উৎসারিত হয়ে চীনের হলুদ আকাশ মার্গ করে এবং ধূসর আকাশ এবং বহুতর কিন্তু আকাশের মহিমা যে, তার অঙ্গে মাখে না; যে তার সৌন্দর্য্যকে আর এক বাহার দিবেনা, রেডিও "সেটের" দিকে চেয়ে গান শুনি, অন্ধকার বিন্দু থেকে গান নামে, নামমাত্র। সে গানে আকাশ সাহায্য নেই, কেমন যেন বা তারই বিস্তার তানে লেখা লেখা ভাব। অনুভবটী যেন সে গাছে বেঁধে রেখে এসেছে এমনই। খোলা মেলা খানিক স্থান নেই—নেই বলি গানটীর কোন মেজাজ আমরা সম্যক উপলব্ধি করতে পারি না। বুকচাপা গান কেমন কেমন হয়। রঙের একটী অভিজ্ঞতা যথা রঙেই অভিব্যক্ত। স্থান বৈ সেই সে দূরত্ব কেমনে ফুটে। এই স্থানের একটী যথার্থই যদি আপনার সঙ্গে বহন না করে তবে তার স্বর অভিজ্ঞতা ভাঙা হাটে পড়ে থাকবেই।

ফলে কোন যান্ত্রিক সাহায্যে আসা না আসা সমান, তাতে এই হয় যে সমগ্র রচনাটী ক্লীব হয়। এখন অন্য কোন উপায় সেই সাহায্যটা আর আনা যাবে কিনা সেই কথা মনে করে আমরা চিন্তা করবো, যাতে করে গীতটী সত্ত হয় শুদ্ধতা থাকে। স্বর আর স্তব্ধতার বিচার সঠিক আইসে। স্থানটীর, প্রত্যক্ষভাবেই—তার একটী চিহ্ন আনা প্রয়োজন। শুধু ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির সমন্বয় না হয়েই অথবা বাক্যবিন্যাসে একটী চৈনিক বিশেষত্ব না পায়; এক্ষেত্রে আপন আপন অভিজ্ঞতাই আমাদের সহায়।

তখন যে গান আমরা কোন এক মিটারে প্রচারিত দোকানের "সেট" প্রমুখাৎ শুনবো, তখন আমাদের ভাল লাগবে। এবং সেই গানের শুদ্ধতা শুধু স্বরেই নয় তার সম্যক সৎস্বরূপ আমাদের মনে, পরে আত্মায় বিশেষ বিশেষ পরিচয় আনবে; সেই সেই সাক্ষাৎ পরিচয়ে আমরা যে কোন সৃষ্টীর বিস্ময়ে, যে কোন সৃষ্টীর স্বরূপতাতে আপনাকে দেখতে পাবে, পাশে দাঁড়াতে পারবো। এই সক্ষমতা কোন অহঙ্কার দেব না এ কথা সত্য, এ সক্ষমতা যা দেবে তা এই মরজগতে অনেকখানি, কেন না তা একের সেই অতীত নয়, যার মধ্যে সেঁদিয়ে বেশ পাশ-বালিশ আঁকড়ে থাকার আরাম পাবো। গমকে গমকে গোল বলার আনন্দ এখানেই নেই। সকালে গঙ্গায় দাঁড়িয়ে জলে অর্দ্ধ দেহ, করজোড়ে আকাশের দিকে চাওয়া যে আনন্দ যে পবিত্রাতা, সেই আনন্দ কে আমাদের হাতে হাতে দেবে!

কমল মজুমদার

রেডিও

কিছুকাল আগে বি. বি. সি-র পরিচালনা ও কার্যপ্রণালী অনুসন্ধান করে বেভারিজ কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। রিপোর্ট স্বীকার করেছে জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বি. বি. সি-র উপযোগিতা, সামাজিক সার্থকতা ও জাতীয় জীবনে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাহকরূপে বি. বি. সি-র অসংখ্য দান—জাতীয় রুচির উন্নয়নে বি. বি. সি-র সফলতা।

এই কিছুদিন আগেও অল ইণ্ডিয়া রেডিওকে বলা হত বি. বি. সি-র পোষ্যপুত্র। লায়নেল ফিল্ডেন ও জেড্. এ. বোখারী প্রভৃতি কর্ণধাররা নাকি ভারতীয় বেতার প্রতিষ্ঠানকে, বি. বি. সি-র কাঠামোয় গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, তাই দৈনন্দিন কর্মসূচিতে গোপন থাকেনি বি. বি. সি-র কৃত্রিম প্রভাব—অর্থাৎ, নির্লজ্জ অনুকরণ ও ধার করা প্রোগ্রাম পরিবেশন। উঞ্ছবৃত্তি জাতীয় চরিত্রের অংশবিশেষ, শুধু বেতার প্রতিষ্ঠানকে এব্যাপারে দোষী করা বাতুলতা। কিন্তু যে-প্রতিষ্ঠানকে প্রায় বিশ বছর অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে বি. বি. সি. তার মধ্যে শেষোক্তের গণতান্ত্রিক প্রভাব কিছুটা দেখতে আশা করা কি অন্যায়? বেভারিজ রিপোর্ট বেতারের দায়িত্ব সম্বন্ধে নতুন আলোকপাত করেছে—কর্তৃপক্ষ ও শ্রোতাদের সজাগ করেছে বেতার প্রতিষ্ঠানের বিভিন্নমুখী সম্ভাবনার প্রতি ইঙ্গিত ক'রে—চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে নানান ত্রুটি বিচ্যুতি।

আমাদের দেশের শ্রোতাদের বিরূপ সমালোচনা গত কয়েক বছর ধরে বেড়েই চলেছে, আর পুরোপুরি সরকারী মনোবৃত্তি নিয়ে রেডিও কর্তৃপক্ষও বদ্ধপরিকর রয়েছেন সবপ্রকার সমালোচনাকে উপেক্ষা করতে। বেতার কর্তৃপক্ষের কাছেই শুনেছি যে বাংলা দেশে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অনেক বেশী রেডিও শ্রোতা। কেবলমাত্র সংখ্যার বিচারেই নয়; সত্যিকারের বেতারানুরাগীর গুণগত বিচারেও বাঙ্গালীর স্থান অনেক উর্ধ্বে। কিন্তু একথা সত্য জেনেও সত্য ব'লে গ্রহণ করতে পারিনি। কেননা আমার কেবলই মনে হয় যে বাংলা দেশের শ্রোতাদের মতামতের উপর রেডিও কর্ণধারদের যদি বিন্দুমাত্র আস্থা থাকত তা' হলে প্রায় গায়ের জোরে নিজেদের খুসীমত এত নিকৃষ্ট প্রোগ্রাম পরিচালনা চলত না। বেভারিজ কমিটির অনুরূপ কোন কমিটি নিয়োগ করে নিশ্চয়ই চেষ্টা করা হোত নিজেদের ত্রুটিগুলি সম্যক হৃদয়ঙ্গম করবার ও সেই সঙ্গে সঙ্গে উপায় নির্ধারণ করা হোত যে কি ক'রে দৈনন্দিন প্রোগ্রামকে আরো উন্নততর করা যায়।

বলাই বাহুল্য যে নিতান্ত প্রাণের দায়ে রেডিও কর্তৃপক্ষ কোন অসরকারী কমিটি নিয়োগের প্রশ্ন সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতে চান। কলকাতার বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় নিয়মিত যে রেডিও সমালোচনা প্রকাশিত হয় তার প্রতিও তাঁরা কোনদিন মনোযোগ দিয়েছেন বলে

আমি অন্তত শুনিনি। অবশ্য ভারতের অন্যান্য কেন্দ্র, বিশেষ করে দিল্লী, এ-ব্যাপারে কিছুটা যে সজাগ তা' বর্তমান লেখকের অজানা নেই।

বোম্বাই, দিল্লী ও লক্ষ্ণৌর দৈনিক পত্রিকাগুলোর নিয়মিত সমালোচনা ওসব কেন্দ্রের কার্যসূচির অনেক কিছু বদলাতে বাধ্য করেছে। একমাত্র কলকাতার পত্রিকা-গুলিতেই কাকস্য পরিবেদনার সুর অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কলকাতার সব পত্রিকাই যে নিস্পৃহ সমালোচক এ-কথা বলা যায় না—কিছু সমালোচনা হয়ত ব্যক্তিগত স্বার্থের সঙ্গেও জড়িত। কিন্তু গত এক বছরে অনেক ভাল রেডিও সমালোচনাও কলকাতার বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় চোখে পড়েছে—এধরণের লেখায় আছে নিঃস্বার্থ মতামত ও সত্যিকার শিল্পানুরাগীর দৃষ্টি। কর্তৃপক্ষ হয়তো বলতে পারেন যে প্রতি সোমাবার সকালে সবিনয়ে যে নিবেদন তাঁরা পেশ করেন (ন্যাকামিতে ও ভাঁড়ামিতে যার তুলনা মেলা শক্ত) এসব সমালোচকদের ঠাণ্ডা রাখতে তাই অত্যন্ত উপযোগী! কিন্তু এরকম আত্মপ্রসাদে যে লাভ নেই তা বেতার পরিচালকমণ্ডলীর একটা অংশ হাড়ে হাড়েই জানেন।

অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সঙ্গে জড়িত আছেন নীরদ চৌধুরী, নারায়ণ মেনন, সোমনাথ চীব। এই সব বিদগ্ধ ও সুরুপচিসম্পন্ন ব্যক্তিদের আমি প্রশ্ন করব যে তাঁরা কি অস্বীকার করতে পারেন যে বেভারিজ রিপোর্ট যা বি. বি. সি. সম্বন্ধে বলেছে তার ঠিক উল্টোটা এ. আই. আর. সম্বন্ধে নিঃসঙ্কোচে বলা যায়—অর্থাৎ, জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ. আই. আর-এর (বিশেষ ক'রে কলকাতা শাখার) অনুপযোগিতা, সামাজিক অসার্থকতা, জাতীয় রুচিকে নিম্নগামী করার সর্বপ্রকার চেষ্টা ও দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির কাছে মৌলিক দায়িত্ব-পালনে অক্ষমতা।

কলকাতা কেন্দ্রের শৈশব অনেকদিন উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু বয়সের বিচারে যৌবনে পদার্পণ করলেও এর আব্দার এখনও শিশুসুলভ। 'বেতার জগতে'র এক বিশেষ সংখ্যায় বলা হয়েছে, "বাংলা দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে—সংগীত, ভাষা ও সাহিত্য, শিক্ষা ও জ্ঞানবিজ্ঞান, সাংস্কৃতিক পরিবেশ-সৃজন প্রভৃতি বিষয়ে বেতারের কার্যাবলী ও তার ফলাফল আজ আর কারো কাছে অপ্রত্যক্ষ নেই। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মনীষী সুস্পষ্ট ভাষায় তা লিপিবদ্ধ করেছেন।......সংবাদ ও সাময়িকপত্রে বেতারের যতো কঠোর সমালোচনাই হোক—শ্রোতৃসাধারণের মধ্যে এর জনপ্রিয়তা সুপ্রতিষ্ঠিত।"

কিন্তু রেডিও কর্ণধাররা একটু খোঁজ করলেই জানতে পারবেন শ্রোতাদের অভিমতটা কি। শ্রোতৃমণ্ডলীকে সংবাদ এবং সাময়িক পত্র থেকে পৃথক ক'রে ভাবা যে অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতা এ-সম্বন্ধে কি আর আজকের দিনে কাউকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন আছে? আর তা' ছাড়া এরকম যুক্তিতে যে রেডিও কর্তৃপক্ষ নিজেরাই বিশ্বাস করেন না তা' অতি সহজেই প্রমাণ করা যায় দুই একটি প্রসঙ্গের উত্থাপন ক'রে। দৃষ্টান্তগুলি মূল্যবান এইজন্যে যে কলকাতার বেতার ও সংবাদপত্রের মধ্যে সত্যিকার সম্বন্ধ বুঝতে এরা আমাদের সহায়তা

করে; কিন্তু এই ঘরোয়া ব্যাপারগুলির অবতারণা এবারের মত স্থগিত রেখে একটি সর্ব-ভারতীয় বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া যাক।

ভারতে সাধারণ নির্বাচনের দিন যতই এগিয়ে আসছে, রেডিও মারফত রাজনৈতিক আলোচনার উপযোগিতা নিয়ে জনসাধারণও মাথা ঘামাচ্ছেন ততই বেশী। এটা খুবই আনন্দের কথা যে সংবাদ পরিবেশনে ইদানিং অনেকটা বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। গত কয়েক বছর সংবাদ বিতরণ ব্যাপারে এ. আই. আরের বিরুদ্ধে সমালোচনা ছিল প্রধানত এইরূপ: সরকারী কার্যকলাপ ও পরোক্ষে দলীয় প্রচারের উপর বিশেষ মনোযোগ; ভিন্ন মতাবলম্বীর মতামত প্রকাশের পথে নানাপ্রকার বাধা; কথিকা ও অন্যান্য প্রোগ্রামের জন্য লেখার উপর ঘন ঘন নীল পেন্সিল চালানোর ফলে প্রাণহীন ও বিরস কথিকার পরিবেশন; অতিশয় সতর্কতার ফলে কোন নতুন জিনিস বা কোন অভিনব ভাবধারার বিরুদ্ধতা; সংবাদের মধ্যে বাঁধাধরা বিষয়বহির্ভূত কোন মন্তব্য বা ভবিষ্যদ্বাণী ঢুকতে না দেওয়া।

অতি সাবধানতার চরম দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি কয়েক বছর আগে, যখন গান্ধীজির উপর বোমা নিক্ষেপের চেষ্টার খবর এ. আই. আর সম্পূর্ণ চেপে গিয়ে এ-সম্বন্ধে বি. বি. সির এক সংবাদকে রিলে করেন এবং ঘটনাটির একটি বিশদ বিবরণ তাঁরা ঢুকিয়ে দেন পরে সংবাদ বুলেটিনে। এই ধরণের হাস্যকর সতর্কতা এখনও দু'একটি বিষয়ে অবলম্বন করা হয়—যেমন সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার পূর্বে সরকারী খবরকে চেপে রাখা, আশু রাজনৈতিক পরিবর্তনের খবর জানা থাকলেও কোন ইঙ্গিত না দেওয়া, অথবা রেডিওর নিজের সংবাদদাতার কোন ভবিষ্যদ্বাণীকে গোড়াতেই সন্দেহের চোখে দেখা।

তবে এসব ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ আজকাল কিছুটা উদার নীতিও অবলম্বন করছেন। নিতান্ত সরকারী বা দলীয় স্বার্থ বহির্ভূত অনেক জনপ্রিয় বিষয়ে সংবাদ বিতরণ কিছু কিছু করা হচ্ছে। বিরুদ্ধ মত প্রকাশের সুযোগও কিঞ্চিৎ বেড়েছে—গত কয়েক সপ্তাহে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল উপদলের খবরাখবর ও কাজের ফিরিস্তি দেওয়া হয়েছে; আচার্য কৃপালনীর কংগ্রেস পরিত্যাগ পত্র, পাটনা সম্মেলনের বিবরণ, রফি সাহেবের পদত্যাগের কারণ প্রভৃতি বাদ যায়নি সাধারণ সংবাদের বুলেটিন থেকে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে সমাজতান্ত্রিক, সাম্যবাদী ও হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি বিরুদ্ধ দলগুলির নির্বাচনী বিবৃতির সারাংশ বেতারে ঘোষণা করা হয়েছে। পণ্ডিত নেহেরুর কংগ্রেস কার্যনির্বাহক কমিটি থেকে পদত্যাগের ব্যাপারে যেমন শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মহতাবের মন্তব্য ঘোষণা করা হয়েছে তেমনি আবার পণ্ডিত ডি. পি. মিশ্রের বিবৃতিও চেপে যাওয়া হয়নি। ভারতের ফিল্ম শিল্পীদের সোভিয়েট দেশ ভ্রমণের সংবাদও এ. আই. আর বেশ ঘটা করেই পরিবেশন করেছেন। এ-ব্যাপারে রেডিওর নীতি পরিবর্তনের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

বিদেশে সংবাদ বিতরণের সময় পূর্ব-পশ্চিম বিরোধে ভারতের নিরপেক্ষতার নীতিকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অনুসরণ করা হয়েছে। কিন্তু এ-সমস্ত সত্ত্বেও আগামী নির্বাচনের প্রচার ব্যাপারে রেডিওর কোন অংশ না-গ্রহণ করার নীতি শ্রোতাদের হতাশ করেছে। এ-সম্বন্ধে মত বদলালে রেডিও কর্তৃপক্ষের একটা বিরাট অভিজ্ঞতার সুযোগ ঘটবে; বেতারের যুগান্তকারী সম্ভাবনা সম্বন্ধে জনসাধারণ হবে আরো বেশী সজাগ; আর অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত ভোটদাতারা তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে পাবে মূল্যবান শিক্ষা।

রাজা রায়

সিনেমা

ভারতে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

সংখ্যার হিসাবে আমাদের দেশ পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম চলচ্চিত্র-উৎপাদনকারী দেশ। 'উৎপাদন' বলাই ভালো, কেননা আমাদের চলচ্চিত্র ব্যবসাবাণিজ্যের দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ, শিল্পের দিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার অবদান যে বিশেষ কিছু নয়, সেটা সকলেরই স্বীকার্য।

চলচ্চিত্রের উৎপত্তি বিদেশে ; আমাদের শিল্পের ঐতিহ্যের সঙ্গে এখনো তার জোড় মেলেনি, মেলানোর কাজ যখন স্বুরু হবে তখনো সে কাজ বেশ কঠিন হবে সন্দেহ নেই। কাজেই বিদেশের সাহায্য নিয়ে ও অনুসরণ করেই আমাদের চলচ্চিত্রের ব্যবসা গড়ে উঠেছে। যন্ত্রপাতি থেকে স্বুরু করে গল্পের ঢং ও বিষয়বস্তু পর্যন্ত অনেক কিছুই বিদেশ থেকে আমদানী। আজকের বোম্বাই-মার্কা ছবি হলিউডের নিকৃষ্ট নকল ছাড়া আর কিছু নয়। বাংলায়ও এই প্রভাব শরৎ-বঙ্কিমের গল্পের মধ্য থেকেও উঁকি দেয়।

কিন্তু হলিউড ছাড়া বিদেশী চলচ্চিত্রের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নিতান্ত কম ; মার্কিণ ও ইংরিজী ছবি ছাড়া আমাদের দেশে অন্য চলচ্চিত্রের সঙ্গে চলচ্চিত্র প্রযোজক ও অধিকাংশ দর্শকের সম্বন্ধ নেই বললেই চলে। ব্যবসায়িক নানা কারণ ছাড়া এর একটা কারণ এই যে হলিউডকেই আমাদের দেশ চলচ্চিত্রের গুরু বলে ধরে নিয়েছে। ফরাসী, রুশ, জার্মান ও ইতালিয়ান চলচ্চিত্রের গুরুত্ব আমরা উপলব্ধি করি না, করার প্রয়োজনও বোধ করিনি। চলচ্চিত্র-শিল্পের বাইরে থেকে কিছু কিছু লোক সোভিয়েট এমন কি অন্যান্য ইউরোপীয় চলচ্চিত্র নিয়েও চর্চা করেছেন, কিন্তু তাঁদের চেষ্টা এখনো কোনো বৃহৎ পরিধিতে পৌছয়নি। সারা ভারতবর্ষে অনেকগুলি ফিল্ম সোসাইটি এই দিকে কাজ করছেন, শিক্ষিত লোকের দৃষ্টিও তার প্রতি কিছুটা আকৃষ্ট হচ্ছে, কিন্তু তেমন ব্যাপক আন্দোলন এখনো হয়নি, যাতে এদেশের চলচ্চিত্র-শিল্পকে পরিবর্তিত করতে পারে।

শিক্ষিত সমাজে এদেশী চলচ্চিত্রের ওপর বিরাগের প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে তাঁরা মার্কিণ-ইংরেজ অধ্যুষিত চলচ্চিত্রের মধ্যেও যে মহত্বের ও শিল্পগত সার্থকতার পরিচয় প্রায়ই পেয়েছেন, তার তুলনায় ও সাধারণভাবে বিদেশী চলচ্চিত্রের মানের সঙ্গে তুলনায় আমাদের দেশের ছবি তাঁদের চোখে অসহ্য ঠেকে। এটা কেবল আমাদের আঙ্গিকের যন্ত্রগত দুর্বলতার জন্য নয়, আমাদের চলচ্চিত্রের পঙ্গু কল্পনা, ব্যাধিগ্রস্ত বিষয়বস্তু ও নিকৃষ্ট সাংস্কৃতিক স্তরের জন্য।

যাঁরা অন্যান্য বিষয়ে এদেশীয় শিল্পের গর্বে শতমুখ, তাঁরাও চলচ্চিত্রের বেলায় এই গ্লানিকর আত্মনিন্দার আশ্রয় নিতে বাধ্য হন।

স্থতরাং বিদেশী চলচ্চিত্রের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাতেই আমাদের শিক্ষিত সমাজকে চলচ্চিত্রের সম্ভাবনা সম্বন্ধে অবহিত করেছে। কতদূর অবহিত করেছে তার পরিচয় পাওয়া যায় গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে দশটি ফিল্ম সোসাইটির উদ্ভবে, ফিল্ম এনকোয়ারী কমিটির নিয়োগে, ফিল্মস্ ডিভিসনের ক্রমোন্নতিশীল ক্রিয়াকলাপে, চলচ্চিত্র বিষয়ে উচ্চাঙ্গ পত্রিকাদির প্রকাশে ও সর্বশেষে এদেশে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-উৎসবের আয়োজনে।

এই উৎসবের ঘোষণায় যে কার্যক্রম প্রকাশ হয়েছে, তা যদি পরিপূর্ণ ভাবে পালিত হয়, তবে ভারতবর্ষে চলচ্চিত্র শিল্প একটা বিরাট পরিবর্তনের তাগিদের সম্মুখীন হবে সন্দেহ নেই। কেননা চলচ্চিত্রের গুরু চার্লি চ্যাপলিন, ইতালীর রসেলিনী ও ডি সিকা, ইংলণ্ডের অলিভিয়ার ও আরও অনেক গুণী ব্যক্তির এই উৎসবে আসবার কথা। সম্প্রতি রেনোয়া, পুডোভকিন ও চেরকাসভ এদেশে ভ্রমণ করে যাওয়ার ফলে বিদেশের সঙ্গে যে স্বাস্থ্যকর যোগের সূত্রপাত হয়েছে, তা আরো শক্তিশালী হয়ে উঠবে এই উৎসবের মধ্যস্থতায়। সারা পৃথিবীর গত দু' বছরের শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি দেখানো হলে তারও গভীর প্রভাব পড়বে জনসাধারণের ওপর। চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ীদের শত অনিচ্ছা সত্বেও ভারতের চলচ্চিত্র-শিল্পের রূপ ক্রমশ বদলাতে বাধ্য হবে। রেনোয়ার ক্ষেত্রে এদেশী ব্যবসায়ীরা যে বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন সেটা পুডোভকিন ও চেরকাসভের ক্ষেত্রে অনেকখানি হ্রাস পেয়েছিল, চলচ্চিত্র-উৎসব তাঁদের বিরুদ্ধতাকে আরো পরাভূত করবে। বিদেশী শিল্পের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে নকলের মোহ ভেঙে গিয়ে জাতীয় মানস চলচ্চিত্রে অধিকতর ভাবে প্রকাশ পাবে বলেই আমার বিশ্বাস।

চি. দা

নাটক

থিয়েটার ভালো হচ্ছে না, বা সিনেমা ভালো হচ্ছে না এই বলে এতো লেখা বেরোয় (আমি নিজেও লিখেছি দু'একটা) যে তাতে বিশেষ একটা সুফল ফলে না। বলা বিস্তর হয়েছে এখন কাজে কিছু ক'রে দেখানো দরকার। অবশ্য কাজও যে হচ্ছে না তা নয়। হালে 'নতুন ইহুদী' নামে একটা নাট্যাভিনয় যোগ্য প্রশংসা পেয়েছে, 'বহুরূপী'-র অভিনয়ও অনেক প্রশংসা পেয়ে ধন্য হয়েছে। কিন্তু এসব সম্বন্ধেও কিছু লেখা আমার পক্ষে শক্ত কারণ আমি নিজে একটা দলের সঙ্গে জড়িত। শেষকালে নিজের ঢাক নিজেই পিটোচ্ছি বলে অপবাদ এলে লজ্জা রাখবার জায়গা থাকবে না।

কিছুদিন আগে 'গৈরিক পতাকা' নাটকে নানান্ অভিনেতার সমাবেশ হওয়ার দরুণ এক সন্ধ্যায় নাকি সাত হাজার টাকার টিকিট বিক্রী হয়েছিল। এইতেই বোঝা যায় চল্‌ছে কী ক'রে। আমরাই চালিয়ে দিচ্ছি যে। মরে মরেও যদি কোনও জিনিষ টিঁকে থাকে তাহলে প্রমাণ হয় নিশ্চয় সেটাকে ঠেকা দিয়ে কেউ তুলে ধরে আছে। এ ক্ষেত্রে কে সেই পৃষ্ঠপোষক ? রাষ্ট্র ? অতি অল্প পরিমাণে। আমোদকর থেকে অব্যাহতি দিয়ে ঠিক নয়, অপরের ওপর আমোদকর চাপিয়ে একটু স্থবিধে করে দেওয়া হয় তাঁদের। কিন্তু বিক্রী হ'লে তবে তো আমোদকর। সেটা সাধারণ দর্শকের কথা। দর্শক সেখানে যায়, না যায় না ?

যায়ও বটে, আবার যায় নাও বটে। অভিনেতা বিশেষ সম্পর্কে তাদের মোহ আছে কিন্তু রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে তাদের কোনও মোহ নেই। সেই রকম অভিনেতা যদি আবার কিছু একজোট হন তাহলে হঠাৎ খুব ভীড় হয়। যেমন, শ্রীরঙ্গমে 'বিজয়া' নাট্যাভিনয়ে হয়েছিল। ভাদুড়ী মহাশয় ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, সরযূবালা। এবং আর একজন, 'ষ্টার' লেখক শরৎচন্দ্র। খুব বিক্রী হয়েছিল কদিন। কিন্তু সে অভিনয়ে পারস্পরিক বোধ থাকে না, সঙ্গৎ হয় না, নাটকও প্রকাশ পায় না। যেটা প্রকাশ পায় সেটা হোল দর্শকের মনোহরণের জন্য ব্যক্তিগত কারিকুরি।

তবু, টাকা তো আসে। এবং সেইটাই প্রমাণ জনপ্রিয়তার। অর্থাৎ বাংলা রঙ্গমঞ্চের ক্রমাগত অবনতির কারণ হচ্ছে দর্শকসমাজ। শিল্পী এবং মালিকদের অনেক গাল দেওয়া হয়েছে। যতো তাঁদের দোষ তার চেয়ে ঢের বেশী নিন্দাবাদ তাঁদের করা হয়েছে। কিন্তু দর্শকসমাজ—সাধারণ লোক—নিজেদের দোষ দেখেন না। পয়সার জন্য থিয়েটার চালানো হয়, দর্শক যদি পয়সা না দেয় তা'হলেই তো বন্ধ হয়ে যাবে থিয়েটার, বদ্‌লে যাবে। কিন্তু টিকিট বিক্রীর হিসাবে দর্শক এই কথাই জানিয়েছে যে, শিল্পের ধার সে বড় ধারে না, খানিকটা রোমাঞ্চ হ'লেই সে খুসী। আর, খানিকটা গ্ল্যামার থাকা চাই।

একথা লেখাপড়ায় অনভিজ্ঞ সস্তার দর্শকদের সম্বন্ধেই খালি বলছি না, তথাকথিত শিক্ষিত উচ্চচাকুরে-বংশজাত আধুনিক ইঙ্গভাবাপন্নদের সম্পর্কেও খাটে, যাঁরা নাকি আমাদের সমাজে অভিজাত শ্রেণী। একজন বিখ্যাত অভিনেতা একবার দুঃখ করে বলেছিলেন—"বুদ্ধিমান লোকগুলোও টিকিটের counterfoils এর সঙ্গে সঙ্গে আধখানা বুদ্ধি জমা রেখে হলে ঢোকেন, আর যতো ন্যাকামি আর নাকীকান্না দেখে হাত্‌তালি দেন।"

কথাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অবশ্য অনেকে বলেন, থিয়েটারে যে আজকাল লোক বেশী হয় না তাইতেই তো প্রমাণ হয় যে লোকে বোঝে। তাই যদি হয়, তাহলে যুদ্ধের মধ্যে অত বাজে বাজে অভিনয় অত প্রভূত টাকা পেয়েছিল কী ক'রে? সে টাকা কে দিয়েছিল?

একজন উত্তর দিয়েছিলেন "সেটা ছিল অস্বাভাবিক সময়, তখন বিস্তর বাজে লোক মেলা কাঁচা টাকা পাচ্ছিল,—তাই।" .তাই যদি হয় তাহ'লে কি বুঝতে হবে যে তখন বাজে লোকে টাকা পাচ্ছিল আর এখন কাজের লোকেরা—যথার্থ শিল্প বোদ্ধারা টাকা পাচ্ছেন! অথচ, মাঝে মাঝে হিসাব দেখেছি, সাধারণ-জীবনে মূল্যমান চার পাঁচ গুণ বেড়ে গেছে; আর দেখেছি, কোটীপতি মালিকরা সকলের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে কতো অর্ব্বুদ জানি মুনাফা করেছে। অর্থাৎ যথার্থ শিল্প বোদ্ধারা হচ্ছেন——!

অতএব, বলা যায় যে, থিয়েটারের এমন কিছু অবনতি হয়নি, যেমনটি দেশের লোক চেয়েছে প্রায় তেমনটি আছে। দোষের মধ্যে গ্ল্যামারের একটু অভাব। অল্পবয়সী ইংরেজী বলিয়ে-কইয়ে মেয়ে আরও কিছু আনতে হবে, আর ইংরেজী ধরণের নাচ-টাচ্ (touch ?!)—যেমন ধরুণ,—ব্যস্, দেখ্‌তে হবে না, ভীড় রোখা যাবে না।

কথাটা মর্ম্মান্তিক ভাবে সত্য। শ্রদ্ধেয় শিশিরকুমারকে বহু সময়ে বলতে শুনেছি, দেশের লোক দাম দেয় না, মর্য্যাদা দেয় না শিল্পের।—গোড়ায় গোড়ায় শুনে রাগ হোত, বরঞ্চ আমরা যে মর্য্যাদা দিয়েছি তাঁকে তিনিই তার সম্মান রাখেন নি। কিন্তু এখন দেখে-শুনে মনে হয় কথাটা হয়তো সত্যি। অনেক চেঁচামেচি ও মূর্খের মতো প্রশংসার মাঝে তাঁর শিল্পীমন হয়তো বুভুক্ষু থেকেছে যথাযথ তারিফের অভাবে। তাঁর অভিনয়ের যে সমস্ত সদ্‌গুণ তার কোনও যোগ্য আলোচনা আমি অন্ততঃ আজ পর্য্যন্ত পড়িনি। রঘুবীরের রঘুয়াতে রূপান্তরিত হওয়ার দৃশ্যে তাঁর যে অভিনয়, তার তুলনা করতে গেলে পৃথিবীর মহৎ শিল্পীদের অভিনয়ের সঙ্গে তুলনা করে দেখ্‌তে হবে। যে ভঙ্গীটা সাধারণ দৃষ্টিতে হাস্যকর সেইটা কী করে বিরাট climax রচনা করতে পারে তা জানতে গেলে ঐ দৃশ্যের অভিনয় দেখা দরকার। আমি যখন দেখেছি তখন তাঁর বয়স ছিল বাহান্ন বছর। ঐ বয়সী একজন ভদ্রলোক যদি দুই পায়ে মল পরে স্টেজের ওপর দু'হাত উঁচু লাফাতে থাকেন তা'হলে হাসি পাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সমস্ত হাসি শুকিয়ে যাবে সেই অবিস্মরণীয় অভিনয় দেখ্‌লে। আমার মনে হয়েছিল যেন ঈগলের মতো ছোঁ মেরে তিনি আমার মনটাকে

কোথায় কোন্ ঊর্দ্ধে যে নিয়ে গেছেন, যেখানে 'মহান্ মৃত্যুর সাথে' আমি মুখোমুখি, একা। সে উপলব্ধি আমি জীবনে ভুলবো না। এই রকম আরো অনেক আছে। দুর্গাদাস বাবুর খাদের গলায় কাজ করবার এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। অতো আবেগ এবং complex আবেগ, অত খাদের পর্দায় আর কারো শুনিনি। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনও কথা লেখা হয়েছে কি, কোনও আলোচনা? অথচ বিদেশী অভিনেতাদের শিল্পবিচার করা প্রবন্ধ আমরা অনেকে পড়েছি। আমি কিছু বিলেতী অভিনেতার মঞ্চাভিনয়ও দেখেছি। তার মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতনামা লোক হচ্ছেন John Gielgud। তাঁর 'হ্যামলেট' অভিনয় দেখেছি। এবং দেখে বুঝেছি যে আমার দেশের প্রথম শ্রেণীর অভিনেতারা প্রচুর শক্তিশালী। কিন্তু Gielgudএর শিল্প সম্বন্ধে যতো প্রবন্ধ আমার চোখে পড়েছে, স্যার লরেন্স অলিভিয়ার সম্পর্কে যতো বিশ্লেষণ আমি পড়েছি তার তুলনায় আমাদের দেশের শিল্পীরা অবহেলিত, অবজ্ঞাত। আমরা রবীন্দ্রনাথকে খাতির করি তিনি নোবেল প্রাইজ পাবার পর, উদয়শঙ্করের নাচ দেখে মুগ্ধ হই আমেরিকা ইউরোপ সসম্মানে ঘুরে আসার পর, এবং ফিল্মস্টারকে খাতির করি তাঁর রোজগারের অঙ্ক দেখে।

অতএব, এই দর্শক সমাজের বুদ্ধির উপযুক্ত থিয়েটারই সম্প্রতি আছে, কোনও অধঃপতন হয়নি। কেবল আর একটু হিন্দী বায়স্কোপের মতো ধরণধারণ করে নিতে পারলেই কোনও গণ্ডগোল থাকবে না।

শম্ভু মিত্র

সমালোচনা

বেড়াল ঠাকুরঝি—বিভূতিভূষণ গুপ্ত। বিশ্বভারতী। দুই টাকা বারো আনা।
কালোর বই—সুনীলচন্দ্র সরকার। দিগন্ত পাবলিশার্স। দেড় টাকা।

শিশুসাহিত্যও যে সাহিত্যই এ কথা প্রায়শঃই আমরা ভুলে যাই। শিশু বা কিশোরের চিত্তে চমৎকার সৃষ্টি করে যিনি ভাব ও ভাষার বিন্যাস করতে পারেন তিনি সাহিত্যিক না হয়ে যান না: আর যিনি সুসাহিত্যিক, বিশেষ কয়েকটি গুণ বা প্রবণতা থাকলে কেবল তাঁর পক্ষেই শিশুসাহিত্য সৃজনে হাত দেওয়া শোভা পায়। বয়স্কদের চিত্তহারী কাব্যে, নাটকে, গল্পে, খেয়ালী রচনায় যেমন ভাষার বাঁধুনি আর ভাবের বাঁধুনি, সত্যের কল্পরূপ আর কল্পনার সত্যতা প্রয়োজন হয়; এক কথায় রূপ দিয়ে রসের আর রস দিয়ে রূপের সার্থকতা সৃষ্টি করতে হয়—এ ক্ষেত্রেও তার অন্যথা ঘটে না। আর তাইতো গালিভারের ভ্রমণ কথাই হোক আর একাধিক এক সহস্র রজনীর আরব্য উপকথাই হোক, ভিন্নদেশী গ্রিম্ বা আণ্ডারসনের গল্পই হোক আর এদেশীয় অবনীঠাকুর বা সুকুমার রায়ের রচনাই হোক—এগুলি আদৌ বড়োদের জন্যে বা ছোটদের জন্যে লেখা হয়েছে কিনা সে কথা আজ অবান্তর—বড়ো ছোটো, রূপমুগ্ধ আর রসজ্ঞ, সকল দেশের আর সকল কালের লোকেরই মনোহরণ করছে, না করবার কোনো হেতু নেই।

অথচ, শিশুসাহিত্যের কয়েকটি বিশিষ্ট গুণও আছে, সে গুণ সকল সাহিত্যিকের লেখায় পাওয়া যায় না। যেমন লৌকিক সৃষ্টিতে তেমনি অলৌকিক মানসসৃষ্টিতে শিশু বা কিশোরের অন্তর সকল বিষয়ে আকৃষ্ট হয় না, সব জিনিষের স্বাদ পায় না। সাধারণ সাহিত্যিকের মুশকিল এইখানেই। ভাষার কারুতে—যে কারুতে শব্দ আছে, ছন্দ আছে, সংগীত আছে—ভাবের বিকাশে—যে বিকাশে ছবি ফোটে, অর্থ ফোটে, রুদ্ধ হৃদয়কোরকও ফুটে ওঠে—নিপুণ ও প্রবীণ প্রতিভার প্রয়োগ হওয়া চাই; ভাব ও ভাষা সম্বন্ধে সে প্রতিভা যেমন সহজাত তেমনি আবার দীর্ঘ সাধনা-সাপেক্ষ; পেয়েও পাওয়া যায় না তাকে সহজে; কিন্তু এই যে প্রতিভা এর অন্তরে থাকা চাই চিরশিশুর, চিরকিশোরের প্রকৃতি। অর্থাৎ একই কালে হতে হয় প্রবীণ, আর শিশু বা কিশোর বা চিরনবীন। নবীনতায় ও প্রবীণতায় আসলে কোনো দ্বন্দ্ব নেই জানি; বুড়ো বুড়ো মানুষের অনেক পূর্ব-সৃষ্ট এই পৃথিবী; কিন্তু ঋতুতে ঋতুতে, বৎসরে ফিরে ফিরে, যে কেউ দেখেছে তার বিচিত্র শোভা স্বপ্নেও কল্পনা করবে না তাকে বুড়ি বলে। মুশকিল মানুষের, অর্থাৎ সাধারণ মানুষের। কালের অদৃশ্য স্রোত বয়ে যায় সমস্ত জগৎ ব্যেপে, সমস্ত জীবন ব্যেপে, আর

তার ফলে দৃশ্যতঃই ধূলিস্তর ও জড়ত্বসঞ্চয় জ'মে জ'মে প্রতিদিনই মানুষ বুড়ো হয়ে যায় দেহে আর মনে। অন্তত মনের জরাকে ঠেকানো চাই। জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায় প্রবীণ হয়েও, এই জীবন ও এই জগৎ সম্পর্কে ভালো লাগায় আর ভালোবাসায় আর বিস্ময়ে শেষ পর্যন্তই শিশু হয়ে থাকা চাই। সে কি সহজ কথা ?

কেমন সে শিশু ? যে থাকে 'জগৎ-মায়ের অন্তঃপুরে'। যেখানে ঘটে—

যা ইচ্ছে তাই
কোনো নিয়ম কোনো বাধা-বিপত্তি নাই।···
সত্য বুড়ো নানা রঙের মুখোষ প'রে
শিশুর সনে শিশুর মতো গল্প করে।···
বোবাদেরও কথা বলান খোকার কানে,
অসাড়কেও জাগিয়ে তোলেন চেতন প্রাণে।···
খেলার গৃহ হয়ে ওঠে বিশ্বজগৎ।

লক্ষ্য করতে হবে, শিশুর তথা শিশুসাহিত্যের কারবার যে মিথ্যা নিয়ে তা নয়, বস্তুত বহুরূপী বা অনন্তরূপী সত্য নিয়ে, যে সত্য ব্যস্তবাগীশ হয়ে কাজের ভাণ করে না ; কিন্তু বিচিত্রভাবে অভিনয় করে ও খেলা করে।

কিশোর প্রাণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় রূপে আর রঙে আর ভঙ্গীতে ও গতিতে। এই নবীন মনোজগতে সর্বদাই দ্রুত বা মন্থর এক অনাদ্যন্ত চলচ্চিত্রের পাক খুলে খুলে চলেছে। সত্যে এখানে স্বপ্নেরও সাদৃশ্য আছে। চিত্রের সঙ্গে চিত্রের যোগ পরিস্ফুট ভাব দিয়ে, অর্থ দিয়ে, যুক্তি দিয়ে ততটা নয়, যতটা রূপ দিয়ে, রাগ দিয়ে আর ভঙ্গী দিয়ে ; ভাবের ও অর্থের শৃঙ্খলা আছে অন্তর্লীন। অর্থাৎ এ এক বিচিত্র রকমের প্রতীকী ভুবন বলা চলে। এই ভুবনকে প্রকাশ করে এরূপ ভাষানিবদ্ধ ও গ্রন্থনিবদ্ধ উৎকৃষ্ট সাহিত্য কোনো দেশেই প্রচুর আছে বলে জানি নে। এক আছে স্নেহময়ী মা দিদিমা ঠাকুমা'র মুখে মুখে : আছে দেশে দেশেই, যুগে যুগেই—আছে ঘুমপাড়ানি ছড়ায়, গানে, গল্পে, রূপকথায়—রূপকথা শব্দের অর্থের ইঙ্গিত লক্ষ্য করার বিষয়—যাতে পাই জিন-পরী, দৈত্য-দানা, সুয়োরাণী, দুয়োরাণী, সোনা-রূপোর কাঠি এবং ঘুমন্ত বা জাগন্ত রাজকন্যার বৃত্তান্ত। রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, বণিকতন্ত্র পার হয়ে রকমারি গণতন্ত্র বা জনতন্ত্রের দিকে মোড় ফিরেছে মানবসমাজ—আজও সেই চোখে-না-দেখা কেবল-কানে-শোনা রাজকন্যা কিন্তু অনর্থ বা অসত্য হয়ে যায় নি। যেমন অসত্য হয় নি আজও রামসীতা, কৃষ্ণার্জুন, ইউলিসিস-হেলেন, রোমিও-জুলিয়েট-মিরান্দা-ম্যাক্‌বেথ-হ্যামলেট আদি অবিস্মরণীয় চরিত্র। সে কথা থাক্, মুখে মুখে রচিত এই শিশুসাহিত্যে আর এক শ্রেণীর কাহিনী আছে যাতে শেয়াল, কুমীর, ভোঁদড়, ভালুক, টুনটুনি, খট্টাস, বুড়ি ও তার কুল গাছ কথা কয়ে উঠেছে—এগুলিতে অলৌকিক কল্পনা ও স্বপ্নমুগ্ধতার বদলে বিশেষ করে আছে হাস্য ও কৌতুকের রস তথা অপেক্ষাকৃত পরিণত মনের বিলাস ও ভাবনা ; এগুলির রচনায় নিরাসক্ত শৈশবে উত্তীর্ণ ঠাকুরদা ও দাদামশাই

কোম্পানির যে যথেষ্ট হাত নেই তা বলা যায় না। (আর এক পা বাড়ালেই গুরুমশাইয়ের এলাকা, হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, ঈশপের গল্প। গুরুমশাইও মনোহরণের ভাণ ক'রে কথা কইয়েছেন বিশ্বের তাবৎ পশুপক্ষীকে, গল্পও ভালোই বলেছেন, দোষের মধ্যে প্রত্যেক গল্পের শেষে 'অনস্বীকার্য' ভাবেই জুড়ে দিয়েছেন একটি উপদেশ—তাতেই তার শিল্পমূল্য বহুল পরিমাণে কমে যায় নি কি ?)

মুখে মুখে প্রচলিত গল্প গাথা ছড়া কালে কালে লেখা হয়েছে। এ যাঁরা সম্পাদন ও সংকলন করেছেন, তেমন যোগ্যতার পরিচয় থাকলে, তাঁদের এক একজনকে বেদব্যাস বললেও খুব বেশি অত্যুক্তি হবে না। বাংলা সাহিত্যে দক্ষিণারঞ্জন মজুমদার এমনি একজন কৃতী ও প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী 'টুনটুনির বই'য়ে অনুরূপ চেষ্টাই করেছেন ; আরও অনেকে আছেন, সকলের নাম উল্লেখের প্রয়োজন এখানে নেই। 'বেড়াল ঠাকুর ঝি' বইটিতে বিভূতিবাবু এ সব পূর্বগামীদের অনুগমন করে নিঃসন্দেহেই বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বাড়িয়েছেন। এ বইয়ের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ মিথ্যা বলেন নি, এ গল্পগুলিতে আছে সাধারণ বাঙালির "ঘরকন্নার হাঁড়িকুঁড়ির অন্তরের কথা। ইহার মধ্যে মানবমনের যে প্রকৃতিপরিচয় পাওয়া যায় তাহারও আধার এই বাংলাদেশের গ্রামের অন্তঃপুরে। অবশ্য মানবপ্রকৃতি ভিতরে সকল জায়গাতেই সমান, কিন্তু তাহার বাহিরের চেহারাটা দেশভেদে অবস্থাভেদে ভিন্ন।" শিল্পমাত্রেরই আকর্ষণ, এ গল্পগুলিরও আকর্ষণ ; যেমন সেই সর্বজনীন ও সর্বকালীন প্রকৃতিতে তেমনি এই বিশেষ চেহারায় ও বিশিষ্ট ভঙ্গীতে। রূপ ও ভঙ্গীর সেই বিশিষ্টতা এই বাংলাদেশে বাঙালি সমাজের যুগ-যুগান্তরব্যাপী বিকাশেরই পরিণাম বলা যেতে। সমাজতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিতদের অনুসন্ধানের বিষয় এখানে নেই তা বলা যায় না, আর যথেষ্ট পরিমাণেই আছে শিল্পী ও শিশুমনের রসোপভোগের সামগ্রী। লেখক তাঁর বর্ষিয়সী কোনো আত্মীয়ার কাছে যেমন শুনেছেন ঠিক তেমনি ভাবেই লিপিবদ্ধ করেছেন বলে মূলের সৌন্দর্য কোথাও ক্ষুণ্ণ বা ম্লান হয়নি। মৌখিক সাহিত্যের বা কল্পকথার যে দ্বিতীয় পর্যায়ের উল্লেখ করা গেছে এ গল্পগুলি তারই অন্তর্গত বলা যেতে পারে। অর্থাৎ সর্বত্রই প্রায় আছে বিশুদ্ধ অর্থাৎ জ্বালা ও তিক্ততা-শূন্য কৌতুক ও হাস্যরস। রচনা গদ্যে ও ছড়ায়—সে অপূর্ব ছড়া অনামা মা, ঠাকুরমা, ঠাকুরদাদা ছাড়া আর কোনো কবি বা মহাকবি রচনা করতে পারতেন বলে মনে হয় না। এই সুন্দর লেখাগুলিকে সুন্দর ছাপায় ও ছবিতে সরূপ ও সুসজ্জিত ক'রে প্রকাশ ক'রে বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

আলোচ্য অন্য বইখানিতে বিশ্বভারতীর অন্য-এক অধ্যাপক সুনীলবাবু, একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে আমাদের চমক লাগিয়ে দিয়েছেন বলতে হবে। হঠাৎ আবিষ্কারের বিস্ময়ে আমার এক প্রবীণ-শিশু বান্ধব বললেন, এ বই বাংলা সরকারের রবীন্দ্র পুরস্কার পায় না কেন ? এই প্রশ্ন বা তার উত্তর নিয়ে মাথা না ঘামিয়েও এ কথা স্বতঃই মনে হয় এবং অকুণ্ঠস্বরে বলা যায় যে, মৌলিক শিশু বা কিশোর সাহিত্যে অলৌকিক-কলা-কুশলী

অবনীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায়, এবং 'কঙ্কাবতী' কাহিনীতে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় যে ধরণের রূপ ও রস সৃষ্টি করেছেন তার সমপর্যায়ের রচনা আর একবার দেখা গেল। প্রসঙ্গক্রমে বলা বাহুল্য হবে না, রবীন্দ্রনাথকে আমরা কবি, মনীষী, জীবনদর্শন ও জীবনশিল্পের গুরু ও ব্যাখ্যাতা হিসাবে এত বড়ো বলেই জানি, তিনি যে আপন মধ্যাহ্নদীপ্তিকে অনেকটা সংবরণ ক'রে অথবা সপ্তবর্ণ ছটাছত্রে বিশ্লিষ্ট ও বিকীর্ণ ক'রে—'ছড়ার ছবি' (বিশেষ স্মর্তব্য 'যোগিন্‌দা' কবিতা), 'খাপছাড়া', 'সে', 'গল্পসল্প' এবং 'ছড়া' বইগুলিও লিখেছেন এ কথা ভুলে যাই। এই সব বইয়ের অধিকাংশ গল্পে কবিতায় কবি অকৃপণ হাতে বিতরণ করেছেন তাঁর 'লক্ষ্যহীন' খেয়ালখুশির সম্পদ, তাঁর আরো-সত্যের অজস্র পশরা। তা ছাড়া 'সহজ পাঠ'-এ এবং সাময়িক পত্রে চলন্ত কোলকাতার বর্ণন, গন্ধমাদনধারী হনুর বিশ্বরূপ-অঙ্কন, অন্যান্য অপ্রচারিত আখ্যান, খাপছাড়া খেয়ালী অথচ অর্থগূঢ় কল্পনার বিচিত্র বিলাসে আশ্চর্য-জনক। * তা হলেও এ কথা নিশ্চয় বলা চলে যে, শিশু বা কিশোর-সাহিত্যে মৌলিক অথচ সুন্দর রচনা সংখ্যায় বেশি হবে না। তা যদি না হত তা হলে এমন বিশাল ইংরেজি সাহিত্যেও *Alice in Wonderland, Through the Looking Glass, Gullivers' Travels* এমন কয়েকখানি বইয়ের উল্লেখ করার পরেই ইত্যাদি বলে তাড়াতাড়ি থেমে যেতে হত না। রবিন্‌সন্‌ক্রুশোর কাহিনীও চিত্তহারী, কিন্তু সেখানে নেই কল্পনার জলে স্থলে শূন্যে সমান স্বচ্ছন্দ-বিহার। বাংলা ভাষার ঐশ্বর্য্য স্বরূপ 'শিশু' আর 'শিশু ভোলানাথ' গ্রন্থও আমরা এ প্রসঙ্গে উল্লেখের বিষয় বলে মনে করি নে, একেবারে অন্য এক কারণে। সেখানে শিশুসাহিত্য আর বিশুদ্ধ সাহিত্যের অন্তর্বর্তী ভেদরেখা একেবারেই লুপ্ত হয়েছে ; সে যেন একেবারেই আর এক পর্যায়ের রচনা।

বিশেষ গ্রন্থটির আলোচনায় ফিরে আসা যাক। লেখক উৎসর্গপত্রের 'ছেলেমানসি প্রণাম'-এ জানিয়েছেন এবং না জানালেও আমাদের বুঝতে কিছু মাত্র দেরি হত না যে, তাঁর বেশি বয়সের অন্তরে সজীব কৌতূহল নিয়ে চির-ছেলেমানুষটি ক্রীড়াশীল আছে। তিনি বিভিন্ন আখ্যান-শৃঙ্খলায় যে অখণ্ড গল্পটি বলে গেছেন তা চিরকালের কথা আর একালের ও এদেশের অর্থাৎ বাংলার শহর ও পল্লীর বিশেষ ছাপ উভয়ই আছে। অবশ্য, গল্পটি বিশেষ ভাবে জমেছে পল্লীর পরিবেশেই। কারণ, এর কুশীলব বলতে কেবল কালো ধোলো এ দুই ভাই নয়, সেই সঙ্গে আছে বাঘা কুকুর যে কালোদের সংসারে এক রকম জোর জুলুম করেই চাকরি বাগিয়ে নেয়, তা ছাড়া পিতৃদত্ত নাম না থাকলেও বিধি এবং বিধাতাকল্প লেখক-দত্ত স্ব-রূপ ও স্ব-ভাব নিয়ে কত যে পশুপাখি—ফর্দ না বানালে তাদের সংখ্যা বলা মুশকিল। এই শেষোক্তদের মধ্যে যেমন আছে অবিশ্বস্ত বেড়াল, তেমনি আছে চড়াই শালিখ টিয়ে, গাধা গোরু ষাঁড়, ভেড়া ছাগল শেয়াল, সাপ ব্যাঙ, এবং আর একটি ব্যক্তি যে বলে—

---

* সম্প্রতি অন্নদাশঙ্কর রায় ও অজিত দত্ত একখানি করে ছেলেদের ছড়ার বই প্রকাশ করেছেন ; কবিত্বে, কল্পনায় ও কারুতে এগুলিও উল্লেখযোগ্য উৎকর্ষে উপনীত হয়েছে সন্দেহ নেই।

ছিট্‌কোকিলের নাম শুনেছেন বাবু ?
আজ্ঞে আমি ছিট্‌কোকিলের বাবা।

এদের প্রত্যেকেরই এক আঁচড়ে চেনা যায় এমন বিশেষ চরিত্র এবং বিশেষ ভাষা আছে। চালাক চড়াইগুলো যখন চার দিকে চড়্‌বড়িয়ে ডাকাডাকি করে—

চ চ চ চ ঃ
চ চ চ চ ঃ
সভা! সভা!

বাচাল অথচ আড়বুঝো শালিখেরা বলে—

কী কী কী কী
কিছু-কি কিছু-কি

আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই—

যাক্‌ যাক্‌ যাক্‌ যাক্‌!

তখন জানি এরা কেউ আরবি ফার্সি পড়ছে না। একেবারে অকৃত্রিম আপন আপন জবানি। ব্যাঙ বলে—

গ্যাঙ্‌, গ্যাঙোর্‌ গ্যাঙ্‌!

দশ দিক থেকে দশ টিক্‌টিকি—

ঠিক ঠিক ঠিক ঠিক!

কখনো বা—

ধিক ধিক ধিক ধিক!

আরও হাজারও আলাপ-আলোচনা তর্কবিতর্কের আড়ালে বেড়াল বৈতালিকের করুণ একতান জোনাকি-জলা অন্ধকারে বাক্‌গ্রাউণ্ড্‌ মিউজিক্‌ জোগায়—

ও মিঞাও! ও মিঞাও!

সমস্ত ব্যাপারটা অদ্ভুত ভাবে সত্য আর কল্পিত তো বটেই, একান্ত শ্রুতিগ্রাহ্য আর দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে সে বিষয়েও সন্দেহ নেই।

এই সুপরিকল্পিত গল্পটিতে কেবল যে রূপরস কল্পনার ও কৌতুকের সত্যতা আছে তা নয়, অনুভব এবং ভাবনার যাথার্থ্যও বিস্ময়কর। মেটার্‌লিঙ্কের 'নীলপাখি' গল্পে অলৌকিক প্রতিভা-উদ্ভূত জীবনদর্শনের যে পরিপূর্ণতা ও যে কবিত্বময় প্রকাশ আছে তেমন কিছু নাইবা থাকল, তবু মানুষ আর পশুপক্ষী উভয়ের মধ্যে চিরকালীন দ্বন্দ্ব এবং সদ্ভাবের যে বিচিত্র ইতিহাস আভাসে ফুটে উঠেছে 'কালোর বই'-এর চিত্রপটে, তাও অপূর্ব ব্যঞ্জনাময়, ধ্বনিময়, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

গদ্যে ও পদ্যে লেখা। গদ্যাংশ এর যেমন পরিচ্ছন্ন, বাহুল্যভারহীন, পদ্যাংশ তেমনি পায়ে পায়ে পরিচিত হসন্ত শব্দের ঘুঙুর বাজিয়ে নাচতে নাচতে দ্রুত চলেছে। ভাষাশিল্পের কী দীর্ঘকালব্যাপী সাধনায় এমন আয়াসচিহ্নহীন সহজ সিদ্ধি মিলেছে তা কেবল শিল্পীরাই বুঝবেন। যেহেতু মননশীল মানবের চেয়ে প্রাণচঞ্চল প্রাণীদের আলাপেই এর প্রায় সবটা

গাঁথা, ধ্বনি-অনুকারী শব্দের হরিরলুট দিয়েছেন লেখক পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে; তার বারো আনাই যে তাঁর নিজের বানানো এবং সার্থক এটিও কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়।

এ বইখানির একটি নাট্যরূপের প্রচারও বিশেষ বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়। লেখক প্রথম-প্রকাশিত রচনাতেই আমাদের যেভাবে চমৎকৃত করেছেন নূতন নূতন রচনা দিয়ে সে চমৎকারকে বাড়াতেও কার্পণ্য করবেন না, এ প্রত্যাশা করি।

কানাই সামন্ত

বিদীর্ণ—গোলাম কুদ্দুস। সাধারণ পাবলিশার্স। দাম দুই টাকা।

কুদ্দুসের কবিতা পড়ে যাঁরা এতোদিন উৎসাহিত হয়েছেন এবার তাঁরা এই কবির কাব্যমূল্য সম্পর্কে খানিকটা স্পষ্ট ধারণা করতে পারবেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, 'বিদীর্ণে' কুদ্দুস তাঁর সব ভালো কবিতা সংকলন করেননি, যদিও এ বইতে যেসব কবিতা আছে তা' প্রায় বিগত দশ বছর ধরে লেখা। 'চতুরঙ্গে' প্রকাশিত 'পঙ্কজ', 'হাড়মাংস সংবাদ' 'রূপায়নে' প্রকাশিত 'লাভা' কেন বাদ পড়েছে? আর একটা বইতে ছাপা হবে বলে কী? অথবা কুদ্দুস এই লেখাগুলোর মূল্য সম্পর্কে সন্দিহান? সম্ভবত তাই। নইলে ভালো কবিতা রেখে এতোগুলো দুর্ব্বল কবিতা তিনি এ সংকলনে ঢোকালেন কেন? নিজের সবচেয়ে সুন্দর এবং সুনির্ব্বাচিত কবিতা বাছাই করাই নিশ্চয় তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো, অন্ততঃ লেখক প্রথম বইটা যে তার লেখার একটা প্রতিনিধিত্বমূলক সংকলন করতে চাইবেন সেতো একান্তই স্বাভাবিক। তাড়াহুড়ো করে যেমন তেমন একখানা বইতো তিনি বের করেননি। দীর্ঘ দশ বছর লেখার পর কুদ্দুসের এটা প্রথম বই। তাই একথা মনে না করে উপায় নেই যে কুদ্দুস এই লেখাগুলোকেই তাঁর সেরা লেখা বলে মনে করেন। এবং এই কবিতাগুলো দিয়েই তিনি পরিচিত হতে চান। এটা যদি নিতান্তই কুদ্দুসের ব্যক্তিগত রুচিবোধের প্রশ্ন হতো, তা'হলে অবশ্যি বলার কিছুই ছিলনা। কিন্তু কুদ্দুসের মনের পিছনে কাজ করছে তাদের নিষেধ—যারা মনে করেন আজকের কবির একমাত্র বিষয়বস্তু রাজনীতি এবং যে রচনা রাজনীতিবিবর্জ্জিততা সাহিত্য-পদবাচ্যই নয়। আজকের মানুষের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক অবশ্য আগের কালে যা ছিলো তার চেয়ে অনেক বেশী নিবিড় এবং প্রত্যক্ষ, কিন্তু তবু রাজনীতি এখনও মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের কেবল একটা অংশই ছুঁয়ে গেছে, সবটা নয়। তাই সাহিত্য এবং কাব্যের কারবার যদি হয় মানুষ নিয়ে তা'হলে তা কিছুতেই মানুষের এই খণ্ডিত পরিধি নিয়ে খুসী থাকতে পারেনা। সামাজিক সম্পর্কের রূপ একটা নয়, হাজারটা। সমাজ সচেতন লেখককে তার সবগুলোর খোঁজ রাখতে হবে। তা' করলে 'বিদীর্ণে' কুদ্দুস ভিন্ন বিষয়বস্তু-

সম্বলিত আরও কিছু ভালো কবিতা ছাপতে পারতেন এবং বইটা অনেকখানি জঞ্জালের হাত থেকে রেহাই পেতো। প্রমাণ 'চারা' কবিতাটা। ষ্টালিনের ওপর লেখা কবিতাটা নিশ্চয়ই ব্যঙ্গ কবিতা নয়। কিন্তু—

……মজুরের বাচ্চা এক, নাম তার কমরেড্ ষ্টালিন,
নিজহস্তে বহুকষ্টে তালচারা লাগিয়েছে বহুরাত্রিদিন
সেই বুড়ো আজকাল
গাছ থেকে পেড়ে খায় পাকা পাকা তাল।

এসব লাইন পড়ে সন্দেহ লাগে। গ্রাম বাংলার একটা বহুপ্রচলিত প্রবাদ বাক্য নিয়ে কুদ্দুস খুব সহজ করে, সকলের বোঝাবার মতো করে, অত্যন্ত দরদ দিয়ে কবিতা লিখতে গিয়েছিলেন কিন্তু ফল যা' হয়েছে তা' মারাত্মক। এক একটী বিশেষ শব্দ শুধু তার অর্থপ্রকাশই করেনা, অর্থের সঙ্গে বয়ে আনে হাজারো অনুসঙ্গ। বিশেষ করে কাব্যে। তাই শব্দচয়ণের ওপর কবিতার ভালোমন্দ অনেকখানি নির্ভর করে। কুদ্দুসের কান একদিকে খুব সজাগ বলে মনে হোলো না। 'মজুরের বাচ্চা' কথাটা আমাদের মনে যে অনুরণন তোলে সে সম্পর্কে সচেতন থাকলে কুদ্দুস এই ভাষায় তাঁর রাজনৈতিক আদর্শের নাম নিতেন না। শুধু তাই নয়। ভাষা ব্যবহারেও কুদ্দুসের শিথিলতা চোখে পড়ে। চল্‌তি ভাষা পড়তে পড়তে হঠাৎ সাধু ভাষার ক্রিয়াপদের সঙ্গে ধাক্কা খেতে হয়। যেমন—

ভদ্দর লোকের ছেলে
আদর্শের নৌকো ঠেলে ঠেলে
মাঝে মাঝে হয়ে পড়ে ক্লান্ত

যে কবিতা এই রীতিতে শুরু, তা'তে যখন পড়ি—

সে দেশ যে কতদূরে কে বলিবে হাত দিয়ে বুকের ওপরে

অথবা

তবুও ক্ষেতের প্রান্তে জলচারা পুঁতিতে পুঁতিতে

তখন তাঁর অসাবধনাতায় আশ্চর্য্য হই। তবে কী 'মরিতের' সংগে মিলের জন্য 'পুঁতিতে' ব্যবহার করেছেন কবি। কিন্তু 'বলিবে'র জায়গায় 'বলবে' লিখলে তো ছন্দ পতন হতোনা।

ছন্দের গোলমালও চোখে পড়েছে।

আমি না খাই খাবে আমার নাতিপুতি এসে

পয়ারের নিয়মে এই লাইনের পূর্ব্বভাগ নির্ভুল নয়। ছন্দে লিখলে লেখা উচিত ছিলো

আমি না খাইতো খাবে আমাদের নাতিপুতি এসে।

কুদ্দুস মোটামোটি ছুটি ছন্দ ব্যবহার করেন। প্রথমতঃ পয়ার, দ্বিতীয়তঃ সমিল গদ্য। পয়ারে তাঁর হাত বেশ ভালো। প্রমাণ 'একজনের জন্মদিনে' অথবা 'সোনার চাঁদ ছেলেরা সব'। নিছক পদ্যের কাঠখোট্টামি এবং সনাতন কাব্যের একঘেয়ে কাব্যিকপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

করেই কাব্যে সমিল গদ্য ছন্দের প্রবর্ত্তনা। আমার বিশ্বাস বাংলা কবিতার মুক্তি বাঁধা ছন্দের বাধা ভেঙ্গে। চলতি বাংলা যেমন গদ্যকে বাঁচিয়েছে, তেমনি পদ্যকেও বাঁচতে হলে চলতি রীতি মানতে হবে। কাব্যের ভাষা যদি লৌকিক ভাষা থেকে খুব বেশী দূরে সরে থাকে তাহলে তা কিছুতেই মানুষের মনের দরজায় পৌঁছবেনা। ইংরেজীতে গদ্য এবং পদ্যের ভাষা কাছাকাছি। বাংলা কাব্যের ঝোঁকটাও সেইদিকে। কুদ্দুসের কাব্যপ্রচেষ্টার যতখানি খোঁজ রাখি তা থেকে মনে হয় তাঁর মনও একসুরে বাঁধা। কিন্তু আদর্শের প্রয়োগের বেলায় তার প্রায়ই গোলমাল হয়ে যায়। নইলে 'যদি দেশ বেঁচে থাকে পূর্ণ হবে শূন্য বক্ষতল'এর সঙ্গে 'ফসল ফলিবে মাঠে' অথবা 'রক্ত দিয়ে অশ্রু দিয়ে এইবার শুধিবার আসিয়াছে দিন' কি করে লিখলেন? 'ফলিবে', 'আসিয়াছে', 'শুধিবার' যদি হয় তাহলে 'বাঁচিবে' নয় কেন? মনে হয় কাব্যের আঙ্গিকের চেয়ে বক্তব্যের দিকেই কুদ্দুসের ঝোঁক বেশী। কিন্তু বিষয়বস্তু নতুন হলে আঙ্গিকের চেহারা বদলও অপরিহার্য্য। যেমন—

অথবা কেউ কেউ দেখে দেখে দেখে সমাজের এ দুঃস্থ চেহারা
ভেবে ভেবে দিশেহারা
অতঃপর তালতলার পীরসাহেবের কাছে আসেন
ঘরে ফিরে স্ত্রীপুত্রকে জন্তুর মত ভালবাসেন
আর গদ গদ হৃদয়ে শোনেন ইসলামী-গান
কিম্বা বিকালে সব কাজ ফেলে
মোহামেডান স্পোর্টিং এর খেলা দেখতে যান।

অথবা

মানুষের ভয়ে তাই মানুষ পালায়
ভীড় করে হাওড়ায় শিয়ালদায়
আর লাটসাহেব ঠাট করে
দিল্লী থেকে কলকাতায় আসেন
কেননা আমাদের তিনি বড্ড ভালবাসেন।

এসব লাইনের তীক্ষ্ণ শাণিত ব্যঙ্গ উপভোগ্য।

'বিদীর্ণে'র মূল সুর 'বিশ্বাস'। কুদ্দুসের মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই। সামাজিক মানবিক সব প্রশ্নের জবাবই তাঁর কাছে জলের মতো স্পষ্ট। তাঁর সৌভাগ্যে ঈর্ষা হয়। তবু তিনি যখন আশ্চর্য্য মাত্রাবৃত্ত ছন্দ লেখেন।

পিতৃপুরুষ সহজ কথাটা শিখিয়েছেন,
জীবদ্দশায় কিছু চাই জল, কিছু চাই তাজা অক্সিজেন!
আমাদের তাই মেঘধরা আর বায়ুভরা কিছু পত্র চাই
উদ্যান নয় পল্লবঘন দিগন্ত ছাড়া উপায় নাই……
করাতটা ভেঙ্গে কাস্তে গড়াও এবার যখন জ্বলিবে কাঠ
করাতে নয় কাস্তের দাঁতে হাসে ফসলের সোনালি মাঠ।

অথবা

জানি জানি একদিন
অবশ্যই উদ্বেলিত জনতার সমুদ্রে সঙ্গীণ
লাগিবে বিপ্লব বন্যা। চন্দ্রে চন্দ্রে লাগিবে গ্রহণ।

তখন তাঁর হৃদয়াবেগ আমাদেরও ছুঁয়ে যায়, সংশয় কেটে যায়।

'করাতি' কবিতাটি বাংলা কাব্যের একটি উজ্জ্বল মণি। বক্তব্যের বলিষ্ঠতায়, প্রকাশের প্রখরতায়, সংহত হৃদয়াবেগে কবিতাটি অনিন্দ্য কিন্তু 'বিদীর্ণে' কুদ্দুস প্রায়ই আবেগের তোড়ে ভেসে গেছেন, বিশ্বাস বক্তৃতায় অধঃপতিত হয়েছে।

রাস্তার মোড়ে শহরে ও গ্রামে
লক্ষ লক্ষ প্রহরী বসাও
কোটি কোটি চোখ তুলে চাও
যেখানেই সাপ আর বিচ্ছুকে পাও
গলা টিপে মারো, মারো, মারো।

অথবা

যে ডাকে এশিয়ায় কেঁপে উঠেছিলো সাম্রাজ্যবাদী শয়তান—
বাঙ্গালী বিহারী মাদ্রাজী পাঞ্জাবী মারাঠ গুজরাটি সিন্ধি পাঠান।

ফিরিস্তীর মতো শোনায়। মনে হয় খবরের কাগজ পড়ছি। 'বিদীর্ণ' বড্ড বেশী সাংবাদিক, সাময়িক। সম্ভবত এটাও ইচ্ছাকৃত। কুদ্দুস কবি হতে চাননা, কর্মী হতে চান। কিন্তু লেখাটাও কি কাজ নয়?

আবুল হোসেন

India Since Partition *by* Andrew Mellor. Turnstile Press. London. *7s. 6d.*

নাম দিয়ে যে সব বই পাঠকের কৌতুহল এবং আগ্রহ সৃষ্টি করে *India Since Partition* সেই ধরণের বই। কিন্তু তা মেটাতে হলে যে গুণ থাকা দরকার আলোচ্য বইখানিতে তার একান্ত অভাব। প্রকাশনের তারিখ ১৯৫১, নামও ঈঙ্গিত করে যে, বইখানি অতিসাম্প্রতিক কালের বিবরণ। বস্তুত ১৯৪৯ সালের পরের ঘটনা এতে স্থান পায়নি। ইতস্তত ১৯৫০ সালের ঘটনার কিছু প্রক্ষেপ আছে। কিন্তু তার কোন অচ্ছেদ্য যোগ নেই সারা বইখানার সঙ্গে। সম্ভবত বইখানি লেখা হয়েছিল অনেক আগে এবং কোন কারণে হয়তো প্রকাশ হতে দেরী হয়ে গিয়েছে।

লেখক *Daily Herald* পত্রিকার সংবাদদাতা হিসেবে এ-দেশে দু'বছর ছিলেন।

কাজেই পত্রিকার রাজনৈতিক মতের ছাপ পেলে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নেই। রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তরের বিবরণও খুব বিষয়নিষ্ঠ হয়েছে বলতে পারিনা। তবে বিশ্লেষণের অংশ বাদ দিয়ে নিছক ঘটনাপরিবেশনে লেখকের কোন পক্ষপাতিত্ব ঘটেনি।

এ-দেশে যাঁরা নিয়মিত সংবাদপত্র পড়ে থাকেন তাঁদের কাছে নতুন কিছু বইখানিতে নেই। বিদেশী পাঠক হয়ত নতুন কিছু পেতে পারেন। তাঁরা নতুন কিছু না পেলেও অন্তত ধারাবাহিক বিবরণ এক জায়গায় পারেন। তবে ছাপার ভুল ও তথ্যগত ভুল আছে। ছাপার ভুলের দৃষ্টান্ত—ডাস্ট্-কভারে যে পুস্তক পরিচয় দেওয়া হয়েছে তাতে লাইন ঠিক নেই। লাইন ওলটপালট হওয়ার জন্যে অর্থবোধ হতে অসুবিধে হয়।

তথ্যগত ভুলের দৃষ্টান্তও সহজেই দেওয়া চলে। আমাদের দেশে নদী খরস্রোতা হয় বর্ষায়, শীতে নয়। অথচ ১০৭ পৃষ্ঠায় দেখতে পাই, লেখক বলছেন যে শীতে এদেশের নদীতে তীব্র স্রোত দেখা যায়, আর গ্রীষ্মে তা যায় শুকিয়ে। আবার যেমন ধরা যাক নদী পরিকল্পনার সুফল। ভাক্‌রা-নঙ্গল, মহানদী, দামোদর, তুঙ্গভদ্রা পরিকল্পনা কার্যকরী হলে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে তার পরিমাণ লেখক ঠিকমত দেননি, অনেক বাড়িয়ে বলেছেন। এ-দেশ থেকে কাপড় রপ্তানীর পরিমাণও যথাযথভাবে দেওয়া হয়নি। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ইংরিজী অর্থ লেখক যা করেছেন (৩৪ পৃষ্ঠা) তাও ভুল। দামোদর পরিকল্পনা কার্য্যকরী হলে যে সমস্ত জমিতে সেচের ব্যবস্থা হবে তার সমস্তটাই বিহারে নয়। কিছুটা অংশ পশ্চিম বাংলায়। অথচ এ-বই পড়ে মনে হয় দামোদর পরিকল্পনায় পশ্চিম বাংলার জমিতে সেচের কোন সুবিধে হবেনা (১০৭ পৃষ্ঠা)।

এ ছাড়াও অনেক রকমের ভুল বইখানাতে খুঁজে বের করা সম্ভব। কিন্তু তা দিয়ে সমালোচনার নিছক কলেবর বৃদ্ধিই করা হবে।

ইন্দ্রদত্ত সেন

অগ্নিসম্ভব—গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য। মিত্রালয়। সাড়ে চার টাকা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'দিবারাত্রির কাব্যে'র পাণ্ডুলিপি কয়েক বছর ফেলে রেখেছিলেন। অসমসাহসীরও অন্তত কিছুদিন থমকে থাকবার প্রয়োজন হয়েছিলো সেদিন: বাংলা সাহিত্যে সে-বই দিয়ে স্যুররিয়ালিজমের শুরু। 'অগ্নিসম্ভবে' অবশ্য স্যুররিয়ালিজমের ছোঁয়া নেই। অতিবাস্তব তো নয়ই, বরঞ্চ, লেখক বলছেন, তাঁর বইয়ের পাত্রপাত্রীরা একান্তই ছিলো 'কল্পনা-পথের মানসে'। সুতরাং বলতে হয় রোমান্টিক উপন্যাস। এবং সেজন্যেই এধরণের গ্রন্থে স্খলনসম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল। সমকালীন সমাজকোলাহলের সঙ্গে ব্যক্তিগত ঘটনাসম্পাত ঘটিয়ে উপন্যাস প্রযোজনার প্রয়াস অনেকই তো হয়েছে, হচ্ছে: কলমের যথেষ্ট কুশলতা-তীক্ষ্ণতা না-থাকলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ সমস্ত কাহিনী উৎরোয়না। গৌরীশঙ্কর

বাবুর বইতেও এমন-কোনো বিদ্যুচ্চমক নেই যা হৃদয়কে আবেগের শুদ্ধতায় সংহত রাখতে পারে।

অথচ মাঝে-মাঝে মনে হয় তিনি যেন গভীরে প্রবেশ করতে চাইছিলেন, দ্বিধাহীন নির্লজ্জ মূলে। সত্তার আবরণগুলো খুলে নিয়ে দ্বিতীয় সমরোত্তর বাঙালি মানসকে উদ্ঘাটন করবার চেষ্টা—রমিতা চরিত্রে মাঝে-মাঝে কল্পনা-আবেশের সঙ্গে অতিবাস্তবের ধৃতি এসে মিশেছে। কারণ আসলে অতিবাস্তবতাও কল্পনার সমকেন্দ্রিকতায় নির্ভরশীল অন্যতম বৃত্ত মাত্র। কিন্তু নিরীকার পথে এগোতে লেখক হয়তো কলঙ্কভয় পেলেন, অথবা, অধিকতর সম্ভবত, নির্মিতিকে সৃষ্টির পর্যায়ে ওঠাতে যে পটুতার প্রয়োজন সেটার অভাব। সুতরাং শেষ পর্যন্ত কোনোই-অর্থ-হয়না-গোছের একটা অস্পষ্ট যবনিকাতেই 'অগ্নিসম্ভব' রুদ্ধ হয়ে রইলো।

তাহলেও, অনুকূল-মেরীঘটিত আবেগ-আলেখ্যটির উল্লেখ করতে হয়—অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল একটি আকাশের ছায়া সেখানে।

অশোক মিত্র

অনিবার্য্য কারণবশতঃ এবার 'চিত্রকলা' প্রকাশিত হলো না।

Printed and Published by Atawar Rahman at Sri Gouranga Press, 5, Chintamani Das Lane, Calcutta.